পশ্চিমের জানালা

তপোধীর ভট্টাচার্য

জীবনের শেষ নেই, পড়ার শেষ নেই। তাই তত্ত্বের শেষ নেই, যুদ্ধেরও শেষ নেই। অবিভাজ্য মানববিশ্বের অধিবাসী আমরা প্রত্যেকে। তাই মানুষের জগতের কোনো অর্জন, কোনো উদভাসন আমাদের পক্ষে দূরবর্তী নয়। পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার ঃ লিখেছিলেন বাংলা ভাষার মহত্তম কবি। বাঙালির মনন পর্বে-পর্বে উৎসুক ভাবে সাড়া দিয়েছে যখনই পশ্চিমে অভিনব কোনো জীবনদর্শন কিংবা তত্ত্বভাবনা অথবা অসম্পূর্ণ কোনো সাহিত্যকৃতি সূর্যের উজ্জ্বল অনুভব ছড়িয়ে দিয়েছে। গত তিন দশকে জীবন যত জটিলতর হয়েছে, তত্ত্ববিশ্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচ্ছুরণ থেকে বাঙালিও মননের নতুন আয়ুধ সংগ্রহ করেছে। নীৎশে-কিয়েৰ্কেগার্দ, সার্ত্র-বোভোয়া, ফুকো-দেরিদা, লাকাঁ-একো কিংবা হ্যামলেট-ফাউস্ট, বাডেনব্রুকস্ -ওয়েটিং ফর গোডো বাঙালির মনোভুবনেও আলো-ছায়ার দ্বিরালাপ তৈরি করে চলেছে। এই বইতে ধরা রইল সেই আগ্রহেরই নিদর্শন

পশ্চিমের জানালা

তপোধীর ভট্টাচার্য

একুশ শতক
১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

PASCHIMER JANALA a collection of essays on
Western Theoreticians and Creative Texts
by Tapodhir Bhattacharjee

প্রথম প্রকাশ : ১৪১৯

© স্বপ্না ভট্টাচার্য

প্রকাশক
একুশ শতক
সুমিত্রা কুণ্ডু
১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ
মনীষ দেব

মুদ্রক
গীতা প্রিন্টার্স
৫১এ, ঝামাপুকুর লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মূল্য : ৩০০ টাকা

উত্তর-প্রজন্মের প্রতিনিধি
আমার মামামণি, জেঠন ও বাবাসোনা
ঋতম, তায়ন, অত্রি, ঐশ্ব, অয়ন, অরিন্দম, তাতার-এর জন্যে

প্রাক্‌কথন

যে-সময় পেরিয়ে যাচ্ছি এখন, তথ্যের চমকপ্রদ বিস্ফোরণে হারিয়ে যাচ্ছে বিস্ময়, পরম্পরাবোধ, গভীরতার তৃষ্ণা। মেঘ না চাইতেই জল নয় শুধু, বর্ষা নেমে আসছে। তাতে জিজ্ঞাসা নেই, জিজ্ঞাসা নির্মাণের অধ্যবসায় নেই। আধুনিকোত্তর কৃষ্ণবিবরে মিলিয়ে দেওয়ার জন্যে আত্মহননের বৌদ্ধিক মাদকে আচ্ছন্ন হওয়া আছে বরং। বিশ্বায়ন সব শিকড়বাকড় উপড়ে ফেলছে বেপরোয়া আগ্রাসনে, উন্মাদের পাঠক্রম রচিত হচ্ছে সর্বত্র। আমাদের স্মৃতি নেই, পরম্পরা নেই, লক্ষ্য নেই, দায়বোধ নেই। পৌর সমাজের ওপর এমনভাবে আক্রমণ নেমে এসেছে যে ভূগোল-ইতিহাস দিয়ে গড়া স্বাতন্ত্র্যের সৌন্দর্য মুছে যাচ্ছে।

এখন আমরা শুনছি প্রতীত বাস্তবতা (ভার্চুয়াল রিয়্যালিটি), প্রতীত পরিসর, প্রতীত সময়, প্রতীত বয়ানের কথা । এদের অভিঘাতে যথাপ্রাপ্ত অবস্থান হয়ে উঠছে শূন্যের চেয়েও রিক্ত। অথচ আমরাই সদর্থকভাবে বিশ্বনাগরিক হতে পারতাম। বলতে পারতাম, বিমানবায়ন থেকে নির্মাণবায়ন প্রক্রিয়ার চোরাবালিতে নিমজ্জিত হওয়ার চেয়ে ভালো বিকল্প আমাদের জানা ছিল। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর লাতিন লেখক টেরেন্স এই বীজমন্ত্র দিয়েছিলেন : 'Homo sum, humani nihil a me alienum puto' অর্থাৎ 'মানুষ আমি, মানুষের পৃথিবীতে কোনো কিছুই আমার দূরবর্তী নয়'। নয়ই তো। তাই সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, সমাজতত্ত্বে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ সক্রেটিস-প্লেটো- অ্যারিস্টটল-নিউটন-আইনস্টাইন-মার্ক্স-বাখতিনের মতো অসংখ্য চিন্তাবিদ্‌দের আত্মস্থ করে নিয়েছে।

সমস্তই মানববিত্ত, সব কিছুতেই আমাদের উত্তরাধিকার স্বতঃসিদ্ধ বলেই কালে-কালান্তরে অনবরত প্রসারিত হচ্ছে মানব-সম্পদের সমৃদ্ধি। এই ধারা যতদিন অক্ষুণ্ণ থাকবে, আলোকযোদ্ধারা কখনও অন্ধকারের কাছে হার মানবে না। আর, যেমন ভেবেছিলেন টেরেন্স, ভারতীয় উপমহাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাসিন্দা হয়েও, আমরা হতে পারব বিশ্বনাগরিক। নেতি ও নৈরাজ্যের বিশ্বায়ন যত উৎকট হোক, নিরন্তর নবায়মান জিজ্ঞাসাই হবে আমাদের প্রতিরোধ আর বিকল্প জীবনবীক্ষার ইস্তাহার।

কত বিচিত্রভাবে দেখা যায় জীবনকে, তৈরি করা যায় মনন ও কল্পনার কত অজস্র সৃজনশীল প্রতিবেদন : বহুবাচনিক এই সত্যের আভাস পাওয়ার জন্যে পড়ব প্রতীচ্যের ভাবুকদের, স্রষ্টাদের রচনা। বুঝব, জীবনের কত লীলা আর মানুষের কত রূপ। হয়তো এতে নিজেদের অজ্ঞাতসারে পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠা রক্ষণশীলতা ও কূপমণ্ডূকতার নিশ্চল অভ্যাস কেটে যাবে। শুনতে পাব মহাসমুদ্রের চলোর্মি আহ্বান। আত্ম-প্রতারক সমঝোতা-প্রবণতার দুঃসহ ঘোর ভেঙে যাবে তখন। আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় যে কাঁটাঝোপ ও ক্যাকটাসের চাষ হয়ে উঠেছে অবাধ অগাধ, তার উপর ভোগোন্মত্ত আধুনিকোত্তরবাদের প্রচ্ছায়া আরোপিত হওয়ার ফলে ছিন্নমূল ব্যক্তিসত্তা

কি অতলান্ত সংকটের মুখোমুখি, কোথাও কি রয়েছে কোনো বিশল্যকরণী : এই বিহ্বল প্রশ্নাবলি উঠে আসবে বিভিন্ন চিন্তাপ্রস্থান থেকে। এইজন্যে পড়া, এইজন্যে লিখন-প্রয়াস। শরিক হওয়ার জন্যে, শরিক করার জন্যেও।

পড়াও যুদ্ধ। নেতিবাদ ও নৈরাজ্যপন্থার বিরুদ্ধে, উৎকট মূল্যবোধহীনতা ও জৈব সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। সমস্ত তাৎপর্য তাই নিঃসন্দেহে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জনীয়। এই পাঠ জীবনের, এই পাঠ সাহিত্যের। এভাবেই যাবতীয় অন্তর্ঘাত ও বিদূষণের বিরুদ্ধে দাঁড়াব আমরা। নির্মাণ করব আমাদের অনুভব-স্থাপত্য, মননবিশ্ব ও বিশ্বাসের ত্রিপাদভূমি। অনিবার্য এখন নতুন দ্রাঘিমার আবিষ্কার, অপরাজেয় আলোর কথকতা। যত পড়ি তত বুঝি নিজেকে আর চারদিকে সৃজ্যমান জগৎকে। লিখি পুরোনোকে নতুন চোখে দেখার কথা, পুরোনোর ঝরে যাওয়া আবার নতুন প্রকরণে ফিরে আসার কথাও। লিখি নতুনের বিহ্বলতা, স্ববিরোধ আর ব্যাসকূট নিয়ে। লিখি যে তীব্র সংঘর্ষের কুহকে সত্তা আর সত্তা নেই। জগৎও জগৎ নেই। এবং লিখি, তত্ত্ববীজদেরও আছে গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত-বসন্ত। শেষ আছে সব কিছুর, শুধু মানুষের শেষ নেই কোনো।

মানুষ এবং তার অন্তর-বাহির নিয়ে কত গ্রন্থনা তাত্ত্বিকদের, স্রষ্টাদের। যত দেখি তত দৃষ্টির পরিধি বেড়ে যায়। যত অধ্যবসায় এই প্রক্রিয়ায়, তার চেয়ে বেশি আনন্দ ; এই জেনেছি তত্ত্ববিশ্ব ও সৃষ্টিবিশ্ব পরিক্রমায়। ছোটো পত্রিকার সহযোদ্ধা সম্পাদকেরা চেয়েছিলেন, তাই এইসব লেখাপত্র; একথা এখানে না-লিখলেই নয়। তাঁদের সঙ্গে আমার নিরবচ্ছিন্ন দ্বিরালাপের নিদর্শন এই নিবন্ধ সংকলন, 'একুশ শতক'-এর অনুজ-প্রতিম কর্ণধার অরুণ কুণ্ডুর সদিচ্ছায় যা প্রকাশিত হচ্ছে। সৎ প্রকাশনা-মনস্ক তিনি ; মানব-বিদ্যার আরেক পরিসরে সম্প্রসারিত হলো তাঁর কৃৎকুশলতা। ভরসা করি, এই প্রকাশনা নতুন সূচনাবিন্দুর স্মারক বলে বিবেচিত হবে অচিরেই। আর, উল্লেখ থাকুক আমার অনুজপ্রতিম কবি অধ্যাপক সুমন গুণ ও স্নেহভাজন সন্দীপ দে-র অকুণ্ঠ সহায়তার কথাও। প্রুফ সংশোধনের নানা পর্বে সাহায্য করেছে আমার ভগিনী শ্রীমতী শিপ্রা চক্রবর্তী এবং স্নেহাস্পদ সঙ্গীতা গোয়ালা, চন্দ্রিমা রায়, সুস্মিতা চন্দ ও অধ্যাপক রামী চক্রবর্তী এবং যার সহযোগিতা ছাড়া কোনো উদ্যম সম্পূর্ণ হয় না কখনও, তিনি।

যে-কথা আগেও জানিয়েছি, তা-ই-আরও একবার জানাই : তত্ত্ব নয়, পড়াই কঠিন। পড়া শিখতে হয়। যে-মানুষ খবরের কাগজ পড়ে, সেই মানুষ একই ভঙ্গিতে উপন্যাস বা কবিতা পড়ে না ; তেমনই পড়ে না অনুসন্ধিৎসা-খচিত প্রবন্ধ। এইজন্যে সকলেই পাঠক নয়, কেউ কেউ পাঠক।

অবশ্য, এখানে একটুখানি সংশোধনী প্রস্তাব করতে চাইছি। পড়ার যুদ্ধে সবাইকে পাঠক হিসেবে চাই ; কেননা আমাদের অন্বিষ্ট সর্বমানবিক অভিজ্ঞান।

১৫ ডিসেম্বর, ২০১১

তপোধীর ভট্টাচার্য

বয়ানক্রম

তত্ত্ব ও তাত্ত্বিক

নীৎশে ও প্রত্ন-আধুনিকোত্তর পরানন্দন ... ১১
কিয়ের্কেগার্দ : অস্তিত্বের নান্দনিক নির্মাণ ... ২৬
ভাষাচিন্তার নানা দিগন্ত : সোস্যুর থেকে দেরিদা ... ৪৩
অ্যাডোর্নোর নন্দনভাবনা ও তত্ত্ববিশ্ব ... ৫৯
সার্ত্রের সাহিত্যচিন্তা ... ৭৪
ঔপনিবেশিক গ্রন্থনা : সার্ত্রের প্রতিস্পর্ধা ... ৮৪
নখদর্পণে প্রতিবিম্ব : প্রসঙ্গ লাকাঁ ... ৯৬
বোভোয়ার নিজস্ব পরিসর ... ১১০
আলত্যুসের, ভাবাদর্শ এবং প্রসঙ্গকথা ... ১২২
উমবের্তো একো, তাঁর চিহ্নবিশ্ব ... ১৩৮
চিহ্নবিজ্ঞান, কথনবিশ্ব ও পাঠকের নির্মিতি ... ১৫৪

সৃষ্টি ও স্রষ্টা

হ্যামলেটের অণুবিশ্ব : বিনির্মাণের খসড়া ... ১৭৫
ডন কিহোতে, সময়ের এপার থেকে ... ১৮৮
ফাউস্ট : একটি পাঠ-প্রস্তাবনা ... ১৯৮
টমাস মান : নির্বাসিত সত্তার কথাকার ... ২২১
অস্তিত্বের শূন্যতা ও ভাঙা জগৎ : ব্যর্থতার উপন্যাসীকরণ ... ২৩৪
স্যামুয়েল বেকেট : অস্তিত্বের নিষ্কর্ষ সন্ধান ... ২৪৩
সারামাগোর আখ্যানবিশ্ব ... ২৫৩
ওরহান পামুক, তাঁর ভাবনাবিশ্ব ... ২৭৫
ঈগলটনের কুন্দেরা-পাঠ : বিলম্বিত পুনর্ভাষ্য ... ২৯৪

তত্ত্ব ও তাত্ত্বিক

নীৎশে ও প্রত্ন-আধুনিকোত্তর পরানন্দন

নীৎশে 'The will to power' বইতে লিখেছেন : That the value of the world lies in our interpretation..... that every elevation of man brings with it the overcoming of narrower interpretations; that every strengthening and increase of power opens up new perspectives and means believing in new horizons—this idea permeates my writings.' (১৯৬৭:৩৩০)

জগতের মূল্য নির্ভর করে আমাদের বিশ্লেষণী ভাষ্যের ওপর—বয়ান হিসেবে এ যেন আমাদের সমকালীন উচ্চারণের সঙ্গে মিলে যায়। সংকীর্ণতার ভাষ্যের বৃত্ত যখনই ভাঙে মানুষ, উত্তরণের নতুন সোপানে পৌঁছে যায়। ক্রমাগত নতুন প্রেক্ষিত, উপকরণ ও দিগন্ত উন্মোচিত করেই মানুষ নিজেকে প্রসারিত করতে পারে। হঠাৎ করে যখন পড়ি, যে-কোনও উদ্ধৃতিযোগ্য বাচনের মতোই মনে হয় এই বক্তব্যকে। তাহলে সময়ের অভিজ্ঞান-নিরপেক্ষ ভাবেই কি ভাষ্যের ওপর ভরসা করব আমরা? বিশেষত সাম্প্রতিক নির্মাণবায়ন প্রক্রিয়া দ্বারা আক্রান্ত প্রতিজগতে বাস করে আধুনিকোত্তর চিন্তাপ্রণালীর সঙ্গে এর সঙ্গতিসূত্র কীভাবে খুঁজব! এই খোঁজার প্রশ্ন উঠছে এইজন্যে যে ফুকো, লিওতার ও বদ্রিলারের মতো আধুনিকোত্তর তত্ত্বদ্রষ্টাও সরাসরি বা পরোক্ষভাবে নীৎশের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন।

সত্তরের দশকে মিশেল ফুকো চিন্তার প্রত্নতত্ত্ব থেকে বস্তুর উদ্ভবক্রম বিষয়ক ভাবনায় বিবর্তিত হচ্ছিলেন এবং বিভিন্ন বস্তুগত প্রতিষ্ঠান ও প্রতাপের প্রকরণ সম্পর্কিত তাত্ত্বিক সন্দর্ভ তৈরি করছিলেন। ফলে, সব মিলিয়ে দেখা দিচ্ছিল প্রতিবেদনের নতুন আদল। ১৯৭১ সালে 'Nietzsche, Genealogy and History' নিবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন নীৎশের ভাববীজ কীভাবে আধুনিকোত্তর চিন্তাপ্রণালীর পক্ষেও প্রাসঙ্গিক। অর্থাৎ অনেক পুরোনো তত্ত্বচিন্তারও যুগোপযোগী পুনর্নির্মাণ সম্ভব— তা তিনি প্রমাণ করতে চাইলেন। তাঁর প্রত্নতত্ত্বাশ্রয়ী বিশ্লেষণ ঐ পর্যায় থেকে পরিচালিত হবে 'in relation to the will to knowledge' (১৯৭৭ :২০১) এবং তার প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভূত প্রতাপের বিচ্ছুরণ পরিমাপের জন্যে—এরকম একটা বিবৃতি দিলেন তিনি। নৈতিকতা, সাধুতা, বিচার ও শাস্তির উদ্ভবক্রম সম্পর্কে নীৎশের বয়ান অনুসরণ করে ফুকো অপরিচিত, বিস্মৃত, বর্জিত ও প্রান্তিকায়িত প্রতিবেদন গড়ে-ওঠার ইতিহাস রচনা করতে চেয়েছেন। উন্মত্ততা, ভেষজবিদ্যা, শাস্তিপ্রকরণ ও যৌনতার প্রতিবেদনে স্বতন্ত্র ইতিহাস ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি যেভাবে পর্যালোচনা করেছেন তিনি, তাতে কেউ কেউ নীৎশের দূরবর্তী ছায়া দেখতে পেয়েছেন। ফুকো যখন জানান যে তিনি চান 'insurrection of subjugated knowledge'(১৯৮০ : ৮১) আর তিনি 'tyranny of

globalizing discourses'(তদেব : ৮৩) এর বিরোধী— বিস্মিত হই। কিন্তু সম্ভবত এও আধুনিকোত্তর চিন্তাপ্রণালীর কেন্দ্রস্থিত অপরতা কিংবা অপরতার সম্ভাবনার প্রতি তর্জনি সংকেত। নীৎশে বিপ্রতীপ দর্পণ হিসেবে সেই পরিসরের বার্তাবহ যেন।

বদ্রিলার ইদানীং আমাদের যে চিহ্নখচিত অধিবাস্তবের মায়াজগৎ সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছেন, তাতে প্রতিবেদনের অন্বিষ্ট ও আশ্রয় হতে পারে শুধু পরানন্দন। ফুকো-লিওতার-দেরিদা তাঁদের নিজস্ব ধরনে এই পরানন্দনের আদল তুলে ধরেছেন। এ এক নতুন প্রদেশ যার হদিশ পাওয়ার জন্যে বর্তমান কাল ও পরিসরের সীমা পেরিয়ে যেতে হয়। নইলে এযুগের তাত্ত্বিকেরা স্পিনোজো, হিউম, কাণ্ট, নীৎশে, বের্গসঁ, প্রুস্ত, মার্ক্স প্রমুখ চিন্তাবিদের বয়ান পুনঃপাঠ করতে চাইতেন না। গ্রহণ বা বর্জনের প্রশ্ন এখানে বড় নয় তত। লক্ষণীয় হচ্ছে এই যে অতিসাম্প্রতিক চিন্তাচেতনায়ও নীৎশের মতো দিক্‌পাল মনীষীর প্রাসঙ্গিকতা পুনর্নির্ণীত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। গিলে দেলেউজ ও ফেলিক্স গুয়াত্তারি লিখেছিলেন: 'We live today in the age of partial objects, bricks that have been shattered to bits, and left overs.... We no longer believe in a primordial totality that once existed, or in a final totality that awaits us at some future dates' (১৯৮৩ :৪২)! এ যুগ আংশিক বস্তুর যুগ, এই মন্তব্য যেন বদ্রিলারের পরিপূরক। পুঞ্জীভূত বস্তুর উপস্থিতি সত্ত্বেও সম্পূর্ণতার আদল কিছুতেই ফুটে ওঠে না। সমস্ত নির্মিতি থেকে খসে পড়ছে পাঁজর; ভোজসভার বাইরে কাঙাল ও কুকুরেরা যেভাবে উচ্ছিষ্ট নিয়ে কাড়াকাড়ি করে, ঠিক তেমনি একালের মানুষেরা যেন ভাঙা দালানের নোনা-ধরা ইটের পাঁজার ফাঁকে-ফোকরে অনির্দেশ্য প্রাপ্তির আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দেলেউজ এই মন্তব্যের ছ' বছর আগে জানিয়েছিলেন, তত্ত্ব সমগ্রীকরণের পক্ষপাতী নয়; তা বিস্তারের আয়ুধ এবং নিজেকেও অনবরত বিস্তারিত বা পরিবর্ধিত করে। প্রতাপের স্বভাবই হলো সমগ্রীকরণ। অতএব তত্ত্ব স্বভাবত প্রতাপের প্রতিস্পর্ধী (১৯৭৭ : ২০৮)। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কথাটির চমৎকারিত্ব ও অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা আমাদের ভাবিত করে। বিশেষত তত্ত্বের মৌল অনেকান্তিকতা সম্পর্কিত প্রত্যয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য দেলেউজের 'Nietzsche and Philosophy' বইটি (মূল ফরাসি : ১৯৬২, ইংরেজি ভাষান্তর : ১৯৮৩) নবায়মান চিন্তাবিশ্বের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ষাটের দশকের ফ্রান্সে মার্ক্সবাদ যখন সার্ত্র ও আলত্যুসেরের মধ্য দিয়ে জীবন ও জগতের সঙ্গে ভাবাদর্শের নতুন অন্বয়সূত্র খুঁজে নিতে চাইছিল, সে-সময় ফরাসি বুদ্ধিজীবীদের অন্য একটি গোষ্ঠী মার্ক্স-হেগেল-দ্বন্দ্ববাদের বিকল্প সন্ধান করছিলেন। পার্থক্য-প্রতীতি সম্পর্কিত নতুন ধরনের অদ্বন্দ্ববাদী তত্ত্ব ফুকো, দেরিদা ও দেলেউজের মধ্যে ক্রমশ রূপ নিচ্ছিল।

আকরণোত্তরবাদ ও আধুনিকোত্তরবাদের পক্ষে যা মৌল অবলম্বন, তেমনি এক পার্থক্যবাদী যুক্তি-শৃঙ্খলার তত্ত্ব গড়ে তোলার কাজে নীৎশের অলক্ষ্য প্রেরণা কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল। ইতিমধ্যে জিদ, বাতেইল, ব্লাশোঁ প্রমুখ চিন্তাবিদদের কল্যাণে নীৎশের

চিন্তাধারা ফ্রান্সে পুনর্বিবেচিত হতে শুরু করেছিল। দেলেউজের প্রাগুক্ত বইটি সমসাময়িক ফ্রান্সের তত্ত্ববিশ্বে নীৎশেকে দার্শনিক হিসেবে নতুন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। লুক্রেতিয়াস, স্পিনোজা, হিউম, বের্গসঁ ও নীৎশের মতো দার্শনিকদের মধ্যে দেলেউজ দর্শনের ইতিহাসের সেইসব প্রধান স্থপতিদের দেখতে পেয়েছিলেন যাঁরা অংশত বা সামগ্রিকভাবে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। দেলেউজের মতে এইসব চিন্তাবিদেরা পরস্পরের সঙ্গে এমন একটা গোপন গ্রন্থিতে যুক্ত— 'Which reside in the critique of negativity, the cultivation of joy, the hatred of interiority, the exteriority of forces and relations, the denunciation of power' (১৯৭৭ : ১১২)

এই মন্তব্যের শেষ অংশে প্রতাপের প্রত্যাখ্যান সম্পর্কিত যে-চিন্তাসূত্রটি রয়েছে, তা আমাদের আলাদাভাবে লক্ষ করতে হয়। নীৎশের মতো দেলেউজও বিশ্বাস করতেন যে দর্শনের প্রধান ভূমিকা সমালোচনাত্মক অর্থাৎ তার সবচেয়ে ইতিবাচক স্বভাব ব্যক্ত হয় যথাপ্রাপ্ত পরিস্থিতি বা চিন্তার সমালোচনা উপস্থাপনায়। কোনো কিছুর স্বরূপ যদি জ্যোতির্বলয়ে আবৃত হয়ে যায়, তাকে ছিন্নভিন্ন করা দর্শনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। দেলেউজের ভাষায় এই প্রক্রিয়া হল 'an enterprise of demystification' (১৯৮০:১৫৩)। নীৎশের প্রতিবেদনে এই প্রক্রিয়ার অভিব্যক্তি লক্ষ করেই দেলেউজের মতো আধুনিকোত্তরবাদী তাত্ত্বিকেরা তাঁর রচনার পুনঃপাঠে মনোযোগী হয়েছিলেন। দ্বন্দ্বমূলক চিন্তাধারাকে আক্রমণ করে নীৎশে পার্থক্য, হয়ে ওঠা ও মূল্যায়নের এমন-এক বিকল্প তত্ত্ব নির্মাণ করতে চাইছিলেন যার শিকড় প্রোথিত রয়েছে প্রাকৃতিক ও জৈবশক্তির গভীরে। নীৎশের বাচন অনুসরণ করেই দেলেউজ বহুবাচনিকতার গৌরব প্রচার করেছিলেন এবং দ্বন্দ্ববাদকে সমগ্রবাদী ও সংকোচনবাদী চিন্তাপ্রণালী হিসেবে আক্রমণ করেছিলেন।

দুই

দেলেউজ যেভাবে নীৎশের ভাষ্য করেছিলেন, তাতে দেখতে পাচ্ছি, বাস্তবতা হলো এই পৃথিবীর সংগঠক চলিষ্ণুতার অভিব্যক্তি যা অন্তর্বৃত ইচ্ছায় পরিচালিত হয়ে থাকে। সত্তার অনড় প্রাতিষ্ঠানিক দর্শন ও অধিবিদ্যা প্রত্যাখ্যান করে নীৎশে ভেবেছিলেন, বিভিন্ন শক্তি একে অপরের সঙ্গে বৈরিতামূলক সম্পর্কে সক্রিয় থাকে। একদিকে অনুজ্ঞা এবং অন্যদিকে মান্যতা সমাজে যে বহুস্তরান্বিত সাংগঠনিক আকল্প তৈরি করে, পীড়ন-ভিত্তিক সম্পর্কের শেকড় তারই মধ্যে রয়েছে। সামাজিক, রাজনৈতিক, জৈবিক, রাসায়নিক—সমস্ত সংস্থাই আধিপত্যবাদী ও অবদমিত শক্তির আন্তঃসম্পর্কের দর্পণে সংজ্ঞায়িত হতে পারে। মানুষের পৃথিবীতে যাদের উচ্চতর ও নিম্নতর, সক্রিয় প্রতিক্রিয়া-প্রবণ বর্গ বলে জানি অর্থাৎ একদিকে যারা অস্তিত্বকে স্বীকৃতি জানায় ও শক্তির মূল্যবোধকে ঊর্ধ্বায়িত করে এবং অন্যদিকে যারা দুর্বলতার নৈতিক ব্যাখ্যা কিংবা সমর্থন খোঁজার ছলে তাকে অস্বীকার করে—তাদের অন্তর্বর্তী ভিন্নতাই জীবন

ও জগতের বহুবাচনিকতার আকর। প্রতাপে পরিণত হওয়ার আকাঙ্ক্ষাই জীবন্ত শক্তিপুঞ্জের মধ্যে ভিন্নতা আনে এবং এই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবতারও ব্যাপকতম অন্তঃসার। দেলেউজ লিখেছেন, 'The monism of the will to power is inseparable from a pluralist typology.' (১৯৮৩ : ৮৬)। কথাটা স্পষ্টতই নীৎশের ভাবনায় অনুপ্রাণিত। মূল বক্তব্য হল, এই আকাঙ্ক্ষা সংশ্লেষণী শক্তিও বটে যা জগতে বিচিত্র সম্পর্কের বিন্যাস তৈরি করে এবং সমস্ত বস্তুতে থাকে অন্তঃসলিলা হয়ে। এই পৃথিবীতে শক্তির বহুবাচনিকতাকে খর্ব করা যায় না কখনো।

নীৎশের বহুবাচনিকতাবাদ পার্থক্যবিষয়ক দ্বন্দ্ববাদী তত্ত্বের তুলনায় স্বরূপেই আলাদা। একে আমরা গ্রহণ করব কি করব না, এই বিচার আপাতত করছি না। দেলেউজ নীৎশের ভাবনাকে আরো বিকশিত করতে গিয়ে পুরোপুরি নতুন চিন্তার কক্ষপথ তৈরি করেছিলেন কিনা—এই প্রশ্নের উত্তরও মুলতুবি থাক। আকাঙ্ক্ষা ও পার্থক্য-প্রতীতির নিষ্কর্ষ সম্পর্কেও নানা জিজ্ঞাসা মনে দেখা দেওয়া সম্ভব। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে ষাট ও সত্তরের দশকে দেলেউজ যখন আধুনিকোত্তর জ্ঞানতত্ত্বের প্রকল্প নির্মাণ করেছিলেন, নীৎশের প্রেরণা তাঁর কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। এই জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কে স্টিভেন বেস্ট ও ডগলাস কেলনের বলেছেন যে তা হলো, 'non-essentialist, non-representational, pluralist, anti-humanist and resolutely anti-dialectical in character' (১৯৯১:৮২)। কীভাবে দেলেউজ আত্তীকৃত করেছেন নীৎশেকে, এ বিষয়ে তাঁদের মন্তব্যও প্রণিধানযোগ্য, 'The dynamism of Nietzsche's account of power and his valorization of active forces is transcoded in Deleuze's early works and collaborations with Guattari as a theory of constitutive desire that champions desire's productivity and condemns the social forces that seek to weaken and immobilize it.'। আধুনিকোত্তর জ্ঞানতত্ত্বের তন্তু দিয়ে যেহেতু গড়ে উঠেছে আধুনিকোত্তর পরানন্দনের বয়ান—পরাপাঠের উৎসে নীৎশের উপস্থিতির তাৎপর্য আমাদের ভেবে দেখতেই হয়। সত্তর দশকের শেষে দেলেউজ ও গুয়াত্তারির যৌথ প্রচেষ্টায় যখন আকাঙ্ক্ষা ও পার্থক্যের নতুন আধুনিকোত্তর তত্ত্বদর্শন ও রাজনীতির অন্যোন্য-সম্পর্ককে গরীয়ান করে তুলছিল, আকাঙ্ক্ষার অণু-রাজনীতি ও মনোবিকলনগত চিহ্নতত্ত্বের অভিনব ধারণা ক্রমশ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল। তাৎপর্যের উপস্থাপনাবাদী প্রকল্প ('representational schemes of meanings') প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মধ্যেই পরানন্দনের বীজাধান হলো—এমন বলা যায়।

নীৎশের চিন্তাবীজ এখানেও সক্রিয়। উপস্থাপনার আলোচনা করতে গিয়ে তিনি সেইসব বাস্তববাদী তত্ত্বপ্রস্থানকে আক্রমণ করেছিলেন যাদের মতে ভাষা-সংস্কৃতি-শরীর সংস্থানের হস্তক্ষেপ ছাড়াই বিষয়ী জগৎকে চিন্তায় যথাযথভাবে প্রতিফলিত বা উপস্থাপিত করতে পারে। তাঁর মতে, উপস্থাপনাবাদী প্রকল্প ও সচেতন অস্তিত্বের উপরে শরীর ও শারীরিক শক্তি এবং আকাঙ্ক্ষা প্রাধান্য বিস্তার করে। আমরা যখন আধুনিকোত্তর

তত্ত্ববিশ্বের দিকে তাকাই, বুঝতে পারি, জগতের ধারণা প্রতিবেদন ও সামাজিকভাবে নির্মিত বিষয়ীসত্তা দ্বারা পরিশীলিত হচ্ছে। সমস্ত ধরনের চিরাগত প্রাতিষ্ঠানিকতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করা সত্ত্বেও অবশ্য নব্য-রক্ষণশীলতার উদ্ভব সম্পর্কে কিছু বেয়াড়া বিতর্ক উঠে এসেছে। তবু, একথা নিশ্চয় বলা যায়, 'Anti-Oedipus', 'Capitalism and Schizophrenia', 'A Thousand Plateaus' ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এমন অনেকান্তিকতার তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়েছে যাকে কখনো সমগ্রীকরণের আওতায় আনা যাবে না। আধুনিকতাবাদ ও মনোবিশ্লেষণবাদের সম্ভাব্য যুক্তিজাল ছিন্ন করে দেলেউজ ও গুয়াত্তারি শেষ পর্যন্ত নিজস্ব যে-কক্ষপথ তৈরি করতে পারলেন, সেখানে পৌঁছাতে নীৎশে তাঁদের সাহায্য করেছিলেন। পার্থক্য ও বহুবাচনিকতার ধারাবাহিক ঊর্ধ্বায়ন যেন আধুনিকোত্তর পাঠকৃতি, তত্ত্ব ও রাজনীতির নতুন ধরনের প্রয়োগ-কৌশল। তাঁরা লিখেছেন: 'In truth, it is not enough to say 'long live the multiple' difficult as it is to raise the cry. No typographical, basical, or even syntactical cleverness is enough to make it heard. The multiple must be made'. (১৯৮৭: ৬)। শেষ বাক্যটি আসলে চিন্তার বীজতলি। কীভাবে, কেন, কাদের জন্যে নির্মিত হবে বহুত্ব এবং কী বা তার সত্তাতাত্ত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক তাৎপর্য— এই বিচারে ও বিতর্কে আমাদের প্রণোদিত করে বাক্যটি।

প্রকৃতপক্ষে আজ যখন আমরা আধুনিকোত্তর চিন্তা-পরিধিতে সংলগ্ন থেকে নীৎশের পুনঃপাঠ করি, পুনর্বিচার এবং নবায়মান বিতর্ক অনিবার্য। ফুকো-দেলেউজ-দেরিদা-বদ্রিলার-লিওতার— যত গ্রহীতার কথা ভাবি না কেন, প্রত্যেকেই নিজস্ব পরিসরের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখেও নিজের জন্যে আলাদা- এক নীৎশেকে আবিষ্কার করে নিয়েছেন। পুনঃপাঠের ধরনটি মোটেই সরল ও রৈখিক নয়, বরং জটিল ও চক্রক। যে-সময়ে অসংখ্য অন্তঃস্বর, তাতে এটাই প্রত্যাশিত। জাঁ ফ্রাসোঁয়া লিওতারের একটি মন্তব্য সাধারণভাবে পাঠক্রিয়া এবং বিশেষভাবে নীৎশে-পাঠ সম্পর্কে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও জরুরি: 'What is important in a text is not what it means, but what it does and incites to do. What it does: the charge of affect it contains and transmits. What it incites to do: the metamorphoses of this potential energy into other things— other texts...' (১৯৮৪ : ৯-১০)। নিশ্চয়। কোন্ পাঠকৃতি থেকে কোন্ অর্থ পেতে পারি— তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রতিবেদন আমাদের কী করে বা কী করতে প্ররোচিত করে—সেটাই বিবেচ্য। অতএব নীৎশে পড়ে আজকের মানুষ হিসেবে আমরা কী ভাবতে ও করতে প্রণোদিত হই এবং কতটা প্রতিক্রিয়া তৈরি করার সম্ভাবনা তাতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে— তা আমাদের ভেবে দেখতে হয়। নীৎশের রচনায় যদি প্রত্ন-আধুনিকোত্তর প্রবণতা খুঁজে পাই, এ ব্যাপারে অনেকখানি সাহায্য করেন লিওতার। আকাঙ্ক্ষার রাজনীতি ও দর্শনে, খানিকটা নীৎশের ঘরানায় ইতিবাচক সন্দর্ভ তিনি লক্ষ করেছিলেন। 'Discourse figure' (১৯৭১), 'Derive a partir de Marse et freud' (১৯৭৩) 'Economie libidiane' (১৯৭৪) থেকে

প্রখ্যাত 'The postmodern Condition' (১৯৮৪)-তে পৌঁছাতে পৌঁছাতে লিওতার বৃত্তাকার পথে বিবর্তন সম্পূর্ণ করলেন যেন। সক্রিয় রাজনীতিতে একদা যিনি অংশ গ্রহণ করেছেন, তিনি সেই পথ থেকে সরে এসে পুরোদস্তুর বৌদ্ধিক জীবনে আত্মনিয়োগ করলেন। মার্ক্স ও ফ্রয়েডের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েও তিনি যে প্রকটভাবে আক্রমণাত্মক নীৎশে-চিন্তাধারায় নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারলেন—তাতে অত্যন্ত মৌলিক কোনো সংকটের ছবি আভাসিত হলো কিনা, এই জিজ্ঞাসা এড়ানো যায় না। হয়তো এতে ব্যক্তির নয়,অনিকেত সময়ের দ্বারা অধিকৃত বর্গের পরিসরই দ্যোতিত হলো। আমরা শুধু লক্ষ করব, লিওতার যেন সময়-নির্ধারিতভাবেই দেলেউজ ও গুয়াত্তারির চিন্তাবৃত্তে সংলগ্ন হলেন। তাঁদেরই মতো নীৎশে উদ্ভাবিত শক্তি নিবিড়তা-প্রতিক্রিয়ার দর্শনের শরিক হয়ে ক্রমশ আকাঙ্ক্ষার দর্শন ও রাজনীতি গড়ে তুললেন।

অন্যান্য তাত্ত্বিকের তুলনায় লিওতার শিল্প ও নন্দন সম্পর্কে অনেক বেশি ওয়াকিবহাল। শুধু বিষয় নয়, ভঙ্গিও নান্দনিক উপলব্ধি দ্বারা পরিশীলিত। চিহ্নায়ন প্রকরণ সম্পর্কে তাঁর অভিনিবেশ একমাত্র বদ্রিলারের সঙ্গে তুলনীয়। নতুন তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত তৈরি করার জন্যে তিনি যে প্রথম থেকেই সচেষ্ট, তা 'Discourse, figure' (১৯৭১) বইতে লক্ষ করি। এতে তিনি সোস্যুর, লাকাঁ, হেগেল, মের্লো পঁতি, ফ্রয়েড প্রমুখ তাত্ত্বিকদের সমালোচনা করে নতুন ধরনের রচনানীতি ও সীমাতিযায়ী নন্দন বিকাশের জন্যে চেষ্টা করেছেন। ডেভিড ক্যারল যাকে 'পরানন্দন' (Paraesthetics: London: 1987) বলেছেন, লিওতার তারই আদল তৈরি করার জন্যে নীৎশের চিন্তাবিশ্বে পরিক্রমা করেছেন। ইন্দ্রিয়ানুভূতি, চিত্রলতা ও অভিজ্ঞতার চেয়ে কোনো বিমূর্তায়ন বা ধারণা বড়ো নয় কিংবা পাঠকৃতি ও প্রতিবেদনের গুরুত্ব বেশি নয়— এই হলো লিওতারের অভিমত। স্টিভেনবেস্ট ডগলাস কেলনের পরানান্দনিক প্রয়াসকে এভাবে বর্ণনা করেছেন— 'Which turns art against theory by using the figures, forms and images of art to subvert and overthrow theoretical positions.' (১৯৯১ :১৪৯)। এই বক্তব্য কতদূর সমর্থনযোগ্য, তা আলাদা কথা। কিন্তু লিওতার যে ইন্দ্রিয়ানুভূতির ওপর প্রলম্বিত বাচনের ধূসর প্রচ্ছায়া সরিয়ে দিতে চাইছেন (১৯৭১ :১১) এবং আকরণোত্তরবাদী বয়ানভাবনার বিপরীত মেরুতে দাঁড়াতে চাইছেন— তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তত্ত্বের উপর শিল্পকলা ও কল্পনার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তিনি, এমনকি, চিহ্নতত্ত্বের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী অবস্থানের আদলও খুঁজে পেয়েছেন। এই বয়ানে যখনই তিনি আকাঙ্ক্ষার দর্শনের কথা উত্থাপন করেছেন, নীৎশের ছায়া ক্রমশ গাঢ়তর হয়ে উঠেছে।

তিন

দেলেউজ ও গুয়াত্তারি যদিও কোনো-কোনো আকাঙ্ক্ষায় ফ্যাসিবাদী প্রবণতা লক্ষ করে তাদের প্রত্যাখ্যান করেছেন, লিওতার কিন্তু ইতিবাচক ও নেতিবাচক আকাঙ্ক্ষার

মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখাননি। সমস্ত আকাঙ্ক্ষাই তাঁর কাছে বরণীয় যদি তা নিবিড় অভিজ্ঞতার সন্ধান দেয়, পীড়নের পরিস্থিতি থেকে মুক্তির পথ দেখায় এবং সৃষ্টিচেতনা উন্মুক্ত করে। তিনি মনে করেন, প্রতিবেদনে যতটুকু আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়, তা ভাষার নিজস্ব নিয়মে রুদ্ধ ও আকরণের প্রতি অনুগত। আকাঙ্ক্ষার প্রবাহ ও নিবিড়তাকে নিশ্চল, স্থবির ও অসাড় করে দেয় যেসব তত্ত্ব, তাদের সঙ্গে প্রতিবেদনকে মিলিয়ে নিয়েছেন লিওতার। স্বভাবত এই বক্তব্য সম্পর্কেও অনেক প্রতিপ্রশ্ন উঠে আসতে পারে। এখানে তার প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র এই প্রশ্ন করা যেতে পারে যে ভাষার মৌল অস্তিত্ব ও চিহ্নতাত্ত্বিক যুক্তিশৃঙ্খলা এড়িয়ে গিয়ে সরাসরি নিবিড়তার পরিসরে পৌঁছাতে পারে কি অনুভূতি? আর 'অচিহ্নায়ক উপকরণ' বলতে সত্যিই কিছু থাকতে পারে কি আদৌ? এখানে বদ্রিলারের কথা আমাদের মনে পড়ে যিনি সাম্প্রতিক জীবনের প্রতিটি অলিন্দে চিহ্নায়ন ও প্রতিরূপায়ণের অভিব্যক্তি দেখেছেন। ভোগবাদী সমাজে মূর্ত ও বিমূর্ত যখন পণ্যায়নের তুমুল আগ্রাসনে তুল্যমূল্য— নিবিড়তা বা মুক্তি বা আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে লিওতারের মতো নব্য-রোমান্টিক অবস্থান তিনি নিতে পারেননি। আসলে লিওতার মার্ক্স-ফ্রয়েড-মের্লোপঁতি হয়ে নীৎশের উপকূলে পৌঁছেছেন বলে তাঁর পরিক্রমায় প্রচলিত অর্থে রৈখিকতা নেই। তিনি নিজেও এ বিষয়ে সচেতন : 'If one had to enumerate the shares from which this boat set adrift and distance itself: a certain Freud; a certain Marx, a general notion of critique... an idea of transgression which belongs to the same sphere of critique.' (১৯৭৩ : ৯)। তিনি সেই আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি দেখতে পেয়েছেন শিল্পে যা ধারাবাহিকতার মধ্যে ছেদ এনে দেয় এবং ন্যায়বৃত্ত-শৃঙ্খলা-অভ্যস্ত পরম্পরার বর্তমান রাজত্বকে আক্রমণ করে। আর, স্বভাবত সীমাতিযায়ী হয়ে জীবনী শক্তির ইতিবাচক প্রকাশকে অবারিত করে। শিল্প মূলত সেই অবচেতন আকাঙ্ক্ষাকেই ব্যক্ত করে যা 'follows the uses of displacement, condensation and metaphoric transformation' (Best and Kellner :ibid)। এই বক্তব্যের সূত্রে আমরা পৌঁছে যাই আধুনিক ও আধুনিকোত্তর অনুভব-বিন্যাসের পার্থক্য-প্রতীতিতে, যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে পরানন্দন বিষয়ক ভাবনা। স্কট ল্যাশ (১৯৮৮ : ৩১৩) ভাষ্যের নন্দনের উপরে ইন্দ্রিয়বোধের নন্দনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আধুনিকোত্তর নন্দনের আদলে যে প্রচ্ছন্ন থাকে পরানন্দন, এর কারণ খুঁজতে হবে আধুনিকোত্তর অনুভবের মধ্যে। ল্যাশের বক্তব্য অনুসরণ করে বেস্ট ও কেলনের লিখেছেন : 'the modern sensibility is primarily discursive, privileging words over images, sense over nonsense, meaning over non-meaning, reason over the irrational and the ego over the id. The postmodern sensibility is, by contrast, figural and privileges a visual over a literal sensibility, figure over concept, sensation over meaning and immediacy over more mediated intellectual modes.' (তদেব:১৫১)

১৯৬৮ সালের ব্যর্থ ছাত্র অভ্যুত্থান পারী নগরের অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের মতো লিওতারের ভাববিশ্বেও মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। অবশ্য তাঁর ক্ষেত্রে রূপান্তর রৈখিকভাবে ঘটেনি। ১৯৭০ সালে 'On Theory' শীর্ষক সাক্ষাৎকারে লিওতার জানিয়েছিলেন, তত্ত্বের কাজ শুধু বুঝিয়ে দেওয়া নয়, সমালোচনা করাও। অর্থাৎ যথাপ্রাপ্ত বাস্তবতা, সামাজিক সম্পর্কের বিভিন্ন বিন্যাস, বস্তুবিশ্ব ও অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক— সব কিছু সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলে ধরা এবং তাদের আমূল পুনর্বিন্যাস করাই তত্ত্বের লক্ষ্য। বিশেষত এটা ঘটে যখন প্রাগুক্ত প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গগুলি সহ্যের অতীত হয়ে ওঠে। প্রাধান্য-প্রবণ প্রতিবেদন ও প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি আনুগত্য সম্পর্কেই তিনি তীক্ষ্ণ প্রশ্ন তুলে ধরছিলেন। ক্রমশ অবশ্য তাঁর অন্বিষ্ট বদলে গেছে। আধুনিক ন্যায়বৃত্ত ও একীকরণ প্রত্যাশী দার্শনিক প্রকরণগুলিকে আক্রমণ করে তিনি নিবিড়তা, বহুবাচনিকতা, খণ্ডপরিসর ও ক্রমাগত অবস্থান পরিবর্তনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করছিলেন।

নিজের এই প্রবণতা সম্পর্কে পরে তিনি নিজেই বলেছিলেন: 'Only by my not mourning my powerlessness could another way of thinking be sketched out, I thought without justification, just as at sea a swimmer incapable of opposing the current relies on drifting to find another way out.' (১৯৮৮ : ৫৪)। পূর্ববর্তী অবস্থান থেকে তাঁর ক্রমাগত সরে যাওয়ার প্রবণতাকে 'Nietzschean drift' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 'Economie libidinale' (১৯৭৪) বইতে আধুনিকতাবাদী প্রতিবেদন থেকে তাঁর সর্বাধিক দূরত্ব সূচিত হলো। এতে মার্ক্সের বিরুদ্ধে ফ্রয়েডকে, ফ্রয়েডের বিরুদ্ধে মার্ক্সকে এবং মার্ক্স ও ফ্রয়েডের বিরুদ্ধে নীৎশেকে কাজে লাগানো হয়েছে। জীবন বিষয়ক দর্শন ও জীবনীশক্তির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার মধ্যে নীৎশের ছায়া লক্ষ করা যায়। লিওতার এই বক্তব্য পেশ করেছেন যে পরিবার, জীবিকাক্ষেত্র, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে আকাঙ্ক্ষাকে রুদ্ধ করে পীড়ন-প্রকরণে রূপান্তরিত করা হয়। সুনির্দিষ্ট বর্গ, মূল্যমান, প্রকরণ ও ব্যবহার-বিধিতে আকাঙ্ক্ষাকে সম্পৃক্ত করে নেয় আধুনিকতাবাদী তত্ত্বগুলি। লিওতার এরই বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার প্রয়োজনে নীৎশের চিন্তাবিশ্ব থেকে অন্তঃসার আহরণ করেছেন। নীৎশের বাচনের নিবিড় পুনঃপাঠ যে করেছিলেন তিনি, এর প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে সমসাময়িক রচনাগুলিতে।

নান্দনিক বিচারের ক্ষেত্রে এইসব ভাবনা কীভাবে আধুনিকোত্তর পর্যায়ের সূচনা করেছে, তার বিশ্লেষণ এখানে না করেও বলা যায়, পরাভাষা ও পরাবাচনের জন্যে উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল নীৎশের পুনঃপাঠের মধ্য দিয়েই। নান্দনিক রাজনীতি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে কতটা মর্যাদা পেতে পারে কিংবা নিবিড়তার সন্ধান কীভাবে যুক্ত হতে পারে উচিত ও অনুচিত বিচারের সঙ্গে, এ সম্পর্কে নানা তর্ক হতেই পারে। আমরা শুধু লক্ষ করব কীভাবে আকাঙ্ক্ষা ও জীবনীশক্তির ধারণার সঙ্গে আভাঁগার্দ শিল্পতত্ত্ব কিংবা সামাজিক চিহ্নতত্ত্বের আধুনিকোত্তর পর্যায়কে মিলিয়ে নিতে চান

লিওতার। শেষ পর্যন্ত তাঁর সিদ্ধান্ত যা-ই হোক, একধরনের মুক্ত বয়ানের প্রতীতি শিল্পকলা বা রাজনীতি বিষয়ক ধারণায় সম্পৃক্ত হয়ে যায়। লিওতারের বিশিষ্ট মনোভঙ্গির দৃষ্টান্ত হিসেবে এই মন্তব্যটি লক্ষ করতে পারি: 'Here are the men of profusion, the masters of today : marginals, experimental painters, pop, hippies and yippies, parasites, madmen, binned loonies. One hour of their lives offers more intensity and less intention than three hundred thousand words of a professional philosopher more Nietzschean than Nietzsche's readers.' (১৯৭৮ :৫৩)।

এই শেষ বাক্যটির সূত্রে লিখতে ইচ্ছে করে যে আধুনিকোত্তর পরানন্দনের বিশ্লেষণে আমরা, নীৎশের পাঠকেরা, লক্ষ করছি কীভাবে সমকালীন তত্ত্ববিদেরা নীৎশের চেয়েও বেশি মাত্রায় নীৎশীয় যুক্তিগুলি রচনা করে চলেছেন। সব মিলিয়ে, উনিশ শতকীয় পরম্পরা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন নীৎশের মধ্যে আমরা আবিষ্কার করছি প্রত্ন-আধুনিকোত্তর চিন্তাবিদের আশ্চর্য উপস্থিতি। আলোচনার পরবর্তী পর্যায়ে যাওয়ার আগে একটি কথা অবশ্য বলে নেওয়া ভালো। ফুকো-দেলেউজ-লিওতার-দেরিদা প্রমুখ তাত্ত্বিকের সমালোচনাত্মক কৃৎকৌশলকে নীৎশে-ঘরানার দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিপন্ন করা এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এইসব আধুনিকোত্তর চিন্তাবিদদের মধ্যে নব্য নন্দন বা শিল্পকলার বিকল্প তত্ত্ব রচনারও প্রকট অভিপ্রায় ছিল না। তবু তাঁদের তত্ত্ববিশ্বে গড়ে উঠেছে নীৎশে প্রভাবিত চিন্তাবৃত্তের পরিসর যেখানে পরাতত্ত্ব ও পরানন্দনের বীজগুলিও প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

চার

পরানন্দন বা Paraesthetics এর সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া হয়েছে : 'as a preposition, Greek 'Para' had the sense 'by the side of beside', whence 'along side of, by, past, beyond' etc. In composition it had the same senses, with such cognate adverbial ones as 'to one side, aside, amiss, faulty, irregular, disordered, improper, wrong' : also expressing subsidiary relation, alteration, perversion, simulation etc. Paraesthetics indicate something like an aesthetics turned against it, rely or pushed beyond itself, a faulty, irregular, disordered, improper aesthetics—one not content to remain within the area defined by the aesthetic. Paraaesthetic describes a critical approach to aesthetics for which art is a question not a given, an aesthetics in which art does not have a determined place or a fixed definition.'(১৯৭৮ : চৌদ্দ)। ডেভিড ক্যারল এই যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা অনুধাবন করলে বুঝতে পারি, প্রাতিষ্ঠানিক নান্দনিকতার আকরণোত্তর বিন্যাসই নয় কেবল, প্রতিস্পর্ধী অবস্থান হিসেবেই একে গ্রহণ করা

প্রয়োজন। আসলে নন্দন-চিন্তার অতিশৃঙ্খলিত ও অতিরৈখিক বদ্ধ স্বভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্যে এবং যুগপৎ অন্তর্বয়ন ও পরাপাঠের ওপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্যে পরানান্দনিক পরিসর কল্পনা করে নেওয়া হয়েছে। ফুকো-দেলেউজ-লিওতার-দেরিদা শিল্পকলা ও সাহিত্যে অন্তঃশায়ী জটিলতা, পরস্পর-বিরোধিতা ও অনেকান্তিকতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। নীৎশের ভাবনা আধুনিকোত্তর চেতনাবিশ্বেও পুনর্নির্মিত হতে পারে—এই উপলব্ধি পুনঃপাঠের মধ্য দিয়ে নীৎশের পুনরাবিষ্কার সম্ভব করে তুলেছে। নতুন নন্দন নির্মিত হলো কিনা কিংবা শিল্পের বিকল্প তত্ত্ব প্রস্তাবিত হলো কিনা—এই বিষয়টি তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। লক্ষণীয় আসলে এই: নীৎশের প্রভাবে আধুনিকোত্তর তাত্ত্বিকেরা শিল্প-ভাবনাকে প্রচলিত পদ্ধতির বাইরে কীভাবে কতটা নিয়ে যেতে পেরেছেন। একদিকে সীমার শাসন অস্বীকার করা এবং অন্যদিকে প্রকরণ ও অন্তঃসার সম্পর্কিত প্রচলিত সমস্ত অবস্থান থেকে সরে আসা খুব সহজ কথা নয়। নীৎশের চিন্তাপ্রকরণ থেকে এ বিষয়ে কী কী সূত্র পাওয়া গেছে, তা খুঁজে দেখাই আমাদের কাজ।

পরানন্দন মূলত সমালোচনাত্মক দৃষ্টিকোন থেকে নান্দনিক বয়ানকে স্পষ্টতর করে তোলে। এর কাছে শিল্পের কোনো নির্ধারিত অবস্থান বা অনড় সংজ্ঞা স্বীকৃত হয় না। আধুনিকোত্তর চিন্তায় শিল্প, এমন কি, নিজেরও তত্ত্বায়ন প্রতিরোধ করে এবং এইজন্য নানা ধরনের কৌশলে নিজের তাৎপর্য ও প্রয়োজন সম্পর্কিত যাবতীয় জিজ্ঞাসাকে তাত্ত্বিক উপস্থাপনার বাইরে নিয়ে যেতে চায়। দর্শনে ও ইতিহাসে 'শিল্পের অবসান' ঘোষিত হওয়ার পরে অর্থাৎ শিল্প ও সাহিত্যের দার্শনিক ও ঐতিহাসিক 'মৃত্যু' হওয়ার পরেও কীভাবে এরা বেঁচে থাকতে পারে—এই সংশয়িত প্রশ্নের পরস্পর-বিরোধী সমাধান পরানন্দনের সূত্রে পাওয়া যায়। দর্শন, ইতিহাস ও রাজনীতি থেকে শিল্প ও সাহিত্যের যত্নরচিত দূরত্ব কি চূড়ান্ত অথবা দূরত্বের অবভাস তৈরি করে অপ্রত্যাশিত পথে ঐসব পরিসরে পুনঃপ্রবেশের অবকাশ তৈরি হয়? নান্দনিক ও অনান্দনিক পরিসরের মধ্যে চিরাচরিত পার্থক্যকেও ইদানীং জিজ্ঞাসার বিষয় করে তোলা হচ্ছে। বিশেষত আধিপত্যবাদী সংস্কৃতিতত্ত্বের বিপ্রতীপে সাংস্কৃতিক রাজনীতির তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসাগুলি সমস্ত সীমান্তকে বিতর্কের বিষয় করে তুলেছে। সময়ের অপরিমিত জটিলতায় প্রতিটি যথাপ্রাপ্ত যখন অস্থির ও অনির্দেশ্য, পারস্পরিক অভিঘাতে এরা ক্রমাগত নিজেরাই নিজেদের রূপান্তরিত করে চলেছে। দর্শন-ইতিহাস-রাজনীতি-সমাজতত্ত্বের পরিসরে তত্ত্বের যে অচিন্তনীয় বিস্ফোরণ হয়ে চলেছে, তাতে 'সীমান্ত' শব্দটি নিরর্থক হয়ে পড়েছে। এরই সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে, কিংবা ঐসব তত্ত্বের দৃশ্য ও অদৃশ্য বিচ্ছুরণে প্রভাবিত হয়ে, রূপান্তরিত হয়ে চলেছে শিল্প ও সাহিত্যের তত্ত্বগুলিও। কাকে বলব নান্দনিক আর কাকেই বলব অনান্দনিক পরিসর! কারণ একে অপরের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে মৌল বিভেদের স্থানগুলিকে অবান্তর করে দিচ্ছে।

একদিকে নান্দনিক ও অনান্দনিক এবং অন্যদিকে নান্দনিক ও তাত্ত্বিক পরিসরের

জটিল আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আধুনিকোত্তর চিন্তাবিদেরা যে ধারাবাহিক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন, সেই প্রয়াসের প্রত্নরূপ খুঁজে পাই নীৎশের ভাবনায়। নান্দনিকতাবাদকে কেউ কেউ বলেছেন, 'mystification of the powers of literature' (তদেব: ১৫)। কিন্তু সেইসঙ্গে ভেবে নিতে হয়, শিল্প ও সাহিত্যের সার্বভৌমত্ব কতদূর স্বীকার্য! দর্শন ও ধর্মের সঙ্গে ধারাবাহিক সংগ্রাম করে যদি তাদের ঐ সার্বভৌমত্ব অর্জন করতে হয়, তাহলে নৈতিকতাবাদ কিংবা বিভিন্ন ধরনের মতান্ধতা থেকে এরা কতদূর মুক্ত থাকতে পারে? যদি ঐ মুক্তি তারা অর্জন করেও, নান্দনিক বা সাহিত্যিক কৃত্য কি আদর্শায়িত হয়ে যায় না? আধুনিকোত্তর পরানন্দন সমস্ত কিছুর নিবিড় পাঠ বা অন্তরঙ্গ সমালোচনা করতে গিয়ে মূল্য-নিরপেক্ষতার নামে চোরাবালির পরিসর তৈরি করে না তো!

অবশ্যই সমস্ত আধুনিকোত্তর তাত্ত্বিক অভিন্ন দৃষ্টিকোন গ্রহণ করেননি। বরং একেকজন একেক ধরনের জিজ্ঞাসা তুলে ধরেছেন। জিজ্ঞাসার এই বহুত্বের সূত্র কতটা প্রচ্ছন্ন রয়েছে নীৎশের ভাবনায়—এর মীমাংসা করাটা কঠিন। আধুনিকোত্তর চিন্তাবিদেরা যখন মহাসন্দর্ভের প্রেতচ্ছায়া দেখতে পেয়ে প্রায় সব কিছুরই অবসান ঘোষণা করছেন, তত্ত্বচিন্তা কিংবা শিল্পসাহিত্যও মহাসন্দর্ভ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। অর্থাৎ তত্ত্ব এবং শিল্প-সাহিত্যেরও মৃত্যু ঘোষণা করার জন্যে পরানন্দনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু আমরা লক্ষ করব পরানন্দনের মধ্য দিয়ে ঐ অবসান ঘোষিত হচ্ছে না; বরং তত্ত্ব ও শিল্পসাহিত্যের পারস্পরিক পুনরুজ্জীবনের প্রক্রিয়ার প্রতি তর্জনি সংকেত করা হচ্ছে।

বস্তুত তৃতীয় সহস্রাব্দের সূচনা-মুহূর্তে ঐতিহাসিক বাধ্যবাধ্যকতার মধ্য দিয়েই আমরা এমন-এক চিহ্নায়ন-প্রবণ পরিস্থিতিতে পৌঁছে গেছি যেখানে শিল্প ও সাহিত্য প্রতিনন্দনের কার্যকরী মোকাবিলা করার জোর পেয়ে যাচ্ছে পরানান্দনিক পরিসরে। আর, তা করতে গিয়ে তত্ত্বচিন্তাকে মুহুর্মুহু পুনরুজ্জীবিত করছে এবং সবধরনের সীমায়িত গন্ডিকে ভেঙে দিয়ে সমালোচনা-প্রবণ করে তুলছে। এই প্রক্রিয়াকে আজ কিছুতেই অস্বীকার করা যাচ্ছে না। ফলে তথাকথিত অনান্দনিক পরিসর বলে কিছুই কোথাও অবশিষ্ট থাকছে না। তেমনি অতাত্ত্বিক পরিসরও অবভাস মাত্র। 'The will to power' বইতে নীৎশের নিম্নোক্ত বিখ্যাত মন্তব্যটি নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে: 'Our religion, morality and philosophy are decadent forms of man. The counter movement : art'

একটু আগে অনান্দনিক পরিসর সম্পর্কে যে-কথাগুলি লিখেছি, এখানে তা আরো একবার মনে করা যেতে পারে। মানুষকে যে-সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তাপ্রণালী রুদ্ধ করে, শিল্পকে তাদেরই বিপ্রতীপে প্রতিস্থাপিত করেছেন নীৎশে। এই মন্তব্যের সূত্রে যদি ভাবি, শিল্প মানুষকে সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত করে, তাহলে তত্ত্বকে ততক্ষণ পর্যন্ত সহ্য করতে পারি যতক্ষণ তা গৌনস্বর ও প্রান্তিক চিন্তাপ্রণালী মাত্র। কিন্তু কথা হচ্ছে, তত্ত্বকে নস্যাৎ করতে গিয়ে তত্ত্ববিরোধী মতান্ধতার শিকার হলেই মুশকিল। তাহলে

আরো-একধরনের জটিল অবভাস মানবচেতনার মুক্তিকে সুদূর-পরাহত করে দেবে। এই নিবন্ধের অন্যত্র ফুকো-দেলেউজ-লিওতারদের যে-সমস্ত বয়ান অনুসরণ করেছি, সেইসব আসলে তত্ত্বের উপযোগিতা প্রতিপ্রশ্নের মধ্য দিয়ে পরীক্ষা করে দেখার তাত্ত্বিক প্রকল্প মাত্র। অর্থাৎ তাদের উদ্দেশ্য তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান বা উপেক্ষা করা নয়। তত্ত্ব জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নিজের জন্যে যে-সীমানা কিংবা সমাপ্তি নির্ধারণ করে, ভেতর থেকেই সেইসব মুছে ফেলা। সেইসঙ্গে তাঁদের লক্ষ্য ছিল সমালোচনার এমন কৌশল তৈরি করা যা পরাতত্ত্বের দিকে তর্জনি সংকেত করবে অথবা পরাতত্ত্বের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তোলার উপায় নির্দেশ করবে।

এঁরা একাজের মধ্য দিয়ে যে-প্রতিবেদন তৈরি করেছেন, তাতেই নিহিত রয়েছে সূক্ষ্ম শিল্পসংবিদ ও সাহিত্যবোধ অর্থাৎ প্রচলিত অর্থের বাইরে-গিয়ে-পাওয়া নন্দন-চেতনা। এই বিন্দুতে স্মরণ করতে হয় নীৎশেকে যিনি এই প্রক্রিয়ার ভিত্তিভূমি তৈরি করে দিয়েছিলেন। দর্শন ও ধর্মকে যখন তিনি শিল্পের বিপ্রতীপে প্রতিস্থাপিত করেন এবং জানান যে ঐসব তত্ত্ববীজ অবমানবায়নের সঙ্গী—তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণের প্রাথমিক সূত্রই নির্দেশিত হয়। সত্যের নিপীড়ক ভূমিকা তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আজকের দিনে আমরা শিখেছি, সত্যও উৎপাদিত হতে পারে প্রতাপের চতুর কৃৎকৌশলে। এই অভিজ্ঞতার সূত্রে বুঝতে পারি, নীৎশে আসলে আধিপত্যবাদী বর্গের দ্বারা উৎপাদিত সত্যকেই নিপীড়ক বলে ভেবেছিলেন। এবং , তার বিরুদ্ধে শিল্পের সংগ্রামী ভূমিকাকে মহিমান্বিত করেছেন। তেমনি বিভিন্ন প্রতাপ-কেন্দ্রের দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে যদি শিল্পকে স্থাপিত করি, তাহলে শিল্পও সেই নিপীড়ক শক্তিতে রূপান্তরিত হবে যা জীবনের পক্ষে আবশ্যিক শক্তি না হয়ে অর্থাৎ সংগ্রামী শক্তি না হয়ে সমস্ত ধরনের সংঘর্ষকে প্রতিহত করে।

পাঁচ

শিল্প সংগ্রামী চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে যদি তা প্রচলিত শিল্পবোধকে প্রতি পদে পদে জিজ্ঞাসার কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখে। শিল্পের সীমানা তাকে পেরিয়ে যেতেই হবে এবং নান্দনিকতাবাদের সমস্ত প্রকরণের বাইরে সক্রিয় হতে হবে। স্বভাবত তা তত্ত্বের সীমানাও মেনে চলতে পারে না। বস্তুত নীৎশের দার্শনিক প্রতিবেদনগুলি সামগ্রিকভাবে এই অতিযায়িতার চমৎকার দৃষ্টান্ত। তাই তাঁকে বলা হয় দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাহিত্যিক গুণে সমৃদ্ধ। তাঁর রচনারীতি ও বয়ানের তির্যক কৌশল এমন যে একদিকে তাঁর পাঠকৃতি তত্ত্ব ও নান্দনিক বোধের যুগলবন্দি, অন্যদিকে এই দুইয়ের নিরন্তর প্রতিস্পর্ধায় সম্পৃক্ত। নীৎশের 'The Birth of Tragedy' বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ইউজেন ফিঙ্ক এমন কিছু মন্তব্য করেছেন যা তাঁর কেন্দ্রীয় বিশ্ববীক্ষার ওপর আলোক সম্পাত করে: 'The aesthetic theme acquires for him the status of a fundamental ontological principle. Art, the tragic poem, becomes for him the key that will open up the essence of the world. Art is raised

into an organ of philosophy and taken as the most serious, authentic entryway for the most original comprehension, the concept at the very best coming after...Nietzsche uses aesthetic categories to formulate his fundamental vision of being. The phenomenon of art is placed at the center : in it and from it the world can be deciphered.' (১৯৬০ : ১৬-১৭)।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলি পাচ্ছি এই মন্তব্যের শেষে। সত্তা সম্পর্কে নিজের মৌল বীক্ষণকে বিশ্লেষণী বয়ানের উপযোগী করে তোলার জন্যেই নীৎশে নান্দনিক বর্গদের ব্যবহার করেছেন। শিল্পকলা সম্পর্কিত চিন্তাপ্রণালীকে তিনি এমনভাবে কেন্দ্রে রেখেছেন যাতে উপস্থাপনার বিশিষ্ট ধরনে এবং সেই কেন্দ্রীয় অবস্থান থেকে জগৎ-প্রক্রিয়ার ভাষ্য করা যায়। সত্তাতত্ত্ব নিশ্চয় দার্শনিক বীক্ষণের সবচেয়ে মৌলিক দিক। শিল্প ও সাহিত্যকে ঐ বীক্ষণে পৌঁছানোর সার্থক উপায় হিসেবে ব্যবহার করে নীৎশে হওয়া ও হয়ে ওঠায় নতুন মাত্রা যোগ করতে পেরেছেন। সুতরাং শিল্প-সাহিত্য লক্ষ্যহীন ও নিষ্প্রয়োজন হতে পারে না; দার্শনিক প্রতিবেদনে রূপন্তরিত হওয়ার সম্ভাবনাতেই এরা সার্থক।

হাইদেগার যেভাবে নীৎশের নিবিড় পাঠ করেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে, সত্তা বিষয়ক জিজ্ঞাসার প্রতিক্রিয়াতেই তাঁর প্রতাপ-অভিমুখী আকাঙ্ক্ষার ধারণায় শিল্পকে কেন্দ্রীয় ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। এই বিশিষ্ট ধারণার স্নায়ুকেন্দ্রকে যদি বিশ্লেষণ করতে হয়, শিল্পকে সর্বোৎকৃষ্ট সূচনাবিন্দু হিসেবে ধরে নিতে হবে। হাইদেগারের মতে নীৎশে-পাঠের সূচনা হতে পারে শুধু শিল্পকলা বিষয়ক জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে: 'The innermost essence of Being is will to power. In the being of the artist we encounter the most perspicuous and most familiar mode of will to power,. Since it is a matter of illuminating the Being of beings, mediation on art has, in this regard, decisive priority.'(Nietzsche : 1 :70) তবে, প্রশ্ন হলো, সত্তা-বিষয়ক এই জিজ্ঞাসার কেন্দ্রে শিল্প-জিজ্ঞাসাকে উপস্থাপিত করার ফলে সত্য ও শিল্পের মধ্যে কি সামঞ্জস্য রচিত হয় অথবা একে অপরের উপর আধিপত্য বিস্তার করে! এই প্রশ্নটি একটু জটিল। কারণ নীৎশের প্রতিবেদন থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে শিল্প ও সত্যের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণ জিজ্ঞাসার চরিত্রকেই পাল্টে দেয়। দর্শন ও তার নিজস্ব সত্যকে শিল্প শুধু প্রতিস্পর্ধাই জানায় না, দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিত থেকে উপরেও উঠে যায়।

নীৎশে 'The will to power' বইতে বলেছেন: 'Art is worth more than truth!' এই যে 'সত্যের চেয়েও বেশি মূল্য' এর ধারণা—তার নানা রকম ব্যাখ্যা সম্ভব এবং স্বভাবত বিতর্কও অনেক রকম। নীৎশের বক্তব্য অনুযায়ী শিল্প হলো জীবন-অস্বীকৃতির যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা মোকাবিলার উপযোগী সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিশক্তি। তাকে আরো বলা যায়—'the redemption of the man of knowledge... the

man of action...the sufferer' (The will to power, 452, 453)! তো, শিল্প যদি এভাবে মুক্তি এনে দেয়, তাহলে দ্বন্দ্ব বা উৎকণ্ঠার অবসান হয়ে যাবে। সর্বত্র-ব্যাপ্ত ধ্বংসবাদের উল্টোদিকে সত্যের নব্য প্রকরণে পৌঁছানোর জন্যেই কি শিল্প প্রচলিত বিষয়-সাপেক্ষ সত্যের চেয়ে বেশি গুরুত্ব অর্জন করতে চায়? উনিশ শতকীয় সংবিদ অনুযায়ী নীৎশে নিঃসন্দেহে কালাতিযায়ী অবস্থানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। কিন্তু সত্যের ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত কিংবা নির্যাস নিয়ে সাম্প্রতিক কালে নানা দৃষ্টিকোন থেকে যত ভাষ্য উপস্থাপিত হয়েছে, সেইসব মনে রাখলে কোনো সরলীকৃত ও সর্বজনীন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো অসম্ভব। তবু এও অনস্বীকার্য যে নীৎশের একান্ত নিজস্ব চিন্তা-প্রকরণেই আমরা প্রত্ন-আধুনিকোত্তর চেতনার কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংকেত পেয়ে গেছি। প্রচলিত দার্শনিক মননের মধ্যে তিনি যে ধ্বংসবাদের নিপীড়ক শক্তির উপস্থিতি লক্ষ করেছেন, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। 'The birth of tragedy' বইতে একটি অসামান্য উদ্ভাবনী চিন্তাসূত্র পাচ্ছি। এতে দেখা যাচ্ছে যে তিনি অস্তিত্বের মধ্যে প্রচ্ছন্ন মৌলিক বিকার ও আধিপত্যবাদী পীড়নের কথা বলছেন। আবার অস্তিত্বের যাবতীয় ভ্রান্তি সংশোধনে কর্তব্যের কথাও লিখেছেন। ('Duty to correct existence')।

নীৎশের প্রবাদপ্রতিম উচ্চারণটি আমাদের মনে পড়ে যেখানে তিনি মতান্ধ দার্শনিক ও নান্দনিকতাবাদীর বিরুদ্ধে স্বপ্ন-কল্পনা-জ্ঞানকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন: 'We have art lest we perish of the truth' (The will to power : 822 :435)। আজ যখন চারদিকে নন্দন হারিয়ে যাচ্ছে প্রতিনন্দনের আগ্রাসনে, শিল্পকে মুছে দিচ্ছে প্রতিশিল্প আর সত্যকে সত্যভ্রম—তখন সাহসী প্রত্যয়ের এই উচ্চারণ কতটা সম্ভব? নীৎশে নিশ্চয় শিল্পকে উৎক্রান্তির পারিভাষিক দ্যোতনায় ব্যবহার করেননি। জীবনের ক্রমবর্ধমান জটিলতা যখন অজস্র তত্ত্বের রণকৌশলকেও মুহুর্মুহু পাল্টে দিচ্ছে, সেই মুহূর্তে 'আমাদের আছে শিল্প'—এই উচ্চারণকে বহুস্বরিক বিচ্ছুরণের স্নায়ুকেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। নীৎশের ঐ উচ্চারণে কোন্ সত্যকে বিনাশক বলা হয়েছে? নিঃসন্দেহে সেই আগ্রাসী প্রতাপের কৌশলে সর্বত্রব্যাপ্ত ছদ্মসত্য অস্তিত্বকেও মুছে ফেলে। অস্তিত্বের বোধই যখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত, সেই মুহূর্তেই এই পুনর্ঘোষণার প্রাসঙ্গিকতা সবচেয়ে বেশি যে আমাদের শিল্প আছে এবং থাকবে। অন্তত যতদিন পিঞ্জরায়িত সত্যের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণের প্রয়োজন আমরা অনুভব করব। আধুনিকোত্তর চিন্তাবিদেরা নীৎশেকে যেভাবেই ব্যবহার করুন না কেন, পরানন্দনের সূত্রধার হিসেবে তাঁর উপস্থিতিও একমাত্রিক নয় কখনো। তাঁর বয়ানের অন্তর্বৃত বহুমাত্রিকতা ও অনেকার্থদ্যোতনা সম্পর্কে চমৎকার আলোকপাত করেছেন বিখ্যাত সমালোচক পল দ্য ম্যান। তাঁর 'Allegories of Reading' এর অধ্যায়ে আমরা নীৎশে-পুনঃপাঠের যে-পথনির্দেশ পাই, তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

ছয়

তৃতীয় সহস্রাব্দের সূচনা-মুহূর্তে এতদিনকার অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে পর্যালোচনা করে মনে হয়, আধুনিকোত্তরবাদ এখন বিশ্বায়নের তুঙ্গ মুহূর্তে অত্যন্ত চতুরভাবে সমস্ত ক্ষেত্রে বৈধতার সংকট তৈরি করেছে। তত্ত্বের রাজনীতি আগেও ছিল; কিন্তু ইদানীংকার চিহ্নায়ন-সর্বস্ব প্রতিজগতে সত্যভ্রমের সন্ত্রাসে সব কিছু নির্বাসিত। সত্য-মিথ্যা, হওয়া-না-হওয়া, নন্দন-প্রতিনন্দনের সীমারেখা মুছে দিয়ে ক্ষান্ত হচ্ছে না আধুনিকোত্তরবাদ। সমস্ত কিছুতে মহাসন্দর্ভের অবজ্ঞেয় মোহর লাগিয়ে দিয়ে যাবতীয় জিজ্ঞাসাকে অবান্তর করে দিচ্ছে। পরানন্দনের লক্ষ্য যদি হয় বিভিন্ন পরিসরের মধ্যবর্তী কৃত্রিম সীমান্ত মুছে দেওয়া—তাহলে এই প্রক্রিয়ায় নির্মাণবায়ন প্রবণতা থেমে যাওয়া উচিত। নীৎশের চিন্তাকে বীজতলি হিসেবে যদি ব্যবহার করি, আধুনিকোত্তর পুনঃপাঠে ঐ ঔচিত্যও স্বীকৃত হবে—এই প্রত্যাশা থাকে। 'The will to power'-এ নীৎশে এই বার্তা তুলে ধরেছেন যে সত্যের নির্যাস আমরা জানতে পারি না কারণ, 'metaphysics, morality, religion, science...... merit consideration only as various forms of lies.' (853, 451)

এইসব মহাসন্দর্ভ বলেই মিথ্যা নাকি প্রতাপের সচেতন নির্মিতি হিসেবে মিথ্যা? এরকম জিজ্ঞাসা নিয়েই আমরা যেতে চাই পরানন্দনের পরিসরে। আমাদের এই যাত্রায় নীৎশে শরিক না-ই বা হলেন, প্রাথমিক প্রেরণা হিসেবে তাঁর উপস্থিতিও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস: সত্যে পৌঁছানোর সমস্ত পথই ছলনার মধ্য দিয়ে যায়। ছলনার সত্য সম্পর্কে সচেতন থাকাও জরুরি—নীৎশের পুনঃপাঠ কিংবা তাঁর আধুনিকোত্তরবাদী পাঠের পুনর্বিশ্লেষণ আমাদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেয়। নীৎশের বয়ানে রয়েছে আত্মবিনাশক জ্ঞানের সংকেত যা আসলে পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়ার প্রথম ডমরুধ্বনি। পরানন্দন সত্যের মৃত্যু থেকে পরাসত্যে পৌঁছানোর সমাপ্তিহীন পথরেখা, আর, সেইসঙ্গে অস্তিত্বের সমান্তরাল অভিব্যক্তির পুনর্বিবেচনাও। পরানন্দন অন্বিষ্টও নয় কিংবা শেষ কথাও নয়; মূলত তা অধিবাস্তবতায় আক্রান্ত ভাববিশ্বের সময়োপযোগী কৃৎকৌশল। আর, নীৎশে হলেন অবভাস ও তত্ত্ববস্তুর সম্পর্ক পুনর্নির্ণয়ের আদি সংকেত-পাঠক। একথা মনে রেখে দ্য ম্যানের নীৎশে-পাঠে অংশীদার হতে পারি আমরাও: 'The wisdom of the text is self-destructive ; art is true but truth kills itself, but this self-destruction is infinitely displaced in a series of successive rhetorical reversals which, by the endless repetition of the same figure,keep it suspended between truth and the death of this truth.' (পৃঃ১১৫)।

এই কি পরানন্দনের ভবিতব্য: সত্য ও সত্যের মৃত্যুর মধ্যে ত্রিশঙ্কুর মতো দোদুল্যমান হয়ে থাকা? এই জিজ্ঞাসার মীমাংসা-প্রয়াস কালে-কালান্তরে পুনর্নবীকৃত হয় মাত্র। তবে নীৎশের জগৎ থেকে আধুনিকোত্তর পৃথিবী অনেক দূরে যেহেতু সরে এসেছে, মীমাংসা-সন্ধান পথ থেকে পথান্তরে অনবরত নিয়ে যাবে আমাদের—এও অনিবার্য।

মাত্র বিয়াল্লিশ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে আমাদের কাছে তা উন্মোচিত করেছেন কিয়ের্কেগার্দ। প্রতিভাসতত্ত্বাবাদী দর্শনে জীববিশ্বের যে-ধারণাটি কেন্দ্রীয় গুরুত্ব পেয়ে থাকে, সেই নিরিখেও তাঁর বৌদ্ধিক জীবনের তাৎপর্য বিচার করে দেখা যায়। প্রাগুক্ত মন্তব্যের অনুদ্ধৃত অংশে ইতিহাস-বৈশ্বিক মাত্রার কথা লিখেছিলেন কিয়ের্কেগার্দ। আর সেইসঙ্গে জানিয়েছিলেন ঐশ্বরিক নির্দেশের কথাও। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মবোধের সঙ্গে তাঁর অন্বয় বা অনন্বয়ের অত্যন্ত জটিল প্রশ্নটি বিপুল সমস্যা তৈরি করে। তাই, একটু আগে যেমন লিখেছি, কিয়ের্কেগার্দের বহুতলযুক্ত ভাববিশ্বে পরিক্রমার জন্যে নিজস্ব একটি পথ নির্বাচন করে নেওয়াই ভালো।

মূল বিষয়ে যাওয়ার আগে আরও একবার তাকাতে পারি তাঁর সময় ও পরিসরের দিকে। ১৮১৩ সালের ৫ মে তাঁর জন্ম। এই একই বছর রিচার্ড হাগনের-এরও জন্ম হয়েছিল। জন্মকালের নিরিখে কিয়ের্কেগার্দ ডস্টয়েভস্কি থেকে আট বছর ও কার্ল মার্ক্স থেকে পাঁচ বছরের বড়। আর, হেগেল থেকে তিনি তেতাল্লিশ বছর ছোট। তাঁর চিন্তাবৃত্তে দার্শনিক শেলিং-এর ছায়াও লক্ষ করেন কেউ কেউ—১৮৪৩-এ যাঁর বিখ্যাত বার্লিন বক্তৃতায় কিয়ের্কেগার্দ শ্রোতা হিসেবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কোপেনহেগেন নগরে সোরেনের সংক্ষিপ্ত জীবন অতিবাহিত হয়েছিল। স্বভাবত সমকালীন কোপেনহেগেনের রাজনৈতিক ধর্মীয় নৈতিক পরিবেশ তাঁকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর বাবা অর্থনৈতিক ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন যদিও উনিশ শতকের গোড়ায় ইংল্যান্ডের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে যাওয়ার ফলে ডেনমার্ক অর্থনৈতিক ভাবে বিপর্যস্ত ছিল। সোরেনের বয়স যখন এক বছর, নরওয়ে ডেনমার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বস্তুত তাঁর শৈশবে ডেনমার্কের সমাজে নানা ধরনের অন্ধকার নেমে এসেছিল। সমাজে দিন দিন বেড়ে যাচ্ছিল অপরাধ-প্রবণতা। এই পরিস্থিতির পাশাপাশি পারিবারিক বৃত্তেও গুমোট আবহাওয়া। সোরেনের বাবা মিকেইল পিডারশন বিষণ্ণ ও নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতেন। অন্যদিকে তাঁর ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ে। সমস্ত পরিবারের উপর মিকেইল নানা ধরনের বাধা-নিষেধ চাপিয়ে দিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে মিকেইলের প্রথম স্ত্রী নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গিয়েছিলেন; দ্বিতীয় স্ত্রী এইনে লুন যদিও তাঁর সাতটি সন্তানের জননী— কোনো-একটি নিগূঢ় কারণে অপরাধবোধ জনিত জটিল মনস্তাত্ত্বিক বিক্রিয়া তাঁকে অসামাজিক, বিবরবাসী ও ধর্মান্ধ করে থাকবে। স্বয়ং সোরেন পরবর্তী কালে এ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেছেন। তা থেকে তাঁর নিজের মানসিক জটিলতার সম্ভাব্য উৎস সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ সংকেত পাওয়া যায়। আর, এও বুঝতে পারি তাঁর চিন্তাবিশ্বের যাবতীয় সূক্ষ্ম ও প্রধান প্রবণতার ধাত্রীভূমি ছিল পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ। ডেনমার্কের ভঙ্গুর আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের রুগ্নতা ও অনিশ্চয়তা যেন কিয়ের্কেগার্দ পরিবারের উদ্ভট, নিরালম্ব ও অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতিকে গাঢ়তর শূন্যতার দিকে সঞ্চালিত করেছিল।

দুই

সোরেন কিয়ের্কেগার্দকে যদি ঠিকমতো বুঝতে চাই, বারবার ফিরে যেতে হবে তাঁর দিনলিপির পাতায়। শূন্যতা-ভরা কূটাভাস-দীর্ণ রুগ্ন সময়ের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর জীবনের পাঠকৃতিকে যদি যথাপ্রাপ্ত আস্তিত্বিক নন্দনের অভিব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করতে চাই, ১৮৪৬ সালের এই বয়ানকে খুব ইঙ্গিতপূর্ণ বলে মনে হয়: 'The new development in our age cannot be political, for politics is a dialectical relation between the individual and the community in the representative individual; but in our times the individual is in the process of becoming far too reflective to be able to be satisfied with merely being represented' (The Journals of Kierkegaard: Newyork: 1959:97)। এই উচ্চারণকে আপাতভাবে যত সরল বলে মনে হোক না কেন, প্রকৃত বিচারে তা কিন্তু বেশ জটিল। যুগের প্রতিনিধি হওয়ার জন্যে কোনও ব্যক্তিকে বিধৃত হতে হবে সত্তা ও সামাজিকতার দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে। এই সম্পর্ক সর্বদা রয়েছে হয়ে ওঠার জায়মান ও আপেক্ষিক প্রক্রিয়ায়; প্রতিনিধিত্বের বোধ তাই যথাপ্রাপ্তের নিয়ত পুনর্বিন্যাস ও পুনরুত্থাপনে পরিশীলিত হয়ে থাকে। কিয়ের্কেগার্দের চেতনাবিশ্ব সম্পর্কে কোনও অনড় ও নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তাই কার্যত অসম্ভব।

প্রাগুক্ত উচ্চারণের তিন বছর আগে, ১৮৪৩ সালে লিখিত দিনলিপির অন্তিম বয়ানে, বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যে-বক্তব্য পেয়েছি, সেখানে বরং ফিরে যেতে পারি: 'It is perfectly true, as philosophers say, that life must be understood backwards. But they forget the other proposition that it must be lived forwards.'(তদেব: ৮৯) অসাধারণ দ্যোতনাময় এই উচ্চারণ, এতে সন্দেহ নেই। জীবনের তাৎপর্য অবশ্যই বুঝতে হয় অতীতের অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধির নিরিখে। এবং এও সত্য যে জীবন কেবলই আমাদের সামনের দিকে তাকাতে বলে। অবশ্য একই নিঃশ্বাসে কিয়ের্কেগার্দ এও জানিয়েছিলেন যে কোনও একটি বিশেষ মুহূর্তের আকরণ থেকে জীবনকে কখনও সময়ের কষ্টিপাথরে যাচাই করা সম্ভব হয় না। কেননা আমরা এমন কোনও প্রয়োজনীয় অবকাশ তৈরি করে নিতে পারি না যেখানে বহতা সময় আপাতভাবে স্থির ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ফলে পেছনের দিকে তাকাতে-না-তাকাতে বর্তমান ও সংলগ্ন ভবিষ্যতের চাপে আমাদের বীক্ষণবিন্দু শিথিল হয়ে পড়ে। দিনলিপির উচ্চারণগুলিকে রৈখিক ভাবে ও কোনও পূর্ব-নির্ধারিত আকল্পের সমর্থনে ব্যবহার করা অবশ্য খুবই কঠিন। এইমাত্র যে অতীতে ফিরে তাকানোর মধ্য দিয়ে জীবনের তাৎপর্য খোঁজার কথা লিখেছি, কিয়ের্কেগার্দের কাছে তা কিন্তু জ্যামিতিক ছকের মতো ব্যবহার্য নয়। জীবনের সূচনা-পর্বেও নিহিত থাকতে পারে পরিণত পর্যায়ের উদ্ভাসন ও অন্ধবিন্দুর বীজতলি—কেন্দ্রীয় এই উপলব্ধিকে কত রকম ভাবে যে উপস্থাপিত করেছেন তিনি, তার ইয়ত্তা নেই। শৈশবেই তাঁর আস্তিত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক উপলব্ধির যাত্রাপথ ও নির্যাস নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। বাবার যৌনজীবনের সম্ভাব্য অন্ধকার বলয়ে উগ্র

ধর্মান্ধতার শিকড় নিহিত ছিল—এই ধারণার কথা পরবর্তী কালে কিয়ের্কেগার্দ স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করেছেন। খ্রিস্টীয় নৈতিকতা ও ধর্মবোধ অনুযায়ী মিকেইল পাপপুণ্যের গাণিতিক ছকের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং এটাই তাঁর উদ্ভট ও অসামাজিক আচরণের প্রধান কারণ। নিজের দুর্বহ অপরাধবোধের বোঝা তিনি তাঁর সন্তানদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন। কিয়ের্কেগার্দ যে পরবর্তী কালে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা, ভয় ও শিহরন, ব্যাধি ও মৃত্যু, শ্লেষ ও কূটাভাস নিয়ে দার্শনিক প্রতিবেদন গুলি রচনা করেছেন, এবং এদের সমবায়ী উপস্থিতিতে গড়ে উঠেছে তাঁর আস্তিত্বিক নন্দন—এর সূক্ষ্ম ও গভীর ভিত্তিভূমি রয়েছে তাঁর বিষণ্ণ ও নিঃসঙ্গ শৈশবে।

তবে বাবার ধর্মান্ধতা তাঁকে কোনও পিঞ্জরে বন্দি করেনি; উগ্র ধর্মীয় নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে বড় হয়ে উঠলেও তাঁর কাছে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম কিন্তু নৃশংস ও অমানবিক বলে প্রতিভাত হয়েছে। নিজেকে জন্মাবধি রুগ্ন ও বৃদ্ধ বলে ভেবেছেন কিয়ের্কেগার্দ। তাঁর সমস্ত অভিনিবেশ কেন বারবার ভয় ও উদ্বেগে ফিরে ফিরে আসে, কেনই বা দীর্ঘশ্বাসের রাজ্যে বাধ্যতামূলক অবস্থান নিতে হয় তাঁকে—এই কথা পুনরাবৃত্ত হয়েছে তাঁর দিনলিপিতে, বৌদ্ধিক বয়ান গুলিতে। তাঁকে কিংবা তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যদের ঠিক স্বাভাবিক বলা যায় না। তাঁর নিজের সম্পর্কে সর্বজন-বিদিত মন্তব্যটি এখানে উল্লেখ করা যায়: 'like a solitary fir tree egoistically separate and pointed upward I stand, casting no shadow, and only the wood-dove builds its nest in my branches.' (এইচ. ব্ল্যাকহ্যাম কর্তৃক উদ্ধৃত: Six Existentialist Thinkers: London: 1997:1)

মাত্র তেইশ বছর বয়সে দিনলিপি লিখতে শুরু করেন কিয়ের্কেগার্দ। ১৮৩৫ সালের প্রথম বয়ানে শৈশব সম্পর্কিত কোমল স্পর্শকাতর ভাবমূর্তি যেন কুঠারাঘাতে ছিন্ন হয়ে গেছে। এর প্রথম বাক্যটি এরকম: 'তখন সেই বিরাট ভূমিকম্প ঘটে গেল; ভয়ঙ্কর এক বৈপ্লবিক আলোড়নের অভিঘাতে আমার উপর আকস্মিক ভাবে নেমে এল নতুন ও অনস্বীকার্য সেই ব্যাখ্যার ধরন যার সাহায্যে সমস্ত তথ্য দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে পড়ে। তখন আমি এই সন্দেহ করতে শুরু করলাম যে আমার বাবার দীর্ঘ জীবন দৈব আশীর্বাদ নয়, বরং তা এক অভিশাপ। আর, আমাদের পরিবারের অতুলনীয় বৌদ্ধিক সম্পদ শুধুমাত্র এইজন্যে অর্জিত হয়েছে আমরা যাতে একে অপরকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলতে পারি: 'Then I felt the stillness of death grow around me when I saw my father, an unhappy man who was to outlive us all, a cross on the tomb of all his hopes. There must be a guilt upon the whole family, the punishment of God must be on it.'(তদেব : ৩৯)। এই মন্তব্যের নিরিখে মনে হতে পারে, অমোঘ দণ্ডাজ্ঞার ছায়াকে অনিবার্য উত্তরাধিকার হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন কিয়ের্কেগার্দ। যেন মৃত্যুর নিস্তব্ধতা তাঁর সত্তার চিরসঙ্গী, বন্দিশালার বাসিন্দা হিসেবে তাঁর অনুভূতি জুড়ে রয়েছে শুধু ব্যর্থ উদ্যমের বার্তা আর সমস্ত প্রত্যাশাই বুঝিবা কবরের উপরে গড়ে-ওঠা সমাধি-ফলকের মতো। কথা হচ্ছে,

এই নৈরাশ্য জর্জরিত পাপবোধ লালিত ভাবনা কি তাঁর জীবনের সঞ্চালক যা সমস্ত যৌক্তিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করে? তাহলে বিষয়গত সত্য বলে কি কিছু নেই? পিঞ্জরায়িত ব্যক্তি-অস্তিত্ব বিষয়ীগত সত্যকে অনুধাবন করতে গিয়ে শুধু কি উদ্বেগে, আতঙ্কে ও অনিশ্চয়তায় আক্রান্ত হবে? যদি এমন হয়, সমস্ত কিছুই তাহলে অমোঘ ও পূর্ব-নির্ধারিত; অতএব বিষয়ীগত সত্য উপলব্ধির জন্যে কোনও দক্ষতা অর্জনের বা সৃজনী ক্ষমতা প্রয়োগের কোনও প্রয়োজন নেই।

এভাবে শৈশবের উপলব্ধি থেকে বিচ্ছুরিত সূক্ষ্ম ভাবনাপুঞ্জ কিয়ের্কেগার্দের দার্শনিক প্রতিবেদন গুলিতে বিচিত্রভাবে ও অজস্র ধারায় বিকশিত হয়েছে। আবার মোহনায় দাঁড়িয়ে যেহেতু উৎসের দিকে ফিরে তাকিয়ে জীবন-ব্যাপ্ত দ্বিবাচনিকতার তাৎপর্য অনুধাবন করতে হয়, অকাল-মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ববর্তী দিনগুলিতে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র আক্রমণাত্মক বয়ানগুলি হয়ে ওঠে বিপ্রতীপ দর্পণ। শৈশব থেকে যৌবনের প্রান্তসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ভাবনাপথ অভিন্ন উপলব্ধি-বলয়ের উদ্ভাসন ও অন্ধবিন্দুতে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। কিয়ের্কেগার্দ কেন বিভিন্ন ছদ্মনামে, নানা লিখন-শৈলীতে, বিচিত্র অন্তর্বস্তু নিয়ে লিখেছেন—এই জিজ্ঞাসার কোনো সহজিয়া মীমাংসা নেই। এমন ভাবতে পারি যে, এক শতাব্দীর চেয়েও পরে লেখক-সত্তার জন্ম মৃত্যু কিম্বা অনেকান্তিকতা নিয়ে যেসব তত্ত্বচিন্তা বিকশিত হয়েছে, তাদের প্রায়োগিক প্রত্নরূপ আভাসিত হয়েছিল কিয়ের্কেগার্দের সন্দর্ভবিশ্বে। এইজন্যে তাঁকে যেমন প্রত্ন-আধুনিকোত্তর চিন্তাবিদ বলব, তেমনই এই সত্যও মেনে নেব যে কোনো বিশেষ পাঠ কখনও তাৎপর্য সম্পর্কে চূড়ান্ত উচ্চারণে সক্ষম হবে না। প্রতিটি পাঠই হবে আপেক্ষিক, এমনকী, অসম্পূর্ণও। তাই কিয়ের্কেগার্দ সম্পর্কে সতর্ক মধ্যম পন্থা গ্রহণের ঝোঁক অনিবার্য হয়ে পড়েছে। তবু, পাঠ-পাঠান্তরের অজস্রতায়, তাঁকে ঘিরে রহস্যবলয় যে গাঢ়তর হয়েছে— তাও ঐতিহাসিক ভাবে নির্ধারিত।

তিন

'On the Concept of Irony with Continued Reference to Socrates' (১৮৪১) শীর্ষক গবেষণাসন্দর্ভ সম্পূর্ণ করার জন্যে কিয়ের্কেগার্দ দশ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ করা যায়, পাশ্চাত্য দর্শনে সক্রেটিস ও কিয়ের্কেগার্দ দু'জন শ্রেষ্ঠ 'ironist' হিসেবে বন্দিত হয়ে থাকেন। সক্রেটিসের মতো কিয়ের্কেগার্দও আপন জীবনের পাঠকৃতি থেকে দার্শনিক নির্যাস নিঙড়ে নিয়েছিলেন। পারিবারিক বৃত্তে বাবার ভূমিকা যদিও শ্বাসরুদ্ধকর ছিল, বৌদ্ধিক চর্চা ও কল্পনা-প্রতিভা প্রয়োগের ব্যাপারে আবার তিনি ছিলেন প্রেরণার উৎস। এই যে বিচিত্র দ্বৈততা, এর গভীর গভীরতর প্রভা তাঁর চিন্তাবিশ্বে বিচ্ছুরিত হয়েছিল। জীবন ও চিন্তার বহুকেন্দ্রিকতা, নিরন্তর নতুন পথ ও গন্তব্য সন্ধান এবং সব ধরনের প্রাতিষ্ঠানিকতা সম্পর্কে অস্বস্তিবোধ ঐ বিচ্ছুরণের ফসল। শৈশব ও কৈশোরের আরোপিত উগ্র খ্রিস্টীয় ধর্মচর্যাকে যেমন তিনি পরবর্তী কালে শৃঙ্খল বলে মনে করেছিলেন, তেমনই হেগেলীয়

দর্শনের প্রতি প্রাথমিক অনুরাগও শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল না। যাতে ব্যক্তি-অস্তিত্বের পরিসর মর্যাদা পায় না বা অস্তিত্বশীল সত্তার গুরুত্ব স্বীকৃত নয়—সেখানে ব্যক্তিগত জীবন মূল্যহীন ও তার ব্যাখ্যা অপ্রাসঙ্গিক। ১ আগস্ট ১৮৩৫ এর দিনলিপিতে লিখেছিলেন কিয়ের্কেগার্দ: 'The thing is to understand myself... the thing is to find a truth which is true for me, to find the idea for which I can live and die.' (প্রাগুক্ত : ৪৪)। আর, এজন্যে জীবনের গতিপথ ও জীবিকা সম্পর্কে তিনি কোনো পূর্ব-নির্দিষ্ট পিঞ্জরে নিজেকে রুদ্ধ করেননি। সেইজন্যে সমস্ত জীবনকে সঞ্চালিত করার মতো কোনও একক ভাবাদর্শও তিনি গ্রহণ করেননি। এদিক দিয়ে উদ্ধৃত মন্তব্যের সঙ্গে তাঁর অবস্থানের বিরোধিতা ব্যক্ত হয়ে পড়ে।

১৮৪১-এ প্রলম্বিত গবেষণার ফসল হিসেবে সক্রেটিস ও শ্লেষতত্ত্ব বিষয়ক সন্দর্ভ যখন সম্পূর্ণ হচ্ছে, রেগিন ওলসেনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করেন সোরেন। মোটামুটি একবছর ধরে রেগিনের সঙ্গে প্রেমপর্ব অব্যাহত ছিল। বাক্‌দত্তা প্রেমিকাকে বিয়ে করতে তিনি কেন অস্বীকার করেছিলেন, এর উত্তর খুঁজতে হবে তাঁর জটিল অন্তর্জীবনে। জীবন ও দর্শনের পাঠকৃতি কিয়ের্কেগার্দের বহুস্বরিক অস্তিত্বের গহনলোকে নির্মিত হয়েছে বলে এই ঘটনার তাৎপর্য নিয়ে বিশেষজ্ঞেরা নানা ধরনের মন্তব্য করেছেন। এই ঘটনা সমকালীন কোপেনহেগেনে এতটা আলোড়ন তৈরি করে যে, কিয়ের্কেগার্দ সাড়ে চারমাসের জন্যে বার্লিনে চলে যান। এ সম্পর্কে জোসিয়া থমসন মন্তব্য করেছেন: 'সারা জীবন ধরে সোরেন যে পার্থিব জগৎ থেকে দূরে সরে থাকতে চেয়েছেন, রেগিনের কাছ থেকে তাঁর পালিয়ে যাওয়াতে আসলে তারই বিশেষ মর্মভেদী বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাচ্ছি।' যাই হোক, ব্যক্তি-জীবনের তুমুল উথাল-পাথালের মধ্যেই তাঁর নিবিড় সৃষ্টিশীল পর্যায়ের সূচনা হয়েছে। এই নিবন্ধের অন্যত্র শেলিং-এর বক্তৃতা শোনার যে-বিষয়টি উল্লেখ করেছি, তা এসময় তাঁর অন্তর্জীবনের ভাঙচুরে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল।

১৮৪৩-এ কিয়ের্কেগার্দের বিখ্যাত বই 'Either/or' প্রকাশিত হয়। ঐ একই বছর বেরোয় 'Repetition' এবং 'Fear and Trembling' নামে দুটি স্বল্পায়তন বই। এইসব সন্দর্ভ লেখকের 'Personal preoccupation with himself'-এরই দৃষ্টান্ত। সত্তা কীভাবে সামাজিক পরিসরে অনন্য অবস্থান গ্রহণ করতে পারে, কীভাবেই বা আত্মিক ও নৈতিক নিরিখের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায় ব্যক্তি-অস্তিত্ব ও সর্বজনীনতার দ্বিরালাপ—কিয়ের্কেগার্দ সেদিকে নানা ভাবে দৃষ্টিপাত করেছেন। ১৮৪৪- এ সামান্য দিনের ব্যবধানে প্রকাশিত হলো 'Philosophical fragments' এবং 'The concept of Anxiety' নামে দুটি বই যাদের মধ্যে লেখকের নতুন দিগন্ত সন্ধান ব্যক্ত হয়েছে। পরের বছর অর্থাৎ ১৮৪৫ এ বেরিয়েছে 'Stages on life's way' যাতে দু-বছর আগের চিন্তাবীজগুলি ধর্মবোধের প্রেক্ষিতে পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে। অস্তিত্ববোধ, জ্ঞানতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বের মধ্যে যেন সুড়ঙ্গ-লালিত সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন কিয়ের্কেগার্দ, এরকম মনে হয়। ১৮৪৬-এ প্রকাশিত 'Concluding Unscientific Postscript to

the Philosophical fragments' বইতে লেখকের সংশ্লেষণী মনোভঙ্গির পরিচয় মেলে। আবার নামকরণের মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যেন লেখক মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সেই ভাবছেন, এ তাঁর উত্তরলেখ। তার মানে, তাঁর বৌদ্ধিক-জীবনের মূল পর্যায় শেষ হয়ে গেছে। এ শুধু তাঁর প্রলম্বিত অস্তিত্বের পরিশিষ্ট।

এইসব রচনার পাশাপাশি নানা ছদ্মনামে কিয়ের্কেগার্দ অজস্র সন্দর্ভ রচনা করেছেন। এইসব লেখার সূত্রে সমসাময়িক নাগরিকদের সঙ্গে তাঁর যাবতীয় সামাজিক সম্পর্ক কার্যত ধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ঘূর্ণাবর্তে বারবার তাঁর নিভৃত সত্তা বিনির্মিত হয়েছে। জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত বারবার পাল্টে নিয়েছেন তিনি, সামাজিক ও আর্থিক কারণে বহুবার বাসস্থান পাল্টে নিয়েছেন। সব মিলিয়ে লেখক হিসেবে তাঁর আস্তিত্বিক ও সামাজিক পরিসর নিরন্তর পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে। স্বতশ্চল ভাবে এসে গেছে নতুন নতুন আরম্ভ, বিকাশ ও পরিগ্রহণের প্রসঙ্গ। প্রকাশিত হয়েছে 'Edifying discourses in different spirits.' এবং 'Works of Love' (১৮৪৭); 'Christian discourses' (১৮৪৮) 'The lilies of the field and the birds of the air' এবং 'Three discourses at communion on fridays'। স্পষ্টত, এই রচনাগুলির আধেয় খ্রিস্টীয় ধর্মানুষঙ্গ। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এগুলি তিনি নিজের নামেই লিখেছিলেন। অবশ্য 'The crisis in the life of an actress' (১৮৪৭) বইতে তিনি নান্দনিক বিষয় অবতারণা করেছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এবিষয়ে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনা 'The point of view of my activity as an author' তাঁর মৃত্যুর পরে ১৮৫৬ তে প্রকাশিত হয়েছিল। আর ১৮৪৯ এ নতুন ছদ্মনামে তিনি লিখেছিলেন 'The sickness unto death' এবং ১৮৫০ এ 'Practice in christianity'। সুতরাং উত্তরলেখ-পরবর্তী বছরগুলিতে কিয়ের্কেগার্দের বহুমাত্রিকতা বরং বিচিত্র রচনাধারায় অভিব্যক্ত হয়েছে। বিষয়বস্তুতে খ্রিস্টীয় ধর্মানুষঙ্গ যদিও কয়েক বছর ধরে, প্রকট ভাবে বর্তমান ছিল, জীবনের শেষ পর্বে তাঁর অবস্থান হয়ে উঠল দ্বিমেরু-বিষম, শৈশব-কৈশোরের জটিল প্রচ্ছায়া নতুন ভাবে ফিরে এল যেন। ১৮৫৪-এর ৩০ জানুয়ারি বিশপ মিন্‌স্টার এর মৃত্যুর পরে গির্জার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক উত্তরোত্তর তিক্ত হয়ে পড়ল। দ্রুত পরম্পরায় কিয়ের্কেগার্দ বেশ কিছু তীব্র আক্রমণাত্মক রচনা লিখলেন 'The Instant' শিরোনামে। মোট নয়টি বয়ান প্রকাশিত হওয়ার পরে ১৮৫৫ সালের ২ অক্টোবর কিয়ের্কেগার্দ হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ছয় সপ্তাহ পরে ১১ নভেম্বর, কোপেনহেগেনের ফ্রেডরিক হাসপাতালে, মাত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়সে, তাঁর দেহান্ত হল।

চার

অস্তিত্বের বহুমাত্রিক জটিল গ্রন্থনা যাঁর জীবনের পাঠকৃতিকে দুরধিগম্য করে তুলেছে, তাঁর নান্দনিক প্রত্যয় সম্পর্কে কোনও সহজ পাঠের প্রস্তাবনা সম্ভব নয়। আগেই লিখেছি ভাষ্যকারদের অবস্থান অনুযায়ী তাঁর ভাববিশ্বের তাৎপর্য নানাভাবে

নির্ধারিত হয়েছে। এঁদের মধ্যে রয়েছেন ফ্রাঙ্কফুর্ট চিন্তাপ্রস্থানের অগ্রণী তাত্ত্বিক থিয়োডোর অ্যাডোর্নো। তাঁর 'Kierkegaard: Construction of the aesthetic' বইটি এই সূত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বভাবত কোনো-একটি সীমিত নিবন্ধে ওই বহুতল যুক্ত বিষয়ের প্রতি সুবিচারও করা সম্ভব নয়। কিয়ের্কেগার্দের কূটাভাস-ভরা লিখনবিশ্ব থেকে তবু নন্দনের সংজ্ঞা কিংবা নান্দনিক প্রতিবেদনের নির্মিতি-প্রকরণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত খুঁজব না। এখানে আরও একটি কথা বলে নিতে হয়। সাধারণ ভাবে আমরা নন্দন বলতে যা বুঝি, সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক প্রতিবেদনে এর আবশ্যিক উপস্থিতিকে যেভাবে গ্রহণ করি—কিয়ের্কেগার্দ মোটেই সেরকম ভাবেননি।

'The Point of View for my Work as an Author' বইতে কিয়ের্কেগার্দ নান্দনিকতার ধারণাকে মূলত লেখকসত্তার অন্যতম মৌলিক বর্গ হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছেন। বিষয়টিকে যথাযথ মাত্রায় অনুধাবন করতে না পারলে নান্দনিক, ধর্মীয়, নৈতিক স্তরে জীবনের বিভাজন অর্থহীন হয়ে পড়ে। লেখক-সত্তার নির্ণায়ক উপাদান হিসেবে নান্দনিক, ধর্মীয় ও নৈতিক প্রবণতার মধ্যে কাকে বেছে নেব, এই প্রশ্নটি যথার্থ দৃষ্টিকোন অবলম্বনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সামগ্রিক কেন্দ্র হিসেবে লেখক-সত্তার ভূমিকাকে কীভাবে উপস্থাপিত করেছেন কিয়ের্কেগার্দ, পরবর্তী ভাষ্যকারেরা সেদিকে মনোযোগ দিয়েছেন। তাঁর বৌদ্ধিক প্রকল্পের অন্তর্বৃত সর্বাত্মক অস্থিরতা ও ব্যাপক আপেক্ষিকতা সত্ত্বেও প্রাগুক্ত তিনটি প্রবণতার মধ্যে নান্দনিক বোধকে কেন আলাদা গুরুত্ব দেব, তা ভেবে দেখতে হয়।

আগেই লিখেছি 'নান্দনিক' শব্দটি মূলত পারিভাষিক হলেও কিয়ের্কেগার্দের লিখনবিশ্বে তা যথাপ্রাপ্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। হয়তো এইজন্যে গোলাম ফারুকের মতো কেউ কেউ শব্দটিকে 'ভোগী' অর্থে গ্রহণ করেছেন। ফারুকের মতে কিয়ের্কেগার্দের নন্দন সংশ্লিষ্ট বইগুলি এমনভাবে লেখা হয়েছে তাতে কোনও ফিলিস্তিন পাঠক সেইসব পড়তে পড়তে জীবনের অসারতা উপলব্ধি করতে পারে। ড্যানিশ ভাষায় রচিত মূল নিবন্ধের ভিন্নধর্মী ইংরাজি অনুবাদের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে বলে কিয়ের্কেগার্দের চিন্তাবিশ্ব সম্পর্কে যথেষ্ট বিভ্রান্তির সূচনা হয়েছে। যেহেতু বাঙালি পাঠকের কাছে কিয়ের্কেগার্দের মতো জটিল ও অনেকান্তিক চিন্তাবিদের ভাবমূর্তি সাধারণভাবে মূল সন্দর্ভ ও সেই সন্দর্ভের বিবিধ ভাষ্যের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে, বিচিত্র বক্তব্যের অনন্বয়ে পরস্পর-বিরোধিতা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তবে আমাদের মনে রাখতে হয় যে, সংক্ষিপ্ত জীবনেও কয়েকটি পরস্পর -বিরোধী ভাব-পর্যায়ের সংকেত তিনি নিজেই দিয়ে গেছেন। অতএব যে-কোনো একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের ভাবনাকে যদি তাঁর চিন্তাবিশ্বের নিয়ন্তা বলে ভেবে নিই, তাতে তাঁর জীবন-ব্যাপ্ত কূটাভাসের গ্রন্থনা দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবে। এই মূল কথাটি মনে রেখেই কিয়ের্কেগার্দের নান্দনিক প্রতীতি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি।

শৈশব থেকে অকাল-মৃত্যুর অব্যবহিত আগেকার দিনগুলি পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ নিরন্তর আত্ম-বিনির্মাণের প্রক্রিয়াকে যদি গুরুত্ব না দিই, কেবলমাত্র তবেই ভাবতে পারি,

কিয়ের্কেগার্দ যা-কিছু লিখেছেন, খ্রিস্টধর্ম নিয়েই লিখেছেন এবং তাঁর সব লেখাই খ্রিস্টধর্মের উদ্দেশে নিবেদিত। অথচ একই নিঃশ্বাসে আমরা তাঁর কূটাভাস-ভরা নিরন্তর পর্বান্ত-গুলির নির্মাণ-প্রকল্পকেও গুরুত্ব দিচ্ছি। ভাবকল্পের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে যিনি বাঁচতে চেয়েছেন, তাঁকে বারবার বিশ্বাসের পিঞ্জরকেও ভাঙতে হয়েছিল। যে খ্রিস্টান নয়, সে প্রকৃত মানুষ নয় এবং তার বেঁচে থাকা অর্থহীন: এই বক্তব্যকে যদি প্রসঙ্গ-বিচ্ছিন্ন ভাবে গুরুত্ব দিই, তাহলে, অন্যধর্মাবলম্বী ও নিরীশ্বরবাদী, যুক্তিবাদী ও খাঁটি আধুনিকদের জন্যে কোনও পরিসরই অবশিষ্ট থাকবে না। ভয়ঙ্কর এই মৌলবাদী ধারণার পঙ্ককুণ্ডে উগ্র ফ্যাসিবাদ জন্ম নেয়। অতএব নন্দন-সংক্রান্ত আলোচনা শুধুমাত্র ফিলিস্তিনদের প্রকৃত খ্রিস্টধর্ম প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে, এ ধরনের কোনও দূরবর্তী সম্ভাবনাও আমাদের কাছে পরিত্যাজ্য।

আমরা কিছুতেই একথা ভুলতে পারি না যে কিয়ের্কেগার্দ একটি সচেতন সত্তা হিসেবে নিজের বহুমাত্রিকতাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। মানুষের অস্তিত্বের চেয়ে মানুষের নির্যাসকে বেশি প্রাধান্য দিতে তিনি রাজি নন। চিন্তাশীল হওয়ার জন্যে মানুষকে অবশ্যই অস্তিত্বশীল হতে হবে। সত্তা যে-নির্যাসকে আশ্রয় করে তৈরি হয়েছে বলে কল্পনা করা হয়, সেই নির্যাসের চেয়ে কিংবা সত্তাকে সংজ্ঞায়িত করার প্রকরণের চেয়ে অথবা বিজ্ঞান-দর্শন-ধর্ম-রাজনীতি প্রস্তাবিত সত্তার ব্যাখ্যার চেয়ে প্রসারণময় অস্তিত্বের গুরুত্ব অনেক বেশি। এই বক্তব্য যদি মেনে নিই, তাহলে বলব, ধর্মতন্ত্র সহ অন্যান্য সমস্ত বহির্বৃত ভাব-পিঞ্জর দ্বারা সত্তাকে সংজ্ঞায়িত করার যাবতীয় প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে মানব-অস্তিত্বকে একটি সচেতন অপ্রাতিষ্ঠানিক সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন কিয়ের্কেগার্দ—এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতেই হয়। যা কিছু অস্তিত্বকে বিষয়ীগত সত্যের দর্পণে প্রতিফলিত করে, তাঁর আগ্রহ সেইজন্যে। কিংবা এটাও হয়তো শেষ কথা নয়। আবার তিনি লক্ষ করেছেন, প্রণালীবদ্ধ যুক্তিবাদের সাহায্যে জ্ঞানাত্মক সত্তার ব্যাখ্যা করা সম্ভব হলেও সেখানে তাঁর নৈতিক সত্তার স্বরূপ কিংবা নিজস্ব অস্তিত্ব সন্ধান করা বৃথা। মানুষ যত বুদ্ধিবাদী হয়ে উঠেছে, প্রখর ভাবাবেগ দিয়ে কীভাবে জীবন যাপন করা যায়, সেই পদ্ধতি ও প্রকরণ সত্তা ভুলে যাচ্ছে। কিয়ের্কেগার্দের এই ভাবনার মুখোমুখি হই যখন, নিরেট কেজো সম্প্রদায়ের নিরন্ধ্র জগতের সঙ্গে প্রতিদিনকার সংঘর্ষে রক্তাক্ত-হওয়া আর্ত ও নিঃসঙ্গ মানুষের সংযোগশূন্য বেদনার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই যেন। নিজের মুদ্রাদোষে নিজে একা প্রতিনিয়ত আলাদা হয়ে যাচ্ছে যে অনন্বয়ক্লিষ্ট মানুষটি, তার পক্ষ থেকে বলার মতো কথাই উচ্চারিত হতে শুনি।

বুঝতে পারি কেন কিয়ের্কেগার্দ বলতে চান, ব্যক্তিমানুষকে পূর্বনির্ধারিত ধারণার পিঞ্জরে রুদ্ধ করা সমীচীন নয়। একক অস্তিত্ব সর্বদা গোষ্ঠী থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, বিষয়গত সত্য আবিষ্কার করতে গিয়ে ব্যক্তিসত্তা যদি বাধ্যতামূলক ভাবে নির্বাসিত হয়ে পড়ে, তাহলে তা কোনো কাজে লাগবে না। দর্শনের অজস্র পদ্ধতিকে কাজে লাগাতে গিয়ে মানুষ যদি কেবলই আপন সত্তাকে আড়াল করার মতো দুর্ভেদ্য

প্রাচীর তৈরি করে, তবে সেই চক্রব্যূহে বন্দিত্বই তাকে প্রতিমুহূর্তে নিরাকৃত করবে। তাঁর বিখ্যাত মন্তব্য: 'এরকম জগৎ তৈরি করে কী লাভ যেখানে আমি বাস করি না?' জীবন ও জগতের অন্তহীন উপকরণ ও পরিস্থিতির টানাপোড়েনে, প্রতিনিয়ত গড়ে উঠছে সত্তা। আর, সেইজন্যে প্রতিমুহূর্তে নিজের সদ্যপ্রাপ্ত অবস্থানকে সে পেরিয়েও যাচ্ছে। হওয়া আর হয়ে ওঠার এই প্রক্রিয়ায় বাইরের কোনো কিছুই নির্মাতা বা নিয়ন্তা হতে পারে না। সদ্যবিগত মুহূর্তের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে মুছে ফেলে ব্যক্তিসত্তা বর্তমানকে গড়ে তুলছে; আর, এই যুক্তিশৃঙ্খলা অনুযায়ী আসন্ন ভবিষ্যতের অনিবার্য তাড়নায় তাকে বিনির্মাণও করছে। সোরেনের মতে ব্যক্তির অস্তিত্ব আর ব্যক্তির প্রত্যয় এক কথা নয়; অস্তিত্ব সার্বভৌম বলেই তাকে প্রত্যয়ে রূপান্তরিত করা যায় না। তা অন্যাপেক্ষ নয়, পরাধীনও নয়; নিছক যৌক্তিক পরম্পরা বা স্বতঃসিদ্ধ ধারণা দিয়ে অস্তিত্বকে বোঝা সম্ভব নয়। বস্তুত প্রণালীবদ্ধ দার্শনিক প্রতিবেদনগুলি এত সীমায়িত যে তাদের মধ্যে ব্যক্তি-অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যায়। সম্ভাবনা যতক্ষণ সক্রিয়, ব্যক্তি-অস্তিত্ব ততক্ষণ প্রাসঙ্গিক।

পাঁচ

এখন, এই একুশ শতকের সূচনাপর্বে, আধুনিকোত্তর চিন্তাপ্রস্থানগুলির আধিপত্য প্রবণতা যখন সন্ত্রাসের চরিত্র অর্জন করে নির্মাণবায়নের সহগামী প্রতীত বাস্তব প্রতীত পরিসর প্রতীত সময়ের চোরাবালিকে অবাধ ও দুস্তর করে তুলেছে—কিয়ের্কেগার্দের আস্তিত্বিক নন্দনের পুনঃপাঠ খুব জরুরি হয়ে উঠেছে। প্রাগুক্ত চিন্তাপ্রস্থানগুলির আক্রমণে সব ধরনের প্রাতিষ্ঠানিকতা এত অনতিক্রম্য যে মানুষের মূর্ত অস্তিত্ব পুরোপুরি উপেক্ষিত। একক অস্তিত্ব এমন গভীর সংকটে বিপন্ন যে পিণ্ডাকার ভিড়ের মধ্যে পার্থক্য-প্রতীতির জন্যে কোনো মর্যাদা নেই আর। মহানাগরিক এবং আধা-নাগরিক সমাজের বাসিন্দারা একটি অভিন্ন ধরনে 'পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ' সোনার হরিণের পেছনে ছুটতে ছুটতে মরীচিকায় বিলীন হয়ে যাচ্ছে। সোরেন দেড় শতাব্দী আগে যা ভেবেছিলেন, তা কি তবে প্রত্ন-আধুনিকোত্তর চিন্তাপ্রণালীর নিদর্শন? কেননা তাঁর মতো আমরাও তো দেখছি, ইদানীং এমন-এক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যখন কোনো মানুষই তার সত্তাকে পরিপূর্ণ করতে পারছে না। অধিকাংশ জন ছাঁচে-ঢালা পদ্ধতি নির্বিচারে অনুসরণ করে সুখ ও পূর্ণতার ভোগসর্বস্ব কল্পস্বর্গে নিজেদের স্থাপন করতে চায়। নিজেরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয় না, দায়বোধও বহন করে না; নিজেদের উৎকট বিচ্ছিন্নতাকে চিনতে না পেরে তৈরি করে শুধু অবভাসের গ্রন্থনা। বিশেষত ইদানীং রাষ্ট্রব্যবস্থা-রাজনৈতিক সমাজ-আমলাতন্ত্রের নিশ্ছিদ্র আঁতাত যেভাবে ব্যক্তি-অস্তিত্বের অন্তঃসারকে শুষে নিচ্ছে, মানুষ হয়ে উঠছে আপেক্ষিক বিন্দু মাত্র।

শাশ্বত ও ক্ষণস্থায়ী কিংবা সসীম ও অসীম যত দ্বিমেরুবিষম হোক না কেন, অস্তিত্ব সন্ধানী মানুষ এদের মধ্যেও দ্বিরালাপ আবিষ্কার করতে চায়। অর্থাৎ জেনে শুনেই

স্ববিরোধিতাকে নিজের গভীরে ধারণ করার চেষ্টা করে। সাধারণভাবে বুদ্ধিবাদ এ ধরনের প্রয়াসকে স্বীকার করুক বা না করুক, অস্তিত্বের নান্দনিক এষণায় ঐ চেষ্টা সম্ভাবনা হিসেবে মান্যতা পেতে পারে। কিয়ের্কেগার্দ তাই লিখেছেন: 'অসীম ও সসীম, শাশ্বত ও ক্ষণস্থায়ীর মিলনে যে শিশুর জন্ম হয়, তা-ই অস্তিত্ব; এইজন্যে অস্তিত্ব মানে নিরন্তর সংগ্রাম।' তাঁর বক্তব্য হলো, ঐ স্ববিরোধী উপাদানের সংশ্লেষণে তৈরি হচ্ছে সত্তা। এই নির্মীয়মান প্রক্রিয়ার সূত্রে যে স্বতশ্চল আন্তঃসম্পর্কের গ্রন্থনা প্রকট হয়ে উঠেছে, তা স্বভাবত মুক্ত ও স্বাধীন। এই অর্থে সংগ্রামশীল অস্তিত্ব আর দ্বন্দ্বময় স্বাধীনতাকে বুঝে নিতে হয় অভিন্ন সক্রিয়তায়। আর, তাই সূত্রাকারে কিয়ের্কেগার্দ বলেছেন: সত্তাই স্বাধীনতা। তা একই সঙ্গে সবচেয়ে বিমূর্ত আবার সবচেয়ে মূর্ত। মানুষের প্রতিটি কাজে, চিন্তা ও চেতনার প্রতিটি অভিব্যক্তিতে, সক্রিয় পর্যবেক্ষক-ভাষ্যকারের উপস্থিতিতে, বাইরে ও ভেতরে, আগে ও পরে বিচ্ছুরিত হয় স্বাধীনতার বোধ। যেখানে স্বাধীনতা, সত্তা সেখানেই। আর, তার বিনির্মাণ, তার সৃষ্টি, তার নন্দন। এইজন্যে মানুষ হয়ে ওঠার একটাই অর্থ: স্বাধীন হওয়া বিনির্মাণ-প্রবণ হওয়া অপ্রাতিষ্ঠানিক হওয়া সৃষ্টির নন্দনে সঞ্জীবিত হওয়া।

রজার পুলের একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য এখানে স্মরণ করতে পারি : 'The Kierkegaardian text does not tell us something, it asks us something.' (১৯৯৮ : ৬১)। এইজন্যে কিয়ের্কেগার্দের বয়নবিশ্বে গ্রহীতা-পাঠকের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। নিরন্তর উত্থাপিত জিজ্ঞাসার অন্তর্বৃত সম্ভাবনাকে খনন করে যাওয়াই আমাদের নান্দনিক কৃত্য। কেননা সোরেন কিয়ের্কেগার্দের প্রাথমিক ও মৌলিক পরিচয় হলো, তিনি একজন সংযোগ-সন্ধানী লেখক। পূর্বসূরিদের চিন্তাপ্রকরণকে অন্তর্বয়ন হিসেবে ব্যবহার করে তিনি ক্রমাগত এক প্রতিবেদন থেকে অন্য প্রতিবেদনে সরে যান। উচ্চারিত বয়ানে সম্পৃক্ত করেন নিরুচ্চার বয়ানের সঞ্চরমান বলয়; উদ্ভাসিত পাঠের অন্তরালে রেখে যান অজস্র অন্ধবিন্দুর সমাবেশ। ফলে তাঁর রচনার নান্দনিক পরিগ্রহণে ব্যাসকূটের মুখোমুখি হওয়া পাঠকের পক্ষে অনিবার্য। চূড়ান্ত মীমাংসার বদলে স্তরে-স্তরে বিন্যস্ত সম্ভাব্য তাৎপর্যের প্রস্তাবনা করতেই বরং উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন আগ্রহী পাঠকেরা। কিয়ের্কেগার্দের প্রতিবেদন যদিও অন্তঃস্বভাবে নাটকীয় ও দ্বান্দ্বিক আকরণে বিন্যস্ত, তবু নির্দিষ্ট দর্শন-প্রস্থান প্রভাবিত প্রচলিত পাঠাভ্যাস অনুযায়ী সেইসব বয়ান থেকে ধর্মতত্ত্ব ও নীতিশাস্ত্রের সমর্থন জ্ঞাপক সিদ্ধান্ত বারবার খুঁজে নেওয়া হয়েছে। এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর বয়ানের অন্তর্বর্তী কূটাভাস বা অন্ধবিন্দুগুলি শুধুই প্রতীয়মান। সুশৃঙ্খল তাৎপর্য যাঁদের কাছে ঈপ্সিত, তাঁরা নানা যুক্তি দেখিয়ে কিয়ের্কেগার্দের বাচনে চূড়ান্ত সমাধানের ইশারা আবিষ্কার করেন। কিয়ের্কেগার্দের লিখনবিশ্বে এত যে পর্বান্তর ও পরস্পর-বিরোধিতা রয়েছে, তাদের মধ্যে পরিব্যাপ্ত মুক্ত গ্রন্থনা আসলে সংশয় ও বিশৃঙ্খলাকে নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য বলে মনে করে না। তাই নান্দনিক বিচারে কোনও ধরনের অভ্যস্ত নিরিখও কার্যকরী নয়। এমন হতেই পারে যে প্রতিটি পুনঃপাঠে লেখকের অভিপ্রায় ও অন্বিষ্ট সম্পর্কে আমাদের ধারণা আমূল বদলে যাচ্ছে। এমন কী,

নন্দন ও নন্দনশূন্যতার মধ্যবর্তী জলবিভাজনরেখা মুছে যাচ্ছে। তাহলে, পাঠকের অভিপ্রায় অনুযায়ী কিয়ের্কেগার্দের লিখনবিশ্বের নান্দনিক সম্ভাবনা ও নির্যাস অনবরত নির্ণীত হতে পারে:· এরকম ধরে নিতে পারি।

রজার পুল এইজন্যে কিয়ের্কেগার্দের ভাববিশ্ব পর্যটনকে বলেছেন 'hermeneutic adventure' (প্রাগুক্ত : ৬২)। তাঁর আস্তিত্বিক নন্দনের অভিব্যক্তিতে বিভিন্ন ছদ্মনামের উপস্থিতি খুব গুরুত্বপূর্ণ, এরকম ভেবেছেন মার্ক টেলর ও জর্জ প্যাটিসন (১৯৯২) এবং সিলভিয়া ওয়ালস্-এর (১৯৯৪) মতো আলোচকরা। নন্দনের প্রাতিভ-সত্তাবাদী বিশ্লেষণ অনুযায়ী এইসব ছদ্মনাম ব্যবহারের ফলে মুহূর্ত-পরম্পরায় বিন্যস্ত উপলব্ধি-পুঞ্জের অনেকান্তিকতা ঈঙ্গিত বহুত্ববাদী আধার পেয়েছে। সেইসঙ্গে অস্তিত্বের নান্দনিক মাত্রার সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পেরেছে জীবনের নানা দিগন্তে ব্যাপ্ত উদ্ভাসন। কিংবা এই বার্তাও সম্ভবত উঠে এসেছে যে, প্রতিটি বয়ানই আপেক্ষিক, অনিশ্চিত, অসম্পূর্ণ। ছদ্মনামে রচিত ভিন্নভিন্ন প্রতিবেদনে বিচিত্র সম্ভাবনাময় আস্তিত্বিক নন্দনের অন্তহীন নির্মাণ-প্রকল্পই প্রস্তাবিত হয়েছে। এদের বিষয় যা-ই হোক, কিয়ের্কেগার্দ বারবার লিখনবিশ্বের সীমানাই যেন নতুন করে আবিষ্কার করেছেন। যেন প্রতিটি পাঠকৃতিতে আপন সত্তার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার নতুন কৃৎকৌশল রপ্ত করে নিয়েছেন। জেনেছেন, অস্তিত্বের কোনো নির্দিষ্ট কেন্দ্র নেই, নেই পরিধি কিংবা লক্ষ্য। জগতের সঙ্গে সংযোগের সেতু কেবলই পুনর্নির্মাণ করে যেতে হয়; অথচ উদ্যমের শেষে কোথাও পৌঁছানোর নিশ্চয়তাও দেওয়া যায় না। পুরোনো উদ্যমকে শুধু নতুন উদ্যম শুরু করার উপক্রমণিকা হিসেবে গণ্য করা যায়। ছদ্মনাম তাই যতখানি আড়াল, ততখানি নান্দনিক প্রয়োজনও। কিয়ের্কেগার্দ আসলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, 'pseudonymity builds contradiction into the discourse and makes all linear or structural progress impossible.' (তদেব : ৬৪)

পর্ব থেকে পর্বান্তরে অস্তিত্ব এবং অস্তিত্বের নান্দনিক অভিব্যক্তি যাতে পার্থক্য-প্রতীতির নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়াকে প্রকট করে তুলতে পারে, সেইজন্যে কিয়ের্কেগার্দ ছদ্মনামগুলি ব্যবহার করেছেন। রবার্ট সি. রবার্টস্ তাই কিয়ের্কেগার্দের আত্ম-নিরাকরণকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে মন্তব্য করেছেন : 'He does not want to be read as Kierkegaard. He wants, instead, to be a dispensable vehicle for his reader's coming to understand other things.' (১৯৮৬ : ১-২)। কিয়ের্কেগার্দকে যে 'dispensable vehicle' বলা হচ্ছে, তাতে বস্তুত তাঁর লিখনবিশ্বের নান্দনিক মাত্রাই ঘোষিত হল। প্রতিটি বয়ানে প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে ব্যক্তিস্বর ও অন্তর্বয়নের নিয়ামক বহুস্বরের সমারোহ—তাদের পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য এবং যথাপ্রাপ্ত বাস্তবের সীমা পেরিয়ে যাওয়ার প্রবণতা আমাদের লক্ষ করতে হয়। তখন মনে হয়, তিনি যত বড়ো দার্শনিক বা ধর্মতত্ত্ববিদ, তার চেয়ে অনেক বেশি কবি। তাঁর রচনার দ্ব্যর্থবোধকতা বা অস্পষ্টতা বা অসম্পূর্ণতা দর্শন বা ধর্মতত্ত্বের অনুসারীদের জন্যে সমস্যা তৈরি করতে পারে; সাহিত্যের পড়ুয়া বা নন্দন-জিজ্ঞাসুদের পক্ষে কিন্তু ঠিক এইসব বৈশিষ্ট্যই আগ্রহ

ও প্রত্যাহ্বানের কারণ।

অবশ্য এর মানে এই নয় যে তাঁর প্রতিবেদনগুলিকে প্রচলিত অর্থে সাহিত্যিকতার নিদর্শন বলা যাবে। বরং প্রতি মুহূর্তে সুনির্দিষ্ট তাৎপর্য সম্পর্কে অনাগ্রহ ও অনাস্থা প্রকাশ করে বলেই গভীরতর অর্থে এদের স্রষ্টাকে কবিসত্তার অধিকারী বলতে পারি। তাৎপর্যের অনির্দেশ্যতাই এইসব বয়ানকে নান্দনিক পরিগ্রহণের বিষয় করে তুলছে। প্রখ্যাত গবেষক মার্ক. সি. টেলর কিয়ের্কেগার্দের লিখন-বিশ্বের নান্দনিক স্বভাবকে এভাবে সূত্রায়িত করেছেন : 'Unity within plurality, being within becoming, constancy within change; peace within flux, identity within difference, the union of union and non-union-reconciliation in the midst of estrangement.' (১৯৮০ : ২৭৬)। এই মন্তব্যের সঙ্গে অবশ্য সবাই একমত নাও হতে পারেন যেহেতু আন্তঃসম্পর্কের অন্তহীন গ্রন্থনায় বৈপরীত্যও নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং নেতি অস্তিত্বের অংশভাক্ হয়ে পড়ে। আকরণোত্তর পাঠতত্ত্বে স্বাধীন সঞ্চরমানতার যে-ধারণাকে কেন্দ্রীয় গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে, কিয়ের্কেগার্দের লিখনবিশ্ব পরিক্রমায় তার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। জাক্ দেরিদা ও রোলাঁ বার্তের তত্ত্বভাবনা এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হতে পারে।

ছয়

কিয়ের্কেগার্দের ভাববিশ্বে উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির দ্বিরালাপ স্বতঃসিদ্ধ। নৈঃশব্দ্য ও বৈকল্পিকতার টানাপোড়েনও তেমনি অনিবার্য। এইসব ভাবনার সূত্রে তাঁকে আধুনিকোত্তর চিন্তা-প্রণালীর যথার্থ পূর্বসূরি বলেই মনে হয়। জাক্ দেরিদা ১৯৬৭ সালে 'Writing and Difference' নামক বিখ্যাত প্রতিবেদন রচনা করার সময় কিয়ের্কেগার্দের ভাববিশ্ব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু চিন্তার সূত্র যে গ্রহণ করেছিলেন, তার দার্শনিক ও নান্দনিক তাৎপর্য অনেকখানি। আবার সোরেনের অস্তিত্ববাদী চিন্তায় 'পরোক্ষ সংযোগ' এর তত্ত্ব ব্যক্তিসত্তার অভিজ্ঞান-বিশ্ববীক্ষা-সমস্যায়নকে সম্মুখায়িত করে তুলেছে। তাঁর উপস্থাপনায় বহুত্ব ও বিকেন্দ্রায়ন, শিথিলতা ও সঞ্চরণশীলতা অন্যোন্য-সম্পৃক্ত। উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠাকে তিনি কেন্দ্রীয় ভাববীজের মর্যাদা দিয়েছেন। আতঙ্ক ও নেতির অন্যোন্য-গ্রন্থনায় এমন-এক দার্শনিক কৃতি রচিত হয়েছে, যার তাৎপর্যকে আমরা এখন নানা দিকে প্রসারিত করতে পারছি। পরবর্তী অস্তিত্ববাদী দার্শনিকেরা কিয়ের্কেগার্দের বিভিন্ন ভাববীজকে সৃষ্টিশীল ভাবে বিকশিত করেছেন। বুর্জোয়া পৃথিবীর কপটতা ও মধ্যমেধার দাপটের মধ্যে এই চিন্তাবিদেরা যখন মুক্ত, স্বাধীন ও দায়িত্বশীল মানব-জীবনের কথা লিখছেন, দানবিক নৈঃশব্দ্যে গ্রথিত নিঃসঙ্গতাকে বিদীর্ণ করে সত্তাকে এই বোধে জেগে ওঠার কথা বলছেন: 'without assistance and without excuse, condemned to decide without support from any quarter, condemned for ever to be free.'(Jean Paul Sartre: The Age of Reason : 1961:243)

সার্ত্রের মতো হাইদেগার, য়াসপের্স, কাম্যু, কাফকা কত গভীর ভাবে কিয়ের্কেগার্দের ভাবনায় পরিশীলিত হয়েছিলেন, তা স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়। আমরা শুধু লক্ষ করব নান্দনিক প্রতিবেদনগুলির উৎসমূলে সোরেনের চিন্তাবীজগুলির প্রগাঢ় উপস্থিতি। কিয়ের্কেগার্দের কিছু কিছু বিশিষ্ট বাচন পরবর্তী কালে তত্ত্ববীজের মর্যাদা অর্জন করেছে। উদ্বেগ, আতঙ্ক, নেতি-পরিসরের মতো প্রবহমান বর্তমান সম্পর্কে তাঁর শ্লেষ-তিক্ত উচ্চারণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। জন-পরিসরকে তিনি 'দানবিক নেতি' বলেছেন; সেই সূত্রে সর্বজনীন বাচনের স্বভাবও তাঁর কাছে দানবিক নেতিতে গ্রথিত। আধুনিকতার ভাববর্গ হিসেবে তিনি যেসব শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন, সেইসব তাঁর নান্দনিক অবস্থানেরও ইঙ্গিতবাহী : বাচালতা, প্রকরণহীনতা, অগভীরতা, (প্রগল্‌ভতা বা প্রতীয়মানতা) তোষামুদি ও ছদ্ম-যৌক্তিকতা। পরবর্তী কালে হাইদেগার তাই আধুনিকতার বাচনিক বর্গ হিসেবে অলস কথকতা, দ্ব্যর্থবোধকতা, স্বতঃপতন ও সমপর্য্যমানতার কথা লিখেছেন।

এতে সন্দেহ নেই যে কিয়ের্কেগার্দ যুগপৎ বহিঃপৃথিবীর নিরেট স্থূলতা ও অগভীর প্রতীয়মানতা এবং অন্তর্জগতের উদ্ভট অনন্বয় ও শৃঙ্খলাবিহীন প্রস্থনায় উৎকণ্ঠিত ও পীড়িত বোধ করেছিলেন। তাঁর জীবন-দর্শন ও নান্দনিক বোধের সঞ্চালক পরাপাঠ হলো মানুষের সমস্ত সম্ভাব্য অবস্থানই নিশ্চিত কোনও সিদ্ধান্তে নিয়ে যেতে পারে না, নতুন নতুন জিজ্ঞাসার উত্থাপন করতে পারে মাত্র। প্রখ্যাত অস্তিত্ববাদী লেখক ও দার্শনিক আলবেয়ার কাম্যু তাঁর 'Myth of Sisyphus' বইতে কিয়ের্কেগার্দের সত্তা-নিঙ্ড়ানো যন্ত্রণার নান্দনিক নির্যাসকে এভাবে প্রতিপ্রশ্নের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন: 'If man did not have eternal spirit if, at the bottom of things, there were nothing but a wild and tempestuous power producing everything, the great as well as the mean in the whirlwind of obscure passions, if the bottomless emptiness which nothing can fill were hidden beneath everything, what would life be, if not despair ?' (১৯৬২ : ৬১)

সাত

এই জিজ্ঞাসাপুঞ্জের মুখোমুখি হয়ে বুঝি, কিয়ের্কেগার্দের অস্তিত্ব-পরিসর আর নন্দন অন্যোন্য-সম্পৃক্ত। হেগেলের মতো তিনি কোনো নন্দনতত্ত্ব মূলক বই লেখেন নি; তবু কবি ও কথাকারদের ঈপ্সিত ভূমিকা তাঁর বয়ান থেকে অর্জিত উপলব্ধিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সঙ্গীত-নাটক-ছবির জগৎও তাঁর নান্দনিক প্রতীতির যুক্তিশৃঙ্খলায় নতুন তাৎপর্যে অন্বিত হতে পারে। আসলে অস্তিত্বকে বুঝি যখন, নন্দনকেও বুঝে নিই, কবিতা বা উপন্যাস বা নাটক বা সঙ্গীত না হয়েও জীবন নান্দনিক মাত্রায় পরিশীলিত, পুনরুজ্জীবিত ও পুনর্নবীকৃত হতে পারে। জীবনের যথাপ্রাপ্ত অনন্বয় ও পরস্পর-বিরোধিতা তাতে নিরাকৃত না হোক, গভীরতর ও ব্যাপকতর নান্দনিক

প্রতিবেদনের মধ্যে সমস্ত তাৎপর্যবহ হয়ে উঠতে পারে। তাতে নান্দনিক অভিব্যক্তিগুলি বাস্তবের যত কাছাকাছি যাক, এর বিকল্প হতে পারে না কখনও। এই যে ব্যবধান বা স্বাতন্ত্র্যের বোধ, তা অস্তিত্বকে আরও শানিত ও নির্বিকল্প করে তোলে। হেগেল কবির চেতনাকে তাই মূলত অসুখী চেতনা (unhappy consciousness) বলে উল্লেখ করেছিলেন। আর, কিয়েৰ্কেগার্দও তাঁর দিনলিপিতে এই ধারণাকে সমর্থন জানিয়েছেন। গ্যয়েঠের 'হ্‌লহেলম্ মাইস্টের' এর মধ্যে তিনি নৈতিক জগৎ-শৃঙ্খলা ও সমগ্র রচনায় ব্যাপ্ত সুসমঞ্জস সঞ্চালক নির্দেশের অস্তিত্ব লক্ষ করেছেন। ঐ উপন্যাসের নায়ক-সত্তায় কেন্দ্রীয় বোধ এমনভাবে প্রতিফলিত হয়েছে যে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে 'truly the whole world seen in a mirror, a true microcosm' (জার্নাল :১৪৫৫)

প্রতিটি সার্থক পাঠকৃতির গভীরে প্রচ্ছন্ন থাকে স্রষ্টা ও গ্রহীতার বিশিষ্ট সংযোগ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা। অসংখ্য অংশের সমবায়ী উপস্থিতির মধ্যে ঐক্যবোধের জেগে ওঠায় শুধু বৌদ্ধিক সামর্থ্য প্রমাণিত হয় না, নান্দনিক পর্যবেক্ষণের আনন্দও ব্যক্ত হয়। কিয়েৰ্কেগার্দ জানেন, অধিকাংশ মানুষ এই সামর্থ্য ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত। স্রষ্টা ও গ্রহীতার সংযোগে কোনো ভাবকল্প যখন নান্দনিক মাত্রা অর্জন করে, জীবনের বয়ান কাব্যিক ভাবে ঊর্ধ্বায়িত হয়। যেন 'a refreshing, renewing bath' (তদেব : ৫২৮৭) এর মধ্য দিয়ে জীবনের অসামঞ্জস্য ও পরস্পর-বিরোধিতার পরিসর অন্বিত হয়ে যায়। তাহলে, এর মানে কি এই যে, প্রকৃত অস্তিত্বের কঠোর ও অপ্রীতিকর বাস্তব থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্যেই নান্দনিক প্রক্রিয়া? আদর্শায়িত কাব্যিক সমগ্রতা অর্জনের জন্যে কি জীবনে অর্জিত সমগ্রতাকে অবচেতন ভাবে বিসর্জন দেবেন কবি? ব্যক্তি-সত্তার গভীরে কাব্যিক জীবন ও নান্দনিক সৃষ্টি জেগে ওঠে যন্ত্রণার সূত্রে। আবার কিয়েৰ্কেগার্দ একথাও বলেছেন যে নান্দনিক প্রকরণের জন্যে মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহ বিপদের সংকেত হিসেবে গণ্য। কেননা এর পরিণাম হলো 'the evaporation of the person, in which the authentic conscious existence is surrendered and everything is poetry.' (তদেব : ৩৮৯০)। তার মানে, বৈধ সচেতন অস্তিত্বকে আরো বিকশিত করার জন্যে নন্দন। আদর্শ চিন্তাপরিসর ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের মাঝখানে রয়েছে শিল্পকর্ম। এই হেগেলীয় দৃষ্টিকোন মেনে নিয়েও কিয়েৰ্কেগার্দ আত্মপ্রতিফলন ও স্বাধীনতার ভাবকল্পের সঙ্গে নান্দনিক প্রক্রিয়ার সম্ভাব্য আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে ভেবেছেন। শিল্পজগৎ তাঁর মতে যৌক্তিক ভাবে নিয়ন্ত্রিত। এই নিরিখে প্রকরণ ও অন্তর্বস্তুর চিরাচরিত সম্পর্ক নিয়েও তাঁর নিজস্ব ধরনে মৌলিক মন্তব্য করেছেন তিনি। এ ব্যাপারে সাম্প্রতিক আলোচকেরা নন্দনতাত্ত্বিক জে. এল. হাইবের্গের সঙ্গে কিয়েৰ্কেগার্দের নিবিড় সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করেছেন।

কমেডি নিয়ে ভেবেছেন তিনি। ভেবেছেন ট্রাজেডি নিয়েও। বিশেষত ট্রাজেডির নন্দন ও অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসা নিয়ে তাঁর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবনায় দর্শন ও কাব্যিকতার প্রথাগত সীমারেখা মুছে গেছে। কাম্যু, সার্ত্র, ইবসেন, কাফকা ও টমাস মানের লিখনবিশ্বে কিয়েৰ্কেগার্দের ভাববিশ্বের দীর্ঘায়িত ছায়ার উপস্থিতি লক্ষ করেছেন কেউ

কেউ। সত্য ও সত্যভ্রমের বহুমাত্রিক আততি থেকে নিষ্পন্ন বয়ানগুলিতে অজস্র প্রবেশবিন্দু ও নির্গমবিন্দু রয়েছে বলে গ্রহীতা-পাঠকের পক্ষে অবস্থান নিশ্চিত করা দুরূহ হয়ে পড়ে। তবে নান্দনিক জিজ্ঞাসার পক্ষেও আবশ্যিক অস্তিত্বের উচ্চতর প্রকরণ: এই হলো কিয়ের্কেগার্দের প্রত্যয়। 'Either/or' এর প্রগাঢ় কাব্যিক উচ্চারণ এরকম: 'Then the spirit masses within him, like a dark cloud, its wrath broods over his soul, and it becomes an anxiety that does not cease even in the moment of enjoyment!'এমন মণিমুক্তো এই প্রতিবেদনের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। বস্তুত এর প্রতিটি অনুচ্ছেদ নিয়ে স্বতন্ত্র বয়ান তৈরি হতে পারে।

আর, তাই, সোরেন কিয়ের্কেগার্দ প্রতিমুহূর্তে নবায়িত এক অফুরন্ত নির্ঝরের নাম। পাঠক হিসেবে আমাদের এখন বারবার নতুন করে জেনে নিতে হবে, কীভাবে পড়ব তাঁর বয়ান! কীভাবে যাব পাঠ থেকে পাঠান্তরে, অর্থ থেকে অর্থান্তরে।

ভাষাচিন্তার নানা দিগন্ত : সোস্যুর থেকে দেরিদা

সাহিত্য যে সংযোগ তৈরি করার একটি বিশিষ্ট ধরন, এ সম্পর্কে দ্বিমত নেই। আর, সংযোগ সম্পর্কে যত তত্ত্বকথাই বলি, তা আদ্যন্ত প্রয়োগকুশলতার ওপর নির্ভরশীল। সাহিত্যের সাফল্য ও ব্যর্থতা আসলে প্রয়োগের লক্ষ্যভেদী হওয়া বা না হওয়া। না লিখলেও চলে, এই প্রয়োগ পুরোপুরি ভাষার, বাচনের, প্রতিবেদনের। তাই ভাষা-ভাবনা ও সাহিত্য-ভাবনা অন্যোন্য-সম্পৃক্ত। না, আসলে বলা উচিত, অবিচ্ছেদ্য। সাহিত্যতাত্ত্বিকদের কাছে ভাষাভাবুকের গুরুত্ব এইজন্যে অপরিসীম। বিভিন্ন পর্যায়ে সাহিত্যতত্ত্বের যাত্রাপথ বদলে দিয়েছে ভাষাচিন্তা; নতুন দিশা দিয়েছে কখনও আর কখনও পুরোনো অন্বিষ্ট পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। বিশ শতকে সাহিত্যিক প্রয়োগে যত বড় মাপের পরিবর্তন হয়েছে, তাদের সঙ্গে লক্ষণীয় ভাবে রূপান্তরিত হয়েছে ভাষাভাবুকতার ধরন। এমনকি, উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই দেখা গেছে, ভাষাচিন্তা ও সাহিত্যচিন্তা যুগলবন্দি প্রবাহের মতো ক্রমশ ঋদ্ধতর হয়ে উঠেছে। একে অপরকে যোগান দিচ্ছে নতুন-নতুন তত্ত্ববীজ, অভিব্যক্তির নতুন পরিসর, নতুন ভাষ্যের সম্ভাবনা, প্রয়োগের নতুন কর্ষণভূমি। বিশ শতকের আগে চিন্তাবিদেরা অবশ্য ভাষার যুগবাহিত পরিবর্তনের কারণ ও পদ্ধতি অনুশীলনে বেশি আগ্রহী ছিলেন। আর, বিশ শতকের সূচনাপর্ব থেকে দেখা গেল, ভাষার সংযোগ-আভিমুখ্য ও প্রায়োগিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অভিনিবেশ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে ক্রমশ। সেই সূত্রে অবধারিত হয়ে উঠল সাহিত্যতত্ত্বের আশ্চর্য দিগন্ত-বিস্তার। ভাষাচিন্তা ও সাহিত্যচিন্তার এই নতুন যুগলবন্দির স্থপতি হচ্ছেন সুইজারল্যান্ডের জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের বরেণ্য অধ্যাপক ফার্ডিনান্দ দ্য সোস্যুর (১৮৫৭-১৯১৩)।

১৯০৬ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত যেসব অল্পসংখ্যক ছাত্র জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব সম্পর্ক সোস্যুরের কাছে পাঠ নিচ্ছিলেন, তাঁরা ভাবতেও পারেননি যে তাঁদের উপলক্ষ করে চিন্তা-পরিসরে নতুন ইতিহাস রচিত হচ্ছে। বিশ শতকের বৌদ্ধিক আন্দোলনগুলির মধ্যে সবচেয়ে সৃজনী সম্ভাবনাময় ভাবপ্রস্থানের অন্যতম ধারার জন্মপ্রক্রিয়ায় তাঁরা যে শরিক, তা বুঝতে আরও কয়েক বছর লেগেছিল। ১৯১৩ সালে সোস্যুরের দেহাবসানের পরে ঐ ছাত্রদের তৈরি অনুশীলনী খসড়া বা তাঁর বক্তৃতার অনুলিপি থেকে 'Course in General Linguistics' নামক যুগান্তকারী বইটি প্রকাশ করা হলো (১৯১৬)। শুরু হলো ভাষাবিজ্ঞানের প্রণালীবদ্ধ যাত্রা। এর প্রভাব কত সুদূরপ্রসারী, তা অনুভব করার জন্যে অবশ্য চার দশকেরও বেশি অপেক্ষা

করতে হয়েছে। ফ্রান্সে আকরণবাদ (Structuralism) উদ্ভূত হলো সোস্যুরের চিন্তাবিশ্ব থেকে আহৃত উপাদান পুনর্বিন্যস্ত করে। আর, ক্রমশ আকর্ণোত্তরবাদ-বিনির্মাণবাদ চিহ্নবিজ্ঞানের মধ্যে অব্যাহত রইল তার বিচিত্র পুনর্নির্মাণ। আসলে সোস্যুরের ভাষাচিন্তার পাঁজর থেকে জন্ম নিয়েছে সাহিত্যতত্ত্বের নতুন-নতুন আকল্প। বস্তুত নৃতত্ত্ব, মনোবিকলন, সাংস্কৃতিক ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি মানবিকী বিদ্যার বিচিত্র ক্ষেত্রে সোস্যুরের ভাষাতাত্ত্বিক ভাবনার বিপুল প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছে।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা যেতে পারে। প্রাগুক্ত বইটি যেহেতু মরণোত্তর প্রকাশনা, সোস্যুরের চূড়ান্ত অভিমত হিসেবে এর প্রতিবেদনকে গ্রহণ করা যায় না। সবচেয়ে বড়ো কথা, প্রচলিত অর্থে যাকে লেখকসত্তা বলি, এই বইতে তার অনুপস্থিতি অত্যন্ত লক্ষণীয়। আসলে ঐ বইয়ের লেখক-অভিধা সমবায়ী উপস্থিতির ফসল। কেননা শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করার মধ্য দিয়ে সোস্যুরের যেসব মৌখিক প্রতিবেদন গড়ে উঠেছিল, তাদের অনুলিপিতেও সোস্যুর নিশ্চয় উপস্থিত। আবার তাঁর ছাত্রদের শ্রুতিলিখন যেহেতু বইয়ের প্রধান ভিত্তি, তাদের নিজস্ব গ্রহণ-ক্ষমতাও বয়ানের মধ্যে নিশ্চয় সূক্ষ্মভাবে সঞ্চারিত হয়েছে। আর, সবার উপরে রয়েছে দুজন সম্পাদক (চার্লস বেলি ও এলবার্ট সেচেহারে) দ্বারা পুনর্লিখিত ও পুনর্বিন্যস্ত বয়ানের প্রসঙ্গও। সম্পাদকের ভূমিকা থেকে জেনেছি যে ছাত্রদের খসড়া থেকে বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে গিয়ে তাঁদের নজরে পড়েছে, সোস্যুরের বক্তব্য কখনও কখনও 'faint, sometimes conflicting, hints' মাত্র। সম্পাদকেরা পুনর্লিখনে হয়তো নিজস্ব ভাষ্যও যোগ করেছিলেন যাতে বয়ান স্বচ্ছ, সুখপাঠ্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। সুতরাং সোস্যুর নামের আড়ালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে বহুবাচনিক লেখকসত্তা, এমন বলা যেতে পারে। ভাষাচিন্তার আবহকে যে-বইটি সূক্ষ্মতা ও ব্যাপকতা দিয়ে বহুমুখি করে তুলেছে, তার মর্মমূলে অনতি-প্রচ্ছন্ন বহুবাচনিকতা অবশ্যই সংকেত-গর্ভ। সাহিত্যতত্ত্ব সহ মানবিকী বিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রকে যিনি চিহ্নায়ন প্রকরণের আধেয় করে তুলেছেন, তিনি এক নন, অনেক—এই উপলব্ধি সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। তবু আমরা সোস্যুরকে গ্রহণ করব অনেকান্তিক একক সত্তা হিসেবেই।

সোস্যুরের প্রতিবেদনে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অন্বিষ্ট হলো ভাষাতাত্ত্বিক অধ্যয়নের যথার্থ লক্ষ্যকে সংজ্ঞায়িত করা। এ বিষয়ে ভাষাবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য আলাদাভাবে চোখে পড়ার মতো। অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিশ্লেষিতব্য বিষয় পূর্বনির্ধারিত; নানা দৃষ্টিকোন থেকে তা আলোচিত হতে পারে। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানে এমন হয় না যেহেতু তাতে বিষয় থেকে দৃষ্টিকোনে যাওয়া চলে না। বরং দৃষ্টিকোনই বিষয়কে সৃষ্টি করে। সুতরাং সোস্যুর কী ধরনের চিন্তা-প্রকল্প তৈরি করতে চেয়েছেন, তা অনুধাবন করাটা জরুরি। যুক্তিনিষ্ঠ স্বচ্ছ বিজ্ঞানসম্মত অন্বিষ্ট তিনি নির্মাণ করতে পেরেছেন কিনা, সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির অনুশীলন প্রয়োজন। সোস্যুর 'Language', 'Langue 'ও' 'Parole'—এই তিনটি প্রধান পারিভাষিক বর্গের কথা জানিয়েছেন, যাদের যথাক্রমে ভাষা, সামূহিক বাচন ও একক বাচন বলে গ্রহণ করতে পারি। স্পষ্টতই ভাষা

হলো বৃহত্তম বর্গ কারণ বাচনের ব্যাপারে মানুষের দৈহিক ও মানসিক, এক কথায়, সমগ্র সম্ভাবনা এতে অন্তর্ভুক্ত। ফলে তা এতটা সাধারণীকৃত ও সংজ্ঞাতীত যে প্রণালীবদ্ধ ভাবে এর অধ্যয়ন করা শক্ত। প্রতিতুলনায় সামূহিক বাচনকে প্রণালীবদ্ধ ভাবে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের সূত্রে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। প্রতিবেদনের জন্ম দেওয়ার জন্যে অন্যদের কাছে বোধগম্য যে-ভাষাপদ্ধতি আমরা সাধারণভাবে ব্যবহার করে থাকি, তা-ই হলো সামূহিক বাচন। আর, আমাদের ব্যক্তিগত উচ্চারণ হলো একক বাচন। তাহলে 'ভাষা' হলো ভাষিক সম্ভাবনা, 'সামূহিক বাচন' হলো নির্দিষ্ট ভাষাগত পদ্ধতি এবং 'একক বাচন' হলো ব্যক্তির উচ্চারণ। সোস্যুরের মতে ভাষাগত অধ্যয়নের কেন্দ্রে রয়েছে ভাষা-পদ্ধতি। ভাষা-ব্যবহারকারীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে ঐ পদ্ধতি। একক বাচন থেকে সামূহিক বাচনে যখন পৌঁছাই, ভাষা-প্রকরণ সম্পর্কিত ধারণা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে গড়ে ওঠে।

পদ্ধতি সম্পর্কিত বোধ সংযোগের পক্ষে আবশ্যিক। কেননা বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে কার্যকরী সেতু অর্থবোধের সাধারণ ভিত্তি ছাড়া গড়ে ওঠা অসম্ভব। সাহিত্য-অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এই চিন্তাসূত্রটি খুব মূল্যবান! যেহেতু কোনও সাহিত্যিক উচ্চারণ বা পাঠকৃতি তাৎপর্যবহ হতে পারে না যদি লেখক ও পাঠকের মনে সাহিত্য-পদ্ধতির উপলব্ধি না থাকে। রোমান য়্যাকবসন যখন সাহিত্যিকতাকে সাহিত্য অধ্যয়নের প্রকৃত অন্বিষ্ট বলেন কিংবা নথ্রপ ফ্রাই সাহিত্যকে শাব্দিক শৃঙ্খলা হিসেবে পাঠ করতে বলেন—সোস্যুরের চিন্তাসূত্রই আমরা প্রসারিত হতে দেখি। ভাষা-পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করার পরে সোস্যুর ঐ পদ্ধতিকে বিকশিত করার উপযোগী চিন্তাবীজগুলি উপস্থাপিত করেছেন। ভাষিক আকরণের মৌলিক উপাদান হিসেবে তিনি বলেছেন চিহ্নের কথা। অবশ্যই 'চিহ্ন' পুনঃসংজ্ঞায়িত হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন, চিহ্ন নিছক কোনো বস্তু-নাম নয়, একটি জটিল সমগ্রতার আশ্রয়ে তা কোনো ধ্বনিপ্রতিমাকে ধারণার সঙ্গে সংযুক্ত করে। আমরা যখন কাউকে কথা বলতে শুনি, তখনই শুধু ধ্বনিপ্রতিমার প্রতীতি হয়—তা কিন্তু নয়। যখন পড়ি কিংবা চিন্তা করি, ভাষার বাইরে তো যেতে পারি না, তাই একই প্রতীতিতে পৌঁছাই। চিহ্নের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্যকে সোস্যুর চিহ্নায়ক (Signifer) ও চিহ্নায়িত (Signifed) বলে উল্লেখ করেছেন। চিহ্ন কি নিজেই নিজের নিয়ন্তা অথবা তা অন্য কিছু দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়—এই বিতর্কে আপাতত যাচ্ছি না। বরং সোস্যুর তাঁর বইতে যেসব প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করেছেন, তার গুরুত্ব বিবেচনা করে এখানে উদ্ধৃত করছি: 'Language is a system of signs that express ideas, and is therefore comparable to a system of writing, the alphabet of deaf-mutes, symbolic rites, polite formulas, military signals etc. But it is the most important of all these systems.

A Science that studies the life of signs within society is conceivable; it would be a part of social psychology and consequently of

general psychology; I shall call it semiology (from Greek Semeion. sign)'. (Course in General Linguistics : 16)

দুই

সমাজে চিহ্নের নিজস্ব জীবন কীভাবে নির্ধারিত ও বিকশিত হয়, তা জানাটা খুব জরুরি। সোস্যুরের কাছে ভাষাচিন্তা মূলত চিহ্নভাবনা। তাঁর সময়ে চিহ্নবিজ্ঞান সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, ভবিষ্যতে তা কোন পথ ধরে চলবে— তা তখন কেউ বলতে পারত না। কিন্তু তিনি অন্তত এইটুকু বুঝে নিয়েছিলেন যে চিহ্নতত্ত্ব হলো বাচন-বিজ্ঞানীর প্রধান ধারা, ভাষাবিজ্ঞান তার উপধারা মাত্র। চিহ্নতাত্ত্বিক অধ্যয়নে যে-বিধিনিয়মগুলি আবিষ্কৃত হয়, ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োগ করা সম্ভব। আবার আকরণবাদী চিন্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নতত্ত্বের ক্রমবিকাশও অনিবার্য ছিল। ক্লদ লেভিস্ট্রাউস ও রোলাঁ বার্ত দেখিয়েছেন, মানবিক সংযোগের ক্ষেত্রে ভাষা রয়েছে কেন্দ্রীয় অবস্থানে। তাৎপর্য অর্জনের যত পদ্ধতির কথা ভাবি না কেন, ভাষার সাহায্য ছাড়া কোনও কিছুই সক্রিয় হতে পারে না। সোস্যুর চিহ্নের স্বভাব সম্পর্কে এই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন: 'The signifier, being auditory, is unfolded in time...it is a line'। অর্থাৎ চিহ্নায়ক সময়ে সম্পৃক্ত, তার প্রকাশ সময়ের বাইরে নয়, আর, প্রতিটি চিহ্ন রৈখিক। স্বভাবত প্রতিটি উচ্চারণও রৈখিক। ছবিতে যেমন বিভিন্ন ধরনের তাৎপর্যবহ উপকরণ সমান্তরালভাবে ব্যক্ত হতে পারে, বাচনিক উচ্চারণের উপকরণ তেমন ভাবে হয় না। নির্দিষ্ট শৃঙ্খলার বিন্যাসে তার অভিব্যক্তি হয় বলে বিন্যাসের ওপর তাৎপর্য নির্ভর করে। বাক্যে গ্রথিত চিহ্ন প্রতিবেদনের একক বলে তা মূলত আখ্যানের ভিত্তি। এইজন্যে সাহিত্যিক পাঠকৃতির নিবিড় পাঠে চিহ্নায়িত ভাষার এই বিশেষ ধরনটি অভিনিবেশ দাবি করে।

সোস্যুর ভেবেছেন, চিহ্নের মধ্যে রয়েছে এক ধরনের খামখেয়ালি প্রবণতা। অর্থাৎ কোনও বিশেষ চিহ্নের সঙ্গে বিশেষ অর্থের অন্যোন্যনির্ভর সম্পর্ক আমরা প্রত্যাশা করি। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে জানি, এই ধারণার সমর্থন সর্বদা পাওয়া যায় না। কোনও কোনও চিহ্নের একাধিক অর্থ খুঁজে পাই, সেইসব অর্থের সঙ্গে চিহ্নের সম্পর্ক সর্বদা সঙ্গতিপূর্ণ বা যুক্তিগ্রাহ্য নাও হতে পারে। অবশ্য উদ্দিষ্ট অর্থের সঙ্গে চিহ্নের সাধারণভাবে একটা প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থেকেই যায়। এই নির্ভরতা অনস্বীকার্য বলে মনে হলেও আসলে চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য নয়—এই হলো সোস্যুরের অভিমত। তিনি দেখিয়েছেন, ধারণার প্রতীতি প্রায়ই দ্বৈততায় আধারিত হয়ে থাকে। চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িত অথবা প্রতীক ও তাৎপর্যের বিষয়ে ঐ দ্বৈততা খুব প্রাসঙ্গিক, বাচনিক এককগুলির বর্গ-বিভাজন যেহেতু প্রয়োজনীয় দ্বৈততার অনুভব ছাড়া অসম্ভব। বাচনিক এককগুলির রূপগত ও বিন্যাসগত সম্বন্ধের মধ্যে যে-ভিন্নতা রয়েছে, তার অনুধাবন অত্যন্ত জরুরি। এছাড়া সোস্যুর অধুনা-অধ্যয়ন ও কালগত অধ্যয়নের মধ্যে দ্বৈততার কথাও বিশেষভাবে বলেছেন। এই সব কিছুর সম্মিলিত

প্রভাবে ভাষাবিজ্ঞান সহ মানবিকী বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় বিপুল পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। সোস্যুর যেভাবে অধুনা-অধ্যয়ন ও কালগত অধ্যয়নের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভাষা-অনুশীলনের দুটি প্রধান ধারা ও তাদের মৌল পার্থক্যের কথা বলেছেন—তারই আলোকে পরবর্তী চিন্তাবিদেরা ভাষা-ভাবনাকে আরও পরিশীলিত করেছেন। সোস্যুর অবশ্য কালগত অধ্যয়নের তুলনায় অধুনা-অধ্যয়নের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাই তার প্রভাবও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

সোস্যুরীয় ভাষাতত্ত্বে প্রতিটি ভাষাই তার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের প্রতিটি পর্যায়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পর্যাপ্ত। এই চিন্তাপ্রস্থানে ভাষায় কোনও প্রগতি নেই, আছে কেবল পরিবর্তন। ভাষাতাত্ত্বিক অধ্যয়নের উপযোগিতা ভাষার ইতিহাসে নেই, আছে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে যথাপ্রাপ্ত ভাষাপদ্ধতিতে ব্যক্ত চিহ্নের সম্পর্কে কিংবা বিরোধিতার যুক্তি-শৃঙ্খলায়। এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মার্ক্সবাদী ভাবনা একমত হতে পারেনি। ফলে এ বিষয়ে চুলচেরা বিতর্কের অভাব নেই। কিন্তু সেই বিতর্কে আমরা অংশ গ্রহণ করছি না। শুধু এই তথ্য লক্ষ করছি যে সোস্যুর পরবর্তী বহু ভাষাতাত্ত্বিক ঐ যুক্তি-শৃঙ্খলাকে গভীরভাবে অনুশীলন করেছেন। এদের মধ্যে অগ্রগণ্য রোমান য়্যাকবসন ও ট্রুবেৎসকো। ভাষা-পদ্ধতি ও বাচনিক যুক্তিশৃঙ্খলার বিশিষ্ট বিশ্লেষণেই নিহিত ছিল আকরণবাদের তাত্ত্বিক বয়ান। এমিল বেনভেনিস্টের 'Problems in General Linguistics' নামক বইতে নিম্নোক্ত বক্তব্য ভাষাবিজ্ঞানের আকরণবাদী প্রবণতার নির্যাস তুলে ধরেছে: 'Granting that Language is a system, it is then a matter of analysing its structure. Each system, being formed of units that mutually affect one another, is distinguished from the other system by the internal arrangements of these units, an arrangement which constitutes its structure...to envisage a language... as a system organised by a structure to be revealed and described is to adopt the structuralist point of view.' (১৯৭১:৮২)। অর্থাৎ মূল কথা হলো, ভাষা মূলত বিশেষ বিন্যাস এবং বিন্যাস মানেই আকরণ। এই তত্ত্বসূত্রই আকরণবাদী নন্দন ও সেই নন্দন সঞ্চালিত সাহিত্যিক পাঠকৃতির মর্মসত্য। একটু আগে যে বাচনিক এককের রূপগত ও বিন্যাসগত সম্পর্কের দ্বৈততার কথা উল্লেখ করেছি, চিহ্নায়ন প্রকরণে কীভাবে তা অজস্রতায় ব্যক্ত হয়—এই বিশেষ অনুশীলনের প্রেরণাও পাওয়া গেছে সোস্যুরের কাছে।

বিভিন্ন চিহ্নের রূপগত ও বিন্যাসগত সম্পর্কের পার্থক্য অনুধাবন করা জরুরি। কোনও একটি বিশেষ উচ্চারণে চিহ্নায়কের অবস্থান সম্পর্কে আলোকপাত করে ভাষার রূপগত উপকরণ। অর্থাৎ কোনও যথাপ্রাপ্ত বাক্যে একক শব্দের তাৎপর্য অংশত নির্ভর করে সেই বাক্যে তার অবস্থান এবং অংশত অন্য সব শব্দ ও ব্যাকরণগত এককের সঙ্গে তার সম্পর্কের ওপর। শব্দের রূপগত বৈশিষ্ট্য স্বভাবে রৈখিক ও কালগত অধ্যয়নের অন্বিষ্ট। বাক্যের বিন্যাসগত ক্রম যদি বদলে যায়, শব্দের এই স্বভাব

অপরিবর্তিত থাকে না। আবার কোনও বাক্যে একক শব্দের তাৎপর্য এমন কিছু শব্দ-সমবায়ের দ্বারাও নির্ধারিত হয়ে থাকে যেগুলি যথাপ্রাপ্ত বাক্যে নেই কিন্তু বিন্যাসগত সম্পর্কের সম্ভাবনায় উপস্থিত রয়েছে। এই সূত্রকে প্রসারিত করে বলা যেতে পারে, বাচনের তাৎপর্য যুগপৎ প্রকৃত ও সম্ভাব্য সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল। ভাষাব্যবহারকারী হিসেবে আমরা যখন কোনও বাক্যে প্রয়োগের জন্যে কিছু কিছু শব্দ বেছে নিই, অতি দ্রুত আমাদের বিন্যাসগত সম্ভাবনার বিষয়টি ভেবে নিতে হয়। আমাদের অন্বিষ্ট পদান্বয়ের নির্মাণে যেসব শব্দ যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে, এ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সময় আমরা ভাষা-পদ্ধতিতে শব্দের সম্পর্ক নির্ণয় করি মূলত অধুনা-অধ্যয়নের ভিত্তিতে।

তিন

রোমান য়্যাকবসন ভাষাভিত্তিক চিন্তাকে সাহিত্যিক বিশ্লেষণে সম্পৃক্ত করে নিয়ে সোস্যুরীয় ভাষাচিন্তাকে প্রবহমান ধারায় রূপান্তরিত করেছিলেন। তাঁর কাছে ভাষা মূলত অনুষ্ঠিতব্য সক্রিয়তা। তবে এতে রয়েছে নানাধরনের মেরু-বিভাজন। পরবর্তী কালে ক্রমশ যখন আকরণবাদী নন্দন গড়ে উঠল, দেখা গেল, এই প্রতীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সোস্যুর যাকে চিহ্নের রূপগত ও বিন্যাসগত সম্পর্কের কথা বলেছেন, য়্যাকবসন কথিত ভাষিক সক্রিয়তার দুটি মেরু তারই সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থাৎ সোস্যুরের যৌক্তিক ও তাত্ত্বিক পরিভাষাকে য়্যাকবসন তথ্যগত সমর্থন যোগান দিয়েছেন। অবশ্য সেখানেই থেমে থাকেননি তিনি, ভাষাগত বিধি-শৃঙ্খলার সমান্তরাল ভাবে তিনি আবিষ্কার করেছেন দু'ধরনের প্রতিন্যাসও, এদের মধ্যে একটি সাদৃশ্যসূচক এবং অন্যটি সংলগ্নতাসূচক। তাত্ত্বিক পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত এই দুটি ভাববীজ পরম্পরাগত তাৎপর্য-বিশিষ্ট প্রয়োগের মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয়েছে। সাদৃশ্যবোধের ঘনীভূত প্রকাশ লক্ষ করি রূপকে যাতে আক্ষরিক শব্দের বদলে অলঙ্কৃত শব্দ গভীর দ্যোতনাবহ বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিকল্পায়নের প্রেরণা হিসেবে নিবিড় সাদৃশ্যবোধ সক্রিয় থাকে। আবার কোথাও তার বদলে প্রবল হয়ে ওঠে অনুষঙ্গগত সংলগ্নতা। য়্যাকবসন ভাষার ব্যক্তিগত অভিব্যক্তিতেই শুধু এই দুটি প্রক্রিয়া লক্ষ করেন না, সামূহিক প্রতিবেদনের বৃহত্তর প্রকল্পের মধ্যেও এদের উপস্থিতি খুঁজে পান। সাহিত্যিক পাঠকৃতির বিশ্লেষণে এই দুটি তত্ত্ববীজ চিন্তা-প্রক্রিয়ার ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। সাহিত্যশৈলীর ভিন্নতা প্রকৃতপক্ষে এদের কার্যকরী পার্থক্যের সূত্রে নির্ধারিত হয়ে থাকে। য়্যাকবসন তাঁর 'Fundamentals of Language' বইতে রোমান্টিকতাবাদ, প্রতীকবাদ ও বাস্তববাদের সূত্রে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন (দ্রষ্টব্য ১৯৫৬:৯১-৯২)। তাঁর মতে সমস্ত মানবিক প্রয়াসের মধ্যে এই দুটি তত্ত্ববীজের মৌলিক দ্বৈততা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং এদের পরিণতিও সুদূরপ্রসারী।

য়্যাকবসনের মতে এই দুটি তত্ত্ববীজ সংশ্লিষ্ট বাচনিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সর্বদা প্রতিযোগিতা চলেছে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্তরে অভিব্যক্ত প্রতীকী প্রক্রিয়ার

মধ্যে এই প্রতিযোগিতার অস্তিত্ব লক্ষ করেছেন তিনি। সাদৃশ্য ও সংলগ্নতার উপলব্ধি কত বিচিত্রভাবে মানবিকী বিদ্যার বিভিন্ন প্রেক্ষিতে লক্ষ করা যায়, তা তিনি দেখিয়েছেন। এদের মধ্যে প্রথমটির ধারণা তুলনামূলক ভাবে সহজবোধ্য। এর প্রাধান্য দেখা যায় কবিতায়, অন্যদিকে সংলগ্নতার সহজ আধার হলো গদ্য— 'for poetry, metaphor, and for prose, metonymy is the line of least resistance and consequently, the study of poetical tropes is directed chiefly toward metaphor' (তদেব:৯৬)।

যেহেতু দুটি তত্ত্বীজই স্বতন্ত্র পরিসরে দীপ্যমান, য়্যাকবসন পরিকল্পিত নান্দনিক চিন্তায় গদ্য ও পদ্যের গুরুত্ব সমানভাবে স্বীকৃত হয়েছে। এখানে অবশ্য একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। এই যে প্রায়োগিক দ্বৈততার কথা বলা হলো, তা সাধারণ সত্য হলেও সব ক্ষেত্রে সমান মাননীয় নয়। কেননা আমাদের পাঠ-অভিজ্ঞতায় এমন কিছু প্রতিবেদন রয়েছে যাদের ক্ষেত্রে এই জলবিভাজন-রেখা মোটেই প্রযোজ্য নয়। বিশেষত যেখানে পরাবাস্তব ও অবচেতনার প্রসঙ্গ রয়েছে, তাতে বাচনিক কৃৎকৌশলের ঐ পার্থক্য বারবার অস্বীকৃত হয়ে থাকে। ভাষার বিশিষ্ট প্রয়োগে যেসব সন্দর্ভ আলাদাভাবে লক্ষণীয়, তাদের মধ্যেও রয়েছে বিচিত্র উচ্চাবচতা। বিশেষত কবিতার ভাষা প্রায়োগিক বিশিষ্টতার নিষ্কর্ষকে বহুদূর অবধি প্রসারিত করে। চিহ্নায়ন প্রকরণের অনন্যতা অনবরত ভাষার প্রায়োগিক সীমাকে ধ্বস্ত করতে থাকে। বস্তুত কোথায় যে তার শেষ, তার ধারণা করাও অসম্ভব। ভাষার কাব্যিক ক্রিয়ার সঙ্গে অন্য সমস্ত ক্রিয়ার সম্পর্ক নিয়ে য়্যাকবসন গভীরভাবে ভেবেছেন। বাচনকে তিনি বলেছেন 'ঘটনা' (event)। সংযোগ গড়ে তোলাই তার প্রধান লক্ষ্য।

যে-ধরনের বাচনিক ঘটনাই হোক না কেন, এতে সর্বদাই আমরা সম্বোধক বা প্রেরকের দ্বারা সম্বোধিত বা প্রাপকের কাছে পাঠানো কোনো-না-কোনো বার্তা খুঁজে পাই। সংযোগ মানে হলো বার্তা পৌঁছে দিতে সফল হওয়া। সাফল্যের প্রসঙ্গ যেহেতু আসছে, লক্ষ করি, তা বাচনিক ঘটনার আরও তিনটে বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল। প্রথমত, বার্তাকে কোনো-একটি সংযোজক সূত্রের মধ্য দিয়ে পাঠাতেই হবে, তা শরীরী হতে পারে অথবা মনস্তাত্ত্বিক কিংবা এই দুটোই। দ্বিতীয়ত, বার্তাটি কোনো-না-কোনো সংকেতের সংরূপকে আশ্রয় হিসেবে ব্যবহার করবে। তৃতীয়ত, তাকে কোনো-একটি প্রেক্ষিতে সম্পৃক্ত হতে হবে। যতক্ষণ প্রেক্ষিতে উপস্থাপিত না হচ্ছে, বার্তার তাৎপর্য স্পষ্ট হবে না। আবার ঐ প্রেক্ষিতে পৌঁছাতে পারি শুধু সংকেতের নিষ্কর্ষ বোঝার পরে, তার আগে নয়। তেমনি উচ্চারণের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তুলতে না পারলে সংকেত-গ্রাহক হয়েও কোনো লাভ হবে না। বার্তার অস্তিত্বই টের পাব না। সম্বোধক বা প্রেরক ও সম্বোধিত বা প্রাপক যখন সংযোগের মানবিক ক্রিয়ার সাহায্যে পরস্পরের মধ্যে সেতু রচনা করে—বার্তার জন্ম হয়। এই সংযোগ বাচনের, বলা ভালো, বাচনিক প্রকরণের; একটু আগে যাকে ঘটনা বলেছি, তার অন্য সব উপকরণের সম্মিলিত উপস্থিতির ওপর প্রকরণ নির্ভরশীল। এছাড়া অর্থ বিজ্ঞাপিত করার পথ নেই। বলা হয়েছে, বার্তাই

তাৎপর্য নয়। বাচনিক ঘটনার সামগ্রিকতা যখন শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছায়, তাৎপর্য ব্যক্ত হয়। এভাবে য়্যাকবসন বাচনিক ঘটনার ছ'টি উপাদান দিয়ে সংযোগের আকল্প তৈরি হওয়ার কথা বলেছেন: প্রেক্ষিত, বার্তা, সম্বোধক, সম্বোধিত, সংযোজক সূত্র ও সাংকেতিক সংরূপ।

সমস্ত বার্তা অভিন্ন প্রতীতি ও গুরুত্বের অধিকারী হয় না। উচ্চারণের স্বভাব ও আকরণ অনুযায়ী বাচনিক আকল্পের প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি নির্ধারিত হয়ে থাকে। অধিকাংশ বার্তা প্রসঙ্গ-নির্ভর, কিছু কিছু আবেগপ্রসূত বার্তা স্পষ্টত সম্বোধক-নির্ভর অর্থাৎ তার বিশেষ দৃষ্টিকোন অনুযায়ী বার্তার চরিত্র নির্ধারিত হয়। আবার কিছু কিছু সম্বোধিতকে লক্ষ করে সংগঠিত হয়ে থাকে। এমনও কিছু বার্তা রয়েছে যাদের অন্বিষ্ট মূলত সংযোজক সূত্র। আবার পরাবাচনে সম্পৃক্ত বার্তা সংকেতকেই উদ্ভাসিত করে। য়্যাকবসন যখন ভাষার কাব্যিক ক্রিয়া সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন, তাতে বার্তার বিশিষ্ট ধরনে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়। সাহিত্যিক রচনার ভাষা সম্পূর্ণভাবে কাব্যিক হয় না, য়্যাকবসন তা আমাদের মনে করিয়ে দেন। এ সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত বক্তব্য হলো: 'poetic function is not the sole function of verbal art but only its dominant, determining function, whereas in all other verbal activities it acts as a subsidary, accessory, constituent. This function by promoting the palpability of science, deepens the fundamental dichotomy of science and objects.' (১৯৬০:৩৫৬)। সুতরাং শেষ পর্যন্ত আমাদের পৌঁছাতে হয় চিহ্নায়ন প্রকরণের পরিসরে। বস্তু-বিশ্ব ও চিহ্ন-বিশ্বের মধ্যে দ্বৈততা ও সংলগ্নতার সমান্তরাল উপস্থিতি গভীরতর তাত্ত্বিক অনুধ্যানের বিষয় হয়ে ওঠে। য়্যাকবসন বার্তা-তাৎপর্য-বাচনিক প্রকরণ-সংযোগ ইত্যাদি পারিভাষিক শব্দকে যেভাবে ব্যবহার করেছেন, তা নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন। চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের পরম্পরাকে বাচনের মধ্যে কীভাবে গ্রহণ করব, এ-সম্পর্কে কোনও কোনও সমালোচক সংশয় প্রকাশ করেছেন।

এইসব প্রশ্ন ও প্রতিপ্রশ্ন অস্বাভাবিক কিছু নয়। আমাদের যা চোখে পড়ে, তা হলো, য়্যাকবসনের সংশ্লেষণী মনোভঙ্গি। ভাষাবিজ্ঞান, নন্দনতত্ত্ব ও চিহ্নবিজ্ঞানের পরিসরকে তিনি অন্যোন্য-সম্পৃক্ত বলে গ্রহণ করেছিলেন। এদের পারস্পরিক উদ্ভাসনের সূত্রে ভাষাচিন্তায় যুক্ত করেছেন আশ্চর্য সূক্ষ্মতা। নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন দ্বিরালাপের মধ্য দিয়ে—এই বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ গ্রহীতা-সম্বোধিত তাঁর কাছে নিছক তাত্ত্বিক আকল্প নয়, অনুভব ও অভিজ্ঞতার যুগলবন্দিকে তিনি সরাসরি পৌঁছে দিতে চেয়েছেন সম্ভাব্য পাঠকের কাছে। এই বিন্দুতে আমাদের মনে পড়ে বিশ শতকের অন্যতম অগ্রণী চিন্তাবিদ মিখায়েল বাখতিনের কথা। কেননা তাঁর ভাষাচিন্তার কেন্দ্রীয় প্রকল্পই হলো দ্বিবাচনিকতা। এ প্রসঙ্গে আরও কিছু লেখার আগে লক্ষ করব, য়্যাকবসনের অনন্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নন্দনতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের দুরূহ সংযোগ গড়ে তোলার সামর্থ্যে। ১৯২৯ সালে তিনি যখন আকরণবাদ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করে ভাষাবিজ্ঞানের

নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করলেন, ভাষাচিন্তার অজ্ঞাতপূর্ব সম্ভাবনা আবিষ্কৃত হওয়া শুরু হলো।

চার

ভাষা-চিন্তার আকরণবাদী বিপ্লব এত সুদূরপ্রসারী ও বহুস্তর-বিন্যস্ত যে একটিমাত্র ছোট প্রবন্ধে তার প্রতি সুবিচার করা অসম্ভব। সোস্যুর ও য়্যাকবসনের অবদানও বিশ্লেষণের স্বতন্ত্র পরিসর দাবি করে। বিশেষভাবে প্রাগ্ চিন্তা-প্রস্থান সম্পর্কেও আলোকপাত করতে হয়, কেননা এতে প্রকরণবাদ ও সোস্যুরীয় ভাষা-বিজ্ঞানের সংশ্লেষণে একক তাত্ত্বিক প্রকল্প তৈরি করে নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে সাহিত্যতত্ত্বের প্রধান প্রতিবেদনগুলি পাওয়া গেছে সামূহিক অভিসন্দর্ভে যা ১৯২৯ সালে প্রাগে অনুষ্ঠিত একটি আলোচনাচক্রের ফসল। এছাড়া ইয়ান মুকারোভস্কির রচনাও তাতে যথেষ্ট অবদান রেখেছে। সাহিত্য ও ভাষা-বিষয়ক গবেষণার মৌল আকল্পে 'আকরণ' এর মতো পরিভাষার কেন্দ্রীয় গুরুত্ব রয়েছে। কবিতার বয়ানকে ক্রিয়াত্মক আকরণ হিসেবে গণ্য করা হয়, এর বিভিন্ন উপাদানকে কেবল সমগ্রের সঙ্গে সম্পর্ক-বিন্যাসে বিশ্লেষণ করা সম্ভব, এই হলো তাদের বক্তব্য। আকরণ মানে বিভিন্ন সম্পর্কের সমগ্রতার বোধ কিংবা আকল্প। প্রকরণবাদীদের আঙ্গিক বা রচনাকৌশলের চেয়ে তা অনেক আলাদা ও উচ্চতর ধারণা। আমরা যখন সাহিত্যিক পাঠকৃতিকে বিশিষ্ট আকরণের বিন্যাস হিসেবে সংজ্ঞায়িত করি, তা আসলে বিভিন্ন সম্পর্কের জটিল প্রণালীর নিয়ামক চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের গ্রন্থনার প্রতি ইঙ্গিত করে। প্রকরণ সম্পর্কিত পরম্পরাগত ধারণা দিয়ে পাঠকৃতির সমগ্রতা-সন্ধানী এই সংগঠনকে বোঝানো যায় না। সাহিত্যিক ও অসাহিত্যিক আকরণের মধ্যে প্রচলিত ব্যবধানকে চিহ্নায়ন প্রকরণ সর্বদা মান্যতা দেয় না। য়্যাকবসন সংযোগের উদ্যমে নিহিত বার্তায় যে ছ'টি ভিন্ন ভিন্ন স্তর বা উপকরণ লক্ষ করেছেন, তাদের মধ্যে সম্বোধক বা সম্বোধিতের গুরুত্ব নিয়ে পরবর্তী তাত্ত্বিকেরা প্রচুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন। এ সম্পর্কে বিতর্কেরও অভাব নেই। কিন্তু সেই বিতর্কে যোগ না দিয়েও আমরা লক্ষ করতে পারি, কীভাবে পাঠকৃতির সমগ্রতা বিধানে চিহ্নায়ন প্রকরণের গ্রন্থনা সবসময়ই সামগ্রিক প্রেক্ষিতের ওপর নির্ভরশীল। আমরা যখন সাহিত্যিকতা বা কাব্যিকতা নিয়ে কথা বলি, তাকে কোনও-না-কোনও ভাবে চিহ্নতাত্ত্বিক আকল্পের নিরিখে বিচার করতে হয়। কোনও বিশেষ সময়ে ও পরিসরে সমাজমনে চিহ্নের জন্ম হয়, মৃত্যুও হয়। কোনও চিহ্নই সমাজ-নিরপেক্ষ কিংবা চিরজীবী নয়। চিহ্নতাত্ত্বিক তথ্য যেহেতু রূপান্তর-প্রবণ, শেষ পর্যন্ত বয়ানের তাৎপর্য পরিবর্তনশীল চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া ও আকরণের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত। অতিপরিচিত তথ্যের বাস্তবকে আমরা যদিও অনুভূতি ও কল্পনায় ক্রমাগত অপরিচিত করে চলি, চিহ্নতত্ত্বের নিরিখে অনির্দেশ্যতার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। প্রতিদিন পরিচিত জগৎকে যেভাবে লক্ষ করি, সেই পর্যবেক্ষণের মধ্যেই যথাপ্রাপ্ত বাস্তব স্বতশ্চলভাবে কিছুটা পরিমাণে প্রতিবিম্বিত বাস্তব হয়ে পড়ে। প্রতিদিনই

আমাদের ব্যবহৃত প্রথাগত চিহ্নায়ন প্রকরণ অনুযায়ী ঐ পর্যবেক্ষণ নির্ধারিত হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়া লক্ষ করেই ফ্রেডরিক জেমসন ভাষাকে ভেবেছিলেন বন্দিশালা। শিল্প বা সাহিত্য প্রথাগত চিহ্নায়ন প্রকরণে হস্তক্ষেপ করে আসলে ভাষার ঐ বন্দিশালাকে ভেঙে দিতে চায়। তখন কোনও যথাপ্রাপ্ত চিহ্নায়ককে আমরা নির্বিচার মান্যতা দিতে পারি না, আমাদের অভিনিবেশ সেইসব চিহ্নায়কের অনাবিষ্কৃত সম্ভাবনার প্রতি কেন্দ্রীভূত হয়।

মুকারোভস্কি এই প্রক্রিয়াকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, এই প্রক্রিয়ার সাহায্যেই শিল্প-সাহিত্য আমাদের 'Renewed awareness of the manifold and multivalent nature of reality' (১৯৬৪:৩৩) সম্পর্কে অবহিত করে। প্রচলিত ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক প্রয়োগ থেকে কতটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে পাঠকৃতির নতুন বয়ান, তার সাধারণ বিশ্লেষণে সন্তুষ্ট থাকেন না আকরণবাদী আলোচকেরা। বাচনের সানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মধ্যেই আবিষ্কার করতে চান পাঠকৃতির নান্দনিক ও প্রায়োগিক অভিনবত্ব। পূর্বধার্য সীমানা ও প্রেক্ষণবিন্দু থেকে যতটা পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য আবিষ্কার করতে পারেন আলোচক, ঠিক সেই অনুপাতে সমগ্রতার এবং বাচনিক আন্তঃসম্পর্কের তাৎপর্য পুনর্নির্ণীত হয়। বিষয়বস্তু যে-সমস্ত অন্তর্বৃত অংশের নিরন্তর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় গড়ে ওঠে প্রাগ চিন্তা-প্রস্থানের প্রস্তাবিত সমগ্রতা, স্বভাবধর্মে তা ক্রিয়াত্মক। তাই এই নিরিখে সাহিত্যিক পাঠকৃতি কখনও নিষ্ক্রিয় কিছু উপকরণের সমাহার মাত্র হতে পারে না। মুকারোভস্কি এবং প্রাগ্ চিন্তা-প্রস্থানের বিভিন্ন বক্তব্যসূত্রে কাব্যিকতায় নিহিত বার্তা সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে এই তত্ত্ব—'By promoting the palpability of signs, deepens the fundamental dichotomy of signs and objects.' (Sebeok: 1971:356)। চিহ্ন ও বস্তুর মৌলিক দ্বৈততাকে গভীরতর করাই যেহেতু চিহ্নায়ন প্রকরণের অন্বিষ্ট, যথাপ্রাপ্ত বিধিবিন্যাসের সীমারেখা লঙ্ঘন করাই প্রতিটি নতুন পাঠকৃতির অভিপ্রায়। এই সীমাতিযায়ী প্রবণতা ছাড়া বাস্তবতার পুনর্নবায়িত পর্যবেক্ষণ সম্ভব হত না এবং সেই সূত্রে নতুন বার্তাও নতুন চিহ্নতাত্ত্বিক তাৎপর্য নিয়ে উদ্ভূত হত না।

ষাটের দশকে আকরণবাদী ভাববিপ্লব যখন প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তার বিন্যাসকে আমূল পালটে দিচ্ছিল, সংস্কৃতির প্রশ্নে ভাষাকেন্দ্রিক অনুধ্যান কেন্দ্রীয় গুরুত্ব অর্জন করেছিল। শুধু তা-ই নয়, সূক্ষ্ম দ্যোতনার সঞ্চার ও তার যৌক্তিক সম্প্রসারণ সর্বতোভাবেই আগ্রহোদ্দীপক হয়ে উঠেছিল। মোটামুটি ১৯৬৭-৬৮ নাগাদ ভাষাচিন্তার আকরণবাদী পর্যায় শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছায়। পরম্পরাগত শৈক্ষিক অভ্যাসের সংযোজন হিসেবে নয়, বহুমাত্রিক বিকল্প হিসেবে দেখা দিয়েছিল নতুন উদ্ভাসন। অতিরিক্ত বিশ্লেষণ-পদ্ধতি হিসেবে এর গুরুত্ব নয়, যখন অন্য সব চিন্তাপদ্ধতি আস্তিত্বিক কিংবা জ্ঞানতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসাকে সমৃদ্ধ করে, নব্য চিন্তা-প্রকরণ হয়ে ওঠে সর্বত্রগামী। শিল্প-সাহিত্য-সমাজবিজ্ঞানের বিচিত্র বিদ্যায় এর তাৎপর্য পরিশীলিত হয়েছে বলে নিঃসন্দেহে এর বৈপ্লবিক সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আপাত-দৃষ্টিতে যাদের সঙ্গে ভাষাতত্ত্বের কোনও

সম্পর্ক নেই, তাদের মধ্যেও যে আকরণবাদী ভাষা-চিন্তার বিচ্ছুরণ অনুভূত হয়, তা বিশেষ অভিনিবেশ দাবি করে। আকরণবাদী সাহিত্যতত্ত্বে বাচন ও চিহ্নায়নের প্রেক্ষিত কীভাবে বহুস্বরিক দ্যোতনা নিয়ে এসেছে, তা আলোচনার জন্যে স্বতন্ত্র সন্দর্ভের প্রয়োজন। আপাতত শুধু এইটুকুই বলা যাক যে সাহিত্যের সঙ্গে সমালোচনার ভাষা-নির্মাণেও ভাষা-চিন্তার অবদান খুব বেশি। পরবর্তী পর্যায়ে হয়তো সূচনাবিন্দু থেকে অনেক দূরে সরে গেছে তত্ত্ব-ভাবনা, তবু এই ভাবপরম্পরার অলক্ষ্য উপস্থিতি অনুভবগম্য। মানবিকী বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় আকরণবাদী নৃতত্ত্ব, সংস্কৃতিতত্ত্ব ও চিহ্নতত্ত্ব ইদানীং যে বিচিত্র ফসলের সমৃদ্ধি এনে দিয়েছে—এর উৎস নির্ণয়ে আমাদের ভুল হয় না। ঐতিহ্যাগত চিন্তা-প্রস্থানগুলির পারস্পরিক সীমান্ত অতিক্রম করার কিংবা অন্যোন্য-সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়ার যে-প্রবণতা ইদানীং দেখা যাচ্ছে, ভাষা-চিন্তার কেন্দ্রীয় আকল্প দিয়ে তাদের তাৎপর্য অনেকটা অনুধাবন করা সম্ভব।

পাঁচ

তথ্য থেকে সত্যে কিংবা পর্যবেক্ষণ থেকে তাত্ত্বিক উদ্ভাসনে পৌঁছানোর মুহূর্তে আমরা মনে রাখি যে সমস্ত পদ্ধতিই ভাষার মতো আকরণে বিন্যস্ত। অর্থাৎ সামগ্রিক পদ্ধতির অপরিহার্য অংশ হিসেবে প্রতিটি উপাদানের তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব। ভাষার মতো সংস্কৃতিরও রয়েছে অনস্বীকার্য ব্যাকরণ-তত্ত্ব। সংস্কৃতি-চিন্তার অন্তহীন অভিব্যক্তির মুখোমুখি হয়ে আমাদের মনে রাখতে হয় রোলাঁ বার্তের বিখ্যাত এই উচ্চারণ: 'Culture, in all its aspects, is a language.'। বস্তুত সামাজিক ব্যবহার-বিধির সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে যেসব পরম্পরাগত নিয়ম নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের আকরণবাদী ভাষা-চিন্তার সৃজনশীল প্রয়োগের সূত্রে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে আকরণবাদকে বার্ত বলেছেন: 'a certain mode of analysis of cultural artefacts, in so far as this mode originates in the methods of contemporary linguistics.' (১৯৭০:৪১২)। সুতরাং স্পষ্টত সোস্যুরের ধারণাবিশ্ব থেকে চিন্তাসূত্র নিয়ে বহুদূর অবধি বাচনকেন্দ্রিক ব্যাখ্যাকে প্রসারিত করেছেন তাত্ত্বিকেরা। ফলে সাহিত্যতত্ত্ব ছাড়াও নৃতত্ত্ব, মনোবিকলন, ইতিহাস, দর্শন, চিহ্নবিজ্ঞান, তথ্যবিজ্ঞান ও সাম্প্রতিক অধিপরিসরবিদ্যায় বিচিত্র তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিবেদন রচিত হয়ে চলেছে। সেইসঙ্গে লোকযান, লোকসংস্কৃতি, সমাজবিদ্যা, প্রত্নকথাতত্ত্ব, এমনকি পোষাক প্রদর্শনীর মতো নিতান্ত দৃশ্যগত বাণিজ্যের বিষয়ও চিহ্নতাত্ত্বিক বলয়ের অন্তর্ভুক্ত। না লিখলেও চলে যে সাহিত্যের তত্ত্ব ও প্রয়োগ সর্বদা ভাষা সম্বন্ধীয়। বিখ্যাত তাত্ত্বিক টোডোরোভের সরলোক্তি এরকম: 'The writer does nothing more than read language.'(১৯৬৯:৮৪)। ভাষার নানা ধরনের ব্যবহার সম্ভব, সাহিত্যে তার ব্যবহার বিশিষ্টতম কেননা ভাষার প্রকৃত স্বভাব সম্পর্কে শুধুমাত্র সাহিত্যিক বয়ানই আমাদের অবহিত করে।

বাচনিক, চিহ্নতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক উপাদানের সুষম সংশ্লেষণ না-হলে কোনো

আমাদের ব্যবহৃত প্রথাগত চিহ্নায়ন প্রকরণ অনুযায়ী ঐ পর্যবেক্ষণ নির্ধারিত হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়া লক্ষ করেই ফ্রেডরিক জেমসন ভাষাকে ভেবেছিলেন বন্দিশালা। শিল্প বা সাহিত্য প্রথাগত চিহ্নায়ন প্রকরণে হস্তক্ষেপ করে আসলে ভাষার ঐ বন্দিশালাকে ভেঙে দিতে চায়। তখন কোনও যথাপ্রাপ্ত চিহ্নায়ককে আমরা নির্বিচার মান্যতা দিতে পারি না, আমাদের অভিনিবেশ সেইসব চিহ্নায়কের অনাবিষ্কৃত সম্ভাবনার প্রতি কেন্দ্রীভূত হয়।

মুকারোভস্কি এই প্রক্রিয়াকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, এই প্রক্রিয়ার সাহায্যেই শিল্প-সাহিত্য আমাদের 'Renewed awareness of the manifold and multivalent nature of reality' (১৯৬৪:৩৩) সম্পর্কে অবহিত করে। প্রচলিত ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক প্রয়োগ থেকে কতটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে পাঠকৃতির নতুন বয়ান, তার সাধারণ বিশ্লেষণে সন্তুষ্ট থাকেন না আকরণবাদী আলোচকেরা। বাচনের সানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মধ্যেই আবিষ্কার করতে চান পাঠকৃতির নান্দনিক ও প্রায়োগিক অভিনবত্ব। পূর্বধার্য সীমানা ও প্রেক্ষণবিন্দু থেকে যতটা পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য আবিষ্কার করতে পারেন আলোচক, ঠিক সেই অনুপাতে সমগ্রতার এবং বাচনিক আন্তঃসম্পর্কের তাৎপর্য পুনর্নির্ণীত হয়। বিষয়বস্তু যে-সমস্ত অন্তর্বৃত অংশের নিরন্তর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় গড়ে ওঠে প্রাগ চিন্তা-প্রস্থানের প্রস্তাবিত সমগ্রতা, স্বভাবধর্মে তা ক্রিয়াত্মক। তাই এই নিরিখে সাহিত্যিক পাঠকৃতি কখনও নিষ্ক্রিয় কিছু উপকরণের সমাহার মাত্র হতে পারে না। মুকারোভস্কি এবং প্রাগ্ চিন্তা-প্রস্থানের বিভিন্ন বক্তব্যসূত্রে কাব্যিকতায় নিহিত বার্তা সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে এই তত্ত্ব—'By promoting the palpability of signs, deepens the fundamental dichotomy of signs and objects.' (Sebeok: 1971:356)। চিহ্ন ও বস্তুর মৌলিক দ্বৈততাকে গভীরতর করাই যেহেতু চিহ্নায়ন প্রকরণের অন্বিষ্ট, যথাপ্রাপ্ত বিধিবিন্যাসের সীমারেখা লঙ্ঘন করাই প্রতিটি নতুন পাঠকৃতির অভিপ্রায়। এই সীমাতিযায়ী প্রবণতা ছাড়া বাস্তবতার পুনর্নবায়িত পর্যবেক্ষণ সম্ভব হত না এবং সেই সূত্রে নতুন বার্তাও নতুন চিহ্নতাত্ত্বিক তাৎপর্য নিয়ে উদ্ভূত হত না।

ষাটের দশকে আকরণবাদী ভাববিপ্লব যখন প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তার বিন্যাসকে আমূল পালটে দিচ্ছিল, সংস্কৃতির প্রশ্নে ভাষাকেন্দ্রিক অনুধ্যান কেন্দ্রীয় গুরুত্ব অর্জন করেছিল। শুধু তা-ই নয়, সূক্ষ্ম দ্যোতনার সঞ্চার ও তার যৌক্তিক সম্প্রসারণ সর্বতোভাবেই আগ্রহোদ্দীপক হয়ে উঠেছিল। মোটামুটি ১৯৬৭-৬৮ নাগাদ ভাষাচিন্তার আকরণবাদী পর্যায় শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছায়। পরম্পরাগত শৈক্ষিক অভ্যাসের সংযোজন হিসেবে নয়, বহুমাত্রিক বিকল্প হিসেবে দেখা দিয়েছিল নতুন উদ্ভাসন। অতিরিক্ত বিশ্লেষণ-পদ্ধতি হিসেবে এর গুরুত্ব নয়, যখন অন্য সব চিন্তাপদ্ধতি আস্তিত্বিক কিংবা জ্ঞানতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসাকে সমৃদ্ধ করে, নব্য চিন্তা-প্রকরণ হয়ে ওঠে সর্বত্রগামী। শিল্প-সাহিত্য-সমাজবিজ্ঞানের বিচিত্র বিদ্যায় এর তাৎপর্য পরিশীলিত হয়েছে বলে নিঃসন্দেহে এর বৈপ্লবিক সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আপাত-দৃষ্টিতে যাদের সঙ্গে ভাষাতত্ত্বের কোনও

সম্পর্ক নেই, তাদের মধ্যেও যে আকরণবাদী ভাষা-চিন্তার বিচ্ছুরণ অনুভূত হয়, তা বিশেষ অভিনিবেশ দাবি করে। আকরণবাদী সাহিত্যতত্ত্বে বাচন ও চিহ্নায়নের প্রেক্ষিত কীভাবে বহুস্বরিক দ্যোতনা নিয়ে এসেছে, তা আলোচনার জন্যে স্বতন্ত্র সন্দর্ভের প্রয়োজন। আপাতত শুধু এইটুকুই বলা যাক যে সাহিত্যের সঙ্গে সমালোচনার ভাষা-নির্মাণেও ভাষা-চিন্তার অবদান খুব বেশি। পরবর্তী পর্যায়ে হয়তো সূচনাবিন্দু থেকে অনেক দূরে সরে গেছে তত্ত্ব-ভাবনা, তবু এই ভাবপরম্পরার অলক্ষ্য উপস্থিতি অনুভবগম্য। মানবিকী বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় আকরণবাদী নৃতত্ত্ব, সংস্কৃতিতত্ত্ব ও চিহ্নতত্ত্ব ইদানীং যে বিচিত্র ফসলের সমৃদ্ধি এনে দিয়েছে—এর উৎস নির্ণয়ে আমাদের ভুল হয় না। ঐতিহ্যাগত চিন্তা-প্রস্থানগুলির পারস্পরিক সীমান্ত অতিক্রম করার কিংবা অন্যোন্য-সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়ার যে-প্রবণতা ইদানীং দেখা যাচ্ছে, ভাষা-চিন্তার কেন্দ্রীয় আকল্প দিয়ে তাদের তাৎপর্য অনেকটা অনুধাবন করা সম্ভব।

পাঁচ

তথ্য থেকে সত্যে কিংবা পর্যবেক্ষণ থেকে তাত্ত্বিক উদ্ভাসনে পৌঁছানোর মুহূর্তে আমরা মনে রাখি যে সমস্ত পদ্ধতিই ভাষার মতো আকরণে বিন্যস্ত। অর্থাৎ সামগ্রিক পদ্ধতির অপরিহার্য অংশ হিসেবে প্রতিটি উপাদানের তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব। ভাষার মতো সংস্কৃতিরও রয়েছে অনস্বীকার্য ব্যাকরণ-তত্ত্ব। সংস্কৃতি-চিন্তার অন্তহীন অভিব্যক্তির মুখোমুখি হয়ে আমাদের মনে রাখতে হয় রোলাঁ বার্তের বিখ্যাত এই উচ্চারণ: 'Culture, in all its aspects, is a language.'। বস্তুত সামাজিক ব্যবহার-বিধির সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে যেসব পরম্পরাগত নিয়ম নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের আকরণবাদী ভাষা-চিন্তার সৃজনশীল প্রয়োগের সূত্রে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে আকরণবাদকে বার্ত বলেছেন: 'a certain mode of analysis of cultural artefacts, in so far as this mode originates in the methods of contemporary linguistics.' (১৯৭০:৪১২)। সুতরাং স্পষ্টত সোস্যুরের ধারণাবিশ্ব থেকে চিন্তাসূত্র নিয়ে বহুদূর অবধি বাচনকেন্দ্রিক ব্যাখ্যাকে প্রসারিত করেছেন তাত্ত্বিকেরা। ফলে সাহিত্যতত্ত্ব ছাড়াও নৃতত্ত্ব, মনোবিকলন, ইতিহাস, দর্শন, চিহ্নবিজ্ঞান, তথ্যবিজ্ঞান ও সাম্প্রতিক অধিপরিসরবিদ্যায় বিচিত্র তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিবেদন রচিত হয়ে চলেছে। সেইসঙ্গে লোকযান, লোকসংস্কৃতি, সমাজবিদ্যা, প্রত্নকথাতত্ত্ব, এমনকি পোষাক প্রদর্শনীর মতো নিতান্ত দৃশ্যগত বাণিজ্যের বিষয়ও চিহ্নতাত্ত্বিক বলয়ের অন্তর্ভুক্ত। না লিখলেও চলে যে সাহিত্যের তত্ত্ব ও প্রয়োগ সর্বদা ভাষা সম্বন্ধীয়। বিখ্যাত তাত্ত্বিক টোডোরোভের সরলোক্তি এরকম: 'The writer does nothing more than read language.'(১৯৬৯:৮৪)। ভাষার নানা ধরনের ব্যবহার সম্ভব, সাহিত্যে তার ব্যবহার বিশিষ্টতম কেননা ভাষার প্রকৃত স্বভাব সম্পর্কে শুধুমাত্র সাহিত্যিক বয়ানই আমাদের অবহিত করে।

বাচনিক, চিহ্নতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক উপাদানের সুষম সংশ্লেষণ না-হলে কোনো

আকল্পই যথার্থ তাৎপর্যবহ হতে পারে না। বাস্তবতার ওপর শব্দের তাৎপর্য নির্ভর করে না। আবার সম্বোধকের ব্যক্তিগত অভিপ্রায় ও আকাঙ্ক্ষা তাৎপর্যের নিয়ামক হতে পারে না। ভাষা স্বয়ংসম্পূর্ণ পদ্ধতি। তার মানে ভাষা-ব্যবহারকারী সরাসরি নিজের উচ্চারণের তাৎপর্য বিধান করতে পারেন না, সামগ্রিকভাবে ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতি ও সংগঠনই তাৎপর্যের উপাদান। এই নিরিখে সাহিত্য-বিশ্লেষণের আকরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি লেখকসত্তা ও বাস্তবতা উভয়কেই শেষ পর্যন্ত পরিহার করে। চিহ্নায়িতের বদলে চিহ্নায়কের প্রতি মনোযোগ যখন কেন্দ্রীভূত হয়, অন্বিষ্ট তাৎপর্যের চেয়ে প্রাধান্য পায় অর্থবহ হয়ে ওঠার পদ্ধতি। অর্থাৎ সাহিত্যিক অধ্যয়নে বিভিন্ন স্তরদের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে পারাই জরুরি। সাহিত্য থেকে বার্তা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টায় দীর্ঘদিন তার বাচনিক প্রকল্পকে অবহেলা করা হয়েছে, এবার আবিষ্কার করতে হবে প্রকল্পের গুরুত্ব, এতে যদি বার্তা কিছুটা নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে তাতেও আপত্তি নেই। সাহিত্য যেহেতু সম্পূর্ণত ভাষা-নিষ্পন্ন, প্রতিটি স্তরে তাকে ভাষারই মতো সংগঠিত হতে হবে—আকরণবাদী চিন্তাপ্রস্থানের অন্বিষ্ট এই বোধের প্রতিষ্ঠা। কোনও তাৎপর্যের অন্তরালে বাস্তবতা থাকতেই হবে, নতুন ভাষাচিন্তা একথায় বিশ্বাসী নয়। সাধারণ পরিস্থিতিতে প্রয়োজন-মাফিক ভাষাকে যখন ব্যবহার করা হয়, তাকে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ বলে ধরে নেওয়া হয়। এতে সক্রিয় থাকে এই যথাপ্রাপ্ত বিশ্বাস যে তাৎপর্য এবং অভিপ্রায়ই ভাষার নিয়ন্তা। স্বাধীনতার প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে উত্থাপিতই হয় না। কিন্তু রোলাঁ বার্ত যখন বলেন যে সাহিত্য বাচনের সার্বভৌমত্বের প্রতিনিধি—তিনি প্রচলিত প্রায়োগিক বিধান থেকে অনেকখানি দূরে সরে যান। এখানে তাঁর একটি প্রসিদ্ধ মন্তব্য স্মরণ করা যায়: 'Language is literature's Being, its very world, the whole of literature is contained in the act of writing, and no longer in those of thinking, portraying, telling or feeling' (১৯৭০:৪১১)। সাহিত্যের পরাসত্তা ও আস্তিত্বিক জগৎ হিসেবে ভাষাকে যখন গ্রহণ করি এবং ভাবি যে লিখন-ক্রিয়ায় সাহিত্যের সর্বস্ব প্রচ্ছন্ন রয়েছে, বক্তব্যটি হয়ে ওঠে আরও বহু চিন্তা-প্রশাখার উৎস। চিন্তন-চিত্রণ-কথন-অনুভাবন: এদের মধ্যে যত মহত্ত্ব বা গভীরতা থাক, সাহিত্যিকতার প্রাতিষ্ঠানিক স্তর থেকে লিখনের প্রবহমানতায় পৌঁছাতে গেলে দৃশ্য ও অদৃশ্য অভ্যাসের শেকলগুলি ভেঙে ফেলতে হবে।

সাহিত্যে ভাষা তো সংযোগের মাধ্যমমাত্র নয় কেবল, তা অস্বচ্ছতা-জটিলতা-বক্রতা নিয়েই অন্তর্বস্তুও হয়ে ওঠে। বিশেষত বহুস্বরিক কবিতার ভাষার দিকে তাকালে এই ধারণার যথার্থতা স্পষ্ট হয়। এছাড়া কমলকুমার মজুমদারের গদ্যভুবনও এর চমৎকার দৃষ্টান্ত। 'যে ভাষাকে আক্রমণ করে সে-ই ভাষাকে বাঁচায়'—এই মন্তব্য মনে রেখে বলা যায়, সাহিত্যিক যেন অনবরত ভাষার কাছে কিছু প্রশ্ন তুলে ধরেন এবং ভাষার মধ্যেই তাদের সমাধান খোঁজেন। এইজন্যে তাঁকে বারবার যেতে হয় এক আকল্প থেকে অন্য আকল্পে। সাহিত্যিক পাঠকৃতিতে এরই ফলশ্রুতিতে একটিমাত্র তাৎপর্য থাকে না, অনেকার্থদ্যোতনার সন্ধান বস্তুত অনিবার্য। এই সন্ধান যখন করি,লেখকের অভিপ্রায়কে

বেশি গুরুত্ব দেওয়া চলে না। তাছাড়া ভাষার চলনে নিহিত থাকে দ্ব্যর্থবোধকতা কিংবা অর্থবোধের বহুত্ব। ফলে বৈচিত্র্য, আততি, বিপ্রতীপতা, কূটাভাস প্রচ্ছন্ন থেকে যায় সমগ্রতার মধ্যে, লেখকের একতন্ত্রী রচনাপ্রণালীতে এর হদিশ মেলে না। লেখা স্বাধীন, স্বয়ংপ্রভ ও সার্বভৌম বলে লেখক-নিরপেক্ষ ভাবে তা হয়ে ওঠে মুক্ত ও বহুধাচিহ্নায়িত। অর্থের বহুত্ব ও সম্বোধিত-নির্ভরতা সম্পর্কে কোনো সংশয় করা যায় না তাই। বাচক বা সম্বোধক আর কেন্দ্র থাকে না। ভাষাচিন্তার এই পর্যায়ে বিষয়ীসত্তার বিকেন্দ্রায়ন তাই হয়ে পড়েছে অবধারিত। আকরণোত্তরবাদী পর্যায়ে জাক দেরিদা ও জাক লাকাঁ এই উপলব্ধিকে তাঁদের ধরনে বিকশিত করেছেন।

বয়ানের অর্থ সম্পর্কে লেখকই আগে শেষ কথা বলতেন। সংস্কৃত কবির বক্তব্য অনুযায়ী অপার কাব্যসংসারে কবিকে প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রতিনিধি হিসেবে জেনেছি, বহু সহস্রাব্দ ধরে ভেবেছি, তাঁর রুচি অনুযায়ী জগৎ নির্মিত হবে। কিন্তু এখন আর বলতে পারি না— 'যথাবৈ রোচতে বিশ্বং তথেদং পরিবর্ততে'। পাঠকৃতির অর্থ কী হবে, লেখক তার নিয়ন্তা প্রভু নন, আদি প্রস্তাবক মাত্র। অনেক সময় লিখিয়ের অতি-উপস্থিতিকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে অর্থবোধের প্রক্রিয়াও ক্যামোফ্লেজের আশ্রয় নেয়। তখন গ্রহীতা পাঠক বা সমালোচক হয়ে ওঠেন অভিযাত্রী-আবিষ্কারক, পাঠ যেন পাঠোদ্ধার। জেনে নিতে হয় অনেক তাৎপর্য নিয়ে বয়ান স্বভাবে বহুবাচনিক। তাই বহু সম্ভাবনা থেকে একটিকে বেছে নেওয়ার যুক্তিই হলো ভাষ্য বা টিপ্পনি। রোলাঁ বার্ত বলেন, শব্দগ্রন্থনায় যদি একটিমাত্র আভিধানিক অর্থ থাকে, সাহিত্য বলে কিছু থাকবে না। অর্থাৎ 'the very plurality of meanings' (১৯৬৬:৫০)-ই সাহিত্যের ভিত্তি। কালান্তরেও যে বেঁচে থাকে কোনো পাঠকৃতি, এই চিরকালীনতার মানে এই নয় যে বয়ান বিভিন্ন প্রজন্মের মানুষের ওপর এক ও অদ্বিতীয় অর্থ চাপিয়ে দেয়। বরং ঠিক তার উল্টো। একই মানুষের কাছে বিভিন্ন পাঠে তা ভিন্ন ভিন্ন অর্থের দ্যোতনা বয়ে আনে। এভাবে বাচনের অনেকান্তিকতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে ওঠাই ভাষাচিন্তার প্রধান চালিকাশক্তি। সাহিত্যে ভাষার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সঞ্চারে কত বিচিত্র পদ্ধতি সম্ভব, এটা যিনি লক্ষ করতে পারেন, তিনিই প্রকৃত তাত্ত্বিক। বিষয়বস্তু বা প্রকরণ সম্পর্কে প্রথাগত মনোভঙ্গি পালটে নেওয়ার আহ্বানই যেন জানান আকরণবাদী ভাবুকেরা। চিহ্নায়িতের বদলে চিহ্নায়কের ওপর গুরুত্ব আরোপ করার নতুন নতুন যুক্তি ক্রমশ যত উত্থাপিত হতে থাকল, ঠিক সেই অনুপাতে নান্দনিক ভাবনায়ও আকরণবাদী পর্যায়ের পরে এল আকরণোত্তরবাদী পর্যায়।

এই সূত্রে রূপান্তরিত হলো আখ্যানতত্ত্বের আকল্পও। টোডোরোভ, জেনেট ও জোনাথন কুলেরের ভাষ্য অনুসরণ করলে দেখব, রোলাঁ বার্তের ভাষাচিন্তাকে এঁরা কত সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে নতুন নতুন খাতে বইয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সেই প্রসঙ্গ এখানে নয়। শুধু যে-কথাটি এখানে লেখা দরকার, তা হলো সাহিত্যিকতার সংগঠনে উপস্থাপনার কত বহুমুখী তাৎপর্য হতে পারে এবং পাঠকৃতির নির্মিতিতে অন্তর্বয়ন ও পরাপাঠের গুরুত্ব কত বেশি, এ সম্পর্কে তাঁরা আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন। কোনও যথাপ্রাপ্ত

বাস্তবতার পুনরুত্থাপন করাই শিল্প নয়। ভাষার বহুস্বরিক বিন্যাস ও প্রতিন্যাসের মধ্য দিয়ে বাস্তব অহরহ পুনর্নির্মিত হয়। যে-অনুপাতে ভাষা নতুন হয়ে ওঠে, ঠিক সেই অনুপাতে শিল্পকেও মৌলিক বলতে পারি। এইজন্যে সৃষ্টি ও নির্মাণের দ্বন্দ্ব। আর, এই ধারণাও এখন অচল যে নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার অধিকারী শুধু লেখক এবং পাঠক কেবল নিষ্ক্রিয় ভোক্তা। রোলাঁ বার্ত তাঁর বিখ্যাত S/Z বইতে বাচনিক নন্দনের নতুন পর্যায়ের সূচনা করেছেন। বালজাকের 'সারাসিন' এর আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি পাঠক-কেন্দ্রিকতা ও লেখক-কেন্দ্রিকতার নতুন সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। ভাষা থেকে অর্থের উদ্ভাসনে যেখানে উৎপাদন প্রক্রিয়ার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়, সেখানে পাঠক সক্রিয় না হয়ে পারে না। স্বভাবত ভাষার অভিব্যক্তিতেও তার ছাপ পড়তে বাধ্য। কিন্তু যেখানে পাঠকৃতিকে আমরা নিষ্ক্রিয় পাঠক হিসেবে গ্রহণ করি, সেখানে ভাষাতেও অর্থাৎ অর্থবোধে সক্রিয়তার বিদ্যুৎস্পর্শ দেখা দিতে পারে না। যেখানে পাঠকের সক্রিয় সহযোগিতা আবশ্যিক সেখানে লিখনপ্রক্রিয়া কার্যত লেখক থেকে পাঠকের কাছে সরে যায়।

ছয়

এই বক্তব্য আকরণোত্তর চেতনারও। আবার দেখা যাচ্ছে পাঠকৃতিতে বার্ত কথিত 'lisible' ও 'scriptible' বৈশিষ্ট্য যুগপৎ উপস্থিত থাকতে পারে না কেননা কোনও বয়ান পুরোপুরি পাঠকের কিংবা লেখকের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। পাঠকৃতিতে নিশ্চয় তাৎপর্যই সব, কিন্তু ভালোভাবে লক্ষ করলে বোঝা যায়, তাৎপর্যের চেয়েও বড়ো তাৎপর্যের উপাদান ও বিচ্ছুরণের প্রক্রিয়া। যখন এই প্রক্রিয়া স্তব্ধ ও অবসিত, প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সেই পাঠকৃতি অন্বিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। তার মানে, পাঠকৃতি হলো সক্রিয়তার কেন্দ্র ও ক্রিয়াত্মক ক্ষেত্র। স্বয়ং তাৎপর্যই হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্থির নয়, সর্বদা সঞ্চরমান। ভাষার গভীরে এই সঞ্চরমান সম্ভাবনা রয়েছে বলেই তা বহুধামূল্যগর্ভ হতে পারে এবং চিহ্নায়কের ঐন্দ্রজালিক ঐশ্বর্য সৃষ্টি করতে পারে। শেষ পর্যন্ত তাই আকরণ ও পদ্ধতির স্থিরতা অটুট থাকতে পারে না, কোনও পর্যায়েই রুদ্ধতা থাকতে পারে না। আদ্যন্ত গতিময় বলেই পাঠকৃতির পাঠক্রিয়া মানে অনবরত প্রেক্ষিতের ধারণার পুনর্মূল্যায়ন এবং অংশ থেকে সমগ্রে ও সমগ্র থেকে অংশে নিরন্তর যাতায়াতের মধ্য দিয়ে রহস্যময় মুক্ত পরিসরের প্রতীতি অর্জন। পাঠক বয়ানের বহুবাচনিকতাকে শুধু আবিষ্কারই করে না, তার নিষ্কর্ষকে অনবরত বদলেও দেয়। বলা বাহুল্য, এই প্রক্রিয়া পূর্ব-নির্দিষ্ট নয় বলেই বহুরৈখিক। ভাষার পাঁচটি মৌল সংকেতের কথা বার্ত আমাদের জানিয়েছেন। এই সংকেতগুলিও অনড় আর অপরিবর্তনীয় নয়। ভাষার স্থাপত্য যদিও অনেকখানি এদের দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে, সময়-স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গে স্থাপত্য রূপান্তরিত হয় বলে এইসব তত্ত্ববীজও কার্যত মুক্ত ও পুনর্মূল্যায়নযোগ্য। বলা যায়, এদের সম্ভাবনা অন্তহীন।

পড়তে পড়তে সংবেদনশীল পাঠক যখন বয়ানের সঞ্চালক সাংস্কৃতিক বিশ্বকোষকে আবিষ্কার ও অনুসরণ করেন, বাচনের চিহ্নবিশ্ব ও রূপকের পরিসর তাঁকেও কিন্তু একটু একটু করে বদলে দেয়। রূপান্তর-প্রবণ পাঠকসত্তা লেখককে ক্রমশ নিষ্প্রভ ও অবান্তর করে দেয়, সেইসঙ্গে যথাপ্রাপ্ত ভাষাচিন্তাকেও বদলে দেয়। এই বিন্দুতে রোলাঁ বার্ত থেকে জাক দেরিদায় পৌঁছে যাই আমরা। আকরণবাদী চিন্তার প্রসারণ ও সমালোচনা: দুটোই লক্ষ করি দেরিদার বয়ানে। তাঁর মতে, আমাদের ভাবনা আকরণবাদের পরিসরে রয়ে যায় যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে মনে করে 'an adventure of vision, a conversion in the way of putting questions to any object'(1978:3)। এই চিন্তাপ্রণালীর মধ্য থেকেই আমরা তার অন্ধবিন্দুগুলি শনাক্ত করতে পারি, তৈরি করে নিতে পারি উদ্ভাসনী সমালোচনা। দেরিদা ভেবেছিলেন, সোস্যুরের বৈপ্লবিক ভাষাচিন্তা যেসব মূল সূত্রের ওপরে প্রতিষ্ঠিত, তাদের প্রতি আকরণবাদী সাহিত্যভাবনা সুবিচার করতে পারেনি। তাঁর মৌলিক অবদান হলো এই ভাবনাসূত্র যে ভাষায় রয়েছে শুধু নিরবচ্ছিন্ন পার্থক্য-প্রতীতি। এই অবস্থান থেকে তিনি আকরণবাদের বহু ধারণাকে জিজ্ঞাসায় বিদ্ধ করেছেন। বিশেষত, চিহ্ন ও আকরণ: এই দুটি তত্ত্ববীজ এবং নন্দনতত্ত্ব ও চিহ্নতত্ত্বের মৌল বিন্যাসপদ্ধতির সমালোচনা উপস্থাপিত করেছেন তিনি। বাক্‌কেন্দ্রিকতা ও পার্থক্যবোধ নিয়ে দেরিদার ভাবনা ভাষাচিন্তায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। বাক্‌কেন্দ্রিকতার নিরিখে সমস্ত ভাববীজকে বিশ্লেষণ করেছেন তিনি; সত্যের তাত্ত্বিক স্বভাব তাদের মধ্যে বিশিষ্টতম। দেরিদা প্রস্তাবিত বাক্‌কেন্দ্রিকতা চূড়ান্ত পরোক্ষ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়ে থাকে। লিখনের চেয়ে কথনকে তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কেননা কথক তাঁর অভিপ্রেত অর্থকে প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করতে পারেন যা লিখনে ঘটে না। কেননা অন্বিষ্ট ভাবনাকে সরাসরি ব্যক্ত না-করে লিখন মূলত কথনক্রিয়ার ধরনকে অনুসরণ করে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়,পরম্পরাগত ভাবে ভাষাকে মাধ্যম হিসেবে ধরা হয় বলে তা বহির্বৃত প্রেক্ষিত ও উপকরণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সোস্যুর অবশ্য ভাষার এই গৌন মর্যাদাকে মেনে নেননি। তাঁর মতে, ভাষা প্রাথমিক গুরুত্ব পাওয়ার অধিকারী কেননা ভাবনা বা তাৎপর্য ভাষার সাহায্যেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাই কথন ও লিখনের মধ্যে কাকে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দেওয়া যায়, এই তর্কে না-গিয়ে দেরিদার মতো ভাষাচিন্তাবিদ লক্ষ করেন পার্থক্যবোধ সৃষ্টির পদ্ধতিগুলিকে। উপস্থিতি, অভিপ্রায় বা উপস্থাপনার নিরিখে ভাষার লিখনরূপ বা কথনরূপকে তাদের প্রয়োগ-সামর্থ্যে বিচার করতে চান তিনি। তাঁর প্রস্তাবিত পার্থক্য-প্রতীতির মধ্যে রয়েছে বাচনের স্থগিত বা বিলম্বিত হওয়া। এতে আভাসিত হচ্ছে সময়ানুভবের নিগূঢ় স্পন্দন। আবার এতে নিহিত রয়েছে কোনও কিছু থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যাওয়ার প্রবণতাও, এতে রয়েছে পরিসরের দ্যোতনা। কোনও পাঠকৃতির মধ্যে ভাষিক উপাদান যখন অন্য উপাদানের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, এদের ব্যবধানের নিরিখে তাৎপর্যের গতি-প্রকৃতিও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। অস্তিত্বের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে যুগপৎ উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি, সংলগ্নতা ও অসংলগ্নতা। এদের সম্পর্ক মূলত পার্থক্য-প্রতীতির। এদের

সম্বন্ধের বিচ্ছুরণে নির্ধারিত হয় ভাষার আলো-অন্ধকার, স্থিতি-গতি-রুদ্ধতা-মুক্তির দ্বিরালাপ, যার কোনও শেষ নেই।

দেরিদার ভাষা-চিন্তার নিরিখেই স্বতশ্চল ভাবে পৌঁছে যাই বাচনের অবচেতনে, বোধের সমান্তরালতায়। এই সূত্রে জাক লাকাঁ ও মিখায়েল বাখতিনের চিন্তাবিশ্ব স্মরণীয় হয়ে ওঠে। ভাষাচিন্তায় এঁরা পরস্পরের সহযাত্রী ও পরিপূরক যেমন, তেমনি প্রতিস্পর্ধীও। কিন্তু সেই আলোচনায় আপাতত যাচ্ছি না। দেরিদা চিহ্নায়ন প্রকরণের শৃঙ্খলিত স্থিতি সম্পর্কিত ধারণার কথা বলেছেন। তাঁরই প্রস্তাবিত পার্থক্য-প্রতীতিকে কীভাবে তার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারি, তা নিয়েও জটিল বিশ্লেষণ রয়েছে। আপাতত লক্ষ করতে পারি তাঁর ভাষা-চিন্তায় সময়-মাত্রা ও পরিসর-মাত্রার সহাবস্থান। ভাষার মধ্যে জীবন ও জগৎ থেকে উদ্ভূত বিচিত্র সম্পর্কের শৃঙ্খলা যিনি লক্ষ করেন, তিনিই আবার খুঁজে পান অনিবার্য অন্ধবিন্দুদের। ভাষা-চিন্তায় মুক্ত বয়ানের যে-প্রতিশ্রুতি বিশ শতকের কয়েক দশক ধরে ক্রমশ গড়ে উঠেছিল, দেরিদা তাকে অনেকখানি সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি যখন বলেন পাঠকৃতির বাইরে কিছুই নেই— সে-সময়ে আসলে তিনি জানাতে চান যে ভাষার বাইরে নেই কোনও জগৎ কিংবা জীবন। অজস্র শূন্যের জটিল পরিধি রচিত হওয়া সত্ত্বেও ভাষারই ভেতর দিয়ে পৌঁছাতে হয় ভাষ্যে। জ্ঞানের ভাষ্য নয়, ভাষ্য অস্তিত্বের। অর্থাৎ মুক্তির।

এমন নয় যে দেরিদা কিংবা তাঁর সহযোগীদের ভাষা-চিন্তা সম্পর্কে কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেল। বাচন-সম্পর্কিত কৃৎকৌশল অহরহ রূপান্তরিত হচ্ছে সময়ের অমোঘ সংকেতে। ভাষার প্রতীতি তো শেষ পর্যন্ত সেই সংকেতের প্রতীতি যা গ্রহীতার সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক অবস্থান, প্রস্তুতি ও ধারণ-ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল।

অ্যাডোর্নোর নন্দনভাবনা ও তত্ত্ববিশ্ব

ফ্রাঙ্কফুর্ট চিন্তাপ্রস্থানে অ্যাডোর্নোর অবদান কার্যত অপরিমেয়। এইজন্যে কোনো একটি প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে তাঁর অনেকান্তিক গুরুত্বের সমস্ত দিক পর্যালোচনা করা অসম্ভব। নির্মীয়মান এই প্রতিবেদনে তাঁর নন্দনভাবনার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে চিন্তার বহুবাচনিক পরিসরে বাধ্যতামূলক ভ্রমণ করতে হবে আমাদের। হয়তো যে-কোনও প্রধান তাত্ত্বিকের তত্ত্ববিশ্ব অনুশীলনে এই প্রক্রিয়া অপরিহার্য। আজকের পরস্পর-বিরোধী ও কূটাভাসময় আধুনিকোত্তরবাদী বীক্ষণবিন্দু অনুযায়ী অ্যাডোর্নোর নিবিড় পাঠ করব কি নান্দনিক অভিজ্ঞতার প্রকৃত ও প্রতীয়মান স্তরের ব্যবধান প্রত্যাখ্যান করার জন্যে? সংস্কৃতি যখন শিল্পায়ন ও দীপায়নের দ্বান্দ্বিকতায় নেতিবাদের ছায়া-আক্রান্ত, অ্যাডোর্নোর চিন্তাসূত্রগুলি ঠিক কীভাবে ও কতখানি ব্যবহার করব? যেহেতু প্রতিটি বয়ান সময়ের দাবি মেটানোর পরে সব ক্ষেত্রে সময়াতীত হতে পারে না, ভাষ্য কিংবা অতিভাষ্য দিয়ে ভেতরকার অন্ধবিন্দুগুলি পুরোপুরি আচ্ছন্ন করা শক্ত। তার ওপর মনে রাখতে হয় গ্রহীতার অবস্থান সংক্রান্ত জরুরি প্রশ্নটিও। দীপায়ন-আধুনিকতা-সাংস্কৃতিক রাজনীতি ভারতীয় উপমহাদেশের অধিবাসীদের কাছে, বিশেষত বাঙালির কাছে, কীভাবে প্রতিভাত হচ্ছে— তার ওপর অ্যাডোর্নোর নন্দন-ভাবনার পরিগ্রহণ অনেকখানি নির্ভর করছে।

এইসব কথা মনে রেখেই অ্যাডোর্নোর তত্ত্ববিশ্ব পরিক্রমা করব, যাব স্তর থেকে স্তরান্তরে। এই তাত্ত্বিকের জন্মশতবর্ষ পেরিয়ে এলাম, এবছর (১৯১২) ১১ সেপ্টেম্বর তাঁর ১০৯ বছর পূর্ণ হচ্ছে। এই তারিখ এখন অবশ্য বিশ্ববাণিজ্যকেন্দ্র ও পেন্টাগনে বিমানহানার জন্যে স্মরণীয় হয়ে গেছে। ১৯০৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর অ্যাডোর্নো যে ফ্রাঙ্কফুর্টে জন্মেছিলেন, এই তথ্য নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে। নবজাত শিশুটি অবশ্য মা মারিয়া ক্যালভেলি অ্যাডোর্নোর পারিবারিক উপাধিতে পরিচিত হয়নি। শৈশবে তাঁর নাম ছিল থিয়োডোর লুডহি্গ হি্জেনগ্রুন্ড। জীবনের প্রথম তিনটি ও শেষ দুটি দশকে ফ্রাঙ্কফুর্ট ছিল তাঁর চারণভূমি। ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত বাধ্যতামূলক প্রবাস কাটাতে হয়েছে তাঁকে অক্সফোর্ড, নিউইয়র্ক ও দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায়। নাৎসি জার্মানি থেকে দূরে নির্বাসিত জীবনযাপন করার সময়ে তিনি তাঁর সর্বজনবিদিত নামটি গ্রহণ করেন, থিয়োডোর ডব্লিউ অ্যাডোর্নো। তাঁর বাবা ওস্কার হি্জেনগ্রুন্ড ছিলেন ধনবান ইহুদি ব্যবসায়ী। মা মারিয়া ও মাসি আগাথার কাছে শৈশবে ও কৈশোরে থিয়োডোর ধ্রুপদী সঙ্গীতের পাঠ গ্রহণ করেন। বৌদ্ধিক জীবন সম্পর্কে তাঁর প্রবল তৃষ্ণা লালিত হয়েছিল জার্মানির সমৃদ্ধ দার্শনিক আবহে। মাত্র পনেরো বছর বয়সে কাণ্টের 'Critique of Pure Reason' বইটির সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় হয়। তখন ধারাবাহিক

ভাবে সাপ্তাহিক পরিশীলনের সুযোগ হয়েছিল তাঁর। ফলে বিভিন্ন দার্শনিক পাঠকৃতির নিবিড় পাঠে সম্পৃক্ত হওয়ার জীবন-ব্যাপ্ত প্রক্রিয়ার সূচনা হল। অতি দ্রুত পরিণত মননের অধিকারী হলেন। এইজন্যে মাত্র একুশ বছর বয়সে তিনি, তিন বছরব্যাপী অধ্যবসায়ের পরে, ফ্রাঙ্কফুর্টের যোহান হ্‌লগ্যাঙ্গ গ্যয়ঠে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।

অভিসন্দর্ভের বিষয় হিসেবে অ্যাডোর্নো বেছে নিয়েছিলেন এডমুন্ড হুসের্লের প্রাতিভসত্তাবাদী দর্শন। গবেষণা করার সময় দু'জন প্রখ্যাত চিন্তাবিদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, যাঁরা পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর বৌদ্ধিক জীবনের ঘনিষ্ঠতম সহযোগী হয়ে উঠেছিলেন। ১৯২২ সালে হুসের্ল সম্পর্কিত একটি আলোচনাচক্রে ম্যাক্স হর্কহাইমারের সঙ্গে আর ১৯২৩-এ তাঁর কাণ্ট-প্রশিক্ষকের মাধ্যমে ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। শেষোক্ত সালে ফ্রাঙ্কফুর্টে প্রতিষ্ঠিত হয় ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল রিসার্চ এবং গিয়র্গ লুকাচের 'History and Class Consciousness' বইটি প্রকাশিত হয়। অ্যাডোর্নো অবশ্য ১৯৩৮ এর আগে সমাজতত্ত্ব গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত সদস্য হননি যদিও ১৯৩১ থেকে এর সঙ্গে তাঁর খানিকটা শিথিল সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তিনি আকৈশোর দার্শনিক মনন সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন, সংস্থার প্রথম সঞ্চালক কার্ল গ্রুনবার্গের (১৯২৩-১৯২৯) কার্যকালে এর ঝোঁক ছিল মূলত ইতিহাস ও অর্থনীতির দিকে। গ্রুনবার্গ প্রারম্ভিক ভাষণে (১৯২৪) তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছিলেন: "The materialist conception of history neither is, nor aims to be a philosophical system....its object is not abstractions, but the given concrete world in its process of development and change."। সুতরাং অ্যাডোর্নো সংস্থার কাজকর্ম সম্পর্কে যে খুব একটা উৎসাহ বোধ করবেন না, তা অনুমান করা শক্ত নয়। কিন্তু যে-সংস্থার সঙ্গে পরে তিনি গভীরভাবে সম্পৃক্ত হবেন, তার প্রভাব একেবারে অস্বীকার করার মতো ছিল না। তিনি ঐ সময় প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ বইপত্র খুব অভিনিবেশের সঙ্গে পড়তেন। প্রখ্যাত মার্ক্সীয় তাত্ত্বিক গিয়র্গ লুকাচের ইতিহাস ও শ্রেণিচেতনা বিষয়ক বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পড়ে নিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকার সময় লুকাচের 'দি নভেল' ও এর্নস্ট ব্লকের বই পড়া হয়ে গিয়েছিল। দার্শনিক নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে অ্যাডোর্নো ক্রমশ যে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলেছিলেন, এইসব বইপত্র ছিল তার প্রেরণাস্থল। এছাড়া ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের গ্যয়ঠে বিষয়ক নিবন্ধ এবং 'The Origin of German Tragic Drama' নামক বিখ্যাত বইয়ের প্রভাব কতখানি ছিল, সে-সম্পর্কে স্বয়ং অ্যাডোর্নো 'Aesthetic Theory'-র খসড়া ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন।

শৈশব থেকে যে সঙ্গীতবোধে পরিশীলিত হয়েছিলেন অ্যাডোর্নো, যৌবনে পশ্চিম ইউরোপের নব্যসঙ্গীত ভাবনার সঙ্গে নিবিড় সংযোগের ফলে তা তাঁর দর্শনচিন্তা বিকাশের পক্ষেও সহায়ক হয়েছিল। বিশের দশকে প্রকাশিত অধিকাংশ প্রবন্ধের অন্বিষ্ট ছিল সমসাময়িক সাঙ্গীতিক সৃষ্টির পর্যালোচনা। ১৯২৫-২৬ সালে অ্যাডোর্নো ভিয়েনায়

এডুয়ার স্টয়েরমানের কাছে পিয়ানো এবং অ্যালব্যান বের্গের কাছে সুরসংহতির তালিম নিয়েছিলেন। ঐ দশকে বার্লিনের অনেক সঙ্গীত-স্রষ্টার সঙ্গে তাঁর নিয়মিত আলোচনা হত। এইজন্যে শিল্পকলা সম্পর্কে ধ্যানধারণা অর্জনের ক্ষেত্রে তিনি বহির্বৃত পর্যবেক্ষক মাত্র ছিলেন না, ভেতর থেকে বাহিরকে দেখার বিশেষ ক্ষমতাও তাঁর অধিগত ছিল। সাঙ্গীতিক উপকরণের ইতিহাস-নিষ্পন্ন বিবর্তন কিংবা সঙ্গীত-সৃষ্টির আত্মগত ও বস্তুগত সত্যের অভিব্যক্তি বিচার: কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। একই সঙ্গে আধুনিক শিল্পকলার নান্দনিক বৈধতা কিংবা বুর্জোয়া শ্রেণির সাংস্কৃতিক প্রকরণ ভাববাদী দর্শনের ক্ষয়িষ্ণুতার নিরিখে শিল্পের তাৎপর্য বিচার অ্যাডোর্নোর অভিপ্রেত ছিল—এমনও বলেছেন কেউ কেউ। অবশ্য অভিব্যক্তিবাদী শিল্পকলার নির্যাস ও ভাববাদবিরোধী দর্শন-প্রস্থানের বিচিত্র সংশ্লেষণ হিসেবে তাঁর নন্দনচিন্তাকে গ্রহণ করা যায় কিনা, এবিষয়ে সমালোচকেরা সংশয় প্রকাশ করেছেন। নিছক সংশ্লেষণের চেষ্টা করেননি তিনি; শিল্পকলার সামাজিক সমালোচনা কতদূর অবধি গ্রাহ্য এবং এই প্রক্রিয়ার পরিধি কতটা বিস্তৃত—তাও বুঝে নিতে চেয়েছেন। লুকাচের রচনা থেকে অর্জিত উপলব্ধি এবং বেঞ্জামিন, হর্কহাইমার সহ গবেষণা-সংস্থার অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা থেকে লব্ধ চিন্তাবীজ সমন্বিত করে তিনি সমালোচনাত্মক প্রতিবেদন তৈরি করতে চাইছিলেন। এছাড়া বিশের দশকের শেষে বার্লিনে বহুবার যাওয়ার সূত্রে ভাবী পত্নী গ্রেটেল কারপ্লাস এবং রাজনৈতিক চিন্তায় বামপন্থী লেখকদের (যেমন ব্লক, বেঞ্জামিন, তাইসলের, হ্ইল, বের্টল্ট, ব্রেখট্) সাহচর্য তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। সামাজিক চেতনা রূপান্তরের ক্ষেত্রে শিল্পের ভূমিকা কী: এই ছিল তাঁদের আলোচনার মুখ্য বিষয়।

আগেই লিখেছি, ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের 'The Origin of German Tragic Drama' অ্যাডোর্নোকে উদ্দীপিত করেছিল। এমন নিবিড় কল্পনা-সিঞ্চিত পাঠ কাঙ্ক্ষিত ছিল তাঁর যা শিল্পকর্ম-দার্শনিক পাঠকৃতি-দৈনন্দিন জীবনের অনুষঙ্গে অন্তর্বৃত সামাজিক দ্বন্দ্ব ও সমস্যার ক্ষেত্রগুলি উন্মোচিত করে। ভাষ্যকার এমন সামাজিক ও ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন যা হয়তো শিল্পী-দার্শনিক-সমাজকর্মীর স্পষ্ট অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে কাজে লাগুক বা না-ই লাগুক, সমালোচকদের বিশ্লেষণী ভাষ্যের রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা থাকে। বেঞ্জামিনের ব্যাখ্যাপ্রণালী থেকে অ্যাডোর্নো যদিও শেষ পর্যন্ত ভিন্ন পথের পথিক হয়েছিলেন, তিরিশের দশকের সূচনা-পর্বের রচনাগুলিতে তাঁদের ভাবনার সাদৃশ্য রয়েছে। সঙ্গীতের সমাজতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর দুটি বক্তৃতায় এবং 'Kierkegaard, Construction of the Aesthetic' নামক প্রথম বইতে বেঞ্জামিনের প্রেরণা দুর্লক্ষ্য নয়। ১৯৩৩ সালে যেদিন হিটলার ক্ষমতা দখল করলেন, ইতিহাসের আশ্চর্য সমাপতনে সেদিন বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। কিছুদিন পরেই অবশ্য জার্মানির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইহুদি অধ্যাপকেরা বরখাস্ত হয়ে গেলেন। এঁদের মধ্যে অ্যাডোর্নো, হর্কহাইমারও ছিলেন। ১৯৩০ থেকে ফ্রাঙ্কফুর্টের সমাজ গবেষণা কেন্দ্রে সঞ্চালক হিসেবে হর্কহাইমার

কাজ করেছিলেন। ইতিহাসের কালো প্রহরে গবেষণা-কেন্দ্রটি নিউইয়র্কে স্থানান্তরিত হলো, কিছুটা শিথিলভাবে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাকে সংযুক্ত করা হলো। সে-সময় অ্যাডোর্নো অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাগ্রসর ছাত্র হিসেবে নথিভুক্ত হলেন। তবে ভাবী পত্নী গ্রেটেল কারপ্লাসের সঙ্গে দেখা করার জন্যে তিনি প্রায়ই জার্মানিতে যেতেন। ১৯৩৭ সালে দু'জনের বিয়ে হলো। বেঞ্জামিন ইতিমধ্যে প্যারিসে চলে গেছেন; ১৯৪০ সালে নাৎসিবাহিনী ফ্রান্স আক্রমণ করার পরে তিনি স্পেনের সীমান্তে পালিয়ে যান এবং সেখানেই আত্মহত্যা করেন।

দুই

অ্যাডোর্নো ইতিহাসের ঘূর্ণাবর্ত থেকে কতখানি পাঠ নিয়েছেন এবং কী কী নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে তাঁর চেতনা-বিশ্বে, এসব বিষয়ে চুলচেরা আলোচনা এখনও অব্যাহত। এই প্রতিবেদনে শুধু লক্ষ করব তিরিশের গোড়ায় নিজের চিন্তা-বিশ্বের প্রধান আধেয় হিসেবে যেসব সমাজতাত্ত্বিক সমালোচনার প্রকল্প তিনি নির্মাণ করেছিলেন, মোটামুটিভাবে সেইসব আমৃত্যু (আগস্ট, ১৯৬৯) অনুসরণ করে গেছেন। দর্শন সম্পর্কে প্রগাঢ় নিষ্ঠা এবং আধুনিক শিল্পকলা, বিশেষভাবে সঙ্গীত সম্পর্কে, প্রবল আকর্ষণ অটুট ছিল। তবে এর মানে এই নয় যে তাঁর চিন্তাবিশ্বে কোনো উচ্চাবচতা নেই, বরং ঠিক তার উল্টো। অন্তত তিনটি প্রধান পর্যায়ে বিবর্তিত হয়েছে তাঁর বহুরৈখিক ভাবনাপ্রস্থান। যেসব বিষয়ে নিয়ে তিনি লিখেছেন এবং রচনায় যে-মনোভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে, তাদের মধ্যে লক্ষ করি ক্রমিক রূপান্তর। পরিবর্তনশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং তত্ত্বচর্চায় সহযাত্রীদের বিভিন্ন প্রকল্পের সম্মেলক প্রভাব ঐ রূপান্তর সম্ভব করে তুলেছে। তাঁর চিন্তাবিশ্বে আকস্মিক কোনও সমাপতন নেই।

অ্যাডোর্নোর ভাববিশ্বের প্রথম পর্যায় ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত বিস্তৃত। এসময় তিনি জনপ্রিয় সংস্কৃতির সমালোচনা উপস্থাপিত করার জন্যে বিভিন্ন চিন্তাপ্রস্থানের মধ্যে অন্যোন্য-উদ্ভাসন প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল। সঙ্গীত কীভাবে শিল্পোদ্যোগের চরিত্র অর্জন করছে, এ বিষয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি। আর, ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের সঙ্গে লিখেছেন যুগান্তকারী বই 'The Dialectic of Enlightenment;' বিশেষত 'সংস্কৃতি শিল্পোদ্যোগ : গণপ্রতারণার অভিব্যক্তি হিসেবে দীপায়ন' শীর্ষক বহু আলোচিত অধ্যায়টি রচনা করেছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে এই পর্যায়ে অ্যাডোর্নো হেগেলীয় শৈলী এবং নিজস্ব দৃষ্টিকোন অনুযায়ী ফ্রয়েডীয় চিন্তাসূত্র অনুসরণ করেছেন। এছাড়া নীৎশের ভাবনা ও অস্ওয়াল্ড স্পেঙ্গলার-এর সংস্কৃতি-সমালোচনাকে কিছুটা পুনর্বিন্যাস করে নিয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাস যাপনের সময় তিনি জনপ্রিয় সংস্কৃতির অন্তর্গূঢ় তাৎপর্য বিশেষভাবে অনুসন্ধান করেছিলেন যাতে ফ্যাসিবাদ, ইহুদি-বিদ্বেষ এবং জনসাধারণের চেতনায় সার্বিক অসাড়তার গভীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলি শনাক্ত করা যায়। এই বিষয়ে লোকায়ত পরিসর সম্পর্কে বেশ কিছু চিন্তাসূত্র উপহার দিয়েছেন তিনি। মানবিকী

বিদ্যার বিভিন্ন শাখার মধ্যে কার্যকরী বিনিময়ের মধ্য দিয়ে যেভাবে তিনি সাংস্কৃতিক সমালোচনার সন্দর্ভ নির্মাণ করেছিলেন, তার উপযোগিতা এখনও পুনঃপাঠ করা যায়।

১৯৪৯ থেকে ১৯৫৮ অবধি বিস্তৃত ছিল তাঁর চিন্তা-প্রস্থানের দ্বিতীয় পর্যায়। এসময় তিনি উচ্চসংস্কৃতির সামাজিক প্রতিবেদনে গবেষক-সুলভ নিরাসক্তি নিয়ে হস্তক্ষেপ করেছেন। ১৯৪৯-এ হর্কহাইমারের সঙ্গে অ্যাডোর্নোও ফ্রাঙ্কফুর্টে ফিরে আসেন এবং সামাজিক গবেষণা-কেন্দ্র ১৯৫১ সালে পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে। এই পর্যায়ের সমাপ্তি হলো ১৯৫৮ তে যখন হর্কহাইমারের পরে গবেষণাকেন্দ্রের সঞ্চালক হিসেবে নিযুক্ত হলেন অ্যাডোর্নো। এ সময়কার রচনায় লক্ষ করি, সরকারি মতাদর্শের অভিব্যক্তিকে প্রত্যাহ্বান জানাচ্ছেন তিনি, বেশ কিছু ক্ষেত্রে যেন বিনির্মাণবাদী প্রবণতার পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। 'Philosophy of Modern Music,' 'Minima Moralia' 'In Search of Wagner' মূলত জার্মানির উচ্চসংস্কৃতির প্রতিপাঠকৃতি। যুদ্ধ-পরবর্তী দিনগুলিতে অ্যাডোর্নো স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন যে সংস্কৃতির জগৎ উত্তরোত্তর পুঁজিবাদী সমাজের কাঠামোয় সম্পৃক্ত হয়ে যাচ্ছে। 'সাংস্কৃতিক সমালোচনা ও সমাজ' নামে যে-প্রবন্ধ ১৯৪৯-এ রচিত ও ১৯৫১-তে প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন অ্যাডোর্নো : 'Cultural Criticism must become social physiognomy... The more total society becomes, the greater the reification of the mind and the more paradoxical its effort to escape reification on its own. Even the most extreme consciousness of doom threatens to degenerate into idle chatter. Cultural criticism finds itself faced with the final stages of the dialectic of culture and barbarism. To write poetry after Auschwitz is barbaric. And this corrodes even the knowledge of why it has become impossible to write poetry today.' (১৯৫১:৩০)।

সংস্কৃতি ও বর্বরতার দ্বান্দ্বিকতা কিংবা অমঙ্গলবোধ সম্পর্কিত চূড়ান্ত চেতনা কীভাবে সাংস্কৃতিক সমালোচনা-ধারাকে প্রভাবিত করে, এ সম্পর্কে অ্যাডোর্নোর মন্তব্য নিঃসন্দেহে আমাদের ভাবায়। আউসহ্বিৎস সভ্যতার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে বিপুল গুরুত্বসম্পন্ন জলবিভাজন-রেখা। এই রেখার ওপারে যারা রয়েছে, কবিতা লেখা তাদের কাছে বর্বরতার অভিজ্ঞান কেন— তা তলিয়ে ভাবতে হয়। সৃষ্টির জ্ঞানও ধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে সার্বিক বিনষ্টির গাঢ়তম ছায়ার অভিঘাতে; তাই কবিতার মতো সূক্ষ্ম সংবেদনশীল শিল্পমাধ্যম এখন নিরাশ্রয়। তবে এই কথাগুলিকে আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করা সমীচীন কি না, এই প্রশ্ন উঠে এসেছে। এমনও হতে পারে, দুঃস্মৃতির দহন এই রচনার সময় পীড়িত করছিল অ্যাডোর্নোকে, তাই যন্ত্রণাময় আত্মসমালোচনার সূত্রে বাচনিক আতিশয্য স্পষ্ট হয়ে পড়েছিল। হয়তো নৈরাশ্য-মন্থর চেতনা নিয়ে লেখক তাঁর পাঠকদের কিছুটা বিদ্ধও করতে চাইছিলেন, যাতে শিল্পকর্মকে কেউ কখনো ইতিহাস-নিরপেক্ষ বলে ভাবতে না পারে। উচ্চসংস্কৃতির ভোক্তা উচ্চবর্গীয় সমাজ

অপ্রীতিকর বাস্তবকে ভুলে থাকতে চায় বলে তিনি শুধু স্মৃতিকে উস্‌কে দিতে চেয়েছেন।

১৯৫৬ সালে প্রকাশিত 'Against Epistemology' বইতে সত্তাতত্ত্ব ও জ্ঞানতত্ত্বকে ঐতিহাসিকভাবে বিচার করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন অ্যাডোর্নো। এছাড়া ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হয়েছে সাহিত্য-সমালোচনামূলক রচনার প্রারম্ভিক বয়ান, 'The Essay as form'। এতে দার্শনিক শৈলীকে সাহিত্যবোধ উন্মোচনের সঙ্গে সূক্ষ্ম ভাবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ধীরে ধীরে সঙ্গীত, সাহিত্য,নন্দনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর চিন্তা বিকশিত হয়েছে আরও।

বস্তুত অ্যাডোর্নোর বৌদ্ধিক জীবনের তৃতীয় পর্যায়ে (১৯৫৯-৬৯) এইসব ভাববীজ আরও বিকশিত হয়ে পারস্পরিক সংশ্লেষণের মধ্য দিয়ে জটিলতর গ্রন্থনা নির্মাণ করেছে। এদের মধ্যে আলাদাভাবে উল্লেখ্য 'Notes on Literature' শীর্ষক নিবন্ধ-সংগ্রহের তিনটি খণ্ড (১৯৫৮,১৯৬১,১৯৬৫) এবং 'Three studies on Hegel' (১৯৬৩)। এ সময় তিনি বিভিন্ন ধরনের শৈক্ষিক ও বৌদ্ধিক বিষয় নিয়ে বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত বিতর্ক হয়েছিল কার্ল পপারের সঙ্গে। (দ্রঃ The positivist dispute in German Sociology: London: 1976)। পপার যেখানে মূল্য-নিরপেক্ষতার আদর্শ প্রচার করছিলেন, অ্যাডোর্নো দৃঢ়তার সঙ্গে জানাচ্ছিলেন যে কোনও সামাজিক তত্ত্ব রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ হতে পারে না। যে-সমস্ত সমালোচক মার্ক্সবাদ থেকে অ্যাডোর্নোর দূরত্ব প্রমাণ করার জন্যে বিশেষভাবে সচেষ্ট, তাঁরা তাঁর নিম্নোদ্ধৃত বস্তুবাদী বিশ্ববীক্ষার অভিব্যক্তি সম্পর্কে অস্বস্তিবোধ করেন: 'The idea of scientific truth cannot be split off from that of a true society. Only such a society would be free from contradiction and lack of contradiction.' (১৯৭৬:২৭)

অ্যাডোর্নো আসলে চাইছিলেন রাজনৈতিক ভাবে দায়বদ্ধ সমাজতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করে সংযোগশূন্যতার সমাধান। বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো উচ্চশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শৈক্ষিক ও বৌদ্ধিক মূলনীতি কোন্ পথ ধরে চলবে, এসম্পর্কে অ্যাডোর্নোর ভাবনাসূত্র এখনও পথ-প্রদর্শক হতে পারে। য়ুর্গেন হাবেরমাস, অ্যালব্রেখট হে্‌লমের প্রমুখ চিন্তাবিদেরা এক্ষেত্রে অ্যাডোর্নোর কাছেই প্রেরণা পেয়েছেন। তবে তৃতীয় পর্যায়ে তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত বই হলো "Negative Dialectics" (১৯৬৬) এবং "Aesthetic Theory"(১৯৭০)। প্রথমোক্ত বইটি হলো পরাদার্শনিক প্রতিবেদন কেননা এতে দর্শন সম্পর্কে দার্শনিক উদ্ভাসন উপস্থাপিত হয়েছে। অন্যান্য দর্শন-সংক্রান্ত আলোচনায় ইতিমধ্যে অ্যাডোর্নো যেসব পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন এবং ভাবনার বর্গ ব্যবহার করেছেন— তাদের আরও বিশদ করা হয়েছে এই বইতে। তেমনি শেষোক্ত বইটিও পরানন্দনের সন্দর্ভ কেননা এতে দার্শনিক নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে দর্শন-নিষ্ণাত ভাবনা উপস্থাপিত হয়েছে। আর, ইতিমধ্যে শিল্পকলা নিয়ে যা কিছু লিখেছেন অ্যাডোর্নো, তাদের মধ্যে অনুসৃত পদ্ধতি ও চিন্তাবর্গগুলি আরও প্রসারিত হয়েছে। বস্তুত এই দুটি

বইতে লেখকের বৌদ্ধিক জীবন-ব্যাপ্ত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির সারাৎসার গ্রথিত হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, ফ্রাঙ্কফুর্ট চিন্তা-প্রস্থানের দার্শনিক নির্যাসও এদের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। তাই অ্যাডোর্নোর চিন্তাবিশ্বে এই বই দুটির গুরুত্ব অপরিসীম।

তিন

অ্যাডোর্নোর নন্দন-ভাবনার আলোচনা তাই কার্যত তাঁর জীবন-ব্যাপ্ত বৌদ্ধিক কৃতির সারমর্ম রচনাও। শৈশব থেকেই তিনি শিল্পকলা ও সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার গভীরতর তাৎপর্য সম্পর্কে পরিশীলিত হয়ে উঠেছিলেন। শিল্পকলার মতো তাঁর প্রগাঢ় আবেগ দর্শনের জন্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। সেইসঙ্গে সমসাময়িক সমাজের অসঙ্গতি ও স্ববিরোধিতা সম্পর্কে তীক্ষ্ণ সমালোচনা পেশ করার ক্ষেত্রেও সমঝোতা করেননি কখনও। যদিও তাঁর জীবন-ব্যাপ্ত নন্দন-ভাবনার সারাৎসার 'Aesthetic Theory' তে, এও আমরা ভুলতে পারি না যে এই বইটি অসম্পূর্ণও। কেননা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হঠাৎ তাঁর জীবনে ছেদ পড়ে যাওয়াতে তাঁর বয়ান খণ্ডিত হয়েই রইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শৈক্ষিক রাজনীতিতে জড়িয়ে গিয়ে এবং নিজেরই কট্টরপন্থী ছাত্রদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে অ্যাডোর্নো যে প্রবল মনঃকষ্ট পেয়েছিলেন, কারো কারো মতে তা-ই তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর কারণ।

তাঁর স্ত্রী গেটেল ও ছাত্র রোলফ্ টিডেম্যান অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিকে প্রকাশনার উপযোগী করে তোলেন। তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যে বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় বইটি অনূদিত হয়। এছাড়া অজস্র প্রবন্ধ-সংগ্রহ ও আলোচনা-চক্রের মধ্য দিয়ে প্রতীচ্যের বৌদ্ধিক পরিসরে অ্যাডোর্নোর গুরুত্ব দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ে। বিশেষজ্ঞদের মতে নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কিত অ্যাডোর্নোর প্রতিবেদন নিরবচ্ছিন্ন পুনঃপাঠের যোগ্য। কারো কারো মতে তাঁর জীবনের মর্মসত্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে এই বইতে; এমনকী এ যেন তাঁর 'Indirect epitaph' (Lambert Zuidervaart: 1994:9)। এই সমালোচকের মতে: 'Aesthetic Theory has become the last testament, as it were, of a truly remarkable man: a Hegelian Marxist who distanced himself from both Hegel and Marx; an assimilated German Jew who wrote several seminal works in American exile; a polished modern musician who subjected music to a critique of ideology, an imaginative and rigorous philosopher who was better known for his work in the social sciences.' (তদেব)। কোনো সন্দেহ নেই যে অ্যাডোর্নোর নন্দনতত্ত্বে ইতিহাস অন্তঃস্বর যোগান দিয়েছে। কিংবা, বলা যায়, বিশ শতকের বহুবাচনিক সময়ে পরস্পর-বিরোধী প্রবণতার দ্বন্দ্ব যখন সামাজিক প্রেক্ষিতকে সংক্ষুব্ধ করে তুলেছে—অ্যাডোর্নোর তত্ত্ববিশ্ব ইতিহাস থেকে প্রাণবায়ু আহরণ করেছে। তাঁর যাবতীয় শক্তি ও কল্পনা, মেধা ও অনুভবের উৎস রয়েছে সেই ইতিহাসে যাতে অনায়াসে সহাবস্থান করতে করে পশ্চিমী মার্ক্সবাদ, নান্দনিক আধুনিকতাবাদ, সাংস্কৃতিক নৈরাশ্য ও পীড়াবোধ, প্রান্তিকায়িত ইহুদি বুদ্ধিজীবীর

আত্ম-অভিজ্ঞান সন্ধান ও বিনির্মাণবাদী প্রবণতার পূর্বাভাস। তাঁকে যাঁরা প্রগতিপন্থী বা সংশয়বাদী, শিথিল বামপন্থী বা অস্থির বীক্ষণের অধিকারী বলে মনে করেন, তাঁরা কেউই ঠিক ভাবেন না। কোনো-না-কোনো একটি বিশেষ উপাদান বা প্রবণতা অ্যাডোর্নোর তত্ত্ববিশ্বে একমাত্রিক প্রাধান্য বিস্তার করেনি। বরং পরস্পর-বিরোধী উপকরণের সংশ্লেষণ ঘটেছে তাঁর বয়ানে। বিশেষত 'AestheticTheory' বইতে ঐ সংশ্লেষণ যেন বিস্ফোরক মাত্রা অর্জন করেছে।

আসলে সমকালীন ইতিহাসের ভেতরে প্রচ্ছন্ন ছিল সমিধ-সংগ্রহ ও দহন ক্রিয়ার সম্ভাবনা; আপন চিন্তার নির্যাসকে স্ফুলিঙ্গের অনুঘটক হিসেবে ব্যবহার করে অ্যাডোর্নো সম্ভাবনাকে আগুনে রূপান্তরিত করেছেন। কতটা আলো পেয়েছি আর কতখানি উত্তাপ, পরবর্তী কালে দ্রুত পরিবর্তিত ইতিহাসের ভস্মস্তূপ দেখে তার হদিশ করা সহজ নয় খুব। তবু এও ঠিক, রূপক এক্ষেত্রে কোনো আড়াল তৈরি করছে না; নন্দন-ভাবাদর্শ-বাস্তব পরিসরের গ্রন্থনা অস্পষ্ট নয়। ইদানীং উত্তর-মার্ক্সবাদ কিংবা আধুনিকোত্তরবাদ যাঁদের চিন্তার সঞ্চালক, তাঁরা পরস্পর-ভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে অ্যাডোর্নোর তত্ত্ববিশ্বকে ব্যবহার করতে চাইছেন বলে নানা সংশয়মথিত জিজ্ঞাসা উঠে আসছে। গ্রহীতাদের কূট ব্যাখ্যায় ও বিশ্লেষণে কখনো গৌন হয়ে যাচ্ছে অ্যাডোর্নোর জীবনব্যাপ্ত ধারাবাহিক ভাবনা ও চলমান ইতিহাসের স্পষ্ট ও নিরবচ্ছিন্ন দ্বিরালাপ। হাবেরমাস তাই আলোচকদের পরস্পর-বিরোধী বিশ্লেষণ জনিত অনিশ্চয়তার ধোঁয়াশা লক্ষ করে খানিকটা ক্ষুব্ধ স্বরে লিখেছেন: 'Adorno has left philosophy with a chaotic landscape'। এর মোকাবিলা করতে হলে অ্যাডোর্নোর নন্দন-চিন্তার ঐতিহাসিক অন্তঃস্বর নির্ণয় করা জরুরি। তাঁর অন্যান্য বইয়ের ক্ষেত্রে যেমন ঘটেছে, 'Aesthetic Theory'ও বিচিত্র দৃষ্টিকোন থেকে নানা মাত্রায় পরিগৃহীত হয়েছে। সম্ভবত বহুস্বরিক তাৎপর্যের নিরিখে এই বইটির পাঠ-প্রতিক্রিয়া সবচেয়ে বেশি কৌতূহলজনক। পশ্চিমী মার্ক্সবাদ ও ফ্রাঙ্কফুর্ট চিন্তা-প্রস্থান প্রবর্তিত সমীক্ষণী সমালোচনা-তত্ত্বের ধারণায় যা-কিছু কেন্দ্রীয় ভাববীজ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, অ্যাডোর্নোর বইতে সেই সবই কোনও-না-কোনও ভাবে প্রাসঙ্গিক। পুঁজিবাদ ও সংস্কৃতির আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে অ্যাডোর্নো যেসব মৌলিক গবেষণা-প্রকল্পের প্রস্তাবনা করেছেন, ধ্রুপদী মার্ক্সবাদী তত্ত্বভাবনা ও রণকৌশলের সঙ্গে এর পার্থক্য খুব স্পষ্ট বলে অনেকেই তাঁর এই স্বতন্ত্র পথগামিতাকে নিজেদের পূর্ব-নির্ধারিত সিদ্ধান্তের অনুকূলে ব্যাখ্যা করেছেন। অথচ এই পার্থক্য-প্রতীতির ঐতিহাসিকতা ও যৌক্তিক পরম্পরা ব্যাখ্যার দিকটি প্রাপ্য গুরুত্ব পায়নি। গিয়র্গ লুকাচ, কার্ল কর্শ ও আন্তনিও গ্রামশির মৌলিক চিন্তাপ্রণালী যখন পশ্চিমী মার্ক্সবাদের স্বাতন্ত্র্য-দীপ্ত পরিসর নির্মাণ করেছিল, অ্যাডোর্নো সেই বিশেষ রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক ঐতিহ্যের আবহে নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন।

একটু আগে ইতিহাসের যে-অন্তঃস্বরের কথা লিখেছি, সেই নিরিখে মনে রাখতে হয়, সে-সময় জার্মানি, ইতালি, ফ্রান্স, হল্যান্ড প্রভৃতি দেশের মার্ক্সবাদীরা প্রায়োগিক পার্টি-রাজনীতির লেনিনীয় আকল্প সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের কাছে

ভাবাদর্শগত ও দার্শনিক সংগ্রামের তাৎপর্য ভিন্নভাবে প্রতিভাত হচ্ছিল। মতান্ধতার বিরোধিতা করতে গিয়ে তাঁরা মার্ক্সবাদের ইতিহাসে তত্ত্ব ও প্রয়োগের পরিবর্তনশীল সম্পর্ক নিয়েও গভীরভাবে ভাবতে শুরু করেছিলেন। কারো কারো মনে হয়েছিল, সর্বহারার বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে; ক্রমশ পার্টি-সংগঠনে স্ট্যালিনীয় ঝোঁকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দানা বেঁধে উঠেছিল। পাশাপাশি ফ্যাসিবাদের উত্থান সাধারণভাবে চিন্তাবিশ্ব এবং বিশেষভাবে বিপ্লবী ভাবাদর্শের জগৎকে সংক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। মত ও পথ নিয়ে ক্রমবর্ধমান বিতর্ক আন্তর্জাতিক মার্ক্সবাদী পরিধিতে বিকেন্দ্রায়নের প্রবণতাকে শক্তিশালী করে তুলেছে। অ্যাডোর্নোর চিন্তা-প্রস্থানে ইতিহাসের ঘূর্ণাবর্ত যে গভীর প্রভাব রেখে গেছে, তাতে সংশয় নেই কোনও। মার্ক্সবাদের ধ্রুপদী ঐতিহ্যে তত্ত্বগত ঘাটতি রয়েছে কিনা, অ্যাডোর্নোকে সে-বিষয়েও অভিনিবেশ দিতে হয়েছিল। নিজস্ব অভিজ্ঞতা, দেশান্তরী হওয়ার বহুমাত্রিক অভিঘাত, ফ্রাঙ্কফুর্ট চিন্তা-প্রস্থানের সহযাত্রীদের বহুমুখী ভাবনার প্রতিক্রিয়া এবং সমসাময়িক অস্তিত্ববাদী মার্ক্সীয় চিন্তাবিদদের প্রবল বৌদ্ধিক উপস্থিতি : এই সব কিছুর সামূহিক প্রভাব আত্তীকরণ করে অ্যাডোর্নো তাঁর বহুস্বরিক ও বহুমাত্রিক নন্দনচিন্তার স্থাপত্য নির্মাণ করেছিলেন।

চার

বিভিন্ন তাত্ত্বিক পরিভাষা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে যত দ্বিধা বা সংশয় থাকুক না কেন, অ্যাডোর্নোর ভাববিশ্বকে বিশ শতকে নানা ধারায় বিকশিত মার্ক্সবাদের ব্যাপক ইতিহাসের পরিসরেই স্থাপন করতে হয়। সেইসঙ্গে পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে যে বিপুল ও গুণগত পরিবর্তন দেখা গেছে এবং ইতিহাসের বয়ানে যাবতীয় রৈখিকতা ধ্বস্ত করে ও অজস্র অন্ধবিন্দুর সঙ্গে সমঝোতা করে তা শতাব্দির শেষে সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক প্রশ্নগুলি পুনঃপরীক্ষা করছে, তাতে তাত্ত্বিক প্রতিবেদন রচনার পদ্ধতিও বিনির্মিত হতে বাধ্য। এই পরিস্থিতিতে অ্যাডোর্নোর নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক পর্যালোচনাও কোনো সরলীকৃত পথ ধরে চলতে পারেনি। প্রযুক্তির অভাবনীয় উৎকর্ষের সূত্রে উন্নততর পুঁজিবাদ যেভাবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ধ্বস্ত হওয়ার পরবর্তী পর্যায়ে উদ্ধত ও আগ্রাসী চরিত্র অর্জন করেছে, আধুনিকোত্তর শিল্পসাহিত্যসমাজ-ভাবনা তারই তালে-লয়ে গাঁথা হতে বাধ্য। এর অকল্পনীয় রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনুধাবনের ক্ষেত্রে অ্যাডোর্নোর নান্দনিক দর্শন আমাদের কতখানি সাহায্য করতে পারে, এই প্রশ্ন এসেই যায়।

ইতিমধ্যে আকরণোত্তরবাদ ও উপনিবেশোত্তর-চেতনাবাদের বহুস্বরিক অভিঘাতও চিন্তাবিশ্বে বহুমুখী তরঙ্গ-বিক্ষোভ তৈরি করেছে। নিঃসন্দেহে পরিগ্রহণের প্রেক্ষিত অত্যন্ত জটিল এবং ফ্রাঙ্কফুর্ট চিন্তা-প্রস্থানের বিশ্লেষণী সমালোচনাত্মক তত্ত্বের আকল্পগুলিও নিবিড়তর অধ্যয়ন দাবি করে। অ্যাডোর্নোর বিকল্প সন্ধান আলোচনা করতে গিয়ে বেশ কিছু মৌলিক জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হই। প্রথমত সমসাময়িক জটিল সমাজ ও সংস্কৃতির গ্রন্থনাকে নির্দিষ্ট সামগ্রিক একক হিসেবে গ্রহণ করতে পারি কি? দ্বিতীয়ত তত্ত্ব ও প্রয়োগের ঐক্য কি পূর্ব-নির্ধারিত অথবা তাদের অনন্বয় সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করা চলে

কি? তৃতীয়ত যুক্তিবাদী মনোভঙ্গির সামগ্রিক ও ঐতিহাসিক ভূমিকা কি অবশ্যমান্য? এইসব জিজ্ঞাসা থেকে দেখা দেয় শিল্পীর স্বাধীনতা, শিল্পের রাজনীতি ও রাজনৈতিক শিল্পের প্রসঙ্গ, নান্দনিক আধুনিকতাবাদ, শৈল্পিক সত্য ও ভাবাদর্শের নিগূঢ় সম্পর্ক ইত্যাদির পুনর্বিবেচনা।

অ্যাডোর্নোর নন্দনতত্ত্বে সার্বভৌম শিল্পের সামাজিক তাৎপর্য বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। পরম্পরাগত মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সমাজে শিল্পকলার স্থান যেভাবে নির্ণীত হয়েছে, অ্যাডোর্নো তা থেকে অনেকখানি দূরে সরে গেছেন। সংস্কৃতি-রাজনীতি-অর্থনীতির সংশ্লেষণ সম্পর্কে তাঁর ভাবনা অনেকখানি ফ্রাঙ্কফুর্ট চিন্তা-প্রস্থানের বিশ্লেষণী সমালোচনাত্মক ধারাই অনুসরণ করেছে। মার্ক্সীয় চিন্তাপ্রকল্পের মূল কথা হলো রাজনৈতিক প্রয়োগের সঙ্গে তত্ত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাই দার্শনিক ও কর্মীর কেন্দ্রীয় দায়িত্ব। কিন্তু ফ্রাঙ্কফুর্ট চিন্তাপ্রস্থান এই দায়িত্ব-বোধের বৈধতা স্বীকার করে না, শ্রেণি-সংগ্রাম ও সর্বহারার বিপ্লবের তত্ত্ব তাতে গুরুত্ব পায় না। রাজনৈতিক সংগঠন ও কার্যপ্রণালী কিম্বা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের অস্ত্র হিসেবে কোনো চিন্তাপ্রস্থানের ব্যবহার-উপযোগিতা নিয়ে মাথা-ব্যথা নেই তার। কোনো কোনো মার্ক্সবাদী চিন্তাবিদের মতে অ্যাডোর্নোর নন্দনতত্ত্বও ঐ মনোভঙ্গি অনুসরণ করেছে। তাঁর বয়ানে রয়েছে ভাবাদর্শগত অবক্ষয়ের নিদর্শন। এটা বিস্ময়কর যে রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিপরীত মেরুর আলোচকেরাও মনে করেন, অ্যাডোর্নোর তত্ত্ব অযৌক্তিক ও দায়িত্বজ্ঞানহীন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে প্রশ্রয় দিয়েছে। ষাট ও সত্তর দশকের ছাত্র-বিক্ষোভ ও নাগরিক সন্ত্রাসবাদের মধ্যে এর বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়া ফুটে উঠেছে। কারও মতে 'Adorno pursued a sterile, unrealistic theory'; কেউবা অ্যাডোর্নোর চিন্তায় ফ্যাসিবাদী লক্ষণ খুঁজে পেয়েছেন। তত্ত্ব ও প্রয়োগের ঐক্য স্থাপনে তিনি ব্যর্থ কেননা প্রয়োগ সম্পর্কে তাঁর আতঙ্ক আক্ষরিক অর্থেই 'neurotic' (১৯৭১:১৫৫)। জর্জ ফ্রিডম্যান তো অভিযোগ করেছেন: 'Adorno flirts with a fascist aestheticizing of politics' অর্থাৎ অ্যাডোর্নোর প্রতিবেদন নিবিড় পাঠ করার ক্ষেত্রে আমাদের বড়ো প্রতিবন্ধক মতান্ধতা ও প্রতিভাবাদর্শ—এই দুটোই।

অ্যাডোর্নো যখন শৈল্পিক সত্যকে তাঁর জিজ্ঞাসার অন্যতম প্রধান অন্বিষ্ট করে তোলেন, পশ্চিমি মার্ক্সবাদের নন্দনতাত্ত্বিক পরিসরের নির্যাস তাতে পরিগৃহীত হয়। এ প্রসঙ্গে অ্যাডোর্নো-বেঞ্জামিন বিতর্ক বিশেষ অভিনিবেশ দাবি করে। খুব বেশি গভীরে না-গিয়েও এইটুকু বলা যায়, গণমাধ্যমের প্রভাব, শিল্পের সামাজিক তাৎপর্য এবং সেই তাৎপর্যের আর্থ-রাজনৈতিক ভিত্তি নিয়ে দু'জনের বক্তব্যে লক্ষণীয় পার্থক্য ছিল। কেউ কেউ মনে করেছেন অ্যাডোর্নোর নন্দনতত্ত্বের তুলনায় অধিকতর মার্ক্সীয় বিকল্প পাওয়া যায় বেঞ্জামিনের বক্তব্যে। অন্যদিকে ১৯৭২-এ হাবেরমাস ঘোষণা করেছিলেন, নিঃসন্দেহে অ্যাডোর্নো মার্ক্সবাদী হিসেবে বেশি গ্রাহ্য। আত্মদীপ্ত সার্বভৌম শিল্পকর্ম ও সংস্কৃতির বাণিজ্য কীভাবে সম্পর্কিত—এই পর্যালোচনা মার্ক্সীয় নন্দনতত্ত্বের ধারায় এর আগে আর দেখা যায়নি। বেঞ্জামিন ও অ্যাডোর্নো এই বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করতেন, তবে

পরম্পরাগত শিল্পবোধের ক্রমিক ক্ষয় সম্পর্কে তাঁদের ধারণায় কিছুটা সাদৃশ্য ছিল। বেঞ্জামিন যেখানে গণমাধ্যমের অভিঘাতে ক্ষয়ের কারণ খুঁজে পেয়েছিলেন, অ্যাডোর্নো আধুনিক শিল্পকলার প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের মধ্যে অবক্ষয়ের কারণ দেখতে পেয়েছেন। তাঁর মতে বেঞ্জামিন স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত শিল্পকলার প্রগতিশীল স্বভাব এবং গণমাধ্যম পরিবেশিত শিল্পের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র উপেক্ষা করেছেন। সমগ্র সমাজ- পদ্ধতির অঙ্গ হিসেবে এদের অবস্থান এবং অন্তবর্তী দ্বান্দ্বিকতা লক্ষ করে বেঞ্জামিনের কাছে ১৮ ই মার্চ, ১৯৩৬ তারিখে লেখা চিঠিতে তিনি মন্তব্য করেছেন : 'Both bear the stigmata of capitalism, both contain elements of change...Both are torn halves of an integral freedom, to which however they do not add up.'

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, 'Aesthetic Theory' বইটির সূচনায় ও সমাপ্তিতে শৈল্পিক সার্বভৌমত্বের প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে। সুতরাং তাঁর নান্দনিক দর্শনে এই জিজ্ঞাসার বিশেষ গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। তিনি লিখেছেন : 'Absolute freedom in art...contradicts the abiding unfreedom of the social whole. That is why the place and function of art in society have become uncertain'। শিল্পের নিজস্ব পরিসরে স্বাধীনতা অন্তহীন যদিও, সামাজিক প্রেক্ষিতে নানা ধরনের দৃশ্য ও অদৃশ্য শৃঙ্খল তাকে আপেক্ষিক বিচারে অনিশ্চিত করে তোলে। শৈল্পিক স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব কিছু কিছু সামাজিক প্রাক্‌শর্তের ওপর নির্ভরশীল। মানবতাবোধের নির্যাস যে-সমাজে মহিমান্বিত, সেই সমাজের শৈল্পিক স্বাধীনতা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ব্যক্ত হয়। তাই সমাজ যত বিমানবায়িত হতে থাকে, সার্বভৌমত্বের বোধ তত ধ্বস্ত হয়। এই বোধের উপস্থিতি শিল্পের ভাবাদর্শগত ভিত্তিকে দৃঢ়তর করে: এর ভেতরকার সত্য-বিষয়বস্তু-শিল্পকে মানব-মুক্তির সঞ্চালক করে তোলে। উন্নততর পুঁজিবাদী সমাজে শৈল্পিক স্বাধীনতার প্রাক্‌শর্তগুলি কতটা রক্ষিত হতে পারে! অবাঞ্ছিত বাস্তবকে প্রত্যাখ্যান করে শিল্পকর্ম কীভাবে অন্য-এক কাঙ্ক্ষিত বাস্তবের প্রকরণ নির্মাণ করে: অ্যাডোর্নো সেসব বুঝতে সাহায্য করেন আমাদের। শিল্পিত সত্য খোঁজার জন্যে আধুনিক শিল্পকলার ওপর নির্ভর করেছিলেন তিনি। তবে এইজন্যে তিনি আধুনিকতার পক্ষ সমর্থন করেননি; বরং আগাগোড়া এর সম্পর্কে বিশ্লেষণী সমালোচনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

আধুনিক শিল্পকলার ভাবাদর্শগত অবস্থানের দিকে লক্ষ রেখে তিনি এই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন : 'It becomes impossible to criticize the culture industry without criticizing art at the same time' (প্রাগুক্ত : ৩৪)। সেইসঙ্গে তিনি এও ভোলেননি যে আধুনিক শিল্পকলার সব কিছুই মান্যতা পেতে পারে না; এর মধ্যে রয়েছে কৃত্রিম ও অকৃত্রিমের বিভাজন। তিনি যখন শিল্পকলার সত্যবস্তুকে 'অবচেতন ইতিহাস-রচনাতত্ত্ব' 'unconscious historiography' (প্রাগুক্ত:২৮৬) বলেন, তাঁর নিজস্ব শিল্পতত্ত্বে ইতিহাসের নির্যাসকেই প্রতিষ্ঠিত করেন। অর্থাৎ শিল্পিত সত্যে খুঁজে পান ইতিহাসের দর্শন ও নন্দনের সারাৎসার। ইতিহাসের নির্যাস নিঙড়ে

নিয়েই শিল্পকলায় সমাজ-নির্ধারিত বৈধ সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। যন্ত্রপ্রযুক্তির ক্রমোৎকর্ষ ও চেতনার দ্রুত বর্ধমান পণ্যায়ন সত্ত্বেও উন্নততর পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্বৃত দ্বন্দ্ব ও অন্ধবিন্দুগুলি শনাক্ত করার জোর শিল্পকর্ম নিজের সত্যস্বভাব থেকেই আহরণ করে। ইতিহাস-নিরপেক্ষ উদ্বেগ ও অবসাদ নেই কোনো, যদি সার্বিক অসাড়তা ও অর্থহীনতার বোধ শিল্পকর্মকে আক্রমণ করে—ইতিহাস ও দর্শনের যুগলবন্দিতে আধারিত ভাষ্যের বয়ান দিয়ে শিল্পিত সত্যের প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয় করতে চান অ্যাডোর্নো। এইজন্যে শৈল্পিক স্বাধীনতা-রাজনৈতিক শিল্পকলা-নান্দনিক আধুনিকতার ভাবনা তাঁর সত্য-সম্পর্কিত ধারণায় সংশ্লেষিত হয়েছে। আর, এই সংশ্লেষিত ধারণা-সমবায়ের অভিব্যক্তি হলো তাঁর নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কিত প্রতিবেদন। একে নন্দনের দর্শন বলবেন নাকি দর্শনের নন্দন : এই নিয়ে বিশেষজ্ঞরা কিছু সমস্যায় পড়েছেন। এতে আমাদের মনে পড়ে যায় ভারতীয় দর্শনের সেই বিখ্যাত পরিহাস-বিজল্পিত তর্ক: পাত্রাধার তৈল নাকি তৈলাধার পাত্র!

অ্যাডোর্নোর বয়ান সম্পর্কে সাধারণভাবে এবং নন্দনচিন্তা সম্পর্কে বিশেষভাবে যে-সমস্যার কথা বলা হয়ে থাকে, তা হলো, তাঁর রচনা সহজে বোধগম্য নয়। তিনি নিজেই জানিয়েছিলেন : 'My theorem that there is no philosophical 'first thing' is coming back to haunt me...I cannot now proceed to construct a universe of reasoning in the usual orderly fashion. Instead I have to put together a whole from a series of partial complexes which are concentrically arranged and have the same weight and relevance. It is the constellation... of these partial complexes which has to make sense.' (প্রাগুক্ত: ৪৪১)।

এই যে পূর্বনির্ধারিত ও সুশৃঙ্খল যুক্তিক্রম থেকে বাইরে গিয়ে সর্বতোভাবে মুক্ত বয়ানের সন্ধান, এর গভীরতর তাৎপর্য বুঝে নিতে হবে আগে। দার্শনিক রচনার পরম্পরাগত প্রণালী প্রত্যাখ্যান করে অ্যাডোর্নো এমন নান্দনিক বোধ-সম্পন্ন পাঠকৃতি নির্মাণ করতে চেয়েছেন যা মহাকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের মতো নিরন্তর অনন্ত কালে ও পরিসরে অপস্রিয়মান।

ভাবনার কোনো আদিপাঠ নেই, উৎস-মুহূর্ত নেই, কোনো প্রত্ন-প্রেরণা নেই: এই বিন্দু থেকে শুরু হয় তাঁর দার্শনিক জিজ্ঞাসা এবং নান্দনিক প্রশ্নও। 'Negative Dialectics' বইতে তাই প্রবাদপ্রতিম মন্তব্য করেছিলেন তিনি : 'True philosophy resists paraphrasing !' তার মানে তাহলে কি এই : অ্যাডোর্নোর রচনা থেকে সহজ ও সাবলীল কোনো অর্থ পাওয়া যাবে না কখনো এবং সহজবোধ্য বয়ান নেই তাঁর ভাববিশ্বে! তাহলে প্রত্যক্ষ সংযোগের প্রতীতি কিংবা আকাঙ্ক্ষা কি অবান্তর? যদি তা-ই হয়, শিল্পকলা কীভাবে জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তুলবে? সংযোগহীন শিল্প আর সোনার পাথরবাটি তো একই কথা। অ্যাডোর্নো তবে কি আমাদের কূটাভাসের কৃষ্ণবিবরে নিক্ষিপ্ত করতে চান? অজস্র খন্ড-ভাবনার অণুকেন্দ্রগুলির

সমবায়ী উপস্থিতি দিয়ে যদি দর্শন ও নন্দনের পাঠকৃতি গড়ে ওঠে, জুইডেরভার্টের মতো কোন বিশ্বাসে বলব: 'The resulting text is neither a systematic treatise nor a collection of essays yet it is neither haphazard nor disjointed' (১৯৯৪:৪৬)। বয়ান এলোমেলোও নয়, শিথিলভাবে গ্রথিতও নয় কিংবা প্রণালীবদ্ধও নয়, অসংবদ্ধ রচনা-সংগ্রহও নয়: কেননা তা আকরণোত্তর মুক্ত পাঠকৃতি।

পাঁচ

হ্যাঁ, এই যে উন্মুক্ততার দ্যোতনা—তা বিশ্বাসেরই কথকতা, তবে তা কোনো সহজিয়া বিশ্বাস নয়। কেননা, এই অর্জনীয় বিশ্বাসের রয়েছে অজস্র অন্তর্বয়ন। অ্যাডোর্নোর নন্দনতত্ত্ব তাই ঐ অন্তর্বয়নময় মুক্ত পাঠকৃতির নতুন ধরনের পাঠ দাবি করে। যিনি দার্শনিককে সিসিফাসের অধ্যবসায়ের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন (Negative Dialectics, ১১৪), নন্দনবোধের তাৎপর্য বোঝার জন্যে তিনি যে নিরবচ্ছিন্ন চড়াই-উৎরাইয়ের সংকেত দেবেন—তা প্রত্যাশিত। একদিকে জ্ঞানের কল্পস্বর্গ, অন্যদিকে নান্দনিক বোধের আধার ও আধেয়ের মধ্যবর্তী অনন্বয় ও কূটাভাস : বস্তুত এদের ছায়ায় সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত। এও অনিবার্য যে কোনও-একটি নির্দিষ্ট আকল্প দিয়ে পরস্পর-বিরোধী অবস্থানের মধ্যে সর্বজনমান্য সামঞ্জস্য অর্জন অসম্ভব। অ্যাডোর্নোর নন্দন-চিন্তায় কোন্ বয়ানকে কেন্দ্রীয় গুরুত্ব-সম্পন্ন বলে মনে করব, এই নিয়েও ঐকমত্যে পৌঁছানো কঠিন।

বইয়ের খসড়া ভূমিকায় নন্দন-চিন্তা সম্পর্কিত প্রতিবেদনের সম্ভাব্য বিশ্লেষণ পদ্ধতির মান্যতা সম্পর্কে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য করেছেন অ্যাডোর্নো স্বয়ং : 'A methodology in the ordinary sense of the term...would fail to do justice to the relation between the aesthetic object and aesthetic thought. The only sound methodological imperative seems to be Goethe's: enter into works of art as you would into a chapel...method is legitimated in its actual use, which is why it cannot be presupposed.' (প্রাগুক্ত : ৫৩০) এই বক্তব্য অনুযায়ী সৃজনশীল শিল্পের প্রতিটি অনন্য পাঠকৃতি পূর্বনির্ধারিত বিশ্লেষণ-প্রণালীকে প্রত্যাখ্যান করে।

এইজন্যে প্রতিটি পাঠকৃতি মানে সিসিফাসের পুনর্নবীকৃত উদ্যম; বয়ানের ভেতরে প্রচ্ছন্ন থাকে তাৎপর্যের গভীরে পৌঁছানোর সোপানমালা। অধ্যবসায়ী শিল্পরসিক পাঠক/দর্শক ছাড়া অন্য কেউ তাদের আবিষ্কার করতে পারে না। অ্যাডোর্নোর ভাবনাবিশ্ব পর্যালোচনা করে মনে হয় শিল্পবোধ ও তাৎপর্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে তিনি কোনো ধরনের নির্দিষ্ট অভিমতেও পৌঁছাতে চাইছেন না। গ্রহীতা-পাঠক অবরোহী নন্দনতত্ত্ব ও আরোহী নন্দনতত্ত্বের আততি পরিশীলন করে নিজস্ব সিদ্ধান্ত নির্মাণ করুন: এই তাঁর অভিপ্রায়। একদিকে তথ্যের প্রতি একমাত্রিক আনুগত্য ও বর্গীকরণ প্রবণতা এবং অন্যদিকে শিল্পাতিরিক্ত নির্দেশনামার ওপর গুরুত্ব আরোপ: এই দুটিকে এড়িয়ে গিয়ে তিনি দ্বান্দ্বিক পথ ও পাথেয় নির্মাণ করতে চান।

অ্যাডোর্নোর অন্বিষ্ট দ্বান্দ্বিক নন্দনতত্ত্ব কেননা 'Deductive aesthetics places art in a theoretical straitjacket, and inductive aesthetics turns art into a meaningless abstraction' (জুইডেরভার্ট: প্রাগুক্ত: ৪৯)। তথ্য ও ধারণার মধ্যে নিয়ত উপস্থিত টানাপোড়েনের গুরুত্ব স্বীকার করেন তিনি; সর্বজনীনতা ও বৈশেষিকতার অবচেতন মিথষ্ক্রিয়া কীভাবে আধুনিক শিল্পকলাকে দ্বান্দ্বিকতার চারণভূমি করে তুলেছে, তা তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন।

সাম্প্রতিক তত্ত্বজিজ্ঞাসুরা শিল্প-স্রষ্টা ও শিল্পোপকরণের বিশেষ অবস্থানের প্রতি মনোযোগী হয়েও শিল্প-প্রক্রিয়ার মধ্যে সর্বজনীন প্রতীতির অভিব্যক্তি উপেক্ষা করতে পারেন না। যদিও বৈশেষিক পরিসরের সম্ভাব্য কল্পস্বর্গ-সন্ধান দার্শনিক নন্দনতত্ত্বের অন্যতম প্রধান উপজীব্য, সামাজিক ইতিহাস প্রসূত দ্বান্দ্বিকতার অভিঘাত দার্শনিক বয়ানে নতুন নতুন কৌনিকতা ও উচ্চাবচতা সঞ্চার করে। শেষ পর্যন্ত বাস্তবের আকরণ ও নির্যাসে দেখা দেয় বেশ কিছু অভাবনীয় কূটাভাস। আগেই লিখেছি, অ্যাডোর্নোর বয়ানের উন্মুক্ততা গ্রহীতার জন্যে একই সঙ্গে সম্ভাবনা ও প্রত্যাহ্বান নিয়ে আসে। কোনও নির্দিষ্ট বিশ্লেষণ-প্রণালী নয়, সমসাময়িকতার প্রয়োজন ও প্রতিশ্রুতিতে গ্রথিত অন্তর্মুখী সন্ধানের আধারে গড়ে ওঠে শিল্পিত সত্যের অবয়ব। একে যুগপৎ 'retrospective and prospective aesthetics' (১৯৯৪:৫৬) বলেছেন কেউ কেউ। একদিকে জটিল জীবন থেকে উদ্ভূত নৈর্ব্যক্তিক সমস্যা গ্রথিত প্রেক্ষিত, অন্যদিকে নতুন নতুন প্রত্যাশার দিগন্ত সন্ধান। এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য তৈরি করা খুব কঠিন, তবুও যা আছে ও যা হতে পারে: তারই দ্বন্দ্বময় আততিতে শিল্পকর্মের ও সেইসঙ্গে দার্শনিক নন্দনতত্ত্বের সত্য আধেয় নির্ণীত হয়ে থাকে। বস্তুত এভাবেই সত্যের উদ্ভাসন থেকে আলাদা হয়ে যায় অসত্যের প্রপঞ্চ; আর, সমাজ ও ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক অভিঘাত শিল্পবস্তুর কোষে কোষে সঞ্চারিত হয়ে যায়।

অ্যাডোর্নোর একটি অসাধারণ মন্তব্য চমৎকারভাবে তাঁর নন্দনতত্ত্বের দিশা নির্দেশ করে: 'Art is a syndrome in motion. Highly mediated in itself, art calls for intellectual mediation terminating in a concrete concept.' (প্রাগুক্ত:৫২৩)। সুতরাং শিল্প সময় ও পরিসরের মধ্যে নিয়ত সঞ্চরমান জীবনেরই প্রতীতি। শিল্পের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে তাই লক্ষ করতে হয়, একদা তা কী ছিল! সেইসঙ্গে বুঝে নিতে হয় শিল্প এখন কী হয়ে দাঁড়িয়েছে আর ভবিষ্যতে তার কী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং ধারণা হিসেবে শিল্পকৃতিও মুক্ত বয়ান। গ্রহীতা হিসেবে আমাদের শুধু মনে রাখতে হয়, সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতের বহুমাত্রিক আততিতে জায়মান শিল্পকর্ম যুগপৎ ঐচ্ছিক নির্মিতি এবং ভাবাদর্শগত অবস্থানের অভিব্যক্তি। অবশ্য এর মধ্যেও রয়েছে যথাপ্রাপ্ত ও কাঙ্ক্ষিত পরিসরের আততি। অবস্থান বদলে গেলে রূপান্তরিত হয় বাস্তব ও সেই বাস্তবের দ্বান্দ্বিক আবহ। কখনও কখনও এই পরিবর্তন আরোপিতও হতে পারে। বিশেষত সর্বাধুনিক প্রযুক্তির শক্তিতে দৃপ্ত উন্নততর পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এমন বিভ্রম আমরা ইদানীং উৎপাদিত হতে দেখেছি।

তার মানে বিপুল সত্যভ্রমের বিস্ফোরণ এবং পণ্যসর্বস্ব বিশ্বায়নের পর্যায়ে শিল্পিত সত্যের তাৎপর্য সম্পর্কে অভূতপূর্ব সংশয়ের চতুর উৎপাদন। আজ থেকে কয়েক দশক আগে নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে যে-প্রতিবেদন রচিত হয়েছে, আজকের আমূল পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তা কীভাবে কতটা প্রাসঙ্গিক হতে পারে—এই জিজ্ঞাসা অনিবার্য। তবে মুক্ত পাঠকৃতির মুখোমুখি হওয়ার জন্যে যথার্থ প্রস্তুতি যদি সম্পন্ন হয়ে থাকে, এই প্রত্যাহ্বান মোকাবিলা করা খুব শক্ত হবে না।

প্রযুক্তি-কেন্দ্রিক আধুনিকতার সঙ্গে শিল্পিত সত্যের মূর্ত হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে এক করে দেখা চলে না। আবার সমস্ত শিল্পকর্মে সত্যের উদ্ভাসন ঘটেও না। তা ঘটে সেই শিল্পে যেখানে 'the most advanced consciousness where sophisticated technical proceedures and equally sophisticated subjective experiences interpenetrate' (প্রাগুক্ত:৫৭)। এই সূত্রে অন্তর্বস্তু ও প্রকরণের সীমারেখা এবং তাদের দ্বান্দ্বিকতার তাৎপর্য বুঝে নিই যখন, প্রযুক্তি-পরিশীলন দায়বোধ-অভিব্যক্তি-অন্যোন্যাশ্রয়িতার গুরুত্বও নতুন ভাবে অনুভব করি। শিল্পকর্ম যখন বাস্তবের নির্মোক ভেদ করে নির্যাসে পৌঁছে যায়, অবভাস ও সত্যভ্রমের বিরোধিতা তা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই করে। আরও একটি কথা লক্ষ করা প্রয়োজন। অ্যাডোর্নো যখন সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন, তিনি ভোলেন না যে শিল্পকর্মকে আগে শৈল্পিক নিরিখে গ্রাহ্য হতে হয়। এইজন্যে নান্দনিক বিচারে যা অকৃত্রিম বলে মান্যতা অর্জন করেছে, তা কখনো ছদ্ম-রাজনৈতিক চেতনার বার্তাবহ হতে পারে না।

সাম্প্রতিক বিমানবায়িত পৃথিবীতে কীভাবে গ্রহণ করব অ্যাডোর্নোর নন্দনতত্ত্বকে, এই জিজ্ঞাসার সূত্রে মনে আসে কবি রণজিৎ দাশের অসামান্য উচ্চারণ : 'সত্য কী, আমরা জানি না। অথচ মিথ্যাকে জানি, নির্ভুল, নিজের ছায়ার মতো। এই সত্য-সন্দিগ্ধ চিরজীবনে মিথ্যাই শেষ পর্যন্ত আমাদের একমাত্র নিঃসংশয় উপলব্ধি, সেই অর্থে আমাদের একমাত্র বিশ্বস্ত সত্য। আমাদের আশ্রয়। ...খুব সম্ভবত, আমরা মাতৃগর্ভ থেকেই মিথ্যাকে জানি। জিনের গূঢ়তম সন্ধাভাষায় হয়তো ইঙ্গিতবদ্ধ আছে মিথ্যার সংজ্ঞা এবং ব্যবহারবিধি।' (ডায়েরি থেকে ২) সত্য মিথ্যা সম্পর্কে কবির এই বাচন কিন্তু শিল্প-মাধ্যমের বিশিষ্ট ভাষাতেই ব্যক্ত হয়েছে। কেননা অন্য কোনও ভাবে শিল্পিত সত্য ব্যক্ত হতে পারে না। অ্যাডোর্নো আমাদের জানিয়েছেন, শিল্প হলো সুখের তেমন প্রতিশ্রুতি যা নিরন্তর ভেঙে ফেলা হয় (প্রাগুক্ত : ২০৪)। প্রতিশ্রুতি বা আকাঙ্ক্ষার জন্মও হয় ইতিহাসের বাস্তবে। বাস্তব মানে যেহেতু ঘেরাটোপ, শিল্প তাকে কোনও অজুহাতে অস্বীকার করতে চায়। আসলে সীমাতিযায়িতার অভিব্যক্তি কখনও কখনও শিল্পগত বিভ্রম তৈরি করে; কিন্তু এই বিভ্রমের মধ্য দিয়েই হয়তো রচিত হয় সত্যে পৌঁছানোর পথ। নানা কারণে ধ্বস্ত জীবন যখন দহনবেলার আভাস নিয়ে আসে, সমাজকে আরোগ্য করার জন্যে শুশ্রূষার বিশল্যকরণী আসে সেই পথ ধরে। অ্যাডোর্নো তাই নান্দনিক দর্শনে সংশয় নয়, অন্তহীন পুনর্নির্মাণের প্রত্যয়ই ব্যক্ত করেছেন।

সার্ত্রের সাহিত্যচিন্তা

বহুস্রোতের উচ্ছ্বাস, আবর্তের জটিলতা ও কূটাভাসের তরঙ্গাভিঘাতের মধ্য দিয়ে পেরিয়ে গেল বিশ শতক। অজস্র ভাঙন ও আত্মবিনাশের অভিজ্ঞতায় দীর্ণ হয়েছে মানুষের পৃথিবী। অভূতপূর্ব বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে আমূল পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে ভূগোল ও ইতিহাস, দর্শন ও সমাজবিদ্যা। আর, শিল্প ও সাহিত্য। বিশ শতকে তীক্ষ্ণধী মনীষীর অভাব নেই কোনও। মানবিকীবিদ্যার প্রতিটি ক্ষেত্র তাদের অসামান্য ধীমত্তায়, সৃষ্টির ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হয়েছে। তবুও এদের মধ্যেও জাঁ পল সার্ত্র অদ্বিতীয়। তিনি সেই বিরল চিন্তাবিদ ও ভাষ্যকার লেখকদের অন্যতম যাঁরা তাঁদের যুগের প্রতিনিধি নন কেবল, সমকালীন পৃথিবীর পক্ষে অপরিহার্যও। বিশ শতকের আটের দশকের গোড়ায় যখন সার্ত্রের জীবনাবসান হয়েছিল, অনেকেই ভেবেছিলেন যে শতাব্দীর শেষ সূর্য অস্তমিত হয়েছে। বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে শুরু করে পরবর্তী তিন দশকে নানাভাবে বিপন্ন ও বিভ্রান্ত মানুষ যত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে, তাদের নির্যাসের প্রতি তর্জনি সংকেত করে ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাষ্য রচনা করে সার্ত্র বহতাকালের প্রতি তাঁর দায় পালন করে গেছেন। তাই সার্ত্রের সর্বাত্মক উপস্থিতি ছাড়া বিশ শতককে ভাবাই যায় না। তাঁর কায়িক অবসানের পরে বিশ শতকও আর আগের মতো রইল না।

অস্তিত্ববাদ ও মার্ক্সবাদের অন্যোন্য-উদ্‌ভাসন সার্ত্রের দার্শনিক ভাবনার মৌলিক অভিজ্ঞান। এদের আন্তঃসম্পর্কের সম্ভাবনা বা অসম্ভাব্যতা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। বাদ-বিসম্বাদের জটিল গ্রন্থনাও কীভাবে সাহিত্যিক প্রতিবেদনের নিষ্কর্ষে রূপান্তরিত হতে পারে, তা সার্ত্র মনন ও সৃষ্টির দ্বিরালাপের মধ্যে ব্যক্ত করে গেছেন। তবে সব কিছুর সঞ্চালক হলো বহুমাত্রিক বিশ্ববীক্ষা যাকে নানা ধরনের অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে যাচাই করে নিয়েছিলেন তিনি। তাই কোনো-একটি একক রচনায় তাঁর সাহিত্য সম্পর্কিত চিন্তা ও উপলব্ধির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় না; তাঁর ভাববিশ্বকে বুঝে নিতে হয় বিশ্ববীক্ষার সামগ্রিকতায়, বিভিন্ন উপকরণের আন্তঃসম্পর্কের ঋদ্ধিতে ও সংশ্লেষণে। এটা প্রত্যাশিত যে বিশ শতকের পুরোধা দার্শনিক উপন্যাস ও নাটকের মতো সাহিত্য-মাধ্যমেও গভীর দর্শন-চিন্তার দ্যুতি বিকিরণ করবেন : Nausea (১৯৩৮) Flies (১৯৪৩), No Exit (১৯৪৪), Age of Reason (১৯৪৫), Reprieve (১৯৪৫), Men without shadows (১৯৪৬), Dirty Hands (১৯৪৮), In camera (১৯৪৮), The Respectful Prostitute (১৯৪৭), The Devil and

the Good Lord (১৯৫১), Altana (১৯৬০), Words (১৯৬৩), Iron in the soul (১৯৫০) প্রভৃতি পাঠকৃতির নিরিখে সার্ত্রের নান্দনিক বোধ ও সাহিত্য-দর্শন প্রণিধানযোগ্য। যেহেতু প্রতিটি বয়ান অজস্র অন্তঃস্বর খচিত, নিবিড় পাঠের মধ্য দিয়েই কেবল এদের অনেকান্তিক তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব। পাশাপাশি যখন মনে রাখি, এই অসামান্য মনীষী লিখেছিলেন The Transcendence of the Ego (১৯৩৬:১৯৬২), Imagination : a Psychological Critique (১৯৩৬ : ১৯৬২) The Emotions : Outline of a Theory (১৯৩৯ : ১৯৪৮), The Psychology of the Imagination(১৯৪০ : ১৯৪৮), Being and Nothingness (১৯৪৩ : ১৯৫৬), Existentialism and Humanism (১৯৪৬ : ১৯৫৭), Notebooks for an Ethics (১৯৪৮ : ১৯৯২), What is literature (১৯৪৮ : ১৯৪৯), আর Truth and Existence (১৯৪৮ : ১৯৯২)-এর মতো বহু-আলোচিত বইগুলি তাঁর ভাবনা-স্থাপত্যের বিপুল ব্যাপ্তি ও অতলান্ত গভীরতা বিস্ময়ে আবিষ্ট করে।

স্বভাবত সার্ত্রের সাহিত্য-চিন্তা অনুসরণ করতে গিয়ে আমরা বারবার চিন্তা ও অনুভূতির বৈদগ্ধ্য ও সমাজ-সংবিদের অন্তহীন কক্ষ-কক্ষান্তর পরিক্রমার প্রস্তুতি নিই। বিশ শতকের উত্তরার্ধে আরেক যশস্বী লিখিয়ে আইরিশ মারডক যথার্থই সার্ত্রকে এই উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি করেন (১৯৯৮) : 'So Versatile so committed so serious industrious, courageous learned talented, clever (he) certainly lived his own time to the full, and whatever the fate of his general theories, must survive as one of its most persistent and interesting critics। হ্যাঁ, সার্ত্র বিশ শতকের জটিল ও কূটাভাস সম্পন্ন সময়কে তলানি পর্যন্ত পান করেছিলেন, আপন সময়ের বহুবিধ দ্বন্দ্ব-আলো আঁধারি-সমৃদ্ধি-শূন্যতাকে পুরোপুরি নিঙড়ে নিয়েছিলেন। তাই তাঁর নিজস্ব সাহিত্যকৃতি ও সাহিত্যচিন্তা সমকালীন প্রত্যাশা-অন্ধবিন্দু-উদ্ভাসন নিরালম্ব আপেক্ষিকতার চমৎকার দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য। দার্শনিক ভাববীজগুলিকে সৃজনী কল্পনায় আখ্যানে রূপান্তরিত করে তিনি সাহিত্যিকতার দিগন্তকে বহুদূর অবধি প্রসারিত করে দিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে নান্দনিক অস্তিত্বের নির্মাণ-প্রকল্প সম্পর্কে নতুন নতুন ইশারা সমকালীন ও উত্তরসূরি সাহিত্য-জিজ্ঞাসুদের জন্যে রেখে গিয়েছিলেন। Nausea উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রোকোয়েন্টিন যে নিবিড় আত্মকথনের অন্তর্নাট্যে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে, তাতে আত্ম-উন্মোচনের আখ্যান সাহিত্যিকতায় অভিনব মাত্রা এনে দিয়েছে। এই তীক্ষ্ণ দ্যুতিময় সংকেতগর্ভ উচ্চারণ বিশেষ ভাবেলক্ষণীয়, 'The body lives all by itself, once it has started. But when it comes to thought, it is I who continue it. I who unwind it. I exist . I think I exist oh, how long and serpentine this feeling of existing is and I unwind it, slowly...If only I could prevent myself from thinking' (পেঙ্গুইন সংস্করণ: ১৯৬৭ : ১৪৫)। অস্তিত্ববাদের প্রেক্ষিতে জীবন-ভাবনার সূত্রে এই যে পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষের বিন্যাস, তা একটু পরেই শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছায়।

এই বিন্যাসকে যখন নতুন ভাবে পড়ি আজ, যুগপৎ আখ্যান ও সাহিত্যবোধের অভিনব আকল্পের সম্ভাবনা ও নির্যাস সঞ্চারিত হয় মনে। রোকোয়েন্টিনের আত্মকথন হয়ে ওঠে বহুস্বরিক এবং বিশেষভাবে অভাবনীয় জিজ্ঞাসায়, কূটাভাসে মথিত বিশ শতকের আত্মভাষ্য: ('My thought is me; that is why I can't stop. I exist by what I think.... and I can't prevent myself from thinking. At this very moment—this is terrible—if I exist it is because I hate existing. It is I, it is I who pull myself from the nothingness to which I aspire; hatred and disgust for existence are just so many ways of making me exist, of thrusting me into existence') (তদেব)। বহুবিধ সাহচর্যের মধ্যেও যে-মানুষটি বারবার নিঃসঙ্গতার দহনে ক্লিষ্ট হয়, অস্তিত্ব-ভাবনাও তার বিশল্যকরণী হতে পারে না। কিন্তু সে-প্রসঙ্গ এখানে নয়। সার্ত্রের প্রকট কথকসত্তা 'Nausea'-র পরবর্তী বয়ানগুলিতেও স্পষ্টভাবে উপস্থিত। সমকালের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জটিলতার ঊর্ণাতন্তু দিয়ে দর্শন-ভাবনা ও সাহিত্যবোধের যে-যুগলবন্দি রচনা করে গেছেন সার্ত্র, তার নিরিখেই সাহিত্য কী, কেন, কাদের জন্যে ও সাহিত্য-পরিস্থিতি সম্পর্কিত তাঁর প্রতিবেদনগুলির নিবিড় পাঠ প্রয়োজন।

দুই

'সাহিত্য কী' (What is literature) ফরাসি পাঠকদের কাছে ১৯৪৮ সালে এবং ইংরেজি সংস্করণের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের কাছে ১৯৫০-এ পৌঁছে গিয়েছিল। সুতরাং ইতিমধ্যে ছয় দশক অতিক্রান্ত। সার্ত্রের জন্মশতবার্ষিকী পুনঃপাঠে অন্তত এইটুকু প্রমাণিত হয়েছে যে, বিমানবায়নের স্তর থেকে নির্মাণবায়নের স্তরে পৌঁছে যাওয়ার পরেও ভঙ্গুর মানববিশ্বে এই প্রতিবেদনের প্রাসঙ্গিকতা অটুট রয়ে গেছে। যন্ত্র-সর্বস্বতার ক্রমবর্ধমান প্রসার এবং অন্তর্জাল-কুহকে নিমজ্জিত প্রতীত বাস্তবের সর্বগ্রাসী উপস্থিতি সত্ত্বেও লিখন-বিশ্ব সমূলে উৎপাটিত হয়নি। উদ্দেশ্য-বিধেয়, সত্য-মিথ্যা অজস্র গোলকধাঁধার মায়ায় আক্রান্ত হলেও বিশ্বজোড়া প্রতাপের ঔদ্ধত্যে এরা উৎখাত হয়ে যায়নি। সার্ত্রের মৃত্যুর পরে (১৯৮০) গত পঁয়ত্রিশ বছরে মানুষ আত্মধ্বংসের নানা প্রকরণ ও রঙবেরঙের আত্মপ্রতারক ফানুস তৈরি করলেও সাহিত্য-স্রষ্টা এবং সাহিত্য-বোদ্ধাদের নতুন নতুন তৎপরতারও অভাব নেই। তাই নতুন ধরনে সার্ত্রের সাহিত্য-চিন্তার প্রতি অভিনিবেশ দেওয়া যেতে পারে। দার্শনিক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সাহিত্য-সমালোচক, সাংবাদিক একই অঙ্গে এত রূপ যাঁর—প্রতিটি বয়ানে তিনি বহুস্বরিকতা ও বহুমাত্রিকতার প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য সংশ্লেষণ ঘটাবেন, এটাই প্রত্যাশিত। তাই তাঁর সাহিত্য-চিন্তাও নিছক একান্তিক নয়, একথা মনে রাখা প্রয়োজন। আন্তঃসম্পর্কে ঋদ্ধ ও সমগ্রতায় বিন্যস্ত বিশ্ববীক্ষাই ক্রমাগত নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন সার্ত্র: সংকেত হিসেবে আজকের স্ববিরোধিতা-দীর্ণ পৃথিবীতে এর গুরুত্ব অনেকখানি। কেননা সীমাহীন শক্তি-দম্ভ, অতিউগ্র ভোগবাদ, নির্লজ্জ পাশবিকতা মানুষের যাবতীয়

উপার্জনকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে। সব কিছুই যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ, সমগ্রতাকে অলীক বিভ্রম ছাড়া কী বা মনে হতে পারে!

উল্টোভাবে বলা যায়, সার্ত্রের সমগ্রতা সন্ধান আজকের নির্মাণবায়িত জগতে বিবেচিত হতে পারে যাবতীয় নীচতা-কুশ্রীতা-বীভৎসতার প্রতিষেধক হিসেবে। কোনো একটি একক রচনার বদলে আমরা মনোযোগী হতে পারি সম্পূর্ণ সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে। কেননা কোনো যুগের অজস্র স্পষ্ট ও অস্পষ্ট প্রবণতা নানা ধরনের আকল্প ও অভিব্যক্তির মধ্যে প্রতিফলিত হয়। কোনো একটি বিশিষ্ট রচনা যদিও বিচিত্র স্বর ও অন্তঃস্বরের সমারোহে যুগের প্রতিনিধি-স্থানীয় হয়ে ওঠে, একথা কখনও বলা যায় না যে এই পাঠকৃতিতেই কালের সমস্ত সম্ভাবনা নিঃশেষিত হয়ে গেছে। সার্ত্রকে যে বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ও লিখিয়ে মনে করেন কেউ কেউ, এর কারণ, শতাব্দীর নিরন্তর বিবর্তন এবং সেই বিবর্তনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভঙ্গ ও বহুমুখী প্রতিক্রিয়া আর কারও প্রতিবেদনে তাঁর বিপুল রচনা-সম্ভারের মতো প্রতিফলিত হয়নি। যদি সার্ত্র সমকালীন ঘটনাপ্রবাহের মনোযোগী নথিরক্ষক ও ভাষ্যকার না হতেন, তাহলে কি আমরা নিজেদের অন্ধবিন্দু ও উদ্‌ভাসনের বিচিত্র দ্বিরালাপকে ঠিকমতো বুঝতে পারতাম? বস্তুত তিনি কালের রাখাল, তাই তাঁকে যুগের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলেই গ্রহণ করতে হয়।

'সাহিত্য কী' নামক বিখ্যাত বইতে যে চারটে অধ্যায় রয়েছে, তাদের মধ্যে সময় ও পরিসরের মন্থন-জাত উপলব্ধিই ব্যক্ত হয়েছে। 'লেখা কী', 'কেন লিখি', 'কার জন্যে লিখি' 'লেখকের পরিস্থিতি' শীর্ষক বয়ান গুলিতে মূলত একজন দার্শনিক ও সমাজ-জিজ্ঞাসুর বহুমাত্রিক সাহিত্য-চিন্তাই প্রকাশ পেয়েছে।

যথাপ্রাপ্ত জীবনের নিরন্তর পুনর্গঠনকে যখন সাহিত্যের পদবি দিই, তাতে সামগ্রিক বিশ্ববীক্ষার সর্বাত্মক গুরুত্ব ও ভূমিকা সবচেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে। সার্ত্রের সাহিত্য চিন্তায়ও এই বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তিন বছর পরে একটি ক্লান্ত ধ্বস্ত পৃথিবীর নতুন দিশা সন্ধানকে প্রখর সংবেদনায় ও অনুভবে ধারণ করেছিলেন সার্ত্র। যেহেতু তিনি সমকালকেই চিহ্নিত করতে চাইছিলেন এবং আসন্ন ভবিষ্যতের জন্যে পূর্বাভাস রচনার কোনও আগ্রহ তাঁর ছিল না, প্রায় সাত দশক দূরে দাঁড়িয়ে আমরা তাঁর প্রতিবেদনকে কোন চোখে দেখব? যেহেতু পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদের অভিঘাতে লেখককে কোনও বয়ানের আদি প্রস্তাবক বলে ভাবা হয়, সার্ত্রের বর্তমান-কেন্দ্রিকতা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ঔদাসীন্যকে আক্ষরিক অর্থে ধরব না। তাঁর বক্তব্যের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা না করে বহিরঙ্গ ও অন্তর্বৃত স্তরের যুগপৎ আততি ও দ্বিবাচনিক গ্রন্থনা সম্পর্কে মনোযোগী হতে পারি বরং। সার্ত্র সমকালীন অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি সম্পর্কে বিশ্বস্ত ছিলেন নিশ্চয়; তবু আমাদের মতো উত্তরপ্র ন্ন পাঠকেরাও তাঁর ভাবনাস্থাপত্যে খুঁজে পাই এমন অনেক উপাদান যা কখনও জীর্ণ হয় না, অপ্রাসঙ্গিকও হয় না।

সাহিত্য যে সার্ত্রের কাছে মূলত আস্তিত্বিক প্রকল্প ছিল, তা 'Nausea', 'Age of Reason', 'Reprieve', 'Iron in the Soul', 'Man without Shadows' ইত্যাদি

প্রতিবেদনে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যেন। অস্তিত্ব-স্বাধীনতা-দায়বদ্ধতা সাহিত্য নামক প্রকল্পের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে সম্পৃক্ত। সার্ত্রের কাছে মানব-অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা সমার্থক। জীবনের বিশিষ্ট যাপনে ও চেতনার ঊর্দ্ধায়নে এর অভিব্যক্তি নবায়মান আঙ্গিকে ও বিষয়বস্তুতে সাহিত্যিক সংরূপ অর্জন করে। এ আসলে সম্ভাবনার ও হয়ে ওঠার অন্তহীন প্রক্রিয়া। যেহেতু সংলগ্ন অপর সত্তাদের স্বাধীনতা ছাড়া কোনও একক সত্তার স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হয় না, এই প্রক্রিয়ার সামাজিক নিষ্কর্ষ অনস্বীকার্য। এই সূত্রে আসে সেই বিখ্যাত মন্তব্য যে মানুষের মুক্ত পরিসর খর্ব করে ও পীড়নকে মান্যতা দিয়ে কোনও মহৎ সাহিত্য পৃথিবীতে কখনও সৃষ্টি হতে পারে না, হয়ওনি কখনও। সমস্ত ধরনের বিচ্ছিন্নতা ও দহন, জাগতিক ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার দম্ভ, মতান্ধতা ও কুসংস্কার, অবসাদ ও মিথ্যা আবেগ থেকে মানুষের মুক্তির পথই সন্ধান করেন প্রকৃত সাহিত্যিকেরা।

তিন

সার্ত্র বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন এই মৌলিক প্রত্যয়ে যে কোনও প্রকৃত লেখকই ইতিহাসকে পেরিয়ে যেতে পারেন না। যথাপ্রাপ্ত বাস্তব সম্পর্কে তাঁর যত প্রত্যাখ্যান বা বিদ্রোহের মনোভঙ্গি থাকুক না কেন, সমকালের নিভৃত চাহিদাই তাঁকে সৃষ্টি করেছে। তাই আপন সময় ও পরিসরের প্রতি নিরপেক্ষ থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব এবং এইজন্যেই তিনি অবধারিতভাবে দায়বদ্ধ। অবান্তর বিশ্বাস ও মূল্যবোধ গুলিকে যাচাই করতে গিয়ে লেখক হয়তো বহু প্রথাগত ভাবনাকে ধ্বস্ত করেন ; কিন্তু একই সঙ্গে মানুষের পক্ষে উপযোগী নতুন পরিস্থিতির সূত্রায়ন করতে গিয়ে মানবমুক্তি ও সত্তার স্বাধীনতা সম্পর্কে কথকতার নতুন বিন্যাসও উপস্থাপিত করেন। লেখক নিজেকেই মুক্ত করেন না কেবল, তাঁর সম্ভাব্য পাঠকদের জন্যেও মুক্ত পরিসরের ইশারা জাগিয়ে দেন। এই প্রক্রিয়া দ্বিবাচনিক বলেই অন্যোন্য-উদ্ভাসনের আধার। সার্ত্রের ভাবনাকে বিশদ করতে গিয়ে ডেভিড কাউট মন্তব্য করেছেন : 'literature should not be a sedative but an irritant, a catalyst provoking men to change the world in which they live and in so doing to change thermselves' (১৯৮১ : ১০)। সার্ত্রের সাহিত্য চিন্তায় বিভিন্ন চিন্তাবীজের সমাবেশ ঘটেছে। এই সমাবেশের তাৎপর্য ধারাবাহিক ভাবে অনুধাবন না করলে তাঁর ভাবনার অনন্যতা স্পষ্ট থাকে না। লেখা তাঁর কাছে মূলত বিশিষ্ট একটি প্রকল্প। আপন সময় ও পরিসর সম্পর্কে সদা জাগ্রত মানুষই কেবল প্রকৃত লেখক হয়ে উঠতে পারেন। লেখক নিজে এবং লেখক হওয়ার প্রকল্প সর্বদা নির্মীয়মান; জীবন ও জগতে সমস্ত উপকরণই যেহেতু যুগপৎ স্থির ও অস্থির, পূর্ণ ও অপূর্ণ এইজন্যে সংযোগের যোগ্যতম প্রকরণকে সর্বদা সন্ধান করে যেতে হয়।

মুক্তির আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টিশীল লেখকের পক্ষে অনিবার্য, তবু আকাঙ্ক্ষার বিশিষ্ট নান্দনিক প্রকরণকেও নির্দিষ্ট সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রয়োজন অনুযায়ী গড়ে তুলতে

হয়। এতে সচেতনভাবে সক্রিয় থাকে লেখকের নিজস্ব পছন্দ বা অভিপ্রায়। ব্যক্তি ও সমষ্টির ভিতর ও বাহিরকে যিনি যাবতীয় ধুপছায়া সহ প্রতিবেদনে রূপান্তরিত করতে পারেন, তিনিই লেখক। সার্ত্রের চিন্তাসূত্র অনুধাবন করে ডেভিড কাউট মন্তব্য করেছেন : 'The writer interiorises the historical totality, but in a manner dependent on temperamental qualities which require to be explained by personal and family relations. The finished literary work then exteriorises, though the mediation of ideas and ideology, the initial interiorisation' (১৯৮১ : পনেরো)। 'লেখা কী' এই বয়ানের শুরুতেই সার্ত্র স্পষ্ট করে দিয়েছেন, অন্যসব শিল্প-মাধ্যমের সঙ্গে সাযুজ্য থাকলেও সাহিত্য-মাধ্যমের নিজস্ব অভিজ্ঞান ও গৌরব রয়েছে। সামাজিক উপাদানগুলি সাহিত্যের নিজস্ব পদ্ধতিতে যখন শিল্পিত সংরূপ অর্জন করে, তার স্বাতন্ত্র্যও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। শুধুমাত্র আঙ্গিকেই পার্থক্য সূচিত করে না, বিষয়বস্তুও করে থাকে। ভাষার বিশিষ্ট ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আমরা নিশ্চয় জীবন সম্পর্কিত তাৎপর্যে পৌঁছাই; কিন্তু উপস্থাপিত বস্তু কেবল চিহ্নায়ক নয়, প্রাথমিক ভাবে বস্তু হিসেবে এরা আপন নিজস্ব অস্তিত্ব ঘোষণা করে। এ প্রসঙ্গে সার্ত্র ফুলের উপমা দিয়েছেন। গোলাপ সাহিত্যে নানাভাবে চিহ্নায়িত হয়েছে; কিন্তু সেইসঙ্গে গোলাপ ফুল হিসেবেও তার স্পষ্ট ও অবিতর্কিত অস্তিত্ব রয়েছে। তেমনি প্রখ্যাত শিল্পী তিন্‌তোরেতোর আঁকা একটি ছবির দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি লিখেছেন, দর্শক তাকে কেবল হলুদ আকাশ দেখেন না, সেইসঙ্গে উৎকণ্ঠাও দেখেন, অন্যভাবে বলা যায়, দর্শকের মনে উৎকণ্ঠার যন্ত্রণা সঞ্চারিত করেও হলুদ আকাশের বস্তুগত ভিত্তি লক্ষ করতে ভোলেন না সেই দর্শক। তেমনি সঙ্গীতের মতো মাধ্যম থেকে দৃষ্টান্ত তুলে নিয়ে সার্ত্র বুঝিয়েছেন যে সুতীব্র বেদনার সুরে গ্রথিত অভিব্যক্তিও যুগপৎ চিহ্নায়িত বেদনা ও বেদনাতিরিক্ত সাঙ্গীতিক ভাষা। তাঁর মতে 'It is a grief which doesnot exist anymore, which is.' (১৯৮১ : ৩)

কিছু কিছু বিশেষ বক্তব্য বলতে চাইছেন বলে কেউ লেখক হয়ে ওঠেন না; নির্দিষ্ট ধরনে প্রকাশ করতে চান বলেই লেখকের পদবি তাঁর প্রাপ্য। এ কেবল শৈলীর প্রসঙ্গ নয়; সমস্ত চিন্তা-অনুভূতি-অভিজ্ঞতার নির্যাস মন্থন করে যা গড়ে ওঠে, তা আসলে সত্তার একান্ত নিজস্ব উদ্ভাসন। প্রখর দায়বোধের প্রেরণায় সূত্রধারের ভূমিকা গ্রহণ করে সৃজনশীল সত্তা এবং নবায়মান চিহ্নায়ক পরম্পরার সাহায্যে মুক্তি ও স্বাধীনতার গ্রন্থনা উপস্থাপিত করে। ভাষা সাহিত্যের মাধ্যম বলে ভাষা-ব্যবহারের গুরুত্ব অপরিসীম। জীবন ও জগতের সত্য নিজস্ব ধরনে খোঁজেন সাহিত্যিকেরা এবং তাঁদের খোঁজার ধরন অনুযায়ী ভাষায় প্রকাশ ও অপ্রকাশের আততি অনিবার্য। বাস্তব অনুপুঙ্খগুলি যখন সাহিত্যিকের কল্পনা-প্রতিভায় পুনর্নির্মিত হয়, অজ্ঞাতপূর্ব বস্তুসত্তা আপন অস্তিত্ব ঘোষণা করে। নতুন তাৎপর্যের উদ্ভাসনে ভাষাও অনেকখানি রূপান্তরিত হয়ে যায়। নতুন এই বাস্তবের সঙ্গে লেখক নিজস্ব ধরনে দ্বিরালাপে যোগ দেন। যেন ভাষা নতুন ছন্দে-তালে-লয়ে কথা বলে; এই বলায় জাগতিক কথকতার সীমানা প্রসারিত হয়।

শব্দ ও নৈঃশব্দ্যের মধ্যে বিচিত্র সেতু তৈরি হতে থাকে। লেখকের বয়ানে তবু পরিচিত সরবতা ও নীরবতার সংজ্ঞা পাল্টে যায়; স্বতন্ত্র কথকতার বিন্যাসে বস্তুস্বভাব ও তাৎপর্য-প্রতীতির মৌলিক পার্থক্য প্রকট হয়ে ওঠে।

চার

সার্ত্র মনে করেন ভাষা-ব্যবহারকারী হিসেবে লেখক মূলত জাগতিক পরিস্থিতিকে বিশেষ বাচনিক পরিস্থিতিতে রূপান্তরিত করেন। বাইরের জগৎ থেকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে অর্জিত বস্তু-সম্বন্ধের অভিজ্ঞতা ও সংলগ্ন উপলব্ধিপুঞ্জকে বিশিষ্ট বাচনভঙ্গির সাহায্যে নতুন সত্তায় রূপান্তরিত করেন বলেই তিনি স্রষ্টা লেখক। ভাষার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রৌদ্রছায়ার দোলাকে তিনি উপস্থাপিত করেন নাকি এদের নিহিত তাৎপর্যকে অভিব্যক্ত করেন—এ নিয়ে সূক্ষ্ম বিতর্ক রয়েছে। চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের রহস্যময় বহুমাত্রিক সম্পর্ক লেখকের নিজস্ব ভাবাদর্শ ও বিশ্বাসের ভূমি অনুযায়ী নানাভাবে ব্যক্ত হয়ে থাকে। সার্ত্র চমৎকার লিখেছেন : 'Between the word and the thing signified, there is established a double reciprocal relation of magical resemblance and meaning.' (পৃ : ৭)

ভাঙনের কালে সত্তা ও মানবিকতাবোধের সংকট ভাষার সংকটে পরিণত হয় অর্থাৎ সামাজিক ও ঐতিহাসিক অভিঘাতে ভাষা-ব্যবহারের প্রচলিত অভ্যাস আক্রান্ত হয়। অদ্ভুত ও অপরিচিত বিন্যাসের প্রভাবে ভাষার কাঠামো ধ্বস্ত হয়ে পড়ে এবং সৃষ্টিশীল লেখকদের জন্যে এই পরিস্থিতি নতুন নতুন প্রত্যাহ্বান নিয়ে আসে। যাঁরা এর মোকাবিলা করে সত্তা ও ভাষার যুগলবন্দিকে পুনরাবিষ্কার করতে পারেন, শুধুমাত্র তাঁদের প্রতিবেদনেই সময় ও পরিসরের দ্বিবাচনিক সত্য ধরা পড়ে। এ প্রসঙ্গে সার্ত্রের গভীর দ্যোতনা সম্পন্ন কাব্যিক উচ্চারণ আমাদের আজও মুগ্ধ করে : 'The writer is a speaker; he designates, demonstrates, orders, refuses, interpolates, begs, insults, persuades, insinuates. If he does so without any effect, he does not therefore become a poet; he is a writer who is talking and saying nothing. We have seen enough of language inside out; it is now time to look at it rightside out.' (পৃ: ১০-১১)। লেখক আসলে একজন কথক অথচ তিনি কথা বলেও কিছুই বলেন না—এই নিগূঢ় মন্তব্য এবং লেখকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্রিয়ার তালিকা সার্ত্রের সাহিত্য-চিন্তার ভিত্তিগত অভিনবত্বকে স্পষ্ট করে দিয়েছে।

ভাষার প্রধান লক্ষ্য সংযোগ সাধন আর সংযোগ মানে উন্মোচন, নিবিড়ভাবে দেখা। দেখার লক্ষ্য শুধু পরিপার্শ্ব নয়, নিজেও। নিজেকে দেখা মানে বিবর্তনশীল সময় ও পরিসরের অভিঘাতে আপন অস্তিত্বের পরিবর্তনকে দেখা। আত্মগত ও বস্তুগত আয়তনের অন্যোন্য-সম্পৃক্তিকে পর্যবেক্ষণ করে লেখক যখন কিছু বলেন, তাতে মানব-পরিস্থিতির নিশ্চয়তা ও অনিশ্চয়তা, সম্প্রসারণ ও সংকোচন, নিজের সঙ্গে

জগতের সংলগ্নতা ও অসংলগ্নতা : এই সবই প্রকাশ পায়। আবার এত কিছু সত্ত্বেও অটুট রয়ে যায় অপ্রকাশের প্রচ্ছন্ন আয়তনও। সার্ত্রের এই মন্তব্যও লক্ষণীয় : ' to speak is to act; anything which one names is already no longer quite the same; it has lost its innocence' (পৃ: ১২)। তার মানে সাহিত্যিক যখন কোনও বাস্তব অনুষঙ্গকে নাম ও রূপ দিচ্ছেন, সেই মুহূর্তেই তিনি যথাপ্রাপ্ত বাস্তব থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছেন। আসলে তৈরি করছেন বাস্তবের উদ্বৃত্ত সমান্তরাল অস্তিত্বকে। সাহিত্যের কথকতা মানে এইজন্যেই ক্রিয়াত্মক হয়ে ওঠা। ভাষা-ব্যবহারের সূত্রেই ভাষার সীমানাকে পেরিয়ে যাওয়া।

সার্ত্রের আরেকটি কবিত্বময় উচ্চারণ মনে আসে : 'regarding language, it is our shell and our antennae; it protects us against others and informs us about them; it is a prolongating of our senses, a third eye which is going to look into our neighbour's heart. We are within language as within our body.' (পৃ: ১১)

ভাষায় নিহিত এই অপার রহস্য, সৌন্দর্য ও সম্ভাবনাকে প্রণালীবদ্ধ ভাবে বুঝতে চান বলেই লিখিয়েরা লেখেন। এ কি তাঁদের সত্তার সম্প্রসারণ অথবা সত্তা থেকে পলায়ন : নাকি দুটোই একসঙ্গে! লেখকদের অন্বিষ্ট যতই আলাদা হোক, যুগপৎ প্রকট ও প্রচ্ছন্ন ভাবে এঁরা প্রত্যেকেই বেছে নেন নিজস্ব পথ আর পাথেয়। এই নির্বাচনে আভাসিত হয় তাঁদের দায়বদ্ধতা যা না থাকলে কোনো বীক্ষা গড়ে ওঠে না, যথাপ্রাপ্ত বাস্তবের অন্তঃশায়ী সত্যও উন্মোচিত হয় না। এ জগতে আমাদের উপস্থিতিই সম্পর্ককে বিকশিত, পুনর্বিন্যস্ত ও বহুধা বর্ধিত করে। মানুষে-মানুষে নয় কেবল, প্রকৃতির অন্তহীন অনুপুঙ্খগুলির সঙ্গেও। এই সম্পর্ক আছে বলেই পৃথিবীতে মানুষ অপরিহার্য। সাহিত্য-সৃষ্টিতে সম্পর্কের অন্তহীন উন্মোচন যতটুকু দক্ষতার সঙ্গে ঘটে, ঠিক সেই অনুপাতে মানুষ আত্মগত ও নৈর্ব্যক্তিক আবিষ্কারে ঋদ্ধ হয়। এ প্রসঙ্গে লেখকসত্তা ও পাঠক-সত্তার টানাপোড়েন বিষয়ে সার্ত্র কিছু চিন্তাসূত্র দিয়েছেন আমাদের : 'The writer neither foresees nor conjectures; he projects... if he hesitates, he knows that the future is not made, that he himself is going to make it, and if he still does not know what is going to happen to his hero that simply means that he has not thought about it that he has not decided upon anything .The future is then a blank page, whereas the future of the reader is two hundred pages filled with words which separate him from the end.' (পৃ: ২৮-২৯)

পাঁচ

এই মন্তব্যের শেষাংশে স্পষ্টত পাঠক-প্রতিক্রিয়া তত্ত্বের পূর্বাভাস পাচ্ছি। তবু সার্ত্রের ভাবনা যে ভিন্ন কক্ষপথ ধরে এগিয়েছে, তা বুঝতে পারি যখন তিনি জানান,

লেখক সর্বত্র শুধু জ্ঞান, তাঁর ইচ্ছা, তাঁর পরিকল্পনা—এক কথায়, আপন সত্তারই মুখোমুখি হন। তিনি কেবল তাঁরই আত্মতাকে স্পর্শ করেন; যেসব বস্তু-পুঞ্জ ও বস্তু-সম্বন্ধ আসলে তাঁর সৃষ্টি, তাদের নাগাল তিনি পান না কখনও। সর্বত্র নিজের মুখোমুখি হয়েও লেখক নিছক নিজের জন্যে সৃষ্টি করতে পারেন না। যদি বা তিনি নিজেকে পুনঃপাঠ করেন, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। আত্মতার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেও তিনি লক্ষ্মণরেখা পেরিয়ে যেতে পারেন না। তাঁর সৃষ্টির বহুমুখী প্রতিক্রিয়া গ্রহীতাদের উপর কী কী ভাবে হচ্ছে সেইসব লেখক যদি বা যাচাই করতে পারেন—গ্রহীতাদের মতো অনুভব কিন্তু হয় না তাঁর। ফলে কোনও লেখকই বলতে পারেন না যে তিনি কেবল নিজের জন্যে লেখেন। কেননা সৃজনী প্রক্রিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত অসম্পূর্ণ ও বিমূর্ত হয়ে থাকবে যতক্ষণ তা গ্রহিষ্ণু পাঠকদের দ্বারা পরিগৃহীত না হচ্ছে। পড়ার সঙ্গে লেখার দ্বান্দ্বিক আন্তঃসম্পর্ক অনস্বীকার্য। পাঠকই লিখন-প্রকল্পকে সম্পূর্ণতা দিচ্ছেন। পর্যবেক্ষণ ও সৃষ্টির সংশ্লেষণে গড়ে ওঠে পাঠ-ক্রিয়া। সার্ত্রের মন্তব্য দ্ব্যর্থবিহীন ও সূচিমুখ: 'It is the joint effort of author and reader which brings upon the scene that concrete and imaginary object which is the work of the mind. There is no art except for and by others.' (পৃ: ২৯-৩০)

যা অন্যের জন্যে আর অন্যের দ্বারা সৃষ্ট নয়— তেমন কোনো শিল্প হতে পারে না; প্রবাদপ্রতিম এই উচ্চারণে বিধৃত রইল সার্ত্রের নান্দনিক বোধের সামাজিক উৎস ও স্বরূপ। এমন এক আশ্চর্য নৈঃশব্দ্যের কথা জানিয়েছেন, লেখক এবং পাঠক আলাদা আলাদা ভাবে যার শরিক হয়ে থাকেন। লেখার ভাববস্তু ও তাৎপর্য, বিষয় ও বিষয়ীর ভূমিকা : এই সবই শৈলী-শোধিত প্রতিবেদনে ব্যক্ত হয়; তবে অভিব্যক্তিতে পৌঁছাতে হয় নৈঃশব্দ্য মন্থন করে। লেখকের অন্বিষ্ট নৈঃশব্দ্যের তাৎপর্য পাঠকের অর্জিত নৈঃশব্দ্য থেকে আলাদা। কেননা, আত্মতা ও বস্তুত্বের গ্রন্থনা দুটি ভিন্ন পথে ব্যক্ত হয়ে থাকে। তাছাড়া পাঠকের পুনরাবিষ্কারের প্রকরণ লেখকের প্রেক্ষিতকে শুরুতেই অস্বীকার করে উৎক্রান্তির আকাঙ্ক্ষায়। এখানেই আসে পড়ার মুক্ত পরিসর ও পাঠকের স্বাধীনতার প্রসঙ্গ। যথাপ্রাপ্ত বয়ান পাঠকের পক্ষে সূচনাবিন্দু মাত্র। উৎক্রান্তি তার ঈপ্সিত। সার্ত্র এইজন্যে বলেছেন, 'reading is directed creation' (পৃ: ৩১)

সুতরাং পাঠকের প্রস্তুতি ও দক্ষতার ওপরই কোনও সাহিত্য-কৃতির আয়ুষ্কাল পুরোপুরি নির্ভরশীল। লেখকের দ্বারা ব্যবহৃত শব্দাবলীকে অবশ্যই অনুভূতি ও মনন উদ্দীপক হতে হয়। বাস্তব ও কল্পনার দ্বিরালাপের সূত্রে বহুমাত্রিক উত্তরণে সক্ষম বাক্-বিন্যাসই শুধু পাঠককে জাগাতে পারে। সার্ত্র লক্ষ করেছেন 'The work exists only at the exact level of his capacities; while he reads and creates, he knows that he can always go further in his reading, can always create more profoundly, and thus the work seems to him as inexhaustible and opaque as things.' (পৃ: ৩২) পাঠকই যেহেতু পাঠকৃতিকে অফুরান

তাৎপর্যের উৎসে রূপান্তরিত করেন, নান্দনিক প্রক্রিয়ায় শুদ্ধতা ও স্বাধীনতার আবেদন শেষ হয় না কখনও। বোধের মুক্ত পরিসর সম্প্রসারণে লেখক ও পাঠকের সহযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই সহযোগ অবশ্যম্ভাবী কেননা পাঠকৃতি মৌলিক দায়বোধের ঘোষণা। এই দায়-বোধ সংযোগের ও সর্বদা নবায়মান স্বাধীনতার পুনরাবিষ্কারে ঘোষিত হয়। স্বাধীন সত্তাই কেবল নান্দনিক চেতনার পুনর্নির্মাণে ব্রতী হতে পারে। সম্বোধক লেখক ও সম্বোধিত পাঠকের মধ্যে জায়মান সম্বোধ্যমানতার প্রক্রিয়ায় অস্তিত্বের নান্দনিক স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াসই ব্যক্ত হয়ে থাকে। সার্ত্র মনে করেন প্রতিটি শিল্পকর্ম ও সাহিত্যকর্ম মূলত 'recovery of the totality of being. Each of them presents this totality to the freedom of the spectator.' (পৃ:৪১)। সত্তার সমগ্রতা সন্ধানে লেখক ও পাঠক যেহেতু শরিক, সাহিত্যচিন্তায় গ্রহীতার ভূমিকার গুরুত্ব অনেকখানি। তাই কী লিখি ও কেন লিখি সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা অনিবার্যভাবে এসে পৌঁছায় 'কার জন্যে লিখি'—এই প্রশ্নে। বলা বাহুল্য-এর সঙ্গে জড়িয়ে যায় সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত, ভাবাদর্শ, নান্দনিক দায়বোধের স্বরূপ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্ন। তাই সাত দশক পরবর্তী পরিবর্তিত এই পৃথিবীতেও সার্ত্রের সাহিত্য-চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা অমলিন রয়ে গেছে।

ঔপনিবেশিক প্রস্থনা : সার্ত্রের প্রতিস্পর্ধা

উপনিবেশ-প্রতিস্পর্ধী চেতনাপ্রস্থানের তাত্ত্বিক ও দার্শনিক নির্মাণে এবং সেইসঙ্গে প্রায়োগিক রণকৌশল নির্ণয়ে কার্ল মার্ক্স-এর পরে যাঁর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি, তিনি নিঃসন্দেহে জাঁ পল সার্ত্র। উপনিবেশবাদ ও নব্য উপনিবেশবাদ সম্পর্কে তিনি যেসব প্রতিবেদন রচনা করে গেছেন, বৌদ্ধিক ও রাজনৈতিক স্তরে তাদের প্রভাব বহুমাত্রিক। তাঁর জীবৎকালে এদের প্রাসঙ্গিকতা সীমাবদ্ধ ছিল, একথা কেউ বলবেন না। তাই জন্মশতবার্ষিকী পুনঃপাঠে তাঁর বক্তব্য নানাভাবে পরীক্ষিত ও বিশ্লেষিত হবে সর্বত্র, তত্ত্বভুবনে ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে দেখা যাবে নতুন আলোর উদ্ভাসন—এই বিশ্বাস আমরা রাখতেই পারি। অস্তিত্ববাদ থেকে উপনিবেশোত্তর চেতনাপ্রস্থান যেন সূক্ষ্ম ও বিচিত্র চড়াই-উৎরাইয়ের সমাবেশ। আন্তোনিয়ো গ্রামশি ও ফ্রান্ৎস ফ্যানোন ছাড়াও আরও কয়েকজন সহযাত্রী ছিলেন তাঁর, যাঁদের সমবায়ী উপস্থিতিকে মান্যতা দিয়েই শানিততর হয়েছে সার্ত্রের মনীষা। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, সমসাময়িক পৃথিবীতে আধিপত্যবাদী শক্তি যখনই সীমাহীন দম্ভে ও ক্রূরতায় উপনিবেশ কায়েম করতে চেয়েছে, সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তোলার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন তিনি। ১৯৪৮ থেকেই সার্ত্র তৃতীয় বিশ্ব সম্পর্কে মনোযোগী। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, আলজেরিয়ায়, মরক্কোতে, কিউবায়, ভিয়েতনামে, আরবভূমিতে তিনি সর্বদা আগ্রাসন ও লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো আলো বিচ্ছুরণ করেছেন।

গ্রামশি বুদ্ধিজীবীদের যে বর্গ-বিভাজন করেছেন কিংবা সার্ত্র স্বয়ং ফ্যানোনের বইয়ের বিখ্যাত ভূমিকায় বৌদ্ধিক বর্গকে যেভাবে চিহ্নিত করেছেন, সেইসব মনে রেখেও বলব, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে আমৃত্যু সার্ত্র ইতিহাসের প্রতি বুদ্ধিজীবীর দায় সচেতনভাবে পালন করে গেছেন। উপনিবেশবাদী শক্তির নির্মম পীড়নের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠনে ও সক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অসামান্য। শুধুমাত্র নৈতিক বা বৌদ্ধিক বা আস্তিত্বিক ভাষ্য রচনা করেই নিজের কর্তব্য কখনও শেষ করেননি তিনি। প্রতিবাদী জনসাধারণের হৃদ্‌স্পন্দন অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব তাত্ত্বিক প্রেক্ষিতও রচনা করেছেন। তাই সাংস্কৃতিক রাজনীতির তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে সার্ত্রের চিন্তাধারার ধারাবাহিক অনুশীলন অপরিহার্য। পশ্চিম ইউরোপীয় মার্ক্সবাদীদের মধ্যে তাঁর মতো আর কেউই ফলিত রাজনীতি ও তাত্ত্বিক নির্মিতির যুগলবন্দি প্রকটভাবে অনুসরণ করেননি। বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধ আন্দোলন সহ রাজনৈতিক সক্রিয়তায় সম্পৃক্ত থেকেও অনুসন্ধিৎসু বুদ্ধিজীবী হিসেবে নতুন নতুন তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে, চলমান ইতিহাসের ভাষ্যে, সংবাদপত্রে

সমসাময়িক ঘটনাবলীর প্রতিবেদনে সার্ত্র প্রমাণ করেছেন যে সময়ের বিশিষ্ট দাবিতেই তিনি এমন আশ্চর্য অনেকান্তিক ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন।,

চল্লিশের দশকের অন্তিম পর্যায় থেকে আশির দশকের সূচনা-পর্ব পর্যন্ত এমন কিছু প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন, যাতে অস্তিত্ববাদী সার্ত্রের পুরোপুরি নতুন পরিচয় আমরা পাই। উপনিবেশবাদী শক্তির দাপট যখন হিংস্রতায় পর্যবসিত হয়, রাজনৈতিক ঘটনাবলীর অন্তর্বর্তী নৈতিকতার প্রশ্ন বড় হয়ে ওঠে। কয়েক দশক ধরে পৃথিবীর নানা প্রান্তে উপনিবেশবাদের বহুমুখী অভিঘাত লক্ষ করেছেন তিনি। আর, নিজস্ব দার্শনিক অবস্থান অনুযায়ী এ সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া নিরলসভাবে ব্যক্ত করে গেছেন। সত্তার স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব প্রেক্ষিত ক্রমশ রূপান্তরিত হয়েছে বৌদ্ধিক ও রাজনৈতিক দায়বোধে। ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা সম্পর্কিত প্রশ্নটি যে মূলত দায়িত্ব স্বীকারের নৈতিক তাগিদের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত, তা তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন। নব্যউপনিবেশবাদ ও উপনিবেশোত্তরবাদের মধ্যে ব্যবধান কীভাবে আধিপত্যবাদী কৃৎকৌশল ও জনমনস্তত্ত্বের নিরিখে ভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব, সার্ত্র তা স্পষ্ট করেছেন। এশিয়া ও আফ্রিকার মুক্তি-আন্দোলনগুলির অভিপ্রয়াণ এবং তাদের স্থানিক জটিলতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ থেকে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় যেমন পাই, তেমনই আসন্ন উপনিবেশোত্তর জ্ঞানতত্ত্ব ও সংশ্লেষণী নৈতিক চেতনা সম্পর্কেও অবহিত হয়ে উঠি। বিশেষত মার্ক্সবাদ সম্পর্কে যখন ক্রমশ সংশয়, পরিকল্পিত দূষণ ও অপভাষ্য জোরালো হয়ে উঠছে, তিনি এর অনড় ও অনমনীয় কাঠামোয় নতুন স্থিতিস্থাপক ভাবনা যুক্ত করেন। এতে মার্ক্সীয় চেতনাপ্রস্থানের পরিধি আরও ব্যাপ্ত হয় ও তাত্ত্বিক আকরণের গ্রহিষ্ণুতা আরও বেড়ে যায়। নতুন ঘটনা-প্রবাহ ও বাস্তবতা থেকে উদ্ভূত সঞ্চরমান ধারণাপুঞ্জকে চিরাগত আকরণে যান্ত্রিকভাবে বিন্যস্ত করা সম্ভব নয়, এই সত্য উপলব্ধি করেই সার্ত্র বিশেষ পরিস্থিতি ও প্রেক্ষিতের উপযোগী চিন্তাগুচ্ছের নবায়ন ও পুনরুত্থান করতে চেয়েছেন।

উপনিবেশবাদ-বিরোধী আন্দোলনগুলিকে সংকীর্ণ অর্থে নিছক রাজনৈতিক প্রচার-অভিযান বলা চলে না, সার্ত্র শুরু থেকেই এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এইসব আন্দোলনের অন্বিষ্ট হলো বৈপ্লবিক 'ত্রিমহাদেশীয় জ্ঞানতত্ত্ব-এর বিস্তারের মধ্য দিয়ে নিজস্ব রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান বিকশিত করা। বিখ্যাত সংস্কৃতি-তাত্ত্বিক রবার্ট জে.সি. ইয়ং মন্তব্য করেছেন যে সাধারণভাবে প্রচলিত অভিধা 'তৃতীয় বিশ্ব'-এর চেয়ে 'ত্রিমহাদেশীয়' (Tricontinental) বেশি গ্রহণযোগ্য। ১৯৬৬ সালে কিউবার রাজধানী হাভানায় আফ্রিকা, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার জনগণের ঐক্য সমিতির প্রথম অধিবেশনে ঔপনিবেশিকতাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনগুলির প্রতি সংহতি ব্যক্ত করা হয়েছিল। সম্মেলনের এই গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাকে ত্রিমহাদেশীয় মৈত্রী ও সংহতির অভিজ্ঞান হিসেবে গুরুত্ব দেওয়াতে এই অঙ্গীকারও ব্যক্ত হয়েছিল যে তিনটি মহাদেশের নিপীড়িত জনতা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রতিরোধের সংগঠন গড়ে তুলবে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর বাস্তবায়িত করার

লক্ষ্যে এই জোট সাধারণভাবে দায়বদ্ধ। ইয়ং এই নিরিখে উপনিবেশোত্তর চেতনাকে বর্ণনা করেছেন "As a tricontinental counter-knowledge positioned against Eurocentric discourses"। অতএব এই মনোভঙ্গিকে ত্রিমহাদেশীয়বাদ বলা হোক, এই ছিল তাঁর প্রস্তাব।

সার্ত্র ইউরোপীয় চিন্তাবিশ্বের উদ্ভাসিত কেন্দ্রে অবস্থান করেও যে প্রতাপ নিষিক্ত জ্ঞানচর্চার বিপক্ষে দাঁড়ালেন এবং ইউরো-কেন্দ্রিক প্রতিবেদনের বিপ্রতীপে প্রতিবয়ান উপস্থাপিত করতে পারলেন, এর সংকেতমূল্য অসামান্য। বস্তুত নিপীড়িত তিনটি মহাদেশের নিপীড়িত জনতার পক্ষে দাঁড়ালো বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সার্ত্র যে গৃহীত হলেন, মদোদ্ধত ইউরোপের মায়াবী জ্ঞানচর্চার প্রতিষেধক হিসেবে, অপর পরিসরের সেই নিষ্কর্ষ আবিষ্কারে প্রতিহত হলো ইউরোকন্দ্রিকতার মায়াজাল। একে ত্রিমহাদেশীয়বাদী চিন্তাচর্চা বলি বা না বলি, এটা স্পষ্ট যে যুগপৎ তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক স্তরে সার্ত্রের প্রভাব প্রতিটি মুক্তিকামী দেশের বৌদ্ধিক বর্গের দ্বারা পরিগৃহীত হয়েছিল। রাজনৈতিক বাস্তবতার নিরিখে এইসব দেশে উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন একরকম নয়। তাই সার্ত্রের পরিগ্রহণের মধ্যেও রয়েছে বিচিত্র উচ্চাবচতা। তাঁর চিন্তার মার্ক্সবাদী অন্তঃসারও সবাই সমান অনুপাতে গ্রহণ করেননি। তাঁর বিখ্যাত জ্ঞানতত্ত্ব বিষয়ক ধারণা বা সত্তার চূড়ান্ত শূন্যতার বোধ সম্পর্কে আগ্রহ চল্লিশের দশকে যেমন ছিল, পরবর্তী পর্যায়ে সামাজিক অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে প্রতিবাদ সংগঠিত করতে গিয়ে তা অনেকখানি গৌন হয়ে পড়েছিল।

দুই

বস্তুজগৎ চেতনাকে নির্ধারণ করে, মার্ক্সের এই কেন্দ্রীয় প্রতীতিকে প্রত্যাখ্যান করে সার্ত্র প্রস্তাব করেছিলেন যে মানুষের মৌলিক মানবিক স্বরূপের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো স্বাধীনতার বোধ। রেনে দেকার্তের সর্বজনবিদিত মহাবাক্য বিনির্মাণ করে তিনি এই চিন্তাসূত্র পেশ করেছেন: 'আমি হচ্ছি আমারই পছন্দের সমষ্টি' আর 'আমি হচ্ছি আমার স্বাধীনতা'। তাহলে মানুষ হওয়া মানে কী, এই প্রশ্নের জবাবে সার্ত্র বলতে পারেন, কোনো স্থির, পূর্ব-নির্দিষ্ট, পূর্ব-অস্তিত্ব সম্পন্ন অন্তঃসার দিয়ে মানবিক হওয়া যায় না।

মানুষ হওয়ার নির্যাস গতিময়, চির সঞ্চরমান, চির-অনির্দিষ্ট। ব্যক্তি নিজের পছন্দমতো যেসব সিদ্ধান্ত নেয় জীবন সম্পর্কে, তাদের দ্বারাই গড়ে ওঠে মানবিক স্বরূপ। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন দ্বিরালাপ থেকেই ব্যক্তি ঐ পছন্দ বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার রসদ পায়। স্বভাবত ব্যক্তি-পরিসর রুদ্ধ নয় কখনও, তা মুক্ত এবং নিয়ত চলিষ্ণু। আত্ম-রূপান্তর ও আত্ম-উৎপাদনের প্রক্রিয়া এই পরিসরের অভিজ্ঞান। আরও অনেক ব্যক্তির সচেতন সমবায়ী উপস্থিতির শরিক হয়ে একক ব্যক্তি নির্মাণ ও বিনির্মাণ করে ইতিহাসের স্থাপত্যকে। সার্ত্রের এই ধারণা তাহলে "The Eighteenth Brumaire' বইতে মার্ক্সের মন্তব্যের বিপরীত :

'Men make their own history but not of their own free will, not under circumstances they themselves have those but under the given and inherited circumstances with which they are directly confronted' (1973 : 146) তবু কম্যুনিস্ট পার্টির উপনিবেশবাদ ও উগ্র জাতিদম্ভ বিরোধী ভূমিকা যে সার্ত্র ও তাঁর সমসাময়িক বুদ্ধিজীবীদের অনুপ্রাণিত করেছিল, তা অনস্বীকার্য।

সমাজে ও রাষ্ট্রে ব্যক্তি অর্থনৈতিক বা ঐতিহাসিক পরিস্থিতি দ্বারা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত : এই বক্তব্য মেনে নিতে পারেননি সার্ত্র। তাঁর মতে, ব্যক্তির দায়িত্ব রয়েছে নিজের সম্পর্কে, জগতে সম্পৃক্ত হওয়ার পদ্ধতি নির্ণয় বিষয়ে। দায়িত্বের এই বোধ আরোপিত নয়, তা সর্বদা অনেকটা দূর পর্যন্ত স্বতঃস্বেচ্ছ অর্থাৎ আপন রুচি ও পছন্দ দ্বারা সংগঠিত। জার্মান দখলদারির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন যখন কঠিন পরিস্থিতিতে গড়ে তুলেছিলেন সার্ত্র, প্রবল রাষ্ট্রীয় দুর্যোগের মধ্যেও তাঁর দার্শনিক সত্তা খুঁজে নিচ্ছিল সক্রিয়তা, কৃৎ-মাধ্যম, বৈধতা, অভিরুচি ও স্বাধীনতার নতুন তাৎপর্য। হানাদার বাহিনি যখন পরাভূত হলো, ফ্রান্সে এল পুনর্গঠনের বহুমুখী জোয়ার, বৌদ্ধিক বর্গের মধ্যে রাজনৈতিক ও দার্শনিক ভাবনার চিরাগত রৈখিকতা থেকে সরে আসার প্রবণতা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। ফ্রান্সের উপনিবেশগুলিতে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যখন ঔপনিবেশিক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দানা বেঁধে উঠল, সার্ত্রীয় বয়ানের প্রভাব স্বভাবত স্পষ্ট হলো। তাঁরাও নিজেদের রাজনৈতিক ও দার্শনিক অবস্থানকে নতুনভাবে নির্ণয় করার সঙ্গে-সঙ্গে প্রতাপের আগ্রাসী প্রকরণ সম্পর্কে আরও বেশি সচেতনতার প্রয়োজন অনুভব করলেন। অন্যদিকে জার্মান দখলদারি সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করা সত্ত্বেও মুক্ত ফ্রান্সের শাসকেরা কিন্তু ইতিহাস থেকে কোনো পাঠ নেয়নি। তাই ১৯৪৫-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর-পরই ফরাসি শাসকেরা আলজেরিয়ার সেটিফ শহরে নির্বিচার বোমা বর্ষণ করেছিল। দেখা গেল, মুক্তি শুধু ইউরোপীয়দের জন্যে; অপর পরিসরের জন্যে বরাদ্দ নিছক কপটতা, প্রতারণা ও হিংস্রতা। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির যে-সমস্ত উপনিবেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল মুক্তি আন্দোলনের অভিঘাতে, সেখানকার প্রতিরোধকামী জনগণের কাছে ঔপনিবেশিক অবদমনের সত্য ও সেই অবদমন থেকে পরিত্রাণের নিজস্ব কৃৎকৌশল সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে।

এই সূত্রে চিনে নিতে হলো ইউরোপীয় সভ্যতার চিত্রিত মুখোশকেও। সার্ত্রের চিন্তাসূত্র নতুনভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠল তখন। বিশ শতকের এই অগ্রণী দার্শনিক উপনিবেশ-বিরোধিতাকে নৈতিক বীক্ষার মধ্য দিয়ে অর্জন করেছিলেন, রাজনীতির মধ্য দিয়ে নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কঠিন দিনগুলিতে তিনি রাষ্ট্রীয় পীড়ন-বর্বরতা ও উৎকট ইহুদি-বিদ্বেষকে দার্শনিকের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে বিশ্লেষণ করে উগ্র জাতি-বৈর ও অমানবিক অসহিষ্ণুতার ভিত্তি আবিষ্কারের চেষ্টা করেছিলেন। প্রাতিভসত্তাবাদের নিরিখে ব্যক্তি-স্তরে এই অপরতা প্রত্যাখ্যানের হেতু ও তাৎপর্য তিনি বুঝতে চেয়েছিলেন।

প্রতিভাবাদর্শ হিসেবে জাতিবৈর কীভাবে সক্রিয় ও সম্প্রসারণশীল থাকে এবং ব্যক্তি-পরিসরের মধ্যে কীভাবে তা ব্যক্ত হয়—এর মীমাংসা করতে গিয়ে তিনি তাঁর প্রধান তত্ত্বীজগুলির কার্য-পরিধি বহুদূর অবধি বিস্তৃত করেছিলেন। অত্যাচারী কতভাবে কেন অত্যাচার করে, কেনই বা উগ্র জাতিবিদ্বেষী জাতিদম্ভের নরক গড়ে তোলে—এতে বৈধতা ও পথ-পাথেয়-লক্ষ্য বেছে নেওয়ার কী কী তাৎপর্য ছেঁকে নেওয়া যায়, এইসবও তাঁর অভিনিবেশের বিষয় হয়ে উঠেছিল। যারা নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত, জাতিবৈরজনিত অমানবিক নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে তাদের প্রতিক্রিয়া পর্বে-পর্বান্তরে একরৈখিক হয়ে থাকে কেন?

এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপনই ছিল অভিনব। কিন্তু ঔপনিবেশিক উপস্থিতির গ্রন্থনা বস্তু-জগতে ও মনোজগতে কত সূক্ষ্ম ও জটিল প্রতিক্রিয়ার বয়ান তৈরি করে, এ সম্পর্কে সার্ত্রের প্রতিবেদনগুলির অনন্যতা যদি বুঝতে চাই—তাঁর আস্তিত্বিক প্রাতিভসত্তাবাদী-জ্ঞানতাত্ত্বিক ধারণাগুলিকে উপেক্ষা করা যাবে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পৃথিবীতে ঔপনিবেশিক বাস্তবতা ও সাম্রাজ্যবাদী প্রতাপের প্রকরণ নিরন্তর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কত বহুরৈখিক হয়ে উঠেছে, তা তিনি লক্ষ না করে পারেননি। এমন নয় যে তাঁর এইসব প্রতিবেদন শুধুমাত্র দর্শন-জিজ্ঞাসুদের জন্যে! বরং দার্শনিকের চিরাচরিত সংজ্ঞাকে পুরোপুরি বিনির্মাণ করেছেন সার্ত্র তাঁর বয়ানে উঠে এসেছে অজস্র বস্তুগত তথ্য যা কীনা সমসাময়িক প্রয়োজনে অনিবার্য ছিল। কিন্তু সমসাময়িকতা কার্যত আপাত বলে প্রতিপন্ন হয় যখন তাঁর অসামান্য উচ্চারণ এইসব রচনার তাৎক্ষণিক প্রেরণাকে অতিক্রম করে আমাদের কালেও অনায়াসে পৌঁছে যায়। অজস্র দৃষ্টান্ত দিতে পারি। এখানে দুটি মাত্র উল্লেখ করছি। ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ তারিখে 'লা এক্সপ্রেস' পত্রিকায় 'The Constitution of contempt' শীর্ষক রচনায় সার্ত্র লিখেছেন: 'This is the trickery: Power, even when usurped, always has the appearance of legality; it is enough that dis-order reigns, especially if it is majestic, for it to be confused with order.' (২০০১ : ৯০)

এ কি শুধু দ্যগল-প্রশাসন সম্পর্কেই প্রযোজ্য? দেশে-দেশান্তরে পর্বে-পর্বান্তরে প্রতাপ কি সর্বদা বৈধতার মুখোশ পরে নেয় না? রাষ্ট্রের বাহ্যিক আড়ম্বরের নিচে কি চাপা পড়ে যায় না এই সত্য যে তৃণমূল স্তরের জনগণ কেবল অনাবশ্যক বিমূঢ় দর্শক মাত্র? রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলার দোহাই দিয়ে নানা কৌশলে জনগণের সম্মতি আদায় করে ক্রমশ কি তাদের এই ব্যবস্থার পক্ষে সর্বতোভাবে অবান্তর করে দেওয়া হয় না? আজ থেকে ৫৫ বছর আগে ফ্রান্সের বিশেষ পরিস্থিতিতে সার্ত্র যে-সব কথা লিখেছিলেন, নির্বাচন-সর্বস্ব ভারতীয় গণতন্ত্রে আমরাও কি তেমনই আধিপত্যবাদী শাসক শক্তির দিকে অস্পষ্ট, অস্বচ্ছ, প্রান্তিক অবতল থেকে একইভাবে বিহ্বল চোখে তাকাচ্ছি না? অতএব আমরা, ভারতীয়রাও, 'গত কয়েকটি সাধারণ নির্বাচনের অভিজ্ঞতায়' সার্ত্রের প্রতিধ্বনি করে বলতে পারি : "Everything is false. Lies and violence, black mail, terror, ambiguity, everything in this referendum is designed to

violate people's consciences and to devalue the votes of its opponents.' (তদেব : ৯৫)

তিন

স্বচ্ছ দৃষ্টি ও প্রজ্ঞার অধিকারী সার্ত্র বুঝতে পেরেছিলেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পৃথিবীতে জটিলতার নতুন নতুন গ্রন্থনা দেখা যাচ্ছে। যুদ্ধ এখন আর বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে সীমাবদ্ধ নয়, তা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছে ভেতরের শত্রুদের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণতর সচেতনতা নির্মাণের মধ্যে। উপনিবেশবাদ যখন অভ্যন্তরীন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, তার বিরুদ্ধে লড়াই খুব কঠিন হয়ে পড়ে কেননা সত্য-মিথ্যা স্বাধীনতা-বদ্ধতার সংজ্ঞা পুরোপুরি নতুনভাবে নির্ণয় করতে হয়। আমরা, ভারতীয়রা, বিশ শতকের শেষ তিনটি দশকে এই অভিনব ঐতিহাসিক সত্যের মুখোমুখি হয়েছি।

প্রাগুক্ত নিবন্ধের দু'সপ্তাহ পরে (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮) একই পত্রিকায় সার্ত্র ঐ বিষয়ে 'The frogs who demand a King' নামে দীর্ঘতর প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এতেও দ্যগল প্রশাসন, জনমত ও ভোটাধিকার প্রয়োগ, আমলাতন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় নীতিমালা, ফরাসি উপনিবেশগুলিতে সামরিক বাহিনির ভূমিকা, ঠান্ডা যুদ্ধ প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে প্রাবন্ধিক তাঁর অভিমত দিয়েছেন। আলজেরিয়া সমস্যা যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে সার্ত্রকে ভাবিয়েছে, এর রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক নিয়েও তিনি সুচিন্তিত অভিমত দিয়েছেন। তবে, একটু আগে যেমন লিখেছি, বিশেষ পরিস্থিতি নিয়ে রচিত বয়ানও, নির্দিষ্ট তথ্য-সন্নিবেশের সীমা পেরিয়ে গিয়ে, আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গী হতে পেরেছে। কেননা তাঁর উচ্চারণ সত্যবদ্ধ ও সর্বজনীন।

তাই আজকের ভারতবর্ষেও সার্ত্রের এইসব মন্তব্য খুব বেশি প্রাসঙ্গিক মনে হয় : 'Out of indifference or impotence, all these political citizens are voting for a politicism, as if it were a programe they wanted to impose. In voting 'yes' they talk their attitude to extremes, to the point of renouncing all their civil rights. They surrender the care of state to the man who will do everything for them. That is then simplified : they remain a spouse, son, employed, or billiard's champion, but they will no longer be citizens." (২০০১:১১১)। এই যে অদ্ভুত উদাসীনতা ও বন্ধ্যাত্ব তথাকথিত রাজনীতি-নিরপেক্ষ নাগরিকদের মধ্যে দেখতে পেয়েছেন সার্ত্র, তা কি ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় চারপাশে দেখছি না আমরা? সাধারণ নির্বাচনের সময়ে সুবিধাভোগী মধ্যবিত্তবর্গ এবং বিশেষভাবে বুদ্ধিজীবীরা কি রাজনীতি-নিরপেক্ষতার দোহাই দেন না? মৌলবাদের বাড়-বাড়ন্ত কিংবা বিশ্ব-পুঁজিবাদের কাছে আত্মসমর্পণ জাতীয় মৌলিক বিষয় সম্পর্কেও এঁরা পিপুফিশু নীতি গ্রহণ করেন না?

যাঁরা বলেন, 'আমরা রাজনীতি বুঝি না, ওতে আমরা নেই'—এরাই সামান্য বা

বিনা অজুহাতে নিজেদের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান নানা গোত্রের প্রভুদের কাছে সমর্পণ করেন। নির্বাচনের সময় এলে কোনো মৌলিক নীতির ভিত্তিতে এঁরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন না। তাই তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিলেও এঁরা মুখে রা'টি পর্যন্ত করেন না। 'আমিই তোমাদের হর্তা-কর্তা-বিধাতা, ভালো-মন্দের অনুশাসন আমাদের দখলে' জাতীয় ঘোষণা ভারতবাসী অতীতে শুনেছে। এখনও নিরুচ্চার ঘোষণায় কেড়ে নেওয়া হচ্ছে বিবেক ও সংবেদনা; তবু, সার্ত্র যেমন বলেছেন, আমাদের মধ্যে একটা বড়ো অংশই অমুকের স্ত্রী বা ছেলে বা ভাইপো বা ভাগ্নে বা জামাই কিংবা তমুক প্রতিষ্ঠানের চাকুরে বা নামজাদা কিছু-একটার পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকতে চাইছে। প্রতিবাদী হওয়া দূরে থাক, সচেতন নাগরিক হিসেবে আপন অধিকারের গৌরবে কেউ বাঁচতে চাইছে না। সর্বব্যাপ্ত বন্ধ্যাত্ব নিঃসাড় করে দিচ্ছে আমাদের। অর্থাৎ, আমরা অরাজনৈতিক ও সাতে-পাঁচে না-থাকা ব্যক্তিরা, অভ্যন্তরীন উপনিবেশবাদের স্বেচ্ছাবৃত শিকারে পরিণত হয়েছি। সার্ত্র আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন, খুব দ্রুত আমরা কথা বলার ভাষাও হারিয়ে ফেলছি। বাহান্ন বছর আগে ফ্রান্সের সামূহিক বন্ধ্যাত্বে বিষণ্ণ বোধ করে তিনি যে-কথা লিখেছিলেন, তা এ-সময়ের ভারতবর্ষে পরিস্ফুট চৈতন্যে মড়ক সম্পর্কে হুবহু প্রযোজ্য। '...The objective impotence... has been deeply inscribed in each and every one of us as a personal sense of powerlessness to alter the destiny of our country.' (তদেব)।

অভ্যন্তরীন উপনিবেশবাদ যখন মনকে নিরেট পাথর করে দেয়, কী হয় তখন, কী হতে পারে? সার্ত্র চমৎকার লিখেছেন সর্বাত্মক পক্ষাঘাতের কথা : 'Fear and impotence, fear because of impotence, impotence because of fear, everything leads us... to opt for impotence and fear. ...Besides, we live, today as the day before yesterday, in total unreality: impotence and abstraction are leading once again to mere words. The old system looked for words which evade while claiming to define. The systems New Look seeks ambiguity, the phrase which offers a double meaning, which appears to offer a double meaning and has none, or the string of phrases where each individually seems intelligible, but whose sum equals zero.' (তদেব : ১১৩,১১৭)। ভয় ও বন্ধ্যাত্ব, বন্ধ্যাত্ব আর ভয় : এ কেবল সত্তর দশকের জরুরি অবস্থার কথা মনে করিয়ে দেয় না আমাদের। নব্বই দশকের পরে ভারতীয় রাষ্ট্রসংস্থা, রাজনৈতিক ও পৌরসমাজ একটু একটু করে যে ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদের চোরাবালিতে তলিয়ে গেছে, এর কারণ 'অরাজনৈতিক' জনতা ঐ আতঙ্ক আর বন্ধ্যাত্ব বেছে নিয়েছিল। মিথ্যে হয়ে গিয়েছিল চার হাজার বছরের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপার্জন। এই নিবন্ধের শুরুতে যে বেছে নেওয়ার কথা লিখেছি, সেই সার্ত্রীয় ভাববীজের কী চমৎকার ব্যতিরেকী চলন দেখলাম। অস্মিতা ও স্বাধীনতা

অভ্যন্তরীন উপনিবেশবাদ সৃষ্ট দ্ব্যর্থবোধকতা ও অনিশ্চয়তার কুহকে বিলীন হয়ে গেছে। অবান্তর ও বাতিল হয়ে-যাওয়া ব্যক্তি-পরিসরের জন্যে রয়েছে শুধু অন্তহীন রিক্ততার ধূসর শূন্য।

১৯৫৮-এর সেপ্টেম্বর থেকে এবার বারো বছর পিছিয়ে গিয়ে ১৯৪৫ সালে রচিত 'Anti Semite and Jew' শীর্ষক রচনায় পৌঁছাতে পারি। হিটলারের ফ্যাসিবাদী জার্মানিতে উগ্র ইহুদি-বিদ্বেষের মধ্যে যে অন্ধ জাতিবৈর ব্যক্ত হয়েছিল, ঐ নিবন্ধ লেখার সময়ে স্পষ্টত তা স্মৃতিতে খুব জীবন্ত ছিল। জাতিগত শুদ্ধতার দম্ভ যখন অপর পরিসরের প্রতি পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার কারণ হয়ে ওঠে, বিশ্বখ্যাত অস্তিত্ববাদী দার্শনিক হাইদেগারও তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েন। কিন্তু সার্ত্র খাপ-খোলা তরোয়ালের মতো ঋজু ও শানিত মেধার অধিকারী ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত মন্তব্য স্মরণীয় হয়ে আছে : 'Contrary to widespread opinion, it is not the jewish character that provokes anti-semitism, but, rather...it is the antisemite who creates the gews'। এই মন্তব্যের তাৎপর্য অত্যন্ত সুদূর-প্রসারী। ইহুদি চরিত্রের তথাকথিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য ইহুদি-বিদ্বেষের জন্ম দিয়েছে—এই ধারণা ভুল। বরং এর উল্টোটাই সত্য যে সর্বব্যাপ্ত ইহুদি-বিদ্বেষই জুগুপ্সিত ইহুদি-সত্তা নির্মাণ করেছে। একে সঞ্চালক চিন্তাসূত্র হিসেবে ধরে নিয়ে বলা যায়, দেশে-দেশান্তরে নিপীড়ক ঔপনিবেশিক শক্তিই 'নেটিভ' বা ভূমিপুত্র ধারণার জন্ম দিয়েছে। উৎকৃষ্ট ও সভ্য শাসকের প্রতিতুলনায় নিকৃষ্ট ও আধা-বর্বর ভূমিপুত্রের ভাবমূর্তি নির্মাণে ঔপনিবেশিক প্রভুর দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থ জড়িত। প্রত্যাখ্যাত ও অপাঙ্‌ক্তেয় অপরেরা নিজেদের চারিত্রিক বৈগুণ্য ও অক্ষমতার জন্যেই মুক্তিদাতা উৎকৃষ্ট ও বহিরাগত শাসকদের দ্বারা পরিচালিত—এই ধারণা সুচতুর নির্মাণ-প্রকল্পের ফসল। শেক্সপীয়ারের 'টেম্পেস্ট' নাটকে প্রসপেরো যেমন দ্বীপ জবরদখল করে আদিবাসীদের প্রতিনিধি ক্যানিব্যালকে আদ্ধেক-পশু আদ্ধেক-মানুষ হিসেবে উপস্থাপিত করে বুঝিয়েছে, এ হেন কেউ দ্বীপের প্রশাসক হতে পারে না। এ-কাজ বাধ্য হয়েই দূরবর্তী ইউরোপ থেকে আসা সুসভ্য শ্বেতাঙ্গদের করতে হয়।

চার

সার্ত্র লক্ষ করেছেন, ইহুদি-বিরোধিতার বিষাক্ত প্রচারে পৃথিবীর মানুষ ভালো ও মন্দ এই দুটি স্পষ্ট শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এই দুই-এর মধ্যে কোনো সমঝোতা সম্ভবই নয় কেননা, 'One of them must triumph and the other be annihilated' (১৯৯৫ : ৪৮)। এই যে দ্বিমেরু-বিন্যাস এবং কোনো জাতি-সত্তাকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ, এতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে সভ্যতার সহগামী অন্ধবিন্দু।

ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিকে কায়েম রাখার জন্যে শ্বেত-প্রভুত্ববাদী ইউরোপীয় শাসকেরা উগ্র জাতি-বিদ্বেষকে রণকৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছিল। শ্বেতাঙ্গ ও

খ্রিস্টধর্মাবলম্বী ইউরোপীয় শাসকেরা নিজেদের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করার জন্যে খোদ ইউরোপের বুকেই পরিত্যাজ্য অপর পরিসরকে নির্মাণ করেছিল। সুতরাং অশ্বেতাঙ্গ এশিয়ায় আফ্রিকায় লাতিন আমেরিকায় অন্য ধর্মাবলম্বী ও কৌম সংস্কৃতির অনুসারীদের প্রতি তাদের মনোভঙ্গি কী, তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। সমস্ত ঔপনিবেশিক ভাবাদর্শই উগ্র জাতিদম্ভ দ্বারা পরিপুষ্ট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে মানব-পরিস্থিতিতে যে অভাবনীয় বিপর্যয় দেখা গিয়েছিল, সেখান থেকে প্রত্যক্ষ পাঠ নিয়ে সার্ত্র অনুভব করেছিলেন, বিরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে কিছু কিছু আস্তিত্বিক নির্বাচন করে যাওয়া-ই জীবন নয়। জীবন বরং এই উপলব্ধিও যোগান দিচ্ছে যে প্রতাপের ধারাবাহিক পীড়নে বিষয়ী কতভাবে বিষয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে! আর, স্বাধীনতাও স্বয়ংনির্ভর নয়; ব্যক্তিসত্তা নিজেকে যখন ঘটনার মাধ্যম হিসেবে বুঝে নিয়ে প্রয়োজনীয় রূপান্তরের জন্যে তৈরি হয়ে উঠছে এবং প্রয়োজন-মাফিক যথাযথ দায়িত্ব স্বীকার করছে—তখনই প্রকৃত স্বাধীনতা উদ্ভাসিত হচ্ছে।

মানুষ যদি স্বাধীনতার এই প্রক্রিয়া ও সংজ্ঞাকে অস্বীকার করে, ব্যক্তি-পরিসর বৈধতার অধিকারী হবে না কখনও। সর্বব্যাপ্ত ইহুদি-বিরোধিতার পরিবেশে যারা স্বাধীনতাকে বেছে নেয় এবং বৈধ জীবনের প্রতি দায়বদ্ধতা ঘোষণা করে, সর্বজনীন মূঢ়তার মধ্যে প্রতিস্রোতের এই উদ্যোগের জন্যে যথেষ্ট সাহস প্রয়োজন। ইউরোপীয় সমাজের মধ্যে দুই সহস্রাব্দ বাস করেও ইহুদিরা রয়ে গেলেন প্রত্যাখ্যাত ও ঘৃণিত অপর যাদের চিরকাল অবাঞ্ছিত, অপরিচিত ও অনুপ্রবেশকারী হিসেবে দেখা হলো। শেক্সপীয়ারের 'দি মার্চেন্ট অফ্ ভেনিস' নাটকের শাইলক অমানবিক ঘৃণার জবাব দিতে চেয়েছিল নিষ্ঠুরতা দিয়ে। কিন্তু ইতিহাস তার পক্ষে ছিল না বলে নাট্যকার তাঁর অনুচ্চারিত সমবেদনা সত্ত্বেও তাকে পর্যুদস্ত করতে বাধ্য হয়েছেন। যদিও এরই মধ্যে সমস্ত অবদমিত ও ঘৃণিত অপর পরিসরের মর্মন্তুদ যন্ত্রণা শাইলকের ক্ষুব্ধ আর্ত উচ্চারণে ব্যক্ত হয়েছে : 'I am a Jew. Hath not a gew eyes? Hath not a Iew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions? fed with the same food, hurt with the samed weapons, subject to the same diseases, healed by the same mean, warmed and cooled by the same winter and summer, as a Christian is? if you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us do we not die? and if you wrong us shall we not revenge? If we are like you in the rest, we will resemble you in that,' (Act III Scene II)

লক্ষণীয় শাইলক বলেছে 'আমরা' ও 'তোমরা'র মধ্যে দুরপনেয় ব্যবধানের কথা। একদিকে জাতিগত পরিচয়ে প্রান্তিকায়িত কালো-রঙে-আঁকা ইহুদি এবং অন্যদিকে সুবিধাভোগী ও সব আলো-শুষে-নেওয়া খ্রিস্ট-ধর্মাবলম্বীরা। মনে হয় নাকি, ভারতীয় উপমহাদেশেও রয়েছে সার্ত্র কথিত 'situation of inauthenticity'-এর অজস্র দৃষ্টান্ত? প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে, নিছক জন্মগত পরিচয়ের 'দুর্বলতা'-র জন্যে তাড়িত

ও বৈধতা-বঞ্চিত জীবন যাপন করে যেতে হয় কোনো কোনো জনগোষ্ঠীকে। বহিরাগত ঔপনিবেশিক শাসকদের কর্তৃত্ব-কালে এই আরোপিত বৈধতা ও অবৈধতার বোধকে চতুরভাবে উস্‌কে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উপনিবেশবাদ যখন অভ্যন্তরীন শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে, কোথাও ধর্মীয় মৌলবাদ কোথাও আঞ্চলিক প্রভুত্ববাদ কোথাও ভাষিক আগ্রাসনবাদ বিষয়ী-সত্তার স্বাধীনতা, বেছে নেওয়ার ইচ্ছা, স্বতন্ত্র হওয়ার অধিকার কেড়ে নিয়ে তাকে বিষয়ে রূপান্তরিত করছে। ফলে উপনিবেশ-ক্লিষ্ট ব্যক্তি-পরিসরের সঙ্গে তার কার্যত কোনও তফাত থাকছে না। ব্যক্তি-স্তরেও তাকে পুরোপুরি সার্বভৌম মানুষ হয়ে উঠতে দিচ্ছে না কেউ। মনস্তাত্ত্বিক ও বস্তুগত স্তরে নয়া-ঔপনিবেশিক পীড়ন সক্রিয় থাকছে আগাগোড়া। এ প্রসঙ্গে ফ্রান্‌ৎস্‌ ফ্যানোনের 'Black skin, white masks' (১৯৫২) বইটির কথা উল্লেখ করা যায়।

বৈধতা-অবৈধতার প্রশ্নে কীভাবে সম্পৃক্ত হয়ে আছে শ্রেণী ও লিঙ্গগত বৈষম্যের প্রশ্নটি, এ-বিষয়ে স্বতন্ত্র প্রতিবেদন তৈরি করা যেতে পারে। উপনিবেশীকৃত ব্যক্তি কতভাবে হীনমন্যতার শিকার হয়ে দৃষ্টি ও অনুভবের ক্ষেত্রেও স্বেচ্ছাবন্দি হয়ে পড়ে, ফ্যানোন-সার্ত্রের যুগলবন্দিতে তা চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে। এই স্বেচ্ছাবন্দিত্ব কেন অবধারিত, কেনই বা দায়িত্ব-বৈধতা-স্বাধীনতার বোধ ক্রমাগত খণ্ডিত হতে থাকে, এর কারণ, সর্বজ্ঞ সর্বদ্রষ্টা সর্বত্রগামী শাসকেরা নিজেদের শাসিতজনদের কাছে কার্যত অদৃশ্য ও অমোঘ করে তুলতে পেরেছিল। ফলে শাসিতবর্গের মধ্যে চিরকাল প্রবলভাবে সক্রিয় থেকেছে 'internalizing the colonial ideology of inferiority'। সার্ত্র লক্ষ করেছেন কী বিচিত্রভাবে দ্বিমেরু-বিষম অবস্থানের মধ্যেও সক্রিয় থেকেছে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক : 'The torturer and tortured, racist and victim, colonizer and colonized, the empowered and disempowered were locked in a symbiotic relation in which the first could not escape the consequences of his relations with the second.' (২০০১ : তেরো)। এই প্রেক্ষিতে ফ্যানোন-এর 'The Wretched of the Earth' (১৯৬১) বইটির বিখ্যাত ভূমিকায় সার্ত্রের বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে।

ঔপনিবেশিক কৃৎকৌশল ঊর্ণাতন্তুর মতো পাকে-পাকে এমনভাবে জড়িয়ে নেয় নিরুপায় শিকারকে যে আপাত-বৈধতা ও আপাত-মুক্তি পাওয়ার নেশায় শোষিতদের একাংশ সত্তাতাত্ত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক দোলাচলের মধ্য দিয়ে স্বেচ্ছায় শাসক গোষ্ঠীর সহযোগী হয়ে ওঠে। এমনকী উত্তরোত্তর আরও বৈধতা ও মুক্তি পাওয়ার ইচ্ছায় নিজেদের অচিরেই পীড়নকারীতে রূপান্তরিত করে। নিচুতলার শিকারদের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যায় ক্রমশ, তাদের ঘিরে নেমে আসে নিশ্ছিদ্র নৈঃশব্দ্য। উনিশ শতকে সাধারণভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে এবং বিশেষভাবে বঙ্গভূমিতে এমনই তো ঘটেছিল। ফ্যাননের বইয়ের প্রাগুক্ত ভূমিকায়, প্রথম অনুচ্ছেদেই, সার্ত্র স্পষ্ট লিখেছেন যে 'মানুষ' অভিধার প্রকৃত দাবিদার সুসভ্য ইউরোপীয়েরা উপনিবেশের 'আধা-মানুষ' আদিবাসীদের উপহার দিয়েছে ভাষা ও জ্ঞান। আর, 'Between the former and the latter, corrupt

kinglets, feudal land-owners and an artificially created false bourgeoise served as intermediaries...The European elite set about fabricating a native elite, they selected adolescents, marked on their foreheads, with a branding iron, the principles of western culture, stuffed into their mouths verbal gags, grand turgid words which stuck to their teeth.' (২০০১ : ১৩৬)। এই বর্ণনা তো ঔপনিবেশিক বাংলার অভিজ্ঞতার সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থা পত্তন সম্পর্কে ম্যাকলে-র কুখ্যাত বক্তব্যও এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

পাঁচ

বাহান্ন বছর আগে সার্ত্র যে-সব চিন্তাপ্রসূ মন্তব্য করেছিলেন, তা কেবলমাত্র আলজেরিয়া বা আফ্রিকার অন্য সব শোষণ-ক্লিষ্ট উপনিবেশগুলি সম্পর্কে প্রযোজ্য, এমন নয়। নইলে বারবার আমরাও আমাদের ইতিহাস পুনর্বিবেচনা করতে চাইতাম না। সার্ত্র-কথিত অসুখী চেতনা (unhappy consciousness) ইতিমধ্যে বঙ্গজ চিন্তাবিদের কাছে মৌলিক ভাববীজ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে গেছে। তাঁর কাছে পাই যুগপৎ ব্যাধি ও তার উপশমের সংকেত; আশ্বস্ত হই এটা জেনে যে 'The third world is discovering itself and talking to itself through this voice.' (২০০১ : ১৩৯)। উপনিবেশীকৃত মেধার কৃত্রিম বিন্যাস ও আরোপিত চিত্রিত মুখোশের বিভ্রম পেরিয়ে গিয়ে আপন সত্তাকে আবিষ্কার করছে তৃতীয় বিশ্ব। তৈরি করছে নিজস্ব বয়ান, কথা বলছে নিজের সঙ্গে নিজেরই দিকে তাকিয়ে আপন কণ্ঠস্বরে। এতদিন ঔপনিবেশিক প্রভুরাই তো আমাদের পক্ষে কথা বলত; আমরা নিছক উপলক্ষ ছিলাম, লক্ষ্য হই নি কখনও। ফ্যাননের প্রতিবেদন থেকে কোন পাঠ নিতে পারি, তা এভাবেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন সার্ত্র। যেন আগাম ইশারা দিয়েছেন, বিশ শতকের শেষ দশক থেকে এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার নিয়ন্তা নব্য-উপনিবেশবাদী মার্কিন প্রভুর আমলে আমাদের ভূগোল-চেতনার অন্তরিক্ষকে গ্রাস করে আধিপত্যবাদী ভাষা-বয়ান-আখ্যান চরম ঔদ্ধত্যের সঙ্গে আক্রান্তেরও প্রতিনিধিত্ব করবে।

কিন্তু তখনও অব্যাহত রাখতে হবে প্রতিস্পর্ধা, তৃতীয় বিশ্বের বিকল্প ভাষা, বিকল্প বয়ান, বিকল্প বক্তব্য তুলে ধরার মধ্য দিয়ে। নব্য সাম্রাজ্যবাদের উদ্ধত একবাচনিকতার বিপ্রতীপে নিরবচ্ছিন্ন আত্ম-আবিষ্কার ও আপন ভাষা খুঁজে নেওয়ার প্রক্রিয়াই হবে হার-না-মানা প্রতিরোধের ঘোষণা। সার্ত্র যা ইউরোপ সম্পর্কে বলেছিলেন,পরিবর্তিত বাস্তবে তা এখন সাম্রাজ্যবাদী মিত্রশক্তির মোড়ল আমেরিকা সম্পর্কে প্রযোজ্য। এছাড়া তাঁর বক্তব্যের নির্যাস এখনও অম্লানভাবে প্রাসঙ্গিক : 'Thus Europe has multiplied divisions and oppositions, forget classes and sometimes racism, attempted by every means to cause and to increase the stratification of the Colonized societies.' (তদেব)। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই মন্তব্য যে প্রাক্তন

উপনিবেশগুলিকেএখন লড়াই করতে হবে নিজেরই বিরুদ্ধে। কথাটি যে কত অমোঘ, তা স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতবর্ষ (সেইসঙ্গে ভিন্ন ভিন্নভাবে পাকিস্তান ও বাংলাদেশও) নির্ভুলভাবে প্রমাণ করে চলেছে।

সার্ত্রের এই আশাও প্রণিধানযোগ্য : 'In the heat of the combat. all internal barriers must meet, the powerless bourgeoisie of racketers and traders, the urban proletariat which is always privileged, the lumpen proletariat of the shanty towns, all must come into line with the positions of the rural masses, the real reservoir of the national revolutionary army.' (তদেব)। সার্ত্রের এই আকাঙ্ক্ষা যে ভারতীয় উপমহাদেশে পূর্ণ হয়নি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এবং, পূর্ণ হয়নি বলেই তাঁর পরবর্তী মন্তব্যও নির্মম সত্য বলে গণ্য হতে পারে : 'If its momentum is halted and the Colonized bourgeoisie takes power, the new state, despite formal soveriegnty, remains in the hands of the Imperialists.' (তদেব)। গত পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করছে যে, মাত্রাগত ভিন্নতা থাকলেও ভারত-পাকিস্তান- বাংলাদেশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতের পুতুল হয়ে পড়েছে। বিশ্বায়নের সাম্প্রতিক পর্যায়ে এমনকি প্রাকরণিক সার্বভৌমত্বও অক্ষুণ্ণ রাখতে দিচ্ছে না মার্কিন সামরিক সাম্রাজ্যবাদ। তিনটি দেশেই রাষ্ট্র ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছিল উপনিবেশীকৃত বুর্জোয়া বর্গের হাতে। এইজন্যে এই তিনটি দেশেই ,নিজেদের স্বতন্ত্র বাস্তব অনুযায়ী, আলাদা আলাদা ধরনে, শ্রেণী-মৈত্রী চূর্ণ করে দিয়ে বিপ্লবের সম্ভাবনাকে প্রতিহত করা হয়েছে।

একুশ শতকের নব্য বাস্তবে সার্ত্রের মূল্যবান প্রবন্ধগুলি গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে পুনঃপাঠ করা প্রয়োজন। বিশেষত বিশ্বায়নের ফলে অভাবনীয় সব জটিলতা দেখা দিয়েছে। প্রাক্তন উপনিবেশগুলিতে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক পুনর্নির্মাণের উদ্যোগ ভেতরে ও বাইরে বিচিত্র সংকটের মোকাবিলা করছে। উপনিবেশবাদ নিশ্চয় আগের পোষাকে ও স্বভাবে নেই। কিন্তু এককেন্দ্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থায় আধিপত্যবাদের প্রকরণ যেহেতু অনেক বেশি পরিশীলিত ও সর্বাত্মক, উপনিবেশোত্তর চেতনা- বিষয়ক প্রতিবেদনগুলির মধ্যে সার্ত্রের পুনরুত্থাপন খুব জরুরি। তাঁর তুলনামূলক অনুপস্থিতির কারণ যা-ই হোক, সংকটের বিপুল আবর্তের মুখোমুখি হয়ে আমরা সার্ত্রের চার দশক ব্যাপী জিজ্ঞাসার গ্রন্থনা থেকে সাম্প্রতিক পর্যায়ের উপযোগী সম্ভাব্য উপনিবেশোত্তর চিন্তার সূত্রায়ন নিশ্চয় করতে পারে। সাঈদ-হোমি ভাবা কিংবা ফুকো-আলত্যুসের অথবা লিওতার-জেমসন-দেরিদা পরবর্তী চিন্তাবিশ্বে সংশ্লেষণী ভাবনা-প্রস্থানের প্রয়োজন অনেকেই অনুভব করছেন। জাঁ পল সার্ত্র হতে পারেন এই পর্যায়ের অনুঘটক। উপনিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিস্পর্ধা যদি মুক্তিকামী মানুষের পক্ষে অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়, তাহলে সার্ত্রের রচনার শতবার্ষিক পুনঃপাঠ হয়ে উঠুক প্রত্যয়ের, সংঘর্ষের, পুনর্গঠনের নতুন বিশল্যকরণী আর দীপ-পরম্পরার উৎস-আলো।

নখদর্পণে প্রতিবিম্ব : প্রসঙ্গ লাকাঁ

বিশ শতকের সমানবয়সী তিনি, জাক-ম্যারি এমিল লাকাঁ। শতাব্দীর প্রথম বছরে জন্ম (১৩ এপ্রিল, ১৯০১) নিয়ে যেন বা ইতিহাস-নির্ধারিত ভাবেই এই শতকের জটিলতাকে ধারণ করছেন আপন অস্তিত্বে। ১৯৮১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর প্রয়াত হয়েছেন সেই পারি মহানগরেই যা তাঁর জন্মস্থান ও ধাত্রীভূমি। ব্যক্তিজীবনেও ছিল নানাধরনের উচ্চাবচতা, জটিলতা আর ধূসরতা। মনোবিকলনবিদ্যাকে তিনি পৌঁছে দিয়েছেন অভাবনীয় ব্যাপ্তিতে ও গভীরতায়। তবু শেষ পর্যন্ত তাঁকে আর যা-ই হোক সহজপাঠ্য বলা চলে না কিছুতেই। বরং তিনি ও তাঁর ভাববিশ্ব মূলত দুরূহ রহস্যময় ও দুরধিগম্য। অথচ বিশ শতকের চিন্তাজগতে নিরন্তর ঘটে-যাওয়া বৈপ্লবিক আলোড়নের পরম্পরা সম্পর্কে যাঁদের কৌতূহল রয়েছে, তাঁরা কেউই জাক লাকাঁকে এড়িয়ে যেতে পারেন না। তাই কায়িক অবসানের প্রায় তিন দশক পরেও তাঁর ভাববিশ্ব ও বয়ানের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচকেরা নানা শিবিরে বিভক্ত এবং তাঁদের মধ্যে তীব্র বিতর্ক অব্যাহত। ভারতীয় উপমহাদেশের বাঙালি পড়ুয়ারা ঐ শিবির-বিভাজন কিংবা বিতর্কের উত্তাপ ও কটু স্বাদ সম্পর্কে আগ্রহী নন। তাঁরা বুঝতে চাইবেন, লাকাঁর চিন্তাবিশ্ব কি আসলে ভুলভুলাইয়া কিংবা চক্রব্যূহ যেখানে প্রবেশ আছে কিন্তু নির্গম নেই। রহস্য-গ্রন্থিলতারও তো রয়েছে নিজস্ব যুক্তিশৃঙ্খলা; অন্যভাবে যদি লিখি, প্রচলিত ভাবনাপ্রকরণ প্রত্যাখ্যানের গভীরতর হেতু যা কারো কারো কাছে method in madness।

'কবিকে পাবে না তার জীবনচরিতে': বলা হয়ে থাকে। তেমনই শিল্পীকে-সাহিত্যিককে-চিন্তাগুরুকেও। কিন্তু এ তো আংশিক সত্য মাত্র। প্রত্যেকেই সময়ের সন্ততি; তবে সময়ের রৌদ্রছায়া, অন্তর্গূঢ় ভাঙা-গড়া, সোচ্চার ও নিরুচ্চার স্বরের গ্রন্থনায় লালিত হতে-হতে কেউ কেউ সময়কেও নিজস্ব খাতে বইয়ে দিতে পারেন। লাকাঁ তেমনই ব্যক্তিত্ব; তাই তাঁর জীবনপঞ্জির দিকে আড়চোখে তাকানো যেতে পারে যেহেতু 'there cannot be a figure without a ground' ! বিশ শতকের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিসরে যেসব তুমুল ভাঙচুর হয়েছিল, বাহিরে ও ভিতরে বারবার ঘটে গিয়েছিল বিচিত্র উদয় ও অস্ত—তা তো কেবল প্রতীচ্যে সীমিত ছিল না; ঔপনিবেশিক সমাজগুলিতেও সেইসব তরঙ্গ-বিক্ষোভের বিপুল অভিঘাত তৈরি হচ্ছিল। অন্তহীন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মন্থনের নিরিখে বিশ শতক প্রতীচ্যের ইতিহাসে দোসরহীন। এতসব আবর্ত কবি-লিখিয়ে-শিল্পী-চিন্তাবিদদের ভাববিশ্বে যে কার্যত অন্তহীন জটিলতা-ধুপছায়া-উচ্চাবচতা তৈরি করেছিল, এর দৃষ্টান্ত রয়েছে বিশ শতকের অজস্র অস্থির চিন্তাপ্রস্থানগুলির সূচনায় ও অবসাদে। মনোবিকলনবাদ-সামূহিক নির্জ্ঞানতত্ত্ব

উদ্ভূত না হলে কি ডাডাবাদ ও পরাবাস্তববাদ দেখা দিত? বাস্তববাদ ও স্বভাববাদের প্রভাব খর্ব করে ক্রমশ যে দেখা দিল ভবিষ্যবাদ, অস্তিত্ববাদ এবং এদের চিন্তা-পৃথিবীকেও মোকাবিলা করতে হলো মার্ক্সবাদের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতির সঙ্গে—এই সবই তো বিশ শতকের উপার্জন। সেইসঙ্গে কখনও স্তিমিত আর কখনও তীব্র গতিতে প্রবাহিত হলো প্রকরণবাদ, ভাষাবিজ্ঞান থেকে উদ্ভূত আকরণবাদ, চিহ্নতত্ত্ব, আখ্যানতত্ত্ব-এ। আবার এইসব কিছুর সমবায়ী উপস্থিতিতে ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠল আকরণোত্তরবাদ, বিনির্মাণবাদ, নারীচেতনাবাদ, মার্ক্সীয় সংস্কৃতিবিদ্যা, পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদ, উপনিবেশোত্তরচেতনাবাদ, নিম্নবর্গীয় চেতনাপন্থা ইত্যাদি। তার ওপর অব্যাহত ছিল আধুনিকতাবাদের ক্ষয় ও নতুন সামর্থ্যসন্ধান। এল নব্য আধুনিকতাবাদ ও আধুনিকোত্তরবাদ। চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছিল রাজনৈতিক পরিসর; আমূল বদলে যাচ্ছিল মানচিত্র এবং সেইসঙ্গে অনিবার্যভাবে ক্ষমতায়ন ও প্রতিরোধ-আকল্পের বিন্যাস।

লাকাঁ তো এই অনেকান্তিক প্রেক্ষিতকেই শুষে নিয়েছেন আপন সত্তার নিষ্কর্ষে। তাঁর জীবৎকালেই ঘটে গিয়েছিল দুটি বিধ্বংসী বিশ্বযুদ্ধ যার ফলে শান্তি-সম্প্রীতি-সংবেদনশীলতা-সহাবস্থান প্রভৃতি যাবতীয় চিরাগত মূল্যবোধ অভূতপূর্ব প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিল। পাশাপাশি ১৯১৭ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নিয়ে এল নতুন জীবন-স্বপ্ন ও মুক্ত পৃথিবী গড়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি। তিরিশের দশকে পুঁজিবাদী অর্থনীতিও সংকটগ্রস্ত হয়ে নিয়ে এল মহামন্দা। তখনই আবার ক্রমশ পৃথিবীর নানাপ্রান্তে জোরদার হয়ে উঠেছিল উপনিবেশবাদ-বিরোধী সংগ্রামগুলি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তিম প্রহরে সমস্ত ন্যায়নীতিকে পদদলিত করে প্রভুত্ববাদী মার্কিন শক্তি জাপানে পরপর দুটি পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করল। পরবর্তী পর্যায়ে যান্ত্রিক প্রযুক্তির ক্রমোৎকর্ষে নির্ভর করে পুঁজিবাদ যখন নয়া উপনিবেশবাদে রূপান্তরিত হচ্ছে, ভাবনা -পৃথিবীতেও দেখা গেল ব্যক্তিসত্তার বিবরায়ন। পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক শিবিরেও দেখা গেছে অভ্যন্তরীন নানা চাপের ফলে ভাবাদর্শ-বিচ্যুতি এবং প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বহুবিধ স্খলন। পশ্চিমী আলোচকদের কাছে তা স্নায়ুযুদ্ধের পর্যায়। বস্তুবিশ্ব যখন চূড়ান্ত অনিশ্চিত ও আত্মদ্বন্দ্বে বিভোর, লাকাঁ তাঁর প্রখর সংবেদনশীলতা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বোধ নিয়ে কিন্তু ঐ বস্তুবিশ্বের দিকে তেমনভাবে তাকালেন না। তিনি ডুব দিলেন সেই ফ্রয়েডীয় ভাবনালোকে যেখানে আলোর চেয়ে ছায়াঞ্চল ও রহস্যঘন অন্ধকারই বেশি প্রাসঙ্গিক। লাকাঁ যেহেতু প্রতীকী বিশ্ব সম্পর্কে বেশি মনোযোগী, সেই সূত্রে লিখতে পারি, বিশ শতকের সর্বত্রব্যাপ্ত বিনির্মাণ তাঁর কাছে প্রতীকী প্রক্রিয়া হিসেবেই ধরা দিয়েছিল।

দুই

সুতরাং লাকাঁর জীবনপঞ্জির বিভিন্ন অনুপুঙ্খ আলাদাভাবে নয়, তাঁর বৌদ্ধিক জীবনের সমবায়ী উপস্থিতিতে জরুরি সংকেত হিসেবেই গ্রাহ্য। তাঁর কায়িক অবসানকে যদি মোহানা বলে ভাবি, সেই বিন্দু থেকেই ফিরে তাকাতে পারি তাঁর হয়ে ওঠার ক্রমিক ইতিহাসের দিকে :

১৯০১ : আলফ্রেড লাকাঁ ও এমিলি বোউদ্রির প্রথম সন্তান জাক-মারি এমিল লাকাঁর জন্ম হল ১৩ এপ্রিল। পারি নগরের রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতের অনুসারী মধ্যবিত্ত পারিবারিক বেষ্টনীতে শৈশব ও কৈশোর কেটেছে।

১৯০২ : ভাই রেমোঁর জন্ম।

১৯০৩ : ২৫ ডিসেম্বর : বোন ম্যাগভেলাইন-মারি-র জন্ম।

১৯০৪ : রেমোঁর মৃত্যু।

১৯০৬ : ১৬ নভেম্বর : মারি-লুই ব্লঁদাঁ-র জন্ম, পরে যিনি জাক লাকাঁ-র প্রথম স্ত্রী হয়েছেন।

১৯০৭ : কলেজ স্তানিস্লাসে বিদ্যারম্ভ। ১৯১৯ পর্যন্ত এখানেই তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ সম্পূর্ণ করেছেন।

১৯০৮ : ১ নভেম্বর। জাক লাকাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী সিল্‌ভিয়া মাক্‌লে-র জন্ম। ২৫ ডিসেম্বর : ভাই মার্ক মারি-র জন্ম।

১৯১৯ : মাধ্যমিক পর্যায়ের পড়াশোনা শেষ করে জাক লাকাঁ চিকিৎসাবিদ্যায় পাঠ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন।

১৯২০ : পরাবাস্তববাদের প্রবক্তা আঁদ্রে ব্রেতোঁ-র (১৮৯৬-১৯৬৬) সঙ্গে লাকাঁর সাক্ষাৎ হচ্ছে। পরাবাস্তববাদী শিল্প-আন্দোলন সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।

১৯২১ : শীর্ণকায় হওয়ার জন্যে সামরিক পরিষেবা থেকে অব্যাহতি পাচ্ছেন। ডিসেম্বরে জেম্‌স জয়েস (১৮৮২-১৯৪১) তাঁর বিখ্যাত ইউলিসিস বইটি যখন সাধারণ পাঠকদের কাছে পড়ে শোনাচ্ছেন, তিনিও তাতে উপস্থিত ছিলেন।

১৯২৬ : ফরাসি মনোবিকলনবাদীদের প্রথম সংস্থা 'সাসোইট সাইকোঅ্যানালিটিক দ্য পারি' (SPP) সৃষ্টি হচ্ছে ৪ নভেম্বর। লাকাঁ সেদিন তাঁর প্রথম বিশ্লেষণ (case) উপস্থাপিত করেছেন এবং ঐ উপস্থাপনার ওপর ভিত্তি করে তাঁর প্রথম বিশ্লেষণী নিবন্ধও প্রকাশ করেছেন।

১৯২৭-২৮ : আঁরি ক্লদ-এর (১৮৬৯-১৯৪৫) তত্ত্বাবধানে তিনি মনোবিকলনের পরীক্ষাগারে প্রশিক্ষণ (clinical training) নিতে শুরু করেছেন। মনোবিজ্ঞান ও তার প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে অমূল্য অভিজ্ঞতা অর্জিত হচ্ছে। আঁরি অ্যাই (১৯০০-১৯৭৭)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হচ্ছে।

১৯২৮ : মারিথেরেসা বের্গেরো-কে বাগদান করছেন লাকাঁ যাকে পরে তাঁর ডক্টরেট ডিগ্রীর সন্দর্ভ উৎসর্গ করেছেন।

এবছরই সমকালীন আরেক ব্যতিক্রমী চিন্তাবিদ জর্জ বাতাইল (১৮৯৭-১৯৬২) ও সিলভিয়া মাক্‌লে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হচ্ছেন।

১৯২৮-২৯ : বিশেষ ধরনের পুলিশি পরীক্ষাগারে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন লাকাঁ।

১৯২৯ : জাক লাকাঁর ভাই মার্ক-মারি এবছর খ্রিস্টীয় ধর্মযাজকের প্রশিক্ষণ নিয়ে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেছেন।

১৯২৯-১৯৩১ : পারি নগরের সঁৎ-অ্যান হাসপাতালের সঙ্গে সম্পৃক্ত পরীক্ষাগারে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন লাকাঁ।

১৯৩০ : প্রখ্যাত পরাবাস্তববাদী চিত্রকর সালভাদোর দালি (১৯০৪-১৯৮৯) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হচ্ছে। এবছরই তাঁর প্রথম একক প্রবন্ধ অ্যানাল মেডিকো-সাইকোলজিক পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে।

জুরিখের একটি ক্লিনিকে নিযুক্তি হচ্ছে তাঁর। ১০ জুন : জর্জ বাতাইল ও সিলভিয়া মাক্লের মেয়ে লরেন্স বাতাইলের জন্ম।

১৯৩১ : এবছর অভিনেত্রী হুগুয়েত ডাফ্লোকে হত্যা করার ব্যর্থ চেষ্টার পরে মার্গারেট পঁতেইন্-আঁজিও হাসপাতালে চিকিৎসিত হচ্ছিলেন। লাকাঁ তার অধীত বিদ্যা ও প্রশিক্ষণ অনুযায়ী মার্গারেটকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করেন। তাঁর পর্যবেক্ষণের ফলে উদ্ভূত সিদ্ধান্ত সমূহ বিবৃত হয়েছে তাঁর ডক্টরেট ডিগ্রীর সন্দর্ভে।

১৯৩২ : দশ বছর আগে প্রকাশিত 'some neurotic mechanisms in jealousy, paranoia, homosexuality' শীর্ষক ফ্রয়েডের নিবন্ধটি ফরাসিতে অনুবাদ করেছেন লাকাঁ।

এবছর নভেম্বরে গবেষণার জন্যে ডক্টরেট ডিগ্রী পেয়েছেন তিনি। সন্দর্ভটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার পরে লাকাঁ বইটি ফ্রয়েডের কাছে পাঠিয়েছেন।

১৯৩৩ : মারি-লুই ব্লুঁদাঁর প্রেমে পড়েছেন লাকাঁ।

এবছর অক্টোবরে আলেকজান্ডার ক্লোজেভ আয়োজিত হেগেল রচিত Phenomenology of spirit সংক্রান্ত আলোচনাচক্রে যোগ দিয়েছেন লাকাঁ। এই অনুষ্ঠানেই জর্জ বাতাইল ও রেমোঁ কুইনোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে তাঁর।

১৯৩৪ : এবছর ২৯ জানুয়ারি মারি লুই ব্লুঁদাঁকে বিয়ে করেছেন লাকাঁ।

জর্জ বাতাই ও সিলভিয়া মাক্লের বিবাহ বিচ্ছেদ হচ্ছে।

লাকাঁ স্বাধীনভাবে চিকিৎসা শুরু করেছেন।

এবছর নভেম্বরে S.P.P নামক সংস্থার প্রার্থী সদস্যপদ লাভ করেছেন তিনি।

১৯৩৬ : চেকোশ্লোভাকিয়ায় আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মনোবিকলন বিদ্যার সম্মেলনে লাকাঁ তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'লে স্তাদ দু মিরোয়া' পেশ করেছেন।

১৯৩৭ : ৮ জানুয়ারি লাকাঁর প্রথম কন্যা কারোলিন মারি-ইমেজ লাকাঁর জন্ম।

১৯৩৮ : অঁরি ওয়ালঁ ও লুসিয়েঁ ফেভ্রে সম্পাদিত ফরাসি বিশ্বকোষ গ্রন্থে পরিবার সম্পর্কে একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

সিলভিয়া মাক্লে-বাতাইল এর সঙ্গে প্রেমের সূচনা।

ছ' বছর আগে রুডোল্ফ্ লাহেব্স্টাইন (১৮৯৮-১৯৭৬) এর সঙ্গে যে যৌথ মনোবিকলনবাদী বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয়েছিল, এবছরের শেষে তা সমাপ্ত হল। এর ফলে লাকাঁ প্রাগুক্ত S.P.P সংস্থার পূর্ণ সদস্য হিসেবে গৃহীত হলেন।

১৯৩৯ : ২৭ আগস্ট : লাকাঁ ও মারি লুই-ব্লুঁদাঁর দ্বিতীয় সন্তান থিবো লাকাঁর জন্ম।

২৩ সেপ্টেম্বর : লন্ডনে সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মৃত্যু।

১৯৪০ : জুনে ফ্রান্সের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মৌলিক পরিবর্তন ঘটায় S.P.P সংস্থার সমস্ত কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত রাখল।

২৬ নভেম্বর : লাকাঁ ও মারি লুই ব্লুঁদাঁর তৃতীয় সন্তান সিবিল লাকাঁর জন্ম।

১৯৪১ : লাকাঁ পারি নগরে তাঁর বাসা বদল করলেন। আমৃত্যু এই বাড়িতে থেকেই তিনি রোগীদের চিকিৎসা সহ নিজের বৌদ্ধিক কাজ চালিয়ে গেছেন।

৩ জুলাই : লাকাঁ ও সিলভিয়া মাক্‌লে-বাতাইলের কন্যা জুডিথ বাতাইলের জন্ম।

১৫ ডিসেম্বর: লাকাঁ ও মারি-লুই-ব্লুঁদাঁর আনুষ্ঠানিক বিবাহ বিচ্ছেদ।

১৯৪৪ : লাকাঁর সঙ্গে জাঁ-পল সার্ত্র (১৯০৫-১৯৮০), পাব্‌লো পিকাসো (১৮৮১-১৯৭৩) ও মোরিস মার্লো-পঁতির (১৯০৮-১৯৬১) সঙ্গে। পিকাসোর ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে গণ্য হলেন লাকাঁ।

১৯৪৫ : সেপ্টেম্বরে লাকাঁ ইংল্যান্ড-এ গিয়ে সমকালীন ব্রিটিশ মনোবিকলনবিদ্যা অধ্যয়ন করলেন।

১৯৪৬ : S.P.P আবার তার সংস্থার কাজ শুরু করল।

৯ আগস্ট : জর্জ বাতাইল ও সিলভিয়া মাক্‌লের আনুষ্ঠানিক বিবাহ বিচ্ছেদ।

১৯৪৮ : S.P.P সংস্থার শিক্ষক সমিতির সদস্য হিসেবে লাকাঁ গৃহীত হলেন।

২১ নভেম্বর : লাকাঁর মায়ের মৃত্যু।

১৯৪৯ : লাকাঁর সঙ্গে আকরণবাদী আখ্যানতত্ত্ব ও সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের জনক ক্লদ লেভিস্ট্রাউসের সাক্ষাৎ।

১৭ জুলাই: জুরিখে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মনোবিকলনবাদী সংস্থার ষোড়শ কংগ্রেসে যোগ দিয়ে লাকাঁ তার প্রখ্যাত দর্পণ-তত্ত্ব সম্পর্কে প্রবন্ধ পেশ করেছেন।

১৯৫১ : মনোবিকলনবাদী বিশ্লেষণ-পদ্ধতির প্রায়োগিক দিক নিয়ে লাকাঁর সঙ্গে SPP সংস্থার সদস্যদের মতপার্থক্য দেখা দিচ্ছে। ফ্রয়েডীয় ভাবনা-পুনর্বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে।

২ মে : ব্রিটিশ সাইকোঅ্যানালাইটিক সোসাইটিতে ‘Some Reflections on the Ego’ শীর্ষক বক্তৃতা।

১৯৫১-৫২ : ‘নেকড়ে-মানুষ’ সংক্রান্ত ফ্রয়েডের বিখ্যাত বক্তব্য সম্পর্কে আলোচনাচক্র সংগঠিত করেছেন লাকাঁ।

১৯৫২ : সাসা নাখ্‌ট (১৯০১-১৯৭৭) SPP সংস্থার সভাপতি হিসেবে ইনস্টিটুট দ্য সাইকোঅ্যানালিস নামে নতুন প্রশিক্ষণ সংস্থার সংগঠন সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য পেশ করার পরে সদস্যদের মধ্যে যে অসন্তোষ দেখা দেয়, এর প্রতিক্রিয়ায় নাখ্‌ট ডিসেম্বরে সংস্থার সঞ্চালক পদ থেকে ইস্তফা দেন। লাকাঁ অন্তর্বর্তী সঞ্চালক হিসেবে নির্বাচিত হন।

১৯৫৩ : ২০ জানুয়ারি: লাকাঁ SPP এর সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হলেন। অন্যদিকে সাসা নাখ্‌ট্ প্রশিক্ষণ সংস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ পুনঃস্থাপন করলেন।

১৬ জুন : লাকাঁ SPP এর সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিলেন। ইতিমধ্যে সোসাইটে

ফ্রাঁসাই দ্য সাইকোঅ্যানালিস (SFP) নামে যে- সংস্থা গড়ে উঠেছে, লাকাঁ কিছুদিন পরে তাতে যোগ দিয়েছেন।

জুলাই : মনোবিকলনবাদীদের আন্তর্জাতিক সংস্থা IPA নবগঠিত SFP সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।

৮ জুলাই : প্রতীকী, কাল্পনিক ও বাস্তব সত্তা সম্পর্কে বিখ্যাত বক্তৃতাটি SFP সংস্থার উদ্বোধনী ভাষণ হিসেবে দিয়েছেন লাকাঁ।

১৭ জুলাই : জাক লাকাঁ ও সিলভিয়া মাক্‌লে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহিত হচ্ছেন।

২৬ সেপ্টেম্বর : 'Rome Discourses' শীর্ষক বিখ্যাত ভাষণ দিচ্ছেন লাকাঁ, যার বিষয় হল : 'The function and field of speech and language in psychoanalysis'

১৮ নভেম্বর : মনোবিকলনের আঙ্গিক সম্পর্কে ফ্রয়েডের নিবন্ধমালা বিষয়ক ভাষণগুলি দিয়ে সঁৎ-অ্যান-হাসপাতালে লাকাঁর সাধারণ ধারাবাহিক আলোচনাচক্রের সূত্রপাত যা ১৯৮০ সালের জুন মাস পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। পাশাপাশি ঐ হাসপাতালে তাঁর সাপ্তাহিক নিরীক্ষা-নির্ভর উপস্থাপনাগুলিও অক্ষুণ্ণ ছিল।

১৯৫৪ : স্যুইজারল্যান্ডে কার্ল গুস্তাভ ইয়ুঙ্গ (১৮৭৫-১৯৬১) এর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন লাকাঁ।

১৯৫৫ : জার্মানিতে গিয়ে বিখ্যাত অস্তিত্ববাদী দার্শনিক মার্টিন হাইদেগার (১৮৮৯-১৯৭৬) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন লাকাঁ।

জুলাই : আন্তর্জাতিক সংস্থার অনুমোদনের জন্যে SFP এর আবেদন প্রত্যাখ্যান করল IPA।

আগস্ট-সেপ্টেম্বর: লাকাঁর পারির বাড়িতে হাইদেগার ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ।

১৯৫৬ : লাকাঁর Rome Discourse এবং হাইদেগারের Logos (১৯৫১) নামক রচনার লাকাঁ-কৃত অনুবাদ প্রকাশিত হল 'La psychoanalyse' নামক পত্রিকার প্রথম সংখ্যায়।

১৯৫৯ : জুলাই: অনুমোদনের জন্যে IPA এর কাছে আবার আবেদন করল SFP। এই প্রসঙ্গে একটি অনুসন্ধান সমিতিও গঠিত হল।

১৯৬০ : ১৫ অক্টোবর: লাকাঁর বাবার মৃত্যু।

১৯৬১ : IPA 'Study Group' হিসেবে SFP গৃহীত হল। কিন্তু তাতে প্রাক্-শর্ত ছিল: জাক লাকাঁ ও ফ্রাঁসোয়া ভোল্‌টোকে সংস্থার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা থেকে অপসারিত করতে হবে।

১৯৬৩ : আগস্ট: SFP কে সতর্ক করে দেওয়া হল যে তাদের স্বীকৃতি IPA প্রত্যাহার করে নেবে যদি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সঙ্গে লাকাঁর সম্পর্ক অব্যাহত থাকে।

১৯ নভেম্বর : SFP সংস্থার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যই IPA এর শর্ত মেনে নিল।

২০ নভেম্বর : 'The names-of-The Father' শীর্ষক আলোচনাচক্রের মধ্য দিয়ে SFP এর সঙ্গে লাকাঁর সম্পর্ক শেষ হল।

তিন

১৯৬৪ : দীর্ঘস্থায়ী আইনি লড়াই এর পর জুডিথ তাঁর বাবার পদবি ব্যবহারের অধিকার পেয়েছেন।

জানুয়ারি : ক্লদ লেভিস্ট্রাউস্ ও লুই আলত্যুসের এর প্রচেষ্টায় একোলে নরমাল সুপিরিয়র-এ মনোবিকলনের ভিত্তিভূমি সম্পর্কে আলোচনাচক্রের সূত্রপাত করলেন লাকাঁ।

২১ জুন : লাকাঁ একোলে ফ্রয়েডিয়ান দ্য পারি (EFP) সংস্থার পত্তন করলেন।

অক্টোবর : লা সাইকো অ্যানালাইস পত্রিকার শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হল।

১৯৬৫ : ১৯ জানুয়ারি : SFP সংস্থা ভেঙে দেওয়া হল।

১৯৬৬ : কাহির প্যু লা-অ্যানালিস পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হল।

ফেব্রুয়ারি-মার্চ: আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা বিষয়ে রোমান য়্যাকোবসন্ (১৮৯৬-১৯৮২) আয়োজিত বক্তৃতামালা উপস্থাপন করলেন লাকাঁ আমেরিকার ছ'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

১৮-২১ অক্টোবর : জন্‌স্ হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে 'The languages of criticism and the sciences of man' শীর্ষক আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে যোগ দিয়েছেন লাকাঁ।

নভেম্বর : Ecrits প্রকাশিত হল।

ডিসেম্বর : জুডিথ লাকাঁর সঙ্গে জ্যাক্-অ্যালাঁ মিলেরের বিবাহ।

১৯৬৭: ৯ অক্টোবর : মনোবিকলনবাদী চিন্তা-প্রস্থানের নতুন বিশ্লেষণ-পদ্ধতি ও প্রকরণ সম্পর্কে প্রস্তাব পেশ করেছেন লাকাঁ।

১৯৬৮ : পারি নগরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিকলন বিভাগ খোলা হল ডিসেম্বরে।

১৯৬৯ : জানুয়ারি: প্রাগুক্ত নবগঠিত বিভাগে শিক্ষাদানের সূত্রপাত।

মার্চ: EFP সংস্থার মধ্যে মতবিরোধের ফলে OPLF নামে নতুন সংস্থার সূত্রপাত।

নভেম্বর : লাকাঁ তাঁর আলোচনা-চক্রের স্থান পরিবর্তন করলেন।

১৯৭৩ : সেপ্টেম্বর: লাকাঁর একাদশ আলোচনা-চক্রের প্রতিবেদন 'The four fundamental concepts of phychoanalysis' নামে প্রকাশিত হল। মূল ফরাসি ভাষায় বইটির গ্রন্থনা ও সম্পাদনা করেছেন লাকাঁর জামাতা জাক-অ্যালাঁ মিলের।

৩০ মে : লাকাঁর প্রথম কন্যা ক্যারোলিন লাকাঁ রোজের মৃত্যু।

১৯৭৪ : ভিঁসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিকলন বিভাগটি পুনর্গঠিত হল এবং জাক-অ্যালাঁ মিলের তার নতুন সঞ্চালক নিযুক্ত হলেন।

১৯৭৫ : ১৬ জুন : পারি নগরে লাকাঁর তত্ত্বাবধানে জেমস্ জয়েস সংক্রান্ত পঞ্চম আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্র শুরু হল।

নভেম্বর-ডিসেম্বর : আমেরিকার তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে লাকাঁর বক্তৃতা-সফর।

১৯৭৭ : অ্যালান শেরিডানের অনুবাদে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হল Ecrits: A selection Seminar XI: the four fundamental concepts of psycho-analysis। দ্বিতীয় বইটির জন্যে লাকাঁ নতুন প্রাক্-কথন লিখে দিয়েছেন।

১৯৭৯ : জুডিথ মিলেরের সঞ্চালনায় ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব আলোচনার নতুন সংস্থার জন্ম।

১৯৮০ : ৫ জানুয়ারী: লাকাঁ EFP সংস্থা ভেঙে দিলেন।

১২-১৫ জুলাই: জুডিথ সঞ্চালিত সংস্থার প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে লাকাঁ সভাপতিত্ব করলেন।

অক্টোবর : একোলে দ্য লা কোজ্ ফ্রয়েডিয়েন (ECF) নামে নতুন সংস্থার জন্ম।

১০ অক্টোবর : লাকাঁ তার জীবনের শেষ নিরীক্ষা-নির্ভর বয়ান উপস্থাপন করলেন।

১৯৮১ : ৯ সেপ্টেম্বর: পারি নগরে লাকাঁর দেহাবসান।

১৯৮৩ : মারি-লুই ব্লঁদা-র মৃত্যু।

১৯৮৫ : পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, ফ্রান্সে বর্তমান কুড়িটি মনোবিকলনমূলক সংস্থার মধ্যে উনিশটি লাকাঁর চিন্তাধারায় প্রভাবিত।

১৯৮৬ : লরেন্স বাতাইলের মৃত্যু।

১৯৯৩ : সিলভিয়া ম্যাকলে-লাকাঁর মৃত্যু।

১৯৯৪ : মার্ক-ফ্রাসোঁয়া লাকাঁর মৃত্যু।

২০০১ : জন্মশতবর্ষ পূর্তিতে প্রতীচ্যের আধুনিকোত্তর চিন্তাপ্রণালীতে লাকাঁর অবদান মানববিদ্যার পরস্পর-ভিন্ন চিন্তা প্রস্থানসমূহ দ্বারা বিপুলভাবে পরীক্ষিত ও স্বীকৃত হয়েছে।

চার

নিরীক্ষা-নির্ভর মনোবিকলনবাদী ভাবনার যথার্থতা প্রয়োগের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে থাকে। শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার চলচ্ছবি ও মিথষ্ক্রিয়া থেকে কত ধরনের অনুসিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব, লাকাঁর চিন্তাপ্রণালী নিরন্তর বিনির্মাণ করে বুঝে নিতে পারি। মনোবিজ্ঞানের বিচ্ছুরণ থেকে দার্শনিক অন্বীক্ষাই কেবল নতুন দিশার সন্ধান পায়নি, ভাবনার নতুন সংকেতে ঋদ্ধ হয়েছে সমাজবিজ্ঞান, নন্দনতত্ত্ব, সাহিত্যবিদ্যা, সংস্কৃতিবিদ্যা, লৈঙ্গিক প্রতিবেদন-তত্ত্ব সহ মানবিকী বিদ্যার বহুমুখি আকরণোত্তর পাঠ। তবে একথা প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে অপরিবর্তনীয় পূর্বনির্ধারিত আকরণের দ্বারা শাসিত একবাচনিক পাঠাভ্যাসের নিরিখে লাকাঁর চিন্তাবিশ্ব দুর্ভেদ্য প্রহেলিকার দুর্গ মাত্র। বিদ্যায়তনিক অধ্যয়নকে যতক্ষণ বহুমাত্রিক প্রেক্ষিতে পুনর্বিন্যস্ত না করছি, এই মৌলিক উপলব্ধির নিষ্কর্ষ স্পষ্ট হবে না যে চেতনা এবং তার অভিব্যক্তি স্বভাবে অনেকান্তিক। আর, লাকাঁ সম্পর্কে উদাসীন থাকব এই ভেবে যে তিনি মূলত

'indefatigable promulgator of oblique ideas lacking coherence, consistency and, most importantly, empirical validation.' (Dany Nobus : Jacques Lacan and the Freudian Practice of Psychoanalysis: Routledge : London : 2000 : P 203)! এই মন্তব্যকে উড়িয়ে দেওয়াও সহজ নয়। প্রতীচ্যের তত্ত্ববিশ্ব সম্পর্কে ভারতীয় উপমহাদেশের পড়ুয়াদের, বিশেষত বাঙালি পাঠকদের, অপরিচয়জনিত সমস্যা এবং অস্বস্তি তো আছেই। তার ওপর রয়েছে মনোবিকলনবাদ সম্পর্কে অস্বচ্ছতা ও অপ্রস্তুতি। ফ্রয়েডীয় ভাবনাকে নতুন খাতে বইয়ে দিতে গিয়ে লাকাঁ যে-পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন, তার অন্তর্বৃত জটিলতা আরো বহুগুণ বেশি সমস্যা তৈরি করেছে অপ্রত্যাশিত সব মন্তব্যের সূত্রে। যেমন, লাকাঁর নিম্নোক্ত মন্তব্যগুলি পাঠকদের বিমূঢ়, বিক্ষুব্ধ ও সন্দিগ্ধ করে তুলেছে :

ক. মানুষ পা দিয়ে কিংবা কখনও কখনও কপালের পেশি দিয়ে চিন্তা করে, মস্তিষ্ক দিয়ে নয়।

খ. যে-বস্তু নেই, তা কাউকে দেওয়ার নামই হল ভালবাসা।

গ. নারী অস্তিত্বহীন।

ঘ. যৌন সম্পর্ক বলে কিছু হতে পারে না।

এ ধরনের মন্তব্য নিঃসন্দেহে বিতর্ক উস্কে দেয়। লাকাঁর ব্যক্তিগত ও বৌদ্ধিক জীবন যাপন চরম উৎকেন্দ্রিক ছিল, তেমনি তাঁর বিদ্যায়তনিক আলোচনায় প্রতিফলিত দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল অননুমেয় এবং এইজন্যে দুরূহ ও বহুক্ষেত্রে অনধিগম্য।

ফলে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে পড়ে যে উৎসুক পাঠকেরা লাকাঁর প্রতিবেদনগুলিকে নিজেদের তাত্ত্বিক রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী পুনর্গঠিত করে নেবেন। তাঁর জীবনপঞ্জির দিকে লক্ষ রেখে যখন ভাবনাজগতের বহুমাত্রিক প্রবণতাগুলির তাৎপর্য বুঝতে চাই, গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে অনুভব করি, এই চিন্তাবিদের প্রধান অন্বিষ্ট নিরবচ্ছিন্ন বিবর্তনের পথে অজস্র শাখা-পথকে মিলিয়ে নিয়েছে। যে-পাঠক যে-ধরনের ভাবনাপ্রস্থানে অনুশীলিত, তিনি তাঁর চাহিদা অনুযায়ী লাকাঁর চিন্তাপথের মোহানা গুলি থেকে তাৎপর্য খুঁজে নেবেন। তবে প্রত্যেক পাঠকের কাছে এটা প্রাথমিকভাবে স্পষ্ট যে লাকাঁ মূলত পুনঃপাঠের নিরবচ্ছিন্ন বৌদ্ধিক উৎসব রচনা করে গেছেন। তাঁর নিজের কথায়, জীবন-ব্যাপ্ত অনুসন্ধানের প্রধান প্রকল্প হল 'return to the meaning of Freud' (১৯৫৫:১১৭)! অর্থাৎ ফ্রয়েডীয় ভাবনার সঠিক পুনঃপাঠের মধ্য দিয়ে চিন্তাগুরুর প্রতিবেদনের আদি-তাৎপর্যে ফিরে যাওয়াই তাঁর অন্বিষ্ট। এইজন্যে সমসাময়িক মনোবিকলনবাদীদের কাছে তিনি এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন যে, ফ্রয়েডের ধারণা-পুঞ্জ ও চিন্তাবীজগুলির ঐতিহাসিক উৎসভূমি আবিষ্কার করে এবং তাদের আত্মগত মূল্য নির্ণয় করে তাঁরা যেন ফ্রয়েডীয় ভাবনাবিশ্বের নতুন ভূগোল ও নিষ্কর্ষ খুঁজে নেন। পরবর্তী আলোচকদের কাছে অবশ্য ফ্রয়েডীয় ভাবনায় পৌঁছানোর পথ লাঁকার চিন্তাবিশ্বের মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হয়েছে। এই বিষয়টি ঘটেছিল তাঁর জীবদ্দশাতেই। ফলে নিজের অনুগামীদের ওপর বিরক্ত হয়ে দেহাবসানের আগের বছরে লাকাঁ EFP সংস্থা ভেঙে

দিয়েছিলেন। কেননা সদস্যদের আনুগত্য ফ্রয়েডের প্রতি ততখানি ছিল না, যতখানি ছিল লাকাঁর কাছে।

তবুও লাকাঁ এতটাই জটিল মনোভঙ্গির অধিকারী ছিলেন যে, তাঁর চিন্তাপ্রণালী ও প্রতিক্রিয়ার ধরনকে একমাত্রিকভাবে গ্রহণ করা যায় না। মনোবিকলন ছাড়াও ভাষা-বয়ান-অবচেতন সম্পর্কে তাঁর গূঢ়ার্থবহ অথচ কুহেলিলীন মন্তব্যগুলি পাঠকদের পক্ষে অস্বস্তি ও অনিশ্চয়তার আবহ তৈরি করে। তাঁর প্রত্যাখ্যান কখনও কখনও স্বীকৃতির তির্যক অভিব্যক্তি। আবার বিচিত্র দ্বান্দ্বিকতায় সম্পৃক্ত তত্ত্ব ও প্রয়োগের বিন্যাসে রয়ে যায় অনন্বয়েরও আভাস। অন্তর্দৃষ্টি ও অন্ধতার দ্বান্দ্বিকতায় আগাগোড়া খচিত তাঁর প্রতিবেদন। এইজন্যে ভাবনার সূচনা ও সমাপ্তির প্রচলিত ধরনের বাইরে গিয়ে লক্ষ করতে হয় অনতিক্রম্য অপূর্ণতার দ্যোতনা যার মধ্য দিয়ে লাকাঁ আসলে ভাষা ও অভিব্যক্তির নিত্য আপেক্ষিকতা প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

তাঁর বহু-উদ্ধৃত মন্তব্যগুলির মধ্যে রয়েছে 'the self is an other' অর্থাৎ সত্তা হল অপর, এই চিন্তাবীজ—দ্বিবাচনিকতার সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক মিখায়েল বাখতিনের ভাবনার কাছাকাছি হলেও আসলে তা আপাত-সাদৃশ্য মাত্র। কেননা অস্মিতা সম্পর্কিত প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে লাকাঁ ও বাখতিন রয়েছেন দ্বিমেরু-বিষম দূরত্বে। লাকাঁর 'অপর' অহংবোধের সূত্রে উপস্থাপিত এবং মনস্তাত্ত্বিক পরিসরের নিরিখে এই অহং বাচনিক সত্তার সূত্রধার। অন্যদিকে ভিন্ন ধরনের বাচন উপস্থাপনার সূত্রে 'অপর' রয়েছে ভিন্ন অবতলে। প্রাথমিকভাবে বলা যায়, অহং বা আমি সচেতনভাবে ঘটমানতার সূত্রধার এবং তাই জ্ঞান, চিন্তা ও অনুভূতির সঞ্চালক। অহং-সঞ্চালিত প্রতিবেদন সর্বদা পূর্ব-নির্দিষ্ট অভিপ্রায় অনুযায়ী ব্যক্ত হয়। অন্যদিকে অপরের প্রতিবেদন অবচেতন থেকে উৎসারিত এবং পূর্ব-নির্ধারিত অভিপ্রায় তার সঞ্চালক নয়। আমরা সবাই আসলে প্রতিবেদনের জগতে জন্ম নিই; আমাদের জন্মের আগেই উপস্থিত থাকে বয়ান বা ভাষা এবং আমাদের মৃত্যুর পরেও সেইসব অব্যাহত থাকে। আমরা যে ভাষাবিশ্বের শরিক হই, তা আমাদের অস্তিত্ব সূচনার বহু আগেই ব্যবহারে-ব্যবহারে নির্ধারিত হয়ে যায়। বহু প্রজন্মের অবদানে গড়ে ওঠে যে বাচনিক পরম্পরা, তারই মধ্যে নিহিত থাকে অহং-এর বাচনিক অস্তিত্ব এবং সেইসঙ্গে ভাষার অপর পরিসরের অস্তিত্বও। এই চিন্তাপ্রণালীর নিষ্কর্ষ লাকাঁ এভাবে উপস্থাপিত করেছেন: আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে কোনও ধরনের বাহ্যিক আড়ম্বর ছাড়াই রূপান্তরিত করে অবচেতনে নিহিত অপর এবং সংযোগের ধুপছায়া এর ফলে ক্রমাগত প্রসারিত হতে থাকে। যৌথ স্মৃতিতে যা কিছু সঞ্চিত থাকে, সেইসব ভাষার ছায়াতপময় সঞ্চরণের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়ে থাকে।

লাকাঁর মতে ভাষাবিশ্বের অধিবাসী ও ব্যবহারকারী হিসেবে মানুষের সবচেয়ে বিচিত্র কূটাভাস এখানেই যে, যখনই সে কথা বলতে শেখে, তখনই সে আপন অহং থেকে বিযুক্ত হয়ে যায়। তার এই বিচ্ছিন্নতা অনিবার্য। যত আকাঙ্ক্ষা ভাষার মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে, ততই তা নতুন নতুন গ্রন্থি তৈরি করে। মানুষ একই সঙ্গে একই বিষয়ে আসক্ত ও নির্লিপ্ত, আকাঙ্ক্ষাময় ও আকাঙ্ক্ষাশূন্য, তৃপ্ত এবং অতৃপ্ত। তাই মানুষ যখন

নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী কোনও কিছু পেয়েছে বলে মনে করে, সেই মুহূর্তেই শুরু হয়ে যায় তার বিযুক্তি ও অবরোহণ। এ যেন বিখ্যাত গ্রিক প্রত্নকথা সিসিফাসের অন্তহীন পর্বত আরোহণের উদ্যম। যখনই উদ্যম সফলতার তুঙ্গ মুহূর্তে পৌঁছে যায়, তখনই ব্যর্থতার বোধ হয়ে ওঠে সর্বগ্রাসী। আর, নতুনভাবে পাথর ঠেলে ঠেলে চুড়োয় নিয়ে যাওয়া শুরু হয়ে যায়।

পাঁচ

লাকাঁর অন্যতম প্রসিদ্ধ উক্তি হল 'অবচেতন ভাষার মতোই আকরণে বিন্যস্ত'; এমনকি এমনও তিনি বলেন যে অবচেতনই ভাষা। এই বক্তব্যের আপাত-সারল্য আসলে ছদ্মবেশ; এর নিহিত অর্থ হল ভাবা সেই উপাদান যা অবচেতনকে সংগঠিত করে। এই ধারণাকে নিয়ে শুধু যে বিভিন্ন ধরনের ভাষ্য তৈরি হয়েছে তা-ই নয়; অবচেতনের বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে সম্পর্কের বিন্যাস, অনুভূতির উপস্থাপনায় চিহ্নায়কের সম্ভাব্য উপস্থিতি, অনুপস্থিতের উপস্থাপনা, আকাঙ্ক্ষা ও প্রকল্পনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গ্রন্থনা প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা করেছেন ভাষ্যকারেরা। স্বভাবত এর প্রতিটি সূত্র নিয়েই স্বাধীন ব্যাখ্যানের সন্দর্ভ রচনা করা সম্ভব। কিন্তু তাতে বৌদ্ধিক প্রক্রিয়ার পক্ষে অস্বস্তিকর কিছু কিছু সংকটও অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে, বলে প্রায় প্রতিটি পদক্ষেপে বাস্তবতার সংজ্ঞা, তার বীক্ষণ প্রণালী ও উপস্থাপনা-পদ্ধতি পুরোপুরি অনিশ্চিত বলে প্রতিভাত হতে পারে। এমনকি আত্মগত ও নৈর্ব্যক্তিক অস্তিত্বের চিরাচরিত ব্যবধানও অলীক বলে প্রতিপন্ন হতে পারে। সেইসঙ্গে ধারণার রাজ্যে দেখা দিতে পারে আপাত-নৈরাজ্য, কেননা বিভিন্ন বয়ানের আপাত-বৈপরীত্য মীমাংসার অতীত বলেও মনে হতে পারে। এইজন্যে লাকাঁর চিন্তা-প্রস্থানে প্রবেশের জন্যে একাধিক প্রবেশ-বিন্দুকে শুরুতেই মান্যতা দেওয়া সমীচীন। আর, বিভিন্ন পাঠ-পদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জস্য তৈরি করার চেষ্টা থেকেও বিরত থাকাই কাম্য। বরং লাকাঁর অজস্র তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ চিন্তা-সমুদ্র থেকে স্বাধীনভাবে এক গণ্ডুষ জল তুলে নেওয়াই ভালো। যেমন :

(ক) 'There is no whole. Nothing is whole.' (১৯৭০)

(খ) 'There is no such thing as a universe of discourse.' (১৯৬৬)

(গ) 'There is no such thing as a metalanguagge.' (১৯৬৬)

প্রসঙ্গ-বিচ্ছিন্নভাবে এদের যদি লক্ষ করি, এদের মনে হবে বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী চিন্তাবিদের খেয়ালি প্রাজ্ঞোক্তি মাত্র। তবুও অস্বীকার করার উপায় নেই যে বিচ্ছিন্ন উচ্চারণ হিসেবেও এদের মূল্য কম নয়। অবশ্য, লাকাঁর নিরবচ্ছিন্ন যাত্রা-সংকেতে পরিপূর্ণ চিন্তাবীজগুলির মধ্যে কোথাও চূড়ান্ততার বোধ নেই, নেই কোনও আরোপিত সমগ্রায়নের প্রবণতা। উদ্ধৃত উচ্চারণগুলিও তাঁর অজস্র সন্দর্ভ-সম্ভাবনার অন্যতম একক মাত্র। অন্তহীন আপাত-অস্তিত্বের সমারোহকে স্বীকৃতি দিই যখন, পারস্পরিক অন্বয় বা অনন্বয়ের প্রশ্নটি গৌন হয়ে পড়ে। একক চিন্তাবীজ বা সন্দর্ভ-সম্ভাবনার মধ্যে কোনও সমগ্রতার প্রতীতি বা আভিমুখ্য থাকে না। লাকাঁ ভেবেছেন, চিরমুক্ত চিন্তাবিশ্বে

কোনও সমগ্রতা-বোধের পরা-উপস্থিতি নেই। কোনো কিছুই সমগ্র বা সম্পূর্ণ নয়। এই নিরিখে কার্যত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে সাম্প্রতিক পৃথিবীতে সর্বব্যাপ্ত প্রতাপের প্রতিবেদন, কেননা প্রতাপ সমগ্রায়নের প্রবণতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। লাকাঁর মনোবিকলনবাদী প্রতিবেদন যেহেতু সর্বব্যাপ্ত বহুবাচনিকতাকে স্বীকার করে নেয়, বিচিত্র উৎসজাত সন্দর্ভগুলির তাৎপর্য বোঝার জন্যে, তা আমাদের চমৎকার সাহায্য করতে পারে।

কিন্তু ভাবনাবিশ্বের প্রতীতিকে মান্যতা দিচ্ছি যখন, প্রতিবেদনের বিশ্বকে কেন অস্বীকার করব? বিশ্লেষণকারী বা প্রতিবেদক নিজেও তো তাঁর প্রতিবেদনের সঙ্গে একীভূত নন; বীক্ষা এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে সামর্থ্য ও উপযোগিতা বদলে যায়। তাছাড়া প্রতিবেদনের অন্তর্বর্তী শূন্যবিন্দু ও অন্তঃস্বরের জটিলতা আপাত-সফল প্রতিবেদনেরও সম্মুখগতিকে রুদ্ধ করে দেয়। ফলে প্রতিবেদক ও প্রতিবেদন যুগপৎ একক ও অনন্য; অন্যসব সম্ভাব্য প্রতিবেদনে তার প্রভাব কিছুদূর পর্যন্ত সত্য হলেও তা সর্বাত্মক প্রতিবন্ধক তৈরি করতে পারে না। স্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে প্রতিবেদনের অন্বিষ্ট ও অভিব্যক্তি মুহুর্মুহু পাল্টে যায়। ফলে সর্বমান্য কোনও সন্দর্ভবিশ্ব রচিত হয় না।

তবে কবিতার সংবেদনশীল পড়ুয়াদের কাছে পরাভাষার প্রত্যাখ্যান গ্রাহ্য হবে না। কেননা তাহলে কল্পনা-প্রতিভা নির্মিত অনুভূতি-পরম্পরা এবং চিহ্নায়কের গ্রন্থনা নিরর্থক হয়ে পড়ে। লাকাঁ অবশ্য মনোবিকলনের নিজস্ব প্রস্তাবনা অনুযায়ী এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। ভাষা ও প্রতিবেদনের আকরণকে বিশদ করতে গিয়ে এদের ভিতর ও বাহির সম্পর্কে যেসব সূক্ষ্ম বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন তিনি, তাতে আকাঙ্ক্ষার সংরাগের ক্রমিক ক্ষয়ের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সত্য-মিথ্যা, নির্যাস-আকরণের আশ্চর্য সহাবস্থান এবং তাদের অন্তর্বর্তী ছায়াঞ্চল সম্পর্কে নিজস্ব দৃষ্টিকোন থেকে লাকাঁ যে-সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, সে-বিষয়ে কবিতা ও দর্শন-জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসন্দেহে দ্বিমেরু-বিষম। লাকাঁরই মন্তব্য সূত্রে (১৯৭৪) বীক্ষণের ভিন্ন অবতল সম্পর্কে সমর্থন খুঁজে পাওয়া সম্ভব: 'The real is what does not depend on my idea of it'! যেহেতু অস্মিতার বোধ ঊর্ণাতন্তু বয়নেরও উৎস, বিষয়ীর আত্মগত চিন্তা ও অনুভবের গ্রন্থনা আত্মগত অবস্থানকে বন্দীশালাও করে তুলতে পারে। এই অবস্থান বিষয়-নিরপেক্ষ বলে তা যথাপ্রাপ্ত বাস্তবকে রঞ্জিত করে দেয় অস্মিতার ঈপ্সিত বর্ণে ও আকাঙ্ক্ষায়। এ তখন হয়ে ওঠে প্রতিবিম্বিত পরা-অস্তিত্ব যার ওপর বাস্তব নির্ভর করে না। এই বাস্তবোত্তর অবতলে জন্ম নেয় কবিতা ও চিত্রকলার দ্যুতিময় পরাভাষা। একই কথা প্রযোজ্য ভাস্কর্য ও সঙ্গীতের বাস্তবোত্তর পরা-অস্তিত্ব সম্পর্কেও। অতএব লাকাঁর প্রাগুক্ত তৃতীয় মন্তব্য সম্পর্কে আপত্তি বহাল রইল।

ছয়

সাহিত্য-দর্শন-মনস্তত্ত্ব-সমাজবিদ্যার পরিসর সহ গণিতশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি না-থাকলে জাক লাকাঁর চিন্তাবিশ্বে পর্যটন কার্যত অসম্ভব, এরকম ভেবেছেন কেউ কেউ। তার ওপর রয়েছে প্রায়োগিক মনোবিকলনবিদ্যার বিপুল দাবি। তাহলে কি সাধারণ কৌতূহলী ও জিজ্ঞাসু পাঠকের কোনো প্রবেশাধিকার নেই লাকাঁর ভাবনা-পৃথিবীতে? এর সরাসরি উত্তর না-দিয়ে বরং চিন্তাগুরুর নিজস্ব তির্যক বাচনের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক : 'Reading in no way obliges you to understand. You have to read first' (Seminar XX, p. 61)। হ্যাঁ আমরা তা-ই চেষ্টা করছি। তাঁর ঈপ্সিত বক্তব্য অধিগত হলো নাকি রইল অনধিগত, এ বিষয়ে বেশি মনোযোগ না-দিয়ে বরং নিজেদের রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী বয়ানগুলি পড়ি। এই নিবন্ধের অন্যত্র যখন রুচি আর সামর্থ্যের উল্লেখ করেছি, তখনও এই বোধ সক্রিয় ছিল যে, সমসাময়িক অন্য সব প্রখ্যাত চিন্তাবিদদের তুলনায় তিনি পুরোপুরি আলাদা— এমনকি ভিন্ন গ্রহের বাসিন্দা যেন। এ কেবল দুরূহতা বা দুরধিগম্যতার প্রসঙ্গ নয়। ফুকো-দেরিদা-বার্ত-বাখতিন-আলথুজেরের মতো প্রসিদ্ধ চিন্তাগুরুরাও সহজিয়া পথের পথিক নন; তাঁদের অসামান্য ভাবনাবীজগুলি স্ফুলিঙ্গের মতো উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে যায়নি। কিন্তু লাকাঁর মতো অন্য কেউই পড়ুয়ার জন্যে প্রতিটি পদক্ষেপে বিভ্রান্তিকর ভুলভুলাইয়া তৈরি করেননি। সুতরাং সমগ্রায়নের হাতছানি এড়িয়ে গিয়েই লাকাঁর দর্পণতত্ত্ব, প্রতীকী বিশ্ব সম্পর্কিত ধারণা, অন্যতর বাস্তবের প্রত্যয়, অস্মিতার সঞ্চরমান ভাবনা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে অংশ ও সমগ্রের নতুন অন্বয়বিধি আবিষ্কার করতে হবে আমাদের। এটা ঠিক, যে-পথেই এগোই না কেন, কোনও-না-কোনওভাবে পূর্বনির্ধারিত প্রতীতির বিচ্ছুরণ থেকে পুরোপুরি মুক্ত হওয়া কার্যত অসম্ভব।

একটু আগে অন্য যেসব তত্ত্বাচার্যদের কথা লিখেছি, ভারতীয় উপমহাদেশের জিজ্ঞাসু বাঙালি পড়ুয়াদের কাছে তাঁরাও ইংরেজি অনুবাদেই পৌঁছেছেন। মূল ভাষার অন্তর্বয়নে নিহিত অনুভব ও ভাবনার সূক্ষ্ম বিচ্ছুরণ অনুবাদে হারিয়ে যায়, তা মেনে নিয়েও লিখব, তাঁদের চিন্তাসূত্র অনুসরণে খুব বেশি অসুবিধা হয় না। কেননা তাঁদের চিন্তা-প্রস্থানের নিবিড় পাঠ যাঁরা করেছেন, তাঁদের বিশ্লেষণের সঙ্গে মতভেদ হলেও চিন্তা-স্থাপত্যের ওপর আলোক-সম্পাত অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু লাকাঁর অনুশীলন যাঁরা করেছেন, তাঁদের প্রধান উৎসাহ সূত্র-আচ্ছাদক ভাষ্য নির্মাণে, ফলে লাকাঁর মূল উপপাদ্য সম্পর্কে সংশয় বেড়ে যায় শুধু। যে-পরাভাষাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন লাকাঁ, তাঁর বয়ানে সেই পরাভাষার উপস্থিতি মোটেই গৌন নয়। এইসব কিছুই আসলে নিবিড়তর পাঠ দাবি করে। পাঠক একইসঙ্গে একাধিক অন্বিষ্ট ও সম্ভাব্য বিচার-পদ্ধতির মোকাবিলা করতে করতে লাকাঁর বিখ্যাত চিন্তাবীজগুলি সম্পর্কে নিজস্ব দৃষ্টিকোনে পৌঁছাতে চেষ্টা করবেন, এটাই কাম্য। আর, তা হবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্তাতরঙ্গের যথাযথ অনুবাদ অসম্ভব—এই প্রাথমিক সত্য মেনে নিয়েই ।

জ্ঞান এবং জিজ্ঞাসা সহ স্বয়ং জ্ঞাতাও আপেক্ষিক যখন, আমরা বরং 'Ecrits' এরই

নিম্নোধৃত বক্তব্যকে আমাদের ভবিষ্যৎ লাকাঁ-অনুশীলনের পথ-প্রদর্শক সূত্র হিসেবে গ্রহণ করতে পারি : 'It is not about him (অনুশীলনীয়) that you have to speak to him... if it is to him that you have to speak, it is literally about something else...which is the thing which is speaking to you, a thing. Which will always remain inaccessible to him, if, being speech which is addressed to you, it could not evoke in you its reply and if having heard its message in this inverted form, you could not, by returning it to him, give him the double satisfaction of having recognized it and making him recognized its truth.' (পৃষ্ঠা ৪১৯-৪২০)

বারবার হয়তো নিজেই বুঝতে পারব : লাকাঁ-অনুশীলনের সময় আমরা যা নিয়ে ভাবছি, আসলে সেখানে ভাবনা পৌঁছায় না—অন্য কোনো সম্বোধ্যমানতার প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হয়ে অন্য-আরেক সম্বোধিতকে নির্মাণ করছি। এই পদ্ধতি চলমান তাই ফুরোয় না আপাত-পাঠ সমাপ্ত হলেও। একি তাহলে সেই বিখ্যাত লোকনিরুক্তির দৃষ্টান্ত: 'কহেন কবি কালিদাস হেঁয়ালির ছন্দ/জানলা দিয়ে ঘর পালাল, গৃহস্থ রইল বন্ধ'? আসুন, আমরা এই প্রশ্ন থেকে যাই পরবর্তী বয়ান রচনার প্রক্রিয়ায়।

বোভোয়ার নিজস্ব পরিসর

'Each object is in reality a small virtual volcano.'

না, এই দ্যুতিময় কথাটি সিমোন দ্য বোভোয়া বলেননি। যদিও কোনো আলাপচারিতায় এরকম তিনি বলতে পারতেন। 'দ্বিতীয় লিঙ্গ' নামে বাংলায় অনূদিত হয়েছে যে 'The Second Sex.', অজস্র আলোচনার মন্থনের পরে সে-দিকে কোন নতুন নির্যাসের জন্যে যেতে পারি? ইদানীং যা আর দেখতে পাই না, কোন পদ্ধতিতে তাকে আরো একবার 'দেখা'র বিষয় করে তুলতে পারি! অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণের সমন্বয় যদি হতে পারত, অতি দ্রুত বিদীর্ণ ও ছিন্নভিন্ন হয়ে-যাওয়া অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধির পুনর্মূল্যায়ন থেকে আহৃত নতুন কৃৎকৌশল দিয়ে কি বহুপঠিত বয়ানের মুখোমুখি হওয়া যেত! সত্য-মিথ্যা এবং অন্বিষ্ট—সমস্তই যখন ক্রমাগত বদলে গেছে, বোভোয়ার অস্তিত্বতাত্ত্বিক ও প্রতিবেদনীকৃত জিজ্ঞাসার প্রাসঙ্গিকতা কীভাবে নির্ণয় করব? আমরা তো জেনেছি সত্যেরও তারতম্য আছে, আছে উদয়-অস্ত; তবু এখনও এই বিশ্বাস অটুট যে গভীরতম ও ব্যাপকতম সত্য স্বভাবে কাব্যিক কেননা তা দুর্নিবার, অপ্রতিরোধ্য। বোভোয়া কি ঐ পরমতার খোঁজ পেয়েছিলেন যা নারীসত্তা কিংবা সন্ধানী ঔপন্যাসিক সত্তার উদ্ভাসনের চেয়েও বেশি মূল্যবান? যাকে সহজে খুঁজে পাওয়া যায়, অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, নিজের অধিকারে নিয়ে আসা যায়, ধারণা হিসেবে পিঞ্জরায়িত করা যায়—তা নেহাৎই 'ছোট' সত্য। কেউ যদি তেমন ছোট সত্যের মোহে গোটা জীবন খরচ করে ফেলে—অপব্যয়ের এই সর্বজনীন প্রবণতা সম্পর্কে সত্যসন্ধানী সতর্কই থাকেন না কেবল, তত্ত্বের যুদ্ধও চালিয়ে যান। বোভোয়ার জীবন ও সৃষ্টির পুনঃপাঠ হোক এই দৃষ্টিভঙ্গিতে।

প্রাথমিক কিছু তথ্যের দিকে এবার তাকানো যাক। বৃহত্তর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক ইতিহাসের অনুষঙ্গে বোভোয়ার সৃষ্টিজীবন আরো তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠে যেন!

১৩৯৯ : যাজকতন্ত্রের উৎকট পুরুষ-সর্বস্বতার চাপে পিষ্ট ফ্রান্সের নারীসমাজের আর্তি ও যন্ত্রণার কথা লিখেছেন ক্রিস্টিন দ্য পিসাঁ। 'L' Epitre abdieu d'amour'[Epistle to the God of Love]। পুরুষের জগতে মেয়েদের স্বতন্ত্র পরিসর যে থাকতে পারে, সে-সম্পর্কে সচেতনতার প্রাথমিক আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

১৬৭৩ : পোলাঁ দ্য লা বারে রচিত 'De L'egalite des deux sexes' [On

the Equality of Both Sexes] বইতে উত্থাপিত হয়েছে পুরুষ ও নারীর সাম্যের প্রশ্নটি।

১৭৮৭ : মার্কুইস দ্য কোন্দোরসে 'Lettres d'um Bourgeois de Newhaven a un citoyen de Virginie' [Letters from a Bourgeoes of Newhaven-to a citizen of Virginia]' নামক প্রতিবেদনে মেয়েদের রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত দাবি উত্থাপন করেন।

১৭৮৯ : ফরাসি বিপ্লব ঘোষিত হচ্ছে । 'Drotis de l'homme et du citoyen [Rights of man and of the citizen].

১৭৯০ : মার্কুইস দ্য কোন্দোরসে তিন বছর আগে উত্থাপিত ধারণার সম্প্রসারণ করেছেন। 'Declaration des droits et l'admission des femmeaudroit de cite' [On the Admission of Women to Citizen rights] শীর্ষক রচনায়। নাগরিক হিসেবে মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে মনোভঙ্গি পরিবর্তনের বৌদ্ধিক সংগ্রাম যে শুরু হয়েছে, সেই সংকেত পাচ্ছি।

১৭৯১ : অলিম্পে দ্য গোজেস লিখেছেন, 'Declaration des droits de la femme et de la citoyenne' [Rights of Woman and of the female citizen] সাধারণভাবে নারী হিসেবে এবং বিশেষভাবে মহিলা নাগরিক হিসেবে জগৎ ও জীবনে আপন পরিসর শনাক্ত করার তাগিদ সংহত হচ্ছে ক্রমশ, এই ইঙ্গিত পাচ্ছি।

১৭৯২ : মেরি হুলস্টোনক্রাফট-এর বিখ্যাত রচনা 'Vindication of the Rights of Woman' প্রকাশিত হয়েছে।

১৮০৭ : গিয়র্গ হেগেলের 'Phenomenology of Spirit' বেরিয়েছে।

১৮৪৩ : ফ্লোরা ট্রিস্টান রচিত 'Union Ouvriere'-এ নারী ও কর্মী হিসেবে চাকরিজীবী মহিলাদের দ্বিবিধ নিপীড়ন আলোচিত হলো।

১৮৪৮ : কার্ল মার্ক্স-এর 'Communist Manifesto' প্রকাশিত হয়েছে।

১৮৯৭ : 'La Fronde' নামে মহিলাদের ব্যবস্থাপনায় প্রথম নারীচেতনাবাহী দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশে মার্গারিট ডুরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন।

১৯০৮ : ৯ জানুয়ারি পারী নগরে সিমোন দ্য বোভোয়ার জন্ম।

১৯১৬ : হেলেন ব্রিয়োঁ রচিত 'La Voie feministe: femme ose etre' [The Feminist Way: Women, Dare to be] প্রকাশিত হলো। স্পষ্টত নারী-অস্তিত্ব ও নারীপন্থার প্রতিষ্ঠা ইতিমধ্যে আকাঙ্ক্ষার স্তর পেরিয়ে সক্রিয়তাবাদে রূপান্তরিত।

১৯১৮ : ত্রিশ বছর বয়সী মেয়েদের ভোটের অধিকার দেওয়া হলো ব্রিটেনে।

১৯২৮ : ব্রিটেনে মেয়েদের ভোটাধিকার অর্জনের বয়সের ঊর্ধ্বসীমা কমিয়ে একুশ করা হলো।

১৯২৯ : পারীর সবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফ্রান্সের নবম মহিলা হিসেবে দর্শনে স্নাতক হলেন বোভোয়া। ভার্জিনিয়া উলফ্ এর 'A room of one's own' নামক বিখ্যাত বই প্রকাশিত হলো।

১৯৩৩ : সিগমুন্ড ফ্রয়েডের 'Femininity' বেরিয়েছে।

১৯৪০ : জার্মান হানাদার বাহিনী ফ্রান্স দখল করল। প্রতিরোধ আন্দোলনের সংগঠনে মেয়েরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিলেন।

১৯৪৩ : বোভোয়ার প্রথম উপন্যাস 'L Invitee' বা 'She came to stay' প্রকাশিত হলো। জাঁ পল সার্ত্রর পৃথিবী-বিখ্যাত বই 'L Etre Et Le Neant' বা 'Being and Nothingness' প্রকাশিত হলো।

১৯৪৫ : 'Le Temps moderns' নামক বিখ্যাত পত্রিকা প্রকাশনার ক্ষেত্রে বোভোয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন।

এপ্রিল : ফ্রান্সে মেয়েরা ভোটাধিকার পাচ্ছেন।

৮ মে : ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তি। জাঁ পল সার্ত্র রচিত 'Les Chemines de La Liberte' বা 'Roads to freedom' প্রকাশিত হল।

১৯৪৬ : ফ্রান্সের সংবিধান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারী-পুরুষের সাম্যকে স্বীকৃতি জানিয়েছে।

অক্টোবর: বোভোয়া তাঁর যুগান্তকারী বই (The Second sex) বা (Le Duxieme Sexe) লিখতে শুরু করেছেন।

১৯৪৭ : বোভোয়ার 'Pour Unemorale de La' ambiguite' বা 'The Ethics of Ambiguity'প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৪৯ : প্রকাশিত হল 'Le Deuxieme Sexe' বা 'The second sex'।

১৯৫২ : H.M. Parshley কৃত ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হল'The Second Sex' নামে।

১৯৫৪ : ইন্দোচীন অঞ্চলে ফরাসি উপনিবেশের অবসান।

আলজেরিয়ায় আট বছরব্যাপী স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরু।

১৯৫৮ : বোভোয়ার 'Memoires d'une jeune fille rangee' বা 'Memories of a dutiful daughter' বেরিয়েছে।

'The second sex' সম্পর্কে প্রথম গবেষণামূলক সন্দর্ভ লিখেছেন— Geneviene Gennari 'Simone De Beauvoir' নামে।

১৯৬৩ : বেটি ফ্রীডান রচিত 'The Feminine Mystique' প্রকাশিত হল। বইটি বোভোয়ার নামে উৎসর্গ করা হয়েছে।

১৯৬৮ : পারী নগরে ছাত্র-অভ্যুত্থান; শ্রমিক-ধর্মঘট।

'Psychoanalyse et Politique' নামে বিশিষ্ট নারী-গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা।

এই গোষ্ঠী সমাজতান্ত্রিক নারীচেতনাবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছে কারণ তা লৈঙ্গিক পক্ষপাতদুষ্ট এবং তা যৌন অস্তিত্বের পার্থক্য-প্রতীতিতে গুরুত্ব আরোপ করেছে। মেরি এলমান রচিত 'Thinking about women' প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৭০ : কেট মিলেট এর 'Sexual Politics' এবং জার্মেইন গ্রীর এর 'The Female Eunuch' বেরিয়েছে।
ফ্রান্সে নারীমুক্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'MLF (Mouvement de Liberation des Femmes' নামক সক্রিয়তাবাদী সংগঠনের যাত্রা শুরু।

১৯৭১ : বোভোয়া MLF-এ যোগ দিয়েছেন। এবছরই গিসেলে হালিমির সঙ্গে যৌথভাবে 'choiser' নামে আরেকটি নারীগোষ্ঠীর সূত্রপাত করেছেন।

১৯৭২ : মেয়েদের যৌনতা সম্পর্কে জাক লাকাঁর বিশ্লেষণাত্মক সন্দর্ভ 'Le Seminaire livre, XX: Encore' প্রকাশিত হল। মার্কিন কংগ্রেসে সমানাধিকার সংক্রান্ত আইনের সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদিত।

১৯৭৩ : ইংরাজি ভাষায় বোভোয়া-বিষয়ে প্রথম গবেষণা গ্রন্থ 'Simone de Beauvoir: Encounters with Death' প্রকাশিত হল। লেখিকা এলেন মার্কস। গিসেলে হালিমি লিখিত 'La Cause des femmes' বেরিয়েছে।

১৯৭৪ : 'Ligue du droit des femmes' নামে আরেকটি নারী -গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হল, যার সভানেত্রী সিমোন দ্য বোভোয়া। লুসি ইরিগেরে রচিত 'Speculum de L'autre femme' (Speculum of the other woman)' জুলিয়া ক্রিস্তেভা রচিত 'Des Chinouses' (About Chinese Women) এবং অ্যানি লেকলেক-এর 'Parole de femme' প্রকাশিত হল।

১৯৭৫ : প্রকাশিত হল হেলেন সিখো রচিত 'Le Rire de la Meduse'বা 'The Laugh of the Meduse'। গর্ভপাত নিষেধক ফরাসি আইন প্রত্যাহার করা হল।

১৯৭৭ : 'Nouvelles feministes' নামক সাময়িকপত্রের সঞ্চালক পদ গ্রহণ করলেন বোভোয়া।

১৯৭৮ : মার্কিন আইনসভায় সমানাধিকার সংক্রান্ত সংশোধনী প্রস্তাব সামান্য ভোটে পরাস্ত হল।

১৯৭৯ : জুলিয়া ক্রিস্তেভা-র 'Le Temps des femmes' বা 'Women's Time' প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৮১ : ফ্রান্সের নবনির্বাচিত সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রপতি মিত্তেরঁ তাঁর মন্ত্রীপরিষদে নারী অধিকার বিষয়ে নতুন মন্ত্রক তৈরি করলেন।

১৯৮৬ : ১৪ এপ্রিল—বোভোয়ার জীবনাবসান।

১৯৯০ : তোরিল মোই প্রদত্ত সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক বার্ষিক বক্তৃতা 'Feminist theory and Simone De Beauvoir' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৯৪ : প্রকাশিত হচ্ছে তোরিল মোই এর 'Simone De Beauvoir: The making of an intellectual woman.'

১৯৯৬ : ৬—৮ সেপ্টেম্বর: বোভোয়ার দশম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ডাবলিনে অনুষ্ঠিত হল 'Simone De Beauvoir : Ten years on' শীর্ষক আলোচনাচক্র।

দুই

বিশিষ্ট ঘটনাক্রমের এই পঞ্জীয়ন যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতকে সুস্পষ্ট করে তুলেছে, তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে বোভোয়া উত্তরোত্তর বিকাশমান চেতনারই অনিবার্য ফসল। সেইসঙ্গে এও বুঝতে পারি যে পিতৃতান্ত্রিক ভাবাদর্শের দাপট যখন সর্বগ্রাসী, সেই মধ্যযুগের প্রতীচ্যেও একরৈখিক চিন্তার বিরুদ্ধে আপত্তি ও প্রতিবাদ একটু একটু করে জেগে উঠছিল। কালপঞ্জিতে যেসব শতাব্দী বা দশক অনুল্লিখিত, ইতিহাস তখনও নিঃশব্দ পদচারণায় নতুন অরুণোদয়ের দিকে এগিয়ে গেছে। নারী-পুরুষের সমানাধিকার একমাত্রিক চেতনায় গৃহীত হতে কয়েক শতাব্দী কেটে গেছে। ক্রমশ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নারীসত্তার ধারণা রাজনৈতিক নারীসত্তায় ধাপে ধাপে উত্তীর্ণ হয়েছে। নাগরিক হিসেবে সহসা যখন মেয়েরা নিজেদের চিনতে পেরেছে, প্রকৃত অর্থেই সেই মুহূর্তে তাদের 'খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ'। নিঃসন্দেহে এই মৌলিক রূপান্তরে ১৭৮৯ এর ফরাসি বিপ্লব বিপুল ভূমিকা নিয়েছে। ইতিহাসের ঘটনাবলী নিজস্ব নিয়মেই ঘটে যায়, আমরা পরবর্তীকালে সেইসব সন তারিখের মধ্যে বিশেষ তাৎপর্য খুঁজে পাই। তাই তো ১৭৮৯-এর ফরাসি বিপ্লবের ঠিক তিনবছর পরে মেরী হ্বলস্টোনক্রাফ্‌টের নারী-অধিকার সংক্রান্ত বিখ্যাত বই-এর প্রকাশনা এবং তারও অর্ধশতাব্দী পরে কমিউনিস্ট ইস্তাহারের প্রকাশ (১৮৪৮) আজ যেন ইতিহাস-নির্ধারিত বলেই মনে হয়। মনে হয় কার্ল মার্ক্সের যুগান্তকারী পুস্তিকাটি যেন মধ্যবর্তী জলবিভাজন রেখা, যার একপ্রান্তে ফরাসি বিপ্লব এবং অন্যপ্রান্তে সিমোন দ্য বোভোয়ার আবির্ভাব (৯ জানুয়ারি ১৯০৮)।

প্রতীচ্যের মানসিক ভূগোল ও যথাপ্রাপ্ত ইতিহাস থেকে জানা যায়, বহু পরবর্তী কালপর্বের অধিবাসী আমাদের কাছেও পিতৃতন্ত্রের নিরুদ্ধ জগৎ এবং সেই জগতের প্রতিস্পর্ধী নারীচেতনার উপল-ব্যথিত গতির বিশেষ সামাজিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। বিশেষত ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতিতে যুক্তিহীন শাস্ত্রানুগত্য এবং পরম্পরাগত অভ্যাসের প্রতি স্বেচ্ছা-সমর্পণ তথাকথিত আধুনিক যুগ শুরু হওয়ার পরেও এত প্রকট ছিল যে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের মতো সমাজ-সংস্কারকদের অভিনিবেশের সিংহভাগ নারীমুক্তি সংক্রান্ত ভাবনা অধিকার করে নিয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার

অভিব্যক্তি নিয়ে যত চুলচেরা বিশ্লেষণ কবি না কেন, তাতে নারী-পরিসরের উপস্থিতি তত্ত্ব ও তথ্যগতভাবে অনিবার্য হয়ে পড়ে। এই প্রেক্ষিতে বোভোয়ার বিখ্যাত পাঠকৃতি বিশ শতকের অন্তিম দুটি দশকের আগে তেমনভাবে চিন্তাজীবী বাঙালির মননে আলোড়ন তোলেনি। বাংলা সাহিত্যে গত শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাট দশকে যে মার্কিনি ধাঁচের আভাঁ গার্দ রচনাধারা দেখা দিয়েছিল, তাতে ইঙ্গ-ফরাসি ভাবনা-বলয়ের প্রভাব ছিল নামমাত্র। তাই সত্তর ও আশির দশকে যে কজন বাঙালি লিখিয়ে নিতান্ত বিচ্ছিন্নভাবে নব্য আভাঁগার্দ প্রণালীর আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁদের লেখার জগৎও সাধারণভাবে পিতৃতান্ত্রিকতায় নিবিষ্ট। তাতে নারী-পরিসর নিয়ে কোথাও কোনও প্রতিপ্রশ্ন উচ্চারিত হয়নি অর্থাৎ লৈঙ্গিক সংস্কৃতির মূলস্রোতের প্রতি যে-প্রত্যাশা তখন বোভোয়া-পরবর্তী পশ্চিম ইউরোপীয় চিন্তাবিশ্বে আপন উপস্থিতি ঘোষণা করছিল—তার কোনও পরোক্ষ ছাপও বাঙালি লিখিয়েদের মধ্যে দেখা যায় না। এই অনুপস্থিতি নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

বোভোয়া 'The force of circumstance' (১৯৬৩) বইতে লিখেছিলেন: 'Through literature one justifies the world by creating it anew in the purity of the imaginary, and by the same token, one justifies one's existence.' (New York : 1976 : 237)। যথাপ্রাপ্ত জগতের মধ্যে যত প্রচ্ছন্ন স্ববিরোধিতা-অবভাস ও শূন্যায়তন রয়েছে, সংবেদনশীল নারীসত্তা সেইসব দ্বারা বিদ্ধ, আলোড়িত ও প্ররোচিত হতে থাকে। তখনই দেখা দেয়, পুনরাবিষ্কার ও পুনর্নির্মাণের তাগিদ। দৈনন্দিন অভ্যাসের মধ্য দিয়ে যে-জগৎ পরিচিত হয়, নানা ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অনুভূতিপ্রবণ নারী তাকে বহুস্তর-যুক্ত নির্মোক বলে বুঝে নেয়। তখনই অতীত ও বর্তমান, ধারণা ও জাগতিক বাস্তব, স্বাধীনতা ও রুদ্ধতার মধ্যবর্তী অদৃশ্য দেয়ালগুলি প্রকট হয়ে পড়ে। আর, তখনই সেইসবকে অস্বীকার ও পুনর্গঠন করতে নারীমন উৎসুক হয়ে পড়ে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে শুধু দার্শনিক বীক্ষার প্রসঙ্গ নেই, সাংস্কৃতিক রাজনীতির স্বরূপও নিহিত রয়েছে। বোভোয়ার 'দ্বিতীয় লিঙ্গ' পাঠ নতুন বোধ ও কৃত্যের উদ্‌বোধনকেই অনিবার্য ও শানিততর করে তোলে।

গত ছয় দশক ধরে দেশ-বিদেশের তাত্ত্বিক, সমালোচক ও ভাষ্যকারেরা বোভোয়ার এই মহাগ্রন্থের সঙ্গে নারীচেতনাবাদ সহ অন্যান্য চিন্তাধারার বহুকৌনিক সম্পর্ক ও মিথস্ক্রিয়া নিয়ে নানা ধরনের বয়ান ও বিতর্ক তৈরি করেছেন। বোভোয়ার প্রবাদপ্রতিম উক্তি 'কেউ নারী হয়ে জন্মায় না, ক্রমশ কেউ নারী হয়ে ওঠে'—এর অন্তর্বর্তী তাৎপর্যের বিচ্ছুরণ নিয়েও এত কথা বলা হয়েছে যে তা নিয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, শিশুকাল থেকে শেষ নিঃশ্বাস পতন পর্যন্ত যেসব অস্তিত্ব ও অভিজ্ঞান নারী হিসেবে সুনির্দিষ্ট ও পুনঃ পুনঃ ঘোষিত, পরিবারের ভেতরে এবং বাইরে সমাজ ও তার সঞ্চালক ইতিহাস-ভাবাদর্শ-মূল্যবোধ প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্যভাবে নারী-অবস্থানের সেই চিহ্নায়কগুলিকে ক্রমশ দুর্ভেদ্য করে তোলে। বোভোয়া যে নারীচেতনাবাদী ইতিহাস-লিখনপদ্ধতিকে তাঁর বইতে অজস্র অনুপুঙ্খ ও বিশ্লেষণের সাহায্যে সুপ্রতিষ্ঠিত

করেছেন, এর গুরুত্ব খারিজ করা সম্ভব নয়। তাঁর বক্তব্যের ধরনে কেউ কেউ আপত্তি জানাতে পারেন, বিশ্লেষণে ঘাটতি দেখিয়ে নতুন বিশ্লেষণের প্রস্তাবনা করতে পারেন, নারীচেতনার অস্তিত্বতাত্ত্বিক বা জ্ঞানতাত্ত্বিক বা সমাজমনস্তাত্ত্বিক অনুষঙ্গ নিয়ে আপত্তি জানাতে পারেন—কিন্তু তাতে এই মহাগ্রন্থের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ম্লান হয় না। বোভোয়ার সুবিখ্যাত প্রাজ্ঞোক্তির মধ্যে যে ক্রমশ নারী হয়ে ওঠার বার্তা রয়েছে, এতে কার্যত নিহিত রয়েছে অন্তহীন ইতিহাসের ইশারা। এই ইতিহাস যতখানি ব্যক্তিগত, ততখানি সামূহিক। সম্ভাব্য মোহানায় দাঁড়িয়ে ধাপে ধাপে সম্পূর্ণ জীবনের গড়ে ওঠার ইতিবৃত্ত আসলে একটি প্রকল্প যাতে নির্মাণের ছলে বিনির্মাণ ও পুনরুপস্থাপনার সাংস্কৃতিক রাজনীতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মেয়েদের হয়ে ওঠার ইতিহাসের এই নবনির্মাণ আসলে বহুপ্রচলিত প্রত্নকথা-কিংবদন্তি-মিথ্যার (যা কিনা পিতৃতন্ত্র দ্বারা পরিকল্পিত ও আরোপিত) আবরণ সরিয়ে দেয় এবং মেয়েদের নিজস্ব সত্যকে আবিষ্কার করে। যেহেতু আদর্শ নারীর সংজ্ঞা প্রতিটি সমাজে ধর্মতন্ত্রই তৈরি করেছে, সেইসব সংজ্ঞাকে প্রত্যাখ্যান না করে পিতৃতান্ত্রিক কল্পনাসৃষ্ট নারী-প্রতিমার ধারণাকে উৎখাত করা যায় না।

তিন

মেয়েদের কোনো নিজস্ব অতীত বা ইতিহাস নেই বলে (দ্বিতীয় লিঙ্গ : পৃ ১৯) বলে যে আক্ষেপ করেছিলেন বোভোয়া, এর কারণ মেয়েদের জন্যে ইতিহাস তৈরির নতুন পদ্ধতিকে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন যাতে পুরুষ-নির্মিত নারীর ইতিহাসকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করা যায়। অর্থাৎ ইতিহাস (history) his story না হয়ে her story ও হতে পারে। বাঙালি কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত ‘ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াতে গিয়ে’ নামক কবিতা-সংকলনে এই বক্তব্যই উপস্থাপিত করেছেন। উপস্থাপনার রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত লৈঙ্গিক অভিজ্ঞান ও পার্থক্যবোধ জনিত সমস্যা আর সম্ভাবনা। আপন বিশিষ্ট সত্তার হয়ে ওঠা ও তার উপযোগী জগতের পুনর্নির্মাণ স্পষ্টত সর্বাত্মক পুনর্মূল্যায়নের পথ ধরেই আসে। এতে আমূল রূপান্তরিত হয়ে যায় চেতনা ও ব্যবহারবিধির আকরণ ও নির্যাস। বোভোয়ার বয়ান যেহেতু বারবার নতুনভাবে পড়তে হয়, প্রতিটি পাঠান্তরে চেতনা-মুক্তি-আত্মতা-অপরতা-আকাঙ্ক্ষা-তাৎপর্য ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের ভাবনা যেন পুনর্গঠিত হয়ে যায়। আর, আমরাও ঐতিহাসিকভাবে গড়ে-ওঠা সাধারণভাবে ভারতীয় এবং বিশেষত বাঙালি পরিস্থিতির নিরিখে, ‘দ্বিতীয় লিঙ্গ’-এ উত্থাপিত যৌন পীড়নের রাজনীতি, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক বাচনের পুনর্বিন্যাস, নারী-পরিসরের পরাপাঠ সম্পর্কে অবহিত হয়ে উঠি। মেয়েদের অভিজ্ঞতার জগৎ কতখানি দৈহিক গঠনের বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল আর চিরাগত লৈঙ্গিক আখ্যানের সংরূপ ও সংজ্ঞাকে কতদূর অবধি প্রতিরোধ করতে হয়—এবিষয়ে বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত সচেতনতার সূত্রপাত হয়েছে বিশ শতকের অন্তিম দুটি দশকে। এতে বোভোয়ার প্রভাব কতটা, তা বোঝার জন্যে কৌতূহল জাগে মনে। তবে ‘The Second Sex’ যে যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য ভাবনা উশ্‌কে দিয়েছে, এতে সংশয় নেই। এই মন্তব্যটি লক্ষ করা

যাক: 'To be present in the world implies strictly that there exists a body which is at once a material thing in the world and a point of view towards this world, but nothing requires that this body has this or that particular structure' (পৃ ৩৯)।

গত তিন দশকে মূলত বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যিক, সমাজতাত্ত্বিক, দার্শনিক বয়ান এবং সেইসঙ্গে অন্য ভাষাভাষী ভারতীয় লেখকদের সন্ধানী রচনা পড়তে পড়তে প্রাথমিকভাবে এই উপলব্ধি হয় যে এদেশে নারীপরিসর খুঁজে নেওয়ার বহুমুখী প্রচেষ্টায় অজস্র প্রেক্ষণবিন্দু প্রকট হয়ে পড়েছে। গবেষণার বৈচিত্র্য সম্পর্কে সন্দেহ নেই, কিন্তু সব মিলিয়ে খুব প্রণালীবদ্ধ উদ্যমের প্রতীতি হয় না। বোভোয়া সহ আরো অনেক নারীচেতনাবাদী তাত্ত্বিক ও গবেষকদের প্রতিবেদন বাংলা সহ ভারতীয় বয়ানগুলির আশ্রয়ভূমি। এদের মধ্যে বৌদ্ধিক দীপ্তি ও বিশ্লেষণ-চাতুর্যের অভাব নেই; কিন্তু সামগ্রিকভাবে সুনির্দিষ্ট চিন্তাপ্রস্থানের আদল গড়ে ওঠেনি। হয়তো এটাই স্বাভাবিক এবং ঐতিহাসিকভাবে অনিবার্য। বিশেষত বাংলা ভাষায় কবি-লিখিয়েদের মধ্যে নারীচেতনা দার্শনিক মননের আকর নয়; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা বহুবিধ প্রবণতার অন্যতম মাত্র। কথাকারদের মধ্যে আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, সুচিত্রা ভট্টাচার্য বা বাণী বসু এর জোরালো প্রমাণ দিচ্ছেন। আর, কবিদের মধ্যে মল্লিকা সেনগুপ্ত বা তসলিমা নাসরিনের সঙ্গে চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর দ্বিমেরুবিষম অবস্থান এই নিরিখে খুব তাৎপর্যবহ। তেমনি শেফালী মৈত্রের মতো খুব কম প্রাবন্ধিকই নারীচেতনার দার্শনিক ভিত্তি এত সার্থকভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন। পাশাপাশি সমাজে বেশ কিছু সক্রিয়তাবাদী ও নারীকল্যাণমূলক সংগঠন নানা কার্যক্রম গ্রহণ করা সত্ত্বেও এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে প্রতীচ্যের তুলনায় এদের অভিঘাত প্রায় ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। তাহলে বোভোয়ার যুগান্তকারী বই 'দ্বিতীয় লিঙ্গ' কিংবা তার পাঠ-প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভুত চেতনা-তরঙ্গ কি বাঙালির মননবিশ্বে তেমন কোনো ছাপ রাখতে পারেনি? এর কোনো গাণিতিক মীমাংসা করতে চাইলে তা ঠিক হবে না। বরং নিবিষ্টভাবে বোভোয়ার চিন্তাবিশ্বে পথিকবৃত্তি গ্রহণ করলে বুঝব, বহুমাত্রিক ইতিহাসের সমস্ত অনুষঙ্গ আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক না হলেও বেশ কিছু মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ নিষ্কর্ষের ক্ষেত্রে বাঙালির মনোভুবনও সর্বমানবিক আবহের শরিক।

একুশ শতকের এই প্রারম্ভিক দশকেই এত অজস্র জটিলতা, স্ববিরোধিতা, আকরণ ও অন্তঃসারের অনন্বয় এবং সর্বাত্মক রিক্ততা ও ধূসরতায় আক্রান্ত হয়েছি যে যাবতীয় প্রাক্‌শর্তের কবল থেকে মুক্ত নারীসত্তার অর্জন ও নারীপরিসর প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া এখন আর সহজ-সাধ্য নয়। কেননা কোনো ধরনের পূর্বানুমান—কী সাহিত্যে, কী সমাজে, কী পীড়নবিরোধী সাংস্কৃতিক রাজনীতির অনুষঙ্গে, কী লৈঙ্গিক পাঠকৃতির পুনর্বিন্যাসে—এখনকার সর্বৈব অনিশ্চিত পরিস্থিতির দরুন গ্রাহ্য নয় আর। বাঙালি নারীর পরিসর একদিকে সমগ্রায়িত ভারতীয়তা এবং অন্যদিকে আন্তর্জাতিকতার প্রতীত বাস্তবের চাপে 'ঘরেও নহে পারেও নহে' হিসেবে অনিশ্চিত, বেপথুমান। 'Virtual reality'র সন্ত্রাসে

বাহির ও ভিতর একাকার, অন্তত বৌদ্ধিক বর্গের মেয়েদের। মধ্যবর্গীয় মেয়েরা ইতিমধ্যে উচ্চবর্গীয় নারীদের লেজুড়ে পরিণত। নিম্নবর্গীয়দের উপরও সার্বিক আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতের ছায়া ঘনায়মান, যার প্রকৃত তাৎপর্য এদের কাছে স্পষ্ট না হলেও ইতিমধ্যে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থানটি প্রকট হয়ে পড়েছে। তাহলে বোভোয়া-কথিত 'The future lies wide open' (পৃ ৭২৩) কি শ্লেষ-গর্ভ বাচন হয়ে উঠল? কেননা এই অনিশ্চয়তায় আক্রান্ত ভবিষ্যতে পথ-পাথেয়-গন্তব্য তো অবান্তর; এর না আছে আকরণ না আছে নিষ্কর্ষ। কিন্তু এই অনিশ্চয়তা যদি সিদ্ধান্তহীনতার জন্ম দেয়, তাহলে নারীচেতনাবাদের সঞ্চালক রাজনীতির তাৎপর্য কী হবে? ভাষ্যের গ্রন্থনায় আমরা কি তবে বোভোয়ার উপকূলরেখা থেকে অনেকদূরে সরে যাব? যেখানে ভাবনা-সমবায়ের তরঙ্গ-বিক্ষোভ ছাড়া অন্য কিছু নেই! এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্নের অভাব নেই। বস্তুত বোভোয়ার ভাবনা-বলয় থেকে আমরা ছিটকে পড়তে পারি আধুনিকোত্তর নারীচেতনার চিন্তাবলয়ে। যেমন, 'romancing the post modern' (London: Routledge: 1992:21-23) বইতে ডায়না এলাম লিখেছেন, নিশ্চয়তা, অনিশ্চয়তা ও সিদ্ধান্তহীনতার রাজনীতি আসলে খুব নমনীয় ও মুক্ত: 'A politics that would not judge events on the basis of a set of pre-existing criteria........feminism is perhaps the clearest instance of a force that has retained its political drives precisely through a refusal to be pinned down to certainties.....feminism is a politics of uncertainty because it insists that we donot yet know what woman can be and that it is always man who have wanted to have the question of woman decisively answered once and for all.'

চার

এই মন্তব্যের সূত্রে লিখতে পারি, নারীসত্তা, নারীপরিসর সহ নারীর আকাঙ্ক্ষা ও অন্বিষ্ট যখন স্বৈরতন্ত্রী পুরুষশক্তি সহস্রাব্দ ধরে অতিনির্ধারিত ও অতিনিশ্চিত বলে ঘোষণা করে এসেছে, প্রাগুক্ত অনিশ্চয়তা-সিদ্ধান্তহীনতা-নমনীয়তা হয়ে ওঠে প্রতিরোধের অত্যন্ত কার্যকরী আয়ুধ। কথা হল, বিচিত্র উচ্চাবচতা এবং প্রাগ্রসর ও পশ্চাদপর উপস্থিতির সহাবস্থানে দীর্ণ ভারতীয় ও বাঙালি সমাজের প্রেক্ষিতে এই রণকৌশলকে কতটা কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব? একদিকে অতীতের তথ্য ও সত্য এবং অন্যদিকে সম্ভাব্য ভবিষ্যতের প্রত্যাশার মধ্যে দোদুল্যমান বাঙালি মন নারীচেতনার কোন্ আদল ও স্বরূপকে খুঁজবে, তা ঠিক করার উপায় কী? বোভোয়ার কাছে ফিরে গিয়ে 'দ্বিতীয় লিঙ্গ' পুনঃপাঠের অজস্র প্রকরণের মধ্যে কোনটি বেছে নেব! ১৯৬৬ সালে ফ্রান্সিস জিয়ানসনকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বোভোয়া বলেছিলেন:

'Feminism is a way of living individually and a way of struggling collectively' (প্যারিস : পৃ ২৬৪)। এই সরল ও সহজ উক্তিতে সর্বমানবিক সত্য ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু বাঙালি জীবন ও সাহিত্যের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এই সরল

উক্তিকেও কতখানি তথ্য-স্বীকৃত বলতে পারি? মূলত নাগরিক চাতুর্যের মধ্যে গড়ে-ওঠা সাহিত্যিক নারীচেতনার অভিব্যক্তিতে সত্যিই কি লেখক-লেখিকার জীবন যাপনের কোনো প্রতীতি মুদ্রিত হয়? একজন তসলিমা নাসরিন নিতান্ত ব্যতিক্রম মাত্র অর্থাৎ অভিব্যক্তির সাহিত্যিকতায় জীবন যাপনের প্রসারিত মিথ্যা আড়ালে পড়ে থাকে। তেমনি সম্মিলিত সংগ্রামের অভিব্যক্তি হিসেবে নারীচেতনাবাদের প্রকাশ আমরা কোথাও লক্ষ করি না—বাঙালির জীবনে তো নয়ই, সাহিত্যেও নয়। তাহলে বোভোয়ার মহাগ্রন্থ থেকে অর্জিত তরঙ্গ-বিক্ষোভ আমাদের ঠিক কীভাবে প্রাণিত করেছে! তাঁর বিপুলায়তন মহাগ্রন্থে কত কক্ষ ও অলিন্দ রয়েছে, কাঙ্ক্ষিত ধৈর্য দিয়ে তার হদিশ কি আমরা করেছি! আমাদের ভিন্ন বিশ্ববীক্ষা সত্ত্বেও বোভোয়ার প্রতিবেদনের গভীরে পৌঁছানোর জন্যে কোনো বাধা নেই কোথাও। প্রেক্ষিত ও প্রসঙ্গের নানা ধরনের কৌনিকতা বোভোয়া যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন, তার নির্যাস আহরণ করে আমরাও আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাস সহ নারীত্বের কিংবদন্তি ও লৈঙ্গিক উপস্থাপন পদ্ধতিকে আমূল বিনির্মাণ করে নিতে পারি। সম্ভবত এটাই 'দ্বিতীয় লিঙ্গ' পাঠের সবচেয়ে বড় সার্থকতা। এই বই পড়ে অন্তত ভাবনার স্থিতাবস্থা বজায় রাখা অসম্ভব যেহেতু মেকি নিরপেক্ষতার দুর্গ ক্রমাগত ধ্বসে পড়তে থাকে। প্রচলিত বিশ্বাস ও প্রতিষ্ঠিত ধারণাগুলিকে প্রত্যাহ্বান জানানো খুব কঠিন। বোভোয়া এই অসম্ভবকে কীভাবে সম্ভব করে তুলেছেন, একমাত্র তা বিশ্লেষণ করেই সাম্প্রতিক প্রজন্মের লিখিয়ে ও পড়ুয়ারা অভ্যাসের জাড্য ও প্রাতিষ্ঠানিকতাকে প্রত্যাহ্বান জানাতে পারেন। এই প্রক্রিয়া কি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ হতে পারে? অর্থাৎ কোনো নারীচেতনাবাদী পুরুষের পক্ষেও নারীর নিভৃত অভিজ্ঞতা-উপলব্ধি-আকাঙ্ক্ষা-বাচনের শরিক হওয়া কি আদৌ সম্ভব? তসলিমা নাসরিনের মতো লিখিয়ে কি প্রমাণ করেননি যে 'Only women can empower women's story to become a story' এবং 'Each woman's story can become a story only through women's collective perception of themselves,' (Shoshana Fulman: What does a woman want ? : Baltimore 1993 : 126)

নারীর আখ্যান কীভাবে প্রতিনিয়ত সচেতন নারীদের দ্বারা রচিত হচ্ছে আবার নিরন্তর ভাঙাগড়ার প্রক্রিয়ায় সমাজের স্তরে স্তরে প্রচ্ছন্ন বিকল্প ক্ষমতায়নের প্রকরণও ঐসব আখ্যানে স্বীকৃত হচ্ছে—তা লক্ষ করাই আমাদের কাজ। বাংলা সাহিত্যে এ বিষয়টি প্রথম যেসব নারী-লিখিয়েদের আখ্যান রচনায় অর্ধস্ফুট বা অস্ফুটভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তাঁদের তালিকা খুব দীর্ঘ নয়। আবার সেইসব 'নারীর কাহিনি'র সঞ্চালক একক বাচনে সামূহিক বাচনের উপস্থিতি কতখানি অনুভবগম্য—এই প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দেওয়া কঠিন। অন্তত মেয়েদের নিজস্ব সম্মেলক বীক্ষণের অনুপস্থিতি উ পস্থিতি-ই সেইসব কাহিনিতে প্রকট। সুলেখা সান্যালের দুটি উপন্যাসে জীবনের অন্তঃস্তরে প্রচ্ছন্ন জীবন, কাহিনির সূচনা ও সমাপ্তির অন্তর্বর্তী অন্যোন্য-সম্পৃক্ত মধ্য-পরিসর থেকে ক্রমাগত এই বার্তা উঠে আসে যে একক উদ্যমে নারীর কাহিনি কোনোদিন উপসংহারে

পৌঁছায় না। সুলেখার জীবনে ব্যাধি, প্রতারণা ও সংগ্রাম যে ধূসর গোধূলিবলয়ে ফুরিয়ে গেল, তা যেন আশ্চর্যজনকভাবে তাঁর রচিত দুটি কাহিনিতে সঞ্চারিত হয়ে গেছে। হেলেন সিখোর সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করেও সুলেখা এই উচ্চারণ করতে পারতেন : 'Life flows towards life. Between life and life there is an unknown passage.......But it is living that mobilizes me; living is such work,' [Helen Cixous: Rootprints: Routedge: London: 1997:82] । পাশাপাশি আশাপূর্ণা দেবীর ত্রয়ী উপন্যাসে সত্যবতী-সুবর্ণলতা-বকুল যে প্রবহমান নারী-প্রজন্মগুলির প্রতিনিধিত্ব করেছে, তাদের মধ্যে 'দ্বিতীয় লিঙ্গ'-এর প্রতিবেদনে ব্যক্ত 'ineffaceable lesson of feminine dignity' (জুলিয়া ক্রিস্তেভা: ১৯৮৬:১৮৩) নারী-কথার নির্মিতিতে স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু তুলনামূলকভাবে নবীনতর প্রজন্মের কথাকার সুচিত্রা ভট্টাচার্য-বাণী বসুর মধ্যে 'নারীর কাহিনি' সম্পর্কে যেন দ্বিধা, সংশয় ও পিছুটান রয়েছে, যে-কারণে তাঁরা অবচেতনভাবেই লিঙ্গ-নিরপেক্ষ বয়ানের পক্ষপাতী থেকে গেছেন।

পাঁচ

আখ্যানের সংরূপ, প্রকরণ ও হয়ে ওঠার মধ্যে সহস্রাব্দ ধরে গড়ে-ওঠা পিতৃতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা-অভ্যাস-সংস্কারের যে প্রচ্ছন্ন ও অমোঘ উপস্থিতি সক্রিয় রয়েছে, তাকে পুনর্বিন্যস্ত করার জন্যে সামাজিক ইতিহাসের আকরণ ও অন্তঃসারের আমূল বিনির্মাণ আবশ্যিক প্রাক্‌শর্ত। প্রতীচ্যে তা যেমনভাবে ঘটেছে, সাধারণভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে এবং বিশেষভাবে বাঙালির ভুবনে তা ঘটেনি। তাই বিচ্ছেদ ও ধারাবাহিকতার দ্বিবাচনিক গ্রন্থনা সত্ত্বেও, এমনকী সংবেদনশীল ও প্রখরভাবে সময়-সচেতন বাঙালি লিখিয়েদের মধ্যেও, আবহমান কাল ধরে প্রচলিত ও আরোপিত লৈঙ্গিক প্রতাপের প্রতিরোধ ও প্রত্যাখ্যানসূচক নারী-কথকতার আদল তেমনভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। মহাশ্বেতা দেবীর কয়েকটি ব্যতিক্রমী রচনা সত্ত্বেও এই সত্য অনস্বীকার্য। তিলোত্তমা মজুমদারদের মতো দু-একজন প্রাতিষ্ঠানিক প্রশ্রয়ে যেসব সাহসী রচনা লিখেছেন, তাদের মধ্যে যৌনতার আখ্যান মূলত ব্যবসায়িক প্রয়োজনে উত্থাপিত হয়েছে, নান্দনিক ও আস্তিত্বিক বয়ান তৈরির কোনো অবচেতন প্রয়াসও এদের মধ্যে নেই। তসলিমা নাসরিনের ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক প্রতিবেদনগুলি সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। আসলে সাম্প্রতিক নারীকথাকারদের মধ্যে সাধারণভাবে পিতৃতান্ত্রিক ভাবনা-বলয়ের অনুসৃতি রয়েছে বলে নারীর যৌনতাকেন্দ্রিক বয়ানগুলিকে আবৃত করে রেখেছে দুর্ভেদ্য নির্মোক যা আসলে ঐসব লিখিয়েদের পদে পদে ভুল পথে চালিত করেছে এবং শেষ পর্যন্ত চক্রব্যূহে বন্দি করে দিয়েছে। তাই তাদের বাচন ও কাহিনির গ্রন্থনায় নারী প্রচ্ছন্ন পুরুষের চোখ দিয়ে নিজের শরীর ও মনকে দেখে; তার কোনও সিদ্ধান্তই অদৃশ্য বৃত্তের বাইরে যেতে পারে না। এইসব লিখিয়েরা নেহাতই আপাত-সময় ও আপাত-পরিসরের বাসিন্দা; ব্যাধির বিচ্ছুরণকে মান্যতা দিতে গিয়ে শুশ্রূষা ও

আরোগ্যের প্রয়োজন তাঁরা ভুলেও অনুভব করেন না। তাই তাদের না-কাহিনি শূন্য থেকে উদ্ভূত হয়ে শূন্যেই মিলিয়ে যায়। তাঁরা হেলেন সিখোর মতো কখনওই ভাবতে পারেন না যে 'We are the authors of our stories ; happily and unhappily, we are the ones to say it, what makes us suffer is when the story goes mad. Must heal it (tell it differently). must find its other narrative, change points of view' (১৯৯৭:৭৭)

কীভাবে প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে পারে প্রতিবেদন, কীভাবেই বা পরিবর্তিত দৃষ্টিকোনের উদ্ভাসনে নারীর আখ্যান সহ সমস্ত কথকতা যথার্থই স্বতন্ত্র হতে পারে, সেই পাঠ নেওয়ার জন্যেই আমরা ফিরে যাব বোভোয়ার কাছে। তাঁর 'দ্বিতীয় লিঙ্গ' সমস্ত যথাপ্রাপ্ত ধারণাকে বিনির্মাণ করতে শেখাবে। একই সঙ্গে ভারতীয় ও বাঙালি পরিবেশে ঐতিহাসিকভাবে অনিবার্য সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক ধারণা ও প্রত্যয়গুলি যেমন মনে রাখব তেমনি সর্বমানবিক প্রেক্ষিতের তাত্ত্বিক উদ্ভাসনও আত্তীকৃত করে নেব। এই প্রক্রিয়া বহুমাত্রিক ও সর্বাত্মক। তাই এর একাধিক সূচনাবিন্দুই থাকা সম্ভব। আমাদের যাপিত অভিজ্ঞতাকে বোভোয়ার চিন্তাবিচ্ছুরণ দিয়ে পরিশীলিত করব, সংশ্লেষণের চেষ্টা করব, কিন্তু কখনওই যান্ত্রিক বা জ্যামিতিক চিন্তাসূত্র বলে মনে করব না। দৃশ্য ও অদৃশ্য পীড়নের বিরুদ্ধে অস্তিত্বতাত্ত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রতিরোধের যে সামাজিক ও নান্দনিক তাৎপর্য রয়েছে, তা আবিষ্কার করাই আমাদের লক্ষ্য। তাছাড়া প্রকৃত নারীমুক্তি অর্জিত না হলে সর্বতোভাবে অন্যোন্যসম্পৃক্ত এই পৃথিবীতে পুরুষেরও মুক্তি সম্ভব নয়। বোভোয়ার অত্যন্ত প্রাজ্ঞ ও উদ্ভাসনী মন্তব্য দিয়ে এই প্রতিবেদনের আপাত-সমাপ্তিতে পৌঁছাতে পারি :

'When at last it will be possible for every human being to set his pride beyond sexual differentiation, in the difficult glory of free existence, then only will woman be able to let her history, her problems, her doubts, her hopes merge with those of humanity: then only will she in her life and her works be able to reveal the whole of reality and not merely her own person. As long as she still has to struggle to become a human being, she cannot become a creator' (পৃ ৭২২-৭২৩)। কবে সম্পূর্ণ মানবী হয়ে ওঠার ও সম্পূর্ণ পরিপার্শ্বকে প্রকাশ করার সংগ্রাম শেষ হবে নারীর, কবে প্রকৃত সম্পূর্ণ স্রষ্টা হয়ে উঠবে নারী!

অন্তহীন এই জিজ্ঞাসার প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ছে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে। বোভোয়ার উত্তর-সাধক হিসেবে কোনো বাঙালি মেয়ে কি তৈরি হচ্ছে কোথাও প্রতিরোধ ও প্রত্যাঘাতের নতুন রণকৌশল নিয়ে?

আলত্যুসের, ভাবাদর্শ এবং প্রসঙ্গকথা

ভাবাদর্শের তাত্ত্বিক হিসেবে লুই আলত্যুসের বহুপঠিত হওয়া সত্ত্বেও প্রশ্ন ও প্রতিপ্রশ্নের জটিল বয়ন অগ্রাহ্য করা যায় না আজও। আপাত-দৃষ্টিতে বিষয়টি সরল বলেই মনে হয়। কিন্তু যত আমরা আলত্যুসেরের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য এবং ভাষ্যকারদের মন্তব্য সম্পর্কে অবহিত হই, কিছু সমস্যা দেখা দেয়। এর জন্যে দায়ী আলত্যুসেরের মূলসূত্র নাকি ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যা—এই জিজ্ঞাসা জাগে আমাদের মনে। অবশ্য 'মূলসূত্র' কথাটি আক্ষরিকভাবে নিলেও মুশকিল। কারণ, প্রচলিত ধরনে ভাবাদর্শের অভিন্ন সংজ্ঞা আলত্যুসেরের কাছে পাওয়া যায় না। তাঁর 'For Marx' এবং 'Lenin and Philosophy'—এই দুটি বিখ্যাত বইয়ের নির্দিষ্ট কিছু অংশে ভাবাদর্শ সম্পর্কিত আলোচনা পাওয়া যায়। দ্বিতীয়োক্ত বইটির প্রাসঙ্গিক অধ্যায় তাঁর 'On Ideology' নামক সর্বাধিক আলোচিত সংকলনে 'Ideology and Ideological State Apparatuses' নামে পুনর্গৃহীত হয়েছে। প্রথমোক্ত 'For Marx' বইতে তিনি মোটামুটি চারটি কার্যকরী সংজ্ঞা তুলে ধরেছেন। তবে ভালভাবে লক্ষ করলে বুঝতে পারি, আলত্যুসেরের দেওয়া সংজ্ঞায় কোনো চূড়ান্ত প্রস্তাবের আভাস নেই, বরং এদের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে নেওয়ার জন্যে পাঠকের প্রতি যেন গোপন আমন্ত্রণ আছে। পূর্ববর্তী মার্ক্সবাদী তত্ত্ববিদেরা এধরনের চেষ্টা করেননি, এই ভেবে আলত্যুসের এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সংজ্ঞাগুলির মধ্যে সমন্বয় করতে গিয়ে কেউ কেউ সমস্যায় পড়েছেন। কারণ, অনন্বয়ের ছায়ায় এদের পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে না সহজে। যাই হোক, 'For Marx' বইতে ভাবাদর্শের প্রথম সংজ্ঞার প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করি, দেখব, আলত্যুসের নিজেই যেন রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের মেহের আলির মতো সতর্কবাণী উচ্চারণ করছেন: নিখুঁত সংজ্ঞার প্রত্যাশা যেন কেউ না করেন, এই অভিপ্রায়ও তাঁর নেই। তিনি শুধু জগৎ-ব্যাপারের মর্মমূলে প্রচ্ছন্ন কিছু মৌল সম্পর্কের সম্ভাবনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। বিজ্ঞান ও ভাবাদর্শের অন্তর্নিহিত পার্থক্য কীভাবে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়, তা অনুশীলন করাকে জরুরি মনে করেন তিনি। আলত্যুসের লিখেছেন : 'There can be no question of attempting a profound definition of ideology here. It will suffice to know very schematically that an ideology is a system (with its own logic and rigour) of representations (images, myths, ideas or concepts depending on the case) endowed with a historical existence and role within a given society. Without embarking on the problem of the relations

between a science and its (ideological) past. we can say that ideology, as a system of representations, is distinguished from science in that in it the practico-social function is more important than the theoretical function (function as knowledge)' (১৯৬৯:২৩১)। এই বক্তব্য থেকে যে-ব্যাপারটি স্পষ্ট হচ্ছে, তা হল এই যে প্রণালীবদ্ধ চিন্তা ছাড়া ভাবাদর্শের প্রকরণ অনুসরণ করা যায় না। ভাবাদর্শের নিজস্ব যুক্তিশৃঙ্খলা আর কঠোর নিয়মতান্ত্রিকতা স্পষ্ট হয় বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির মধ্যে। ধারণা ও ভাবনার অনুপুঙ্খ, প্রত্নকথা, চিৎপ্রতিমা প্রভৃতিতে আলত্যুসের বৌদ্ধিক উপস্থাপনার প্রয়োগ-পদ্ধতি লক্ষ করেছেন। কোনো নির্দিষ্ট সমাজে ঐতিহাসিক অস্তিত্ব ও ভূমিকার নিরিখে এদের বুঝে নিতে হয়। বিজ্ঞানের সঙ্গে এদের সম্পর্ক নিয়ে যদি ভাবি, ভাবাদর্শগত অতীতের প্রাসঙ্গিক আলোচনা এড়ানো যায় না। তবে আলত্যুসের এই বিশ্লেষণে না-গিয়ে ভাবাদর্শের প্রাথমিক সূত্রায়ন করেছেন এভাবে : জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রয়োগ-প্রস্থান হিসেবে বিজ্ঞানের বিপুল গৌরব থাকলেও বহুমাত্রিক উপস্থাপনার পদ্ধতি রূপে ভাবাদর্শের গুরুত্ব তুলনামূলক ভাবে বেশি তার সামাজিক প্রয়োগমূলক কার্যকারিতার জোরে। মোদ্দা কথা এই, একদিকে বিজ্ঞানের তাত্ত্বিকতা আর অন্যদিকে ভাবাদর্শের প্রয়োগ-কেন্দ্রিকতা। পরবর্তী আলোচকেরা আলত্যুসেরের সিদ্ধান্ত নিয়ে যখন ভেবেছেন, তাঁদের কিছু কিছু খটকা লেগেছে। যেমন, নৃতত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতি মানবিকী বিদ্যার নিয়মিত শাখার মতো ভাবাদর্শের প্রকরণও কি স্বতন্ত্র একক বলে বিবেচ্য হতে পারে? এর মধ্যে তো স্পষ্টতই নানা উৎস-জাত ধারণা অন্যোন্য-সম্পৃক্ত।

তবে অনেক বেশি মৌলিক আপত্তি উঠেছে এখানে যে বিবিধ বৌদ্ধিক উপস্থাপনার প্রয়োগ-পদ্ধতি বলে যখন ভাবাদর্শকে সূত্রায়িত করা হলো, মার্ক্সবাদী হয়েও কার্যত ভাববাদী ঐতিহ্যের বাচনই ব্যবহার করলেন আলত্যুসের। ভাববাদী চিন্তার একান্ত নিজস্ব ধরনটি 'উপস্থাপনা'র ওপর গুরুত্ব আরোপ করার মধ্যে অন্তর্বৃত। কেউ কেউ আবার প্রশ্ন তুলেছেন ভাবাদর্শের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্পর্কে। এটা ঠিক যে, বেশ কিছু মার্ক্সবাদী বয়ানে তার উপস্থিতি ছায়াবৃত। কিন্তু যখন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় তার ভূমিকার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে, তা ছায়ামাত্র থাকছে না আর। মার্ক্সীয় যুক্তিশৃঙ্খলায় যাঁরা অতিনিয়ন্ত্রণবাদের ভূত দেখে আঁতকে ওঠেন, তাঁদের মতে ভাবাদর্শের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব আসলে ঘটনাপ্রবাহের অতিনিয়ন্ত্রণবাদী ব্যাখ্যার সঙ্গে যুক্ত। প্রকৃতপক্ষে এই আপত্তি স্থিতাবস্থাপন্থী ভাববাদী ভাষ্যকারদের বহু পুরোনো অস্ত্র। এভাবে তাঁরা ইতিহাস-নিরপেক্ষ বিমূর্ত অবস্থানের চিরাভ্যস্ত গোলকধাঁধায় ভাবাদর্শকে সম্পৃক্ত করতে চান। তাতে এর অন্তঃশায়ী শ্রেণী-উৎস ও শ্রেণী-চরিত্র সহ কার্যকরী হওয়ার ক্ষমতাও চিরতরে লুপ্ত হয়ে যাবে, এই তাঁদের প্রত্যাশা। যাদুঘরের মহাসরীসৃপদের জীবাশ্মের মতো তখন ভাবাদর্শও হয়ে উঠবে নিরাপদ বৌদ্ধিক চর্চার বস্তু। তবে ভাষ্যকারেরা আরো সমস্যায় পড়েছেন ভাবাদর্শের তাত্ত্বিক কার্যকারিতার প্রতিতুলনায় সামাজিক প্রয়োগের কার্যকারিতাকে আলত্যুসের বেশি গুরুত্ব দেওয়ায়। তাঁদের বক্তব্য

এরকম: মানবতাবাদকে যদি প্রায়োগিক উৎকর্ষের নিরিখে ভাবাদর্শ বলি, তার সুস্পষ্ট তাত্ত্বিক প্রেক্ষিতকে অস্বীকার করব কোন্ যুক্তিতে? তাছাড়া হেগেলের দৃষ্টান্ত যদি তুলে ধরা যায়, তাঁর চেয়ে কার রচনা তাত্ত্বিকতায় বেশি ঋদ্ধ! ভাববাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তাঁরা আরও বলেছেন যে, এর প্রকট তত্ত্বসর্বস্বতার জন্যেই ফয়েরবাখ ও তরুণ মার্ক্স হেগেলের বিরোধিতা করে জানিয়েছিলেন, ভাববাদ নিছক তত্ত্ব মাত্র, প্রয়োগের মধ্যে তাকে যাচাই করা যায় না। তাহলে আলত্যুসের মার্ক্সীয় চিন্তাপ্রস্থানের শরিক হয়েও কীভাবে বললেন, কেবলমাত্র বিজ্ঞানই তত্ত্বনির্ভর এবং প্রচলিত প্রায়োগিক বিন্যাসের মূলে রয়েছে ভাবাদর্শ!

দুই

ভাবাদর্শ সম্পর্কিত আলত্যুসেরের দ্বিতীয় সংজ্ঞা-প্রয়াসে তরুণ মার্ক্সের প্রভাব লক্ষ করেছেন কেউ কেউ। অবভাস ও বাস্তবের পরস্পর-বিরোধিতার কাঠামোয় এই চিন্তাসূত্রকে বিচার করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন: 'মানুষ ও তার জগতের উপলব্ধ ও জীবনে অনুশীলিত সম্পর্কের মধ্যে ভাবাদর্শ প্রতিফলিত হয়ে থাকে। অবচেতন বিষয় হিসেবে গৃহীত হওয়ার শর্তে এই সম্পর্ক যেমন সচেতন বলে প্রতিভাত হয়, তেমনি জটিল বলে উপলব্ধ হওয়ার শর্তে তা সরল বিন্যাস হিসেবে প্রতিভাত হয়ে থাকে। এ আসলে কোনো সরল ও প্রাথমিক পর্যায়ের সম্পর্ক নয়, একে বলা যেতে পারে বিভিন্ন সম্পর্কের অন্তর্বর্তী সম্বন্ধ, বস্তুত প্রাসঙ্গিক ইংরেজি শব্দবন্ধ 'lived relation' পারিভাষিক প্রয়োগ হিসেবে বিপুল পরিচিতি পেয়েছে। হুজের্ল ও মের্লোপঁতির অস্তিবাদী তত্ত্ববস্তুবিদ্যায় শব্দভাণ্ডারের কথাটি ঘুরে-ফিরে আসে। আলত্যুসেরের তির্যক প্রকাশভঙ্গিতে মূলত এই বক্তব্য পেশ করা হয়েছে যে, ভাবাদর্শ সেই কাল্পনিক সম্পর্ক-বিন্যাসের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে থাকে যা কিনা যথাপ্রাপ্ত ও চলমান সম্পর্কের অভিব্যক্তি। তার মানে, বিভিন্ন মানুষেরা তাদের জগতের প্রতি যেমন সম্পর্ক গড়ে তোলে, তারই উপলব্ধি ও অনুশীলনের নির্যাস হল ভাবাদর্শ। এবিষয়ে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি এভাবে স্পষ্ট করেছেন আলত্যুসের: 'In ideology men do indeed express, not the relation between them and their conditions of existence, but the way they live the relation between them and their conditions of existence, this presupposes both a real relation and an 'imaginary', 'lived' relation. Ideology, then, is the expression of the relation between men and their 'world', that is, the (overdetermined) unity of the real relation and the imaginary relation between them and their real conditions of existence. In ideology the real relation is inevitably invested in the imaginary relation, a relation that expresses a will (conservative, conformist, reformist or revolutionary), a hope or a nostalgia, rather than describing a reality',

নিঃসন্দেহে বাংলা ভাষান্তরে উদ্ধৃত বক্তব্যের চেয়ে এই বয়ান অনেক বেশি সহজ ও স্বচ্ছন্দ। বাক্যের অন্তর্বর্তী শূন্যায়তন সহ যদি নিবিড় পাঠ করি, দেখব, আলত্যুসের যেন নিজস্ব সূত্রের বিশদ ব্যাখ্যার পথও নিজেই নির্দেশ করছেন। আমাদের প্রত্যেকের মনেই প্রচ্ছন্ন আছে জীবন-জগৎ-পারস্পরিক সম্পর্কের ঈপ্সিত আদল; অনিবার্য কিছু কিছু বিচ্যুতি সত্ত্বেও সাধারণত যাপিত জীবনে আমরা সচেতন ও অবচেতন ভাবে ঐ আদলটি প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। বাস্তব যদিও বাস্তবই থেকে যায়, আদর্শ আকল্পকে আমরা প্রতিমার মতোই মান্যতা দিই। এবার আলত্যুসেরের সূত্রটি লক্ষ করলে দেখব, তিনি বলেছেন, ভাবাদর্শের মধ্যে মানুষেরা নিজেদের মধ্যেকার সম্পর্ক আর তাদের অস্তিত্বের শর্ত ও পরিবেশই প্রকাশ করে না কেবল, পূর্বনির্দিষ্ট সম্পর্ক-বিন্যাস ও অস্তিত্বগত পরিবেশ উপলব্ধির বিশেষ প্রকরণকেও ব্যক্ত করে। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাদের উপযোগিতা পরীক্ষিত ও পুনঃপরীক্ষিত হয়ে থাকে। কীভাবে, কোন্ পদ্ধতিতে আমাদের জীবন ও মননকে সঞ্চালিত করব এবং অস্তিত্বের প্রেক্ষিতে তাদের সমন্বিত করব—এই জিজ্ঞাসা খুব মৌলিক। বস্তুসত্য ও ভাবসত্য একই সঙ্গে আমাদের জীবনে কার্যকরী। সম্পর্ক কখনো বাস্তব, কখনো বা কাল্পনিক। এদের ঐক্য-প্রতীতি অতিনির্ধারিত কিনা অর্থাৎ এদের মধ্যে কোনো আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য সম্ভব কিনা এবং কতদূর তা গ্রাহ্য—এইসব কূট প্রশ্নও এড়ানো যায় না। আলত্যুসের ভাবাদর্শের মধ্যে কাল্পনিক সম্পর্ক-বিন্যাসে আধারিত বাস্তব সম্পর্কের বিচ্ছুরণ লক্ষ করেছেন। তাঁর চিন্তাসূত্র অনুসরণ করে আমরা সম্পর্কবোধে অন্তর্নিহিত দ্বিবাচনিকতার সন্ধান পাই যেন। এতে অভিব্যক্ত হচ্ছে এক আকাঙ্ক্ষা যা রক্ষণশীল, সাযুজ্যবাদী, সংস্কারপন্থী বা বৈপ্লবিক আবেগসম্পন্ন। এই সম্পর্ক নিছক বাস্তবতার বিবরণ না দিয়ে আকাঙ্ক্ষা বা প্রত্যাশা বা স্মৃতিপীড়া প্রকাশ করে থাকে।

প্রশ্ন এই , উপলব্ধ সম্পর্কের এই ধারণাকে শুধুমাত্র কাল্পনিক প্রকরণের মধ্য দিয়ে যদি যাচাই করে নিতে হয়—জীবন ও জগতের সঙ্গে নিরন্তর বিনিময়ের মধ্যে অর্জিত বাস্তব অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন কি তবে পূর্ব-নির্ধারিত আকল্পের বাইরে সম্ভব নয় আদৌ! এই বয়ানে তরুণ মার্ক্সের বক্তব্য থেকে আলত্যুসের অনেকটা দূরে সরে গেছেন নাকি! কারণ, তরুণ মার্ক্স বাস্তব আর কাল্পনিক অস্তিত্বকে পরস্পর-বিরোধী ভেবেছেন; কিন্তু আলত্যুসের অভিজ্ঞতা আর কাল্পনিকতাকে অন্যোন্যসম্পৃক্ত করে তুলেছেন। তার মানে, কোনো ভাবাদর্শ যুগপৎ অভিজ্ঞতায় বৃত এবং কাল্পনিক; ফলে তাকে বলা যেতে পারে কাল্পনিক বলে গৃহীত যাপিত বাস্তব। অতএব আমরা এমন এক ধরনের বাস্তব সম্পর্কের মুখোমুখি হচ্ছি যা কিনা কাল্পনিক সম্পর্কের মধ্যে কিছুটা তির্যক হয়ে পড়েছে। কিন্তু এ ধরনের সংজ্ঞা সম্পর্কেও ভাষ্যকারদের সমস্যা হয়েছে। কেননা আলত্যুসের যখন বাস্তব সম্পর্কের কথা বলেন, তা কিন্তু রক্তমাংসের বাস্তব ব্যক্তিদের কথা ভেবেই বলেন। কিন্তু তাত্ত্বিক বাচনের মধ্যে বাস্তব ব্যক্তিদের মৌলিক উপজীব্য করা চলে না। কোনো মানুষ যখন বাস্তব জীবন যাপন করে, সে-সময় তার অস্তিত্বের প্রকরণ যেমন থাকে—সেই একই মানুষ যখন স্বপ্ন দেখে বা কল্পনা করে, তার অস্তিত্বের অনুষঙ্গ কিন্তু

বদলে যায়। দু'টি ক্ষেত্রে ভাবাদর্শ কার্যকরী হলেও এদের পদ্ধতি ও অভিব্যক্তি ভিন্ন হতে বাধ্য। যখন সংজ্ঞার সূত্রায়ন করি, তার আঁটোসাঁটো গাঁথুনির মধ্যে এত সব কৌনিকতা ও উচ্চাবচতার প্রতি সুবিচার করা সহজ নয়।

মার্ক্সীয় চিন্তাবৃত্তে অতিনিয়ন্ত্রণের ধারণা সাধারণত অবসংগঠন ও অধিসংগঠনের বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক আলোচনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ বিষয়ে বিতর্কেরও অভাব নেই। আলত্যুসের কিন্তু পুরোনো প্রসঙ্গে ধারণাটি ব্যবহার করেননি; বাস্তব ও কাল্পনিক বিষয়ের সম্পর্ক অনুশীলনের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করেছেন। কোনো কোনো ভাষ্যকার এর মধ্যে দেখতে পেয়েছেন ফ্রয়েডীয় ভাববৃত্তের ছায়া। বাস্তব ও কাল্পনিকের সংমিশ্রণ মূলত সাহিত্যিকের সৃষ্টি-প্রতিভায় বেশি প্রাসঙ্গিক, একথা আমাদের মনে হয়। আলত্যুসের লিখেছেন: 'It is this over-determination of the real by the imaginary and of the imaginary by the real that ideology is active in principle.' (তদেব:২৩৪)। আসলে 'অতিনিয়ন্ত্রণ' শব্দটি অনেকের মনেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। তাঁরা ভাবেন, এতে চিন্তার স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়, পূর্ব-নির্দিষ্ট ধারণা গ্রহীতার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। আলত্যুসের একথা বলতে চান যে, ভাবাদর্শ রুদ্ধ-পরিসর ধারণা নয়, বরং বিপরীতের সমন্বয় বা সংশ্লেষণ সম্ভব বলে তার মধ্যে রয়েছে মুক্তির প্রতিশ্রুতি। তাই আর যা-ই হোক, তাকে মন্দ ভাবা চলে না। চিন্তার প্রগতি দিয়ে চিহ্নায়িত সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে ভাবাদর্শকে আমরা বর্জ্যবস্তু হিসেবে পেছনে ফেলে আসি না। বরং একে বলা যেতে পারে অনমনীয় নিয়মের বহির্ভূত এক সৃষ্টিশীল প্রেরণা যা আমাদের অনবরত উৎসাহ যোগায় এবং সামনের দিকে এগিয়ে দেয়। বাস্তব ও অবাস্তবের পরিধি যদি অতিব্যক্ত হত এবং এদের মধ্যেকার লক্ষ্মণের গন্ডি যদি অনতিক্রম্য হত—তাহলে যান্ত্রিকতার প্রভাব কিছুতেই এড়ানো যেত না। কিন্তু এদের মধ্যে যেহেতু স্পষ্ট বিভাজন নেই, ভাবাদর্শ সৃষ্টিশীল প্রেরণার প্রকরণ হিসেবে বিকশিত হয়ে চলেছ।

তিন

বাস্তব ও কাল্পনিকের সম্পর্ক-বিন্যাসের সূত্রে যেমন ভাবাদর্শকে বুঝি, তেমনি তাকে আলাদাভাবে বুঝে নিতে হয় বাস্তব ঐতিহাসিক অস্তিত্বের সূত্রে। অর্থাৎ, প্রশ্নটা দাঁড়ায় খোদ ভাবাদর্শের বাস্তবতা নিয়ে। বাস্তব-সত্তা হিসেবে ভাবাদর্শকে ব্যক্ত হতে হবে বাস্তব দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে,বহুস্তরে বিন্যস্ত বাস্তব উপাদানের অভিব্যক্তিতে ও বাচনে। একটু আগে যে প্রাসঙ্গিক কাল্পনিক উপাদানের কথা বলেছি, নিশ্চিতভাবে তা যথেষ্ট নয়। অন্তত আলত্যুসেরের তৃতীয় সংজ্ঞাসূত্রে দেখা যাচ্ছে যে কাল্পনিকের মধ্যে নিহিত রয়েছে এক ধরনের অস্তিত্বশূন্যতা। পরবর্তী পর্যায়ে আলত্যুসের যখন তাঁর বহু আলোচিত ভাবাদর্শগত কৃৎকৌশল বিষয়ক নিবন্ধটি লিখলেন, দেখা গেল, তিনি নিজের দেওয়া সংজ্ঞাকে খানিকটা পরিমার্জিত করে নিচ্ছেন যাতে ভাবাদর্শ যুগপৎ অবভাস এবং ঐতিহাসিক অস্তিত্বের উপকরণগুলিকে আত্মস্থ করে নিতে পারে। তাঁর মতে

ভাবাদর্শগত কৃৎপ্রকরণ নিহিত থাকে বস্তুভিত্তিতে ও বস্তুসত্তায় যা কিনা মানুষের স্বপ্ন ও কল্পনাপ্রতিভাকে যথেষ্ট পরিমাণে বাস্তব অস্তিত্বে সম্পৃক্ত করতে পারে। আসলে 'For Marx' লেখার সময় বিভিন্ন সংজ্ঞাসূত্রের মধ্যেকার সূক্ষ্ম অসামঞ্জস্য মীমাংসা করতে পারেননি আলত্যুসের। আমরা আলোচ্য তৃতীয় সংজ্ঞায় দেখেছি, ভাবাদর্শ সম্পর্কিত পূর্ববর্তী বাচন কিছুটা বদলে গেছে। তিনি এবার অভিজ্ঞতায় বৃত প্রত্যয় থেকে দৃষ্টান্তমূলক প্রত্যয়ে পৌঁছেছেন। লক্ষণীয় ভাবে এই পর্যায়ে আলত্যুসেরের বাচন থেকে বিমূর্ত দ্যোতনা অনেকখানি ঝরে গেছে। ফলে তাঁর বক্তব্যে এসেছে ঋজুতা ও স্পষ্টতা: 'So ideology is as such an organic part of every social totality. It is as if human societies could not survive without these specific formations. These systems of representations (at various levels), their ideologies, human societies secret ideology as the very element and atmosphere indispensible to their historical respiration and life. Only an ideological world outlook could have imagined societies without ideology and accepted the utopean idea of a world which ideology (not just one of its historical forms) would disappear without trace, to be replaced by science.' (তদেব:২৩২)।

এখানে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়েছে। প্রতিটি সামাজিক সমগ্রতায় ভাবাদর্শ উপস্থিত জৈব সাংগঠনিক উপাদানের মতো অর্থাৎ তা সমাজ-সত্তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। মানুষের সমাজ বহু সহস্রাব্দ ধরে অজস্র স্তর-পরম্পরায় যেভাবে বিবর্তিত হয়েছে, তা অনুশীলন করে মনে হয়, নির্দিষ্ট সময়-পরিধিতে সুনির্দিষ্ট অন্তঃসার হিসেবে ভাবাদর্শ প্রতিটি স্তরের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিতে উপস্থিত। সমাজে স্বতশ্চল ভাবে কিছু নির্দিষ্ট আকরণ গড়ে ওঠে প্রয়োজনের তাগিদে। এইসব নির্দিষ্ট গঠনের বাইরে মানুষের সমাজ টিকে থাকতে পারে না। এই নিবন্ধের অন্যত্র যে-সমস্ত উপস্থাপনাকে সামাজিক অস্তিত্বের বিভিন্ন স্তরে প্রত্নকথা আদিকল্প কিংবদন্তি হিসেবে সক্রিয় হওয়ার কথা বলেছি—তাদের মধ্য দিয়েই সামাজিক সমগ্রতার উপলব্ধি ভাবাদর্শের নির্যাসকে ধারণ করে। একটা পরিচিত দৃষ্টান্ত দিয়ে আলত্যুসেরের বক্তব্যকে খানিকটা স্পষ্ট করা যেতে পারে। মৌচাক থেকে মধু কিংবা খেজুর গাছ থেকে রস যেভাবে ক্ষরিত হয়ে থাকে, তেমনি মানুষের সমাজের বিচিত্র আকরণ থেকে ভাবাদর্শ জীবনের মৌল উপকরণ ও আবহ হিসেবে নিয়ত বিচ্ছুরিত হয়। জৈব সংস্থানের পক্ষে শ্বাস-প্রশ্বাস যেমন অপরিহার্য, সামাজিক জীবনের পক্ষে ভাবাদর্শ তেমনি অনিবার্য। আমরা যখন বিশ্ববীক্ষার কথা বলি, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অনিবার্য কিছু পক্ষ নেওয়ার কথা বলি—ভাবাদর্শ তখনই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গী হয়ে ওঠে। একথার যদি আরো গভীরে যাই, দেখব, আমাদের জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে ভাবাদর্শই মূল সঞ্চালক শক্তি। তার মানে, ভাবাদর্শ-বর্জিত কোনো সমাজের কল্পিত অভাবকেই বুঝে নিতে হয় কোনো-না-কোনো ভাবাদর্শগত দৃষ্টিকোন থেকে। তর্কের

খাতিরেও যদি আমরা এই ইউটোপীয় ধারণাকে মেনে নিই যে এমন কোনো জগৎ সম্ভব যাতে ইতিহাসের সমস্ত আখ্যান ক্রমশ শূন্যে মিলিয়ে যাবে এবং ভাবাদর্শও পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং ভাবাদর্শের স্থান নেবে বিজ্ঞান—সে-ক্ষেত্রেও ভাবাদর্শ ও প্রতিভাবাদর্শের দ্বিবাচনিকতা আমরা এড়িয়ে যেতে পারব না।

এভাবে আলত্যুসেরের বক্তব্য নিবিড় পাঠ করে আমরা ভাবাদর্শের প্রতি প্রবল ইতিবাচক দৃষ্টিকোনের মুখোমুখি হই যেখানে সামাজিক সংবেদনায় ভাবাদর্শের অপরিহার্যতা উপলব্ধির পক্ষে জোর সওয়াল করা হয়েছে। 'For Marx' থেকে চার দশকের দূরত্বে দাঁড়িয়ে দেখছি, ক্রমাগত জটিলতর-হওয়া বিশ্বপ্রেক্ষিতে অসংখ্য স্তরে শুধু তথ্য ও তত্ত্বের অনন্বয়, বিশ্বাসের অপমৃত্যু, সূক্ষ্মতার বিলয়, প্রত্যাশার বিপর্যয় এবং সর্বগ্রাসী যন্ত্র-প্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিস্ফোরণ। সাময়িক প্রয়োজনের নিরিখে সব কিছুই বিচার্য এখন। জীবনের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে যন্ত্র-প্রযুক্তির উৎকর্ষ ছায়াপাত করেনি। অনেকেই এই ধারণায় বিশ্বাসী যে ইদানীং আমরা ভাবাদর্শের যুগকে পুরোপুরি পেছনে ফেলে এসেছি এবং এখন আমরা স্বচ্ছন্দে ভাবাদর্শের মৃত্যু নিয়ে নিরাসক্ত ও নৈর্ব্যক্তিক আলোচনা শুরু করে দিতে পারি। বিশেষত আধুনিকোত্তরবাদ যখন অজস্র বিভঙ্গের মধ্য দিয়ে মানুষের মৌল মানবিকতাই নস্যাৎ করে দিতে চাইছে, সে-সময় আলত্যুসেরের ভাবাদর্শ বিষয়ক চিন্তাসূত্রের নিবিড় পুনঃপাঠ অত্যন্ত জরুরি।

নিজস্ব সময়-প্রেক্ষিতের প্রতি সচেতন থেকেই যদিও তিনি সন্দর্ভ নির্মাণ করেছেন, একুশ শতকের প্রারম্ভিক প্রহরের উৎকণ্ঠা-যন্ত্রণা-স্ববিরোধিতা-কূটাভাসে কিছু কিছু চিন্তাসূত্র উদ্ভাসনী আলো হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। আলত্যুসের এই নিশ্চয়তা আমাদের দিতে চান, মানুষের পৃথিবী জুড়ে স্রোত ও প্রতিস্রোতের যত সংঘর্ষই ঘটুক না কেন—ভাবাদর্শ চিরকাল ছিল, চিরকাল আছে এবং চিরকাল থাকবে। এর কারণ হিসেবে অত্যন্ত সহজ, সরল ও মৌলিক এই সত্যের কথা বলা যায় যে মানুষ যতদিন তাদের জীবন যাপনের অর্থ খুঁজবে, ততদিন অক্ষুণ্ণ থাকবে ভাবাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা। গুহাবাসী আদিম মানুষ যখন প্রকৃতির বিপুল উপস্থিতির মধ্যে নিজের জীবনের বিবর্তনশীলতা থেকে অপার বিস্ময়ে নানাভাবে অর্থ খুঁজত তখনও ছিল ভাবাদর্শ। সভ্যতার স্তরে স্তরান্তরে নিজেকে যত সমৃদ্ধ করেছে মানুষ এবং নবার্জিত সমৃদ্ধির আদলে বারবার নতুন করে অস্তিত্বের অর্থ খুঁজেছে, ভাবাদর্শই ছিল তার সন্ধানের মৌল আধেয়। তেমনি তৃতীয় সহস্রাব্দের সূচনা-মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যারা আজ আধুনিক-আধুনিকোত্তর-উত্তরাধুনিক জগতের নিষ্কর্ষ নিয়ে কূট তর্ক করছে এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির যাবতীয় পূর্বাগত আকরণের ধ্বংস ঘোষণা করছে—তারাও জীবনের প্রকট অর্থহীনতার মধ্যে তাৎপর্য-ই খুঁজে চলেছে। তার মানে, ভাবাদর্শের অনুপস্থিত উপস্থিতি। বাঙালির পরিচিত একটি প্রবচনের ভাষায় বলতে পারি, 'মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরি!'

চার

জীবন-যাপনের মধ্যে অর্থ খোঁজার এই প্রক্রিয়া তো বিজ্ঞানের একক এলাকা নয়! বিজ্ঞান জীবনের অনেক দিক ছুঁয়ে থাকে নিশ্চয়, কিন্তু তাই বলে তাকে তো আর সর্বার্থসাধক বলা যায় না। জীবন থেকে নির্যাস ছেঁকে নেওয়া বা ঐ নির্যাসের সঞ্চালক আদলকে বুঝিয়ে দেওয়া ভাবাদর্শেরই দায়। একটু আগে লক্ষ করেছি, আলত্যুসের চেয়েছেন ইতিবাচক প্রতীতি। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী সমাজের বাস্তব ঐতিহাসিক অস্তিত্বের সমান্তরাল ভাবে ভাবাদর্শকে যদি অবভাস বলেও ভেবে নিতে হয়, একটু সমস্যা দেখা দেয়। বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে জীবনকে 'স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু' বলে মনে হওয়া বিচিত্র নয়; কিন্তু স্বপ্ন বা মায়া বা মতিভ্রম বা এক কথায় প্রকল্প তো বাস্তবের বিপ্রতীপ পরাঅস্তিত্ব। একে সাধারণ সত্য বলি কী করে? বাঙালি কবি জীবনানন্দ চেতনার পরাগতি অনুভব করে লিখেছিলেন : 'মরণের হাত ধরে স্বপ্ন ছাড়া কে বাঁচিতে পারে।' নীৎশের বক্তব্যও ছিল এরকম : জীবনের কঠোর কর্কশ বাস্তবের মধ্যে টিকে থাকতে হলে আমাদের চাই স্বপ্ন, চাই অবভাস। খানিকটা বাখতিনের সুর যেন বেজে ওঠে আবশ্যিক অপরতার সমান্তরাল উপস্থিতি বিষয়ক এই ধারণায়। মানব-অস্তিত্বের প্রকৃত সত্য যদি আমরা দেখতে চাই, যেতে হবে মৃত্যুর প্রান্তে। উপলব্ধির দ্বিবাচনিকতা যেন সূত্রাকারে রয়েছে এই বিশ্লেষণে। প্রশ্নটা আসলে সমগ্রতার, অন্য কিছুর নয়। মৃত্যু জীবনকে দেয় সম্পূর্ণতা, আর দেখার জন্যে ঈপ্সিত সেই নৈর্ব্যক্তিক দূরত্ব। তার মানে কি তবে এই যে, ভাবাদর্শের গাঁটছড়া বাঁধা জীবনেরই সঙ্গে অথচ তার প্রকৃত তাৎপর্য বোঝার জন্যে আমাদের যেতে হবে জীবন পেরিয়ে! এর মধ্যে তাহলে দেখতে পাই নেতিবাচক ও নৈরাশ্যবাদী দৃষ্টিকোন, যার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে যায় এই ব্যঞ্জনা যে বিজ্ঞান জীবনের অর্থ বুঝতে সাহায্য করে না বলেই মানুষ ভাবাদর্শের প্রয়োজন অনুভব করে। যাঁরা মনে করেন কোনো একদিন বিজ্ঞান ভাবাদর্শের স্থান নিয়ে নেবে, আলত্যুসের তাঁদের ইউটোপীয় ধারণার শিকার বলে মনে করেছেন। তাঁর বক্তব্য : নীতিশাস্ত্রের নির্যাস হলো ভাবাদর্শ, তাকে সরিয়ে দিয়ে বিজ্ঞান কোনোদিন তার জায়গা নেবে বা নীতিশাস্ত্র স্বয়ং খোলনলচে পাল্টে বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের বিষয় হয়ে উঠবে—এই ধারণা ইউটোপীয়, কেননা তার কোনো ভিত্তি নেই। তেমনি কেউ যদি মনে করেন, বিজ্ঞান প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে ধ্বংস করবে বা কোনো উপায়ে তার জায়গা নিয়ে নেবে কিংবা শিল্প মিশে যাবে জ্ঞানের সঙ্গে বা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিষয় হয়ে উঠবে—তাহলে তাদেরও একইভাবে ইউটোপীয় বলে গণ্য করতে হবে। (তদেব:২৩২)

গত তিরিশ বছরের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় আলত্যুসেরের বক্তব্য বিশেষ তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠে যেন। এখানে যদিও বিস্তারিত ব্যাখ্যার কোনো অবকাশ নেই, তবুও সাবেক সোভিয়েত রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের ঘটনা-প্রবাহ প্রমাণ করে, ভাবাদর্শের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উপযোগিতার উপর প্রথম বিশ্বের আধিপত্যবাদী শক্তি যখন সুপরিকল্পিত ভাবে আক্রমণ শানিয়েছিল, ভোগবাদ ও পণ্যায়নের তুমুল প্রচার ছাড়াও ধর্মীয় সংস্কার

উসকে দেওয়াই ছিল তাদের প্রধান হাতিয়ার। পোল্যান্ডে স্পষ্টভাবে এবং অন্যান্য দেশে গৌনভাবে গির্জার ভূমিকা দেখিয়ে দিয়েছে যে, বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের দিনেও ধর্মতন্ত্র নতুন নতুন উপায়ে তার শেকড় ছড়িয়ে দিতে পারে। সুতরাং ভাবাদর্শ হোক বা ছদ্ম-ভাবাদর্শ, বিজ্ঞান তার স্থান দখল করতে পারে না কখনও। বরং প্রতাপ-সর্বস্ব শ্রেণির চক্রান্তে বিজ্ঞান ছদ্ম-ভাবাদর্শকে সঙ্গে নিয়ে চলে। নব্বই-এর ঘটনা-প্রবাহ যদি চুলচেরা বিশ্লেষণ করি, দেখব, উত্তর-সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নতুন নতুন কল্পমায়া তৈরি করে ভাবাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা মুছে ফেলতে চাইছে। প্রতিভাবাদর্শ দিয়ে অনবরত অন্তর্ঘাত করছে ভাবাদর্শে যাতে মানুষের যুগযুগান্তর ব্যাপ্ত সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসকে ধ্বস্ত করে দিয়ে কার্যত না-মানুষ এবং যান্ত্রিক জীবন ও যন্ত্র-সর্বস্ব জগতের প্রতিষ্ঠা ঘটতে পারে। নীতিশাস্ত্র ও শিল্পকলা পুনর্গঠিত হচ্ছে তারই মাপে। কিন্তু আলত্যুসেরের সংজ্ঞা-সূত্র দিয়ে এহেন উদ্‌ভ্রান্ত বিশ্ব-পরিস্থিতিরও বিশ্লেষণ সম্ভব। মনে রাখতে হবে শুধু এই কথা যে ভাবাদর্শের তাৎপর্য-পরিধিকে আজ বাড়িয়ে দিতে হবে অনেক গুণ, তার আলো-অন্ধকার ছায়া-প্রচ্ছায়া সমেত। সুতরাং ভাবাদর্শকে নিঃশেষে মুছে ফেলা অসম্ভব, পুরোপুরি প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তা অব্যাহত রাখে তার নিরবচ্ছিন্ন চিহ্নায়ন সন্ধানের প্রক্রিয়া। এক গোত্রের চিহ্নায়ক মুছে যায় হয়তো, কিন্তু অচিরেই তার স্থান নেয় অন্য গোত্রের চিহ্নায়কেরা। যতদিন মানুষের পৃথিবী থাকবে, বিদূষণের হাজার সন্ত্রাস সত্ত্বেও এই প্রক্রিয়ার অন্ত হবে না কখনও।

যাঁরা মনে করেন নীতিশাস্ত্র, শিল্পকলা ও ধর্মীয় দর্শন নিতান্তই পেছনে ফেলে -আসা প্রাক্-বৈজ্ঞানিক যুগের নাছোড়বান্দা অবশেষ মাত্র, তাঁরা অভিজ্ঞতায় লব্ধ ব্যবহারিক জগৎকে অকারণে উপেক্ষা করেন। কেননা এ সমস্ত যে-কোনো সমাজের অপরিহার্য উপকরণ। আজকের দিনে বিজ্ঞান নিশ্চয় আমাদের জীবনে অনেক কিছু, কিন্তু তা কখনো সব কিছু হতে পারে না। ভাবাদর্শের অনিবার্য উপস্থিতি সম্পর্কে সংশয়ের কোনো কারণ নেই। কারণ তা যুগপৎ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির সত্য। তাছাড়া অন্য আরেক দিক থেকে বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। বিজ্ঞানের সার্বিক উপস্থিতি সত্ত্বেও আমাদের অস্তিত্বকে যদি বিজ্ঞানসর্বস্ব বলে ভাবি, তাহলে তা মানুষের আওতার বাইরে চলে যাবে। অর্থাৎ চরম বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির চোখ-ধাঁধানো মন-ভোলানো উপস্থিতি হয়ে উঠবে কার্যত প্রভুত্ববাদ এবং আমরা মুগ্ধভাবে তার কাছে আত্মসমর্পণ করব। ব্যবহারকারীর তুলনায় আয়ুধ যখন বড়ো হয়ে ওঠে, তা নব্য বৌদ্ধিক সন্ত্রাসের জন্ম দেয় এবং সমস্ত উদ্দিষ্ট লক্ষ্য ঝাপসা হতে হতে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। আজকের আধুনিকোত্তর জগতে আমরা যে প্রায়ই প্রতিজগতের প্রকান্ড ছায়া দেখে আঁতকে উঠছি, এর কারণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এখন আর সর্বমানবের আয়ত্তাধীন নয়। প্রথম বিশ্বের মুষ্টিমেয় প্রতাপভোগী বর্গের হাতিয়ার হিসেবে তা মানবিক নির্যাসকেই অনিকেত করে দিচ্ছে।

অবশ্য কেউ কেউ বলবেন, বিজ্ঞান সম্পর্কিত আমাদের ধারণাকে যদি আমরা বেশ কিছুটা উঁচু তারে বেঁধে নিই, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ভাবাদর্শের ক্ষেত্রও ব্যাপকতর হয়ে

উঠবে। কেননা এদের বুঝে নিতে হয় পারস্পরিক ইতিবাচক ও নেতিবাচক সম্পর্কের ভিত্তিতে। কোনো তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনের ওপর যদি বেশি গুরুত্ব আরোপ করি, তাহলে দৈনন্দিন জীবনযাপনের তাৎপর্য অনুধাবনের ক্ষেত্রে তার ক্ষমতাকে হারিয়ে ফেলি। ফলে ব্যাপারটা এই দাঁড়ায় যে ভাবাদর্শের ক্ষেত্র অনেকটা প্রসারিত হতে পারে যেহেতু বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্র সীমিত। আলত্যুসের এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য এভাবে লক্ষ করেছেন কারণ ভাবাদর্শকে তিনি মূলত স্থির ও অনড় বলে ভাবেন নি। ব্যক্তি-সত্তা ও সামাজিক সত্তার অনির্ণেয় পরিস্থিতিতে ভাবাদর্শ হয়তো সত্য হয়ে ওঠার জোরটুকু সর্বদা আয়ত্ত করতে পারে না কিন্তু তবু তাকে অন্তত প্রয়োজনীয় অবভাসের আশ্রয়ে বেঁচে থাকতে হয়। কথাটি আরো বিশদ করে বলতে পারি, এই বিশ্বাসের সজীবতা যদি না থাকত, মানুষের ইতিহাসে তিতিক্ষা ও ঐকান্তিকতা জাতীয় শব্দের কোনো অর্থই থাকত না। এই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে সম্ভবত একথাও বলা চলে যে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রকট ঘাটতি দেখা দেওয়ার ফলেই মুখ্যত-সাবেক সোভিয়েত রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশে, গৌনত অন্যান্য দেশের সমাজতন্ত্র-সন্ধানী অংশের মধ্যে আমাদের দেখতে হলো উল্টোরথের পালা আর ইতিহাসের প্রত্যাখ্যান।

পাঁচ

এই প্রেক্ষিতে আমাদের মনে পড়ে মার্ক্সের একটি পরিচিত বক্তব্য: শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শাসক বর্গের ভাবাদর্শই আধিপত্যবাদের নিজস্ব যুক্তিশৃঙ্খলায় সর্বজনীন মান্যতা ও মর্যাদা অর্জন করে নেয়। এর কারণ, সমাজের গভীরে প্রোথিত থাকে ঐতিহাসিক ভাবে নির্মিত ও নির্ধারিত এমন-কিছু প্রকরণ, যার সাহায্যে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রচারিত হতে থাকে শ্রেণি-প্রভুদের মহিমা এবং তাদের উপযোগী সংস্কৃতি, নৈতিকতা ও ধর্মাচার। আধিপত্যবাদীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, স্বর্গ-নরক, বাস্তব-কল্পনা এমন সর্বগ্রাসী যে তাদের দ্বারা নির্মিত ও নির্দিষ্ট জগৎ আর জীবনের অভিজ্ঞান হয়ে ওঠে দীন অভাজনদেরও আবশ্যিক মান্যতার বিষয়। আরোপিত এই সার্বভৌমতা যুগ যুগ ধরে গোটা সমাজের ভাবাদর্শ হিসেবে বিনাপ্রশ্নে ও নির্বিচারে স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে। প্রতাপের দৃশ্য ও অদৃশ্য সন্ত্রাসে পুরোপুরি প্রান্তিকায়িত জনদের প্রয়োজনও একই উৎস থেকে নির্ধারিত হয়ে থাকে। সচেতন ও অবচেতন ভাবে আরোপিত সমগ্রতার কাছে আত্মসমর্পণ করে বহুধা-বিভক্ত সমাজের অন্তেবাসীবর্গ। কয়েক প্রজন্মের নিরবচ্ছিন্ন অভ্যাসে কোনো আকরণ যখন নিগড়ে পরিণত হয়, তাকে আর চাতুর্য বা কৌশল দিয়ে কিংবা পরিশীলিত মিথ্যার সাহায্যে আরোপ করতে হয় না। বাস্তবের সঙ্গে সমান্তরাল কাল্পনিক উপস্থিতির আকরণ এত শক্তিশালী ও অনিবার্য হয়ে ওঠে যে বহুধা-বিভাজিত সমাজে তা বাস্তবকে অনায়াসে নিজের মাপে তৈরি করে নিতে পারে।

সামাজিক মনস্তত্ত্বের আদলও এমনভাবে গড়ে ওঠে যে চিন্তা-বিশ্বাস-অনুভূতি

অভ্যাসবাহিত সত্যের ধারণাকেই খাঁটি সত্য বলে জানে। একটু আগে যে অবভাসের কথা লিখেছি, তা এভাবেই প্রয়োজনের সংজ্ঞা ও চরিত্র নির্ধারণ করে এবং সত্য ও ছদ্মসত্য এভাবে জটিল বুনটের মধ্য দিয়ে ভাবাদর্শেরও সামাজিক ভিত্তি গড়ে নেয়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই একই অবভাস সক্রিয় ছিল, এই বক্তব্যের তাৎপর্য আলত্যুসেরের প্রতিবেদন থেকে বিচ্ছুরিত চিন্তাসূত্রের আলোয় গভীর নিষ্কর্ষ বয়ে আনে যেন। ভাবাদর্শ বিষয়ে মায়া কি তবে এতদূর প্রসারিত হয়েছিল যে, সমান্তরাল বাস্তব শেষ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যাত হয়ে গেল? অথবা অন্তর্ঘাতএমন আত্মবিদারক হয়ে উঠল যে, প্রকৃত বাস্তব আর কল্পিত বাস্তবের ভার বইতে পারল না! অবসংগঠন থেকে অধিসংগঠনের ব্যবধান ও বিচ্ছিন্নতা কি এতটাই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, পারস্পরিক সংযোগসূত্র হারিয়ে এরা সম্বন্ধ-সংস্থাপক ভাবাদর্শ সহ মুছে গেল অচিরেই? এইসব প্রশ্ন যখন উঠে আসে নতুন নতুন জটিল জিজ্ঞাসা নিয়ে, আমরা যেন ভাবাদর্শের অনন্ত সম্ভাবনাই আবিষ্কার করি। কেননা শ্রেণিদ্বন্দ্বে বিক্ষত সমাজগুলিতেও ঐতিহাসিক ভাবে বিবর্তিত হয়েছে ভাবাদর্শের অজস্র বিভঙ্গ, আবার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে দেখেছি ভাবাদর্শের কত বিচিত্র কৌনিকতা ও উচ্চাবচতা। শ্রেণিহীন সমাজ-ব্যবস্থার যে-আকল্পটি আমাদের মননে ও স্বপ্নে রয়েছে, তার মধ্যেও কিন্তু ভাবাদর্শের অরৈখিকতা এবং অবভাস ও বাস্তবের দ্বিবাচনিকতা অনিবার্য সত্য। শ্রেণিহীন সমাজের রাজনৈতিক অনুষঙ্গ নিয়ে আলোচনা না-করেও আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে সম্ভাবনার সূত্রে তার পরিসর অনন্ত বলেই ভাবাদর্শের তরঙ্গভঙ্গ এবং অবভাসের দ্বিবাচনিক উপস্থিতি অনস্বীকার্য।

অবশ্য এই অনন্ত ও চিরন্তনের নির্যাস নিয়ে প্রতিপ্রশ্ন উত্থাপিত হতেই পারে। আমরা শুধু লক্ষ করব, আলত্যুসের ভাবাদর্শের কৃৎপ্রকরণ বিষয়ক প্রখ্যাত নিবন্ধে এই চিরন্তনতা নিয়ে ভেবেছেন। সেখানে একে ফ্রয়েড-কথিত অবচেতনের সময়-শূন্যতা বিষয়ক ধারণার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আলত্যুসের লিখেছেন: 'It is clear that ideology (as a system of mass representations) is indispensable in any society if men are to be formed, transformed and equipped to respond to the demands of their conditions of existence.' (তদেব:২৩৫)। এই বক্তব্যকে যদি ব্যাখ্যা করি, তাহলে দেখব, মানুষেরও একটি কার্যকরী সংজ্ঞা এখানে দেওয়া হয়েছে এবং তারই নিরিখে ভাবাদর্শও বিচার্য হয়ে উঠেছে। এর আগে যেসব সংজ্ঞা-সূত্র নিয়ে আলোচনা করেছি, তাদের চেয়ে খানিকটা আলাদাভাবে, ভাবাদর্শকে গণ-উপস্থাপনার পদ্ধতি হিসেবে বর্ণনা করা হলো। মানবিক অস্তিত্বের প্রেক্ষিত ও তৎ সংশ্লিষ্ট উপকরণের বিন্যাস থেকে অহরহ যে-সমস্ত দাবি জীবনের কাছে উত্থাপিত হচ্ছে, তাদের প্রতি উপযুক্ত সাড়া দেওয়াই মানুষের দায়। বস্তুত এই সাড়া দেওয়ার ক্ষমতাতেই মানুষের মানবিক অস্তিত্বের সার্থকতাও প্রমাণিত হচ্ছে। মানুষকে যদি তার ঈপ্সিত জগৎ গড়ে তুলতে হয় বা আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী রূপান্তরিত করতে হয়—তাহলে তাকে অস্তিত্বের শর্ত ও দাবি পূরণ করার জন্যে উপযুক্ত কৃৎকৌশল রপ্ত করতেই হবে।

ইতিহাসের যে-পর্যায়েই থাকুক না কেন, প্রতিটি সমাজে এই প্রক্রিয়া অনিবার্য। আর, তাই ভাবাদর্শের গুরুত্বও স্বতশ্চলভাবে প্রমাণিত। সময়ের স্বভাব যত পরিবর্তিত হোক না কেন, এই নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম নেই। এই সূত্রে ভাবাদর্শকে সময়-নিরপেক্ষ বলা যেতে পারে। একদিকে বাস্তবতার বিভিন্ন দাবি এবং অন্যদিকে তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করার ক্ষমতা—এদের মধ্যে সর্বদা সামঞ্জস্য থাকে না। প্রতিটি সমাজে এমন পরিস্থিতি থাকা সম্ভব। এমনকি তেমন কোনো সমাজ যদি সত্যিই চোখে পড়ে যেখানে শ্রেণি-সংঘর্ষ আর নেই, সেখানেও চোখে পড়বে, বাস্তবতা ও তার মুখোমুখি হওয়ার ক্ষমতার মধ্যে রয়ে গেছে দুরপনেয় অনন্বয়। আসলে আমাদের ক্ষমতা কখনো বাস্তবতা ও অবভাস কিংবা আকাঙ্ক্ষা ও জীবনের মধ্যে সেতু গড়ার পক্ষে পর্যাপ্ত হয় না। আমরা যতটুকু ভাবতে পারি, তার চেয়েও ঢের বেশি মূল্য দিয়ে বাস্তবকে জানতে হয়। মৃত্যু ও জীবনের কঠোরতা সম্পর্কে ফ্রয়েড যে-সমস্ত মন্তব্য করেছিলেন, এখানে হয়তো সেসব মনে পড়বে আমাদের। মানুষের ক্ষমতা অন্তহীন, একথা ঠিক, কিন্তু সেই ক্ষমতার চেয়েও প্রকৃত বাস্তবতা অনেক বড় বলে এর সঙ্গে মানুষ এঁটে উঠতে পারে না। বস্তুত পারে না বলেই জীবনের রহস্য সম্পর্কে তার আগ্রহ ফুরোয় না কোনোদিন। আর, জগৎকে মনে হয় অফুরান বিস্ময়ের উৎস।

ছয়

আলত্যুসের লিখেছেন: 'It is in ideology that the classless society lives the inadequacy/adequacy of the relation between it and the world, it is in it and by it that it transforms men's 'consciousness' that is, their attitudes and behaviour so as to raise them to the levels of their tasks and the conditions of their existence'. (তদেব) : শ্রেণিহীন সমাজের অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের জগতের সম্পর্ক থেকে কখনও পর্যাপ্ততা আর কখনও অপর্যাপ্ততার বোধ জেগে ওঠে। এই সবই প্রতিফলিত হয় ভাবাদর্শের আকরণে। বস্তুত ভাবাদর্শের মধ্যে এবং ভাবাদর্শের সাহায্যে ঐ সমাজ মানুষের চেতনাকেও ক্রমশ রূপান্তরিত করতে পারে। রূপান্তরের এই প্রক্রিয়ায় মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যবহার সেই পর্যায়ে উন্নীত হয় যে-বিন্দু থেকে শ্রেণিহীন সমাজের অধিবাসীরা নিজেদের অস্তিত্ব-সংশ্লিষ্ট কর্তব্য ও শর্তাবলী পালন করার পক্ষে উপযুক্ত হয়ে ওঠে। এই বক্তব্য থেকে বুঝতে পারি, ভাবাদর্শ এমন-এক সচল ও সজীব সত্তার অধিকারী যা আপাত-উন্নত সমাজ-ব্যবস্থাকেও ক্রমাগত উৎকর্ষের দিকে সঞ্চালিত করতে পারে। ফলে মানুষের চেতনাও নিরন্তর পরিশীলিত হতে-হতে নতুন নতুন দায়িত্ব পালনের জন্যে যোগ্যতর ও শানিততর হয়ে ওঠে।

সব মিলিয়ে, এখানে আমরা পাচ্ছি ভাবাদর্শ বিষয়ে আলত্যুসেরের আরো একটি সংজ্ঞার প্রস্তাবনা। সাধারণভাবে সমাজে পরিবর্তনের ফলে প্রকৃত পরিস্থিতি যেভাবে তৈরি হয়, তার সঙ্গে যথাযথ ভাবে মানিয়ে নেওয়ার জন্যে আমরাও নিজেদের বদলে

নেওয়ার মতো ক্ষমতা অর্জন করতে চাই। যেসব কৃৎপ্রকরণের মধ্য দিয়ে আমাদের পরিবর্তনশীলতা পরীক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, তাদের এক কথায় বলা যেতে পারে ভাবাদর্শ। এদিক দিয়ে যদি ভাবি, ভাবাদর্শের মধ্যে দেখতে পাব নৈতিক সক্রিয়তা। কেননা জীবন তো সরলরেখায় চলে না কখনও; তার মধ্যে রয়েছে অজস্র চড়াই-উৎরাই, উপত্যকা ও মালভূমি এবং আকস্মিকতার সমাবেশ। অস্তিত্বের সমস্ত অনুপুঙ্খ তো আনন্দ দিতে পারে না; বিষাদের কুয়াশা ও যন্ত্রণার দহন আমাদের সত্তার বড় অংশ দখল করে রাখে। এদের সম্মিলিত উপস্থিতির স্ববিরোধিতা ও কূটাভাস থেকে কোনো অর্থই আমরা ছেঁকে নিতে পারতাম না ভাবাদর্শের প্রাগুক্ত নৈতিক অনুষঙ্গ ছাড়া। অস্তিত্ববাদীরা অবশ্য এই প্রক্রিয়াকে আরো বিশদ ও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেন। আমরা শুধু লক্ষ করি যখনই কেউ স্ববিরোধিতা বা কূটাভাসের কথা বলেছেন, তা কিন্তু যুক্তিশাস্ত্রের দ্বন্দ্ব বা বিভিন্ন আকরণের মধ্যে সংঘর্ষ নয়। এই নিবন্ধের অন্যত্র ব্যবহৃত পারিভাষিক বাচনের সূত্রে বলতে পারি, এই স্ববিরোধিতা ও কূটাভাস ব্যক্ত হয় জীবনে অর্জিত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির সূত্রে। কিংবা, একটু আগে উত্থাপিত সূত্র অনুযায়ী বলা যায়, এই স্ববিরোধিতা প্রকাশ পায় যখন বাস্তবতার ভিন্নমুখি দাবি এবং আমাদের মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতার মধ্যে অনন্বয় দেখা দেয়।

সাত

এতক্ষণ আলত্যুসেরের বিভিন্ন সংজ্ঞা-সূত্র যেভাবে আলোচিত হলো তাতে বেশ কিছু প্রশ্ন ধারাবাহিক ভাবে উঠে এসেছে। এইসব প্রশ্নের মীমাংসা-প্রয়াস জন্ম দিচ্ছে আরো অনেক প্রশ্নের। ভাবাদর্শকে বিজ্ঞান-বহির্ভূত বলে যদি ভাবতে চাই, বিজ্ঞান-চিন্তার পরিধি সম্পর্কে আমাদের আগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তাছাড়া নৈতিকতার সম্পর্ক-বিষয়ক প্রশ্নটি কতদূর এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব, এই জিজ্ঞাসার বিকল্প হিসেবে দেখা দিতে পারে প্রতিপ্রশ্নও। যেমন, ভাবাদর্শ ও নীতিশাস্ত্র কি আদৌ অন্যোন্য-সম্পৃক্ত? অথবা, বিজ্ঞান ও ভাবাদর্শকে যদি মূল্যের দিক দিয়ে সমান বলে ধরে নিই—তাহলে তাত্ত্বিক বয়ানের পক্ষে কোনো হানি হয় কি? এছাড়া কল্পনা ও বাস্তবের পার্থক্য-প্রতীতি ভাবাদর্শের সংগঠনে কতদূর প্রাপ্য— এই প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত রয়ে যায়। বাস্তবে যেমন অন্তর্ঘাত করে কল্পনা, তেমনি কল্পনাতেও অন্তর্ঘাত করে বাস্তব এবং ফলে তৈরি হয় অভিনব কত সুরসাম্য ও মনোমৈত্রী। বাস্তবে যদি অন্তত প্রতীকীভাবেও হস্তক্ষেপ না করে পরা-অস্তিত্বের ছায়া, তাহলে কাল্পনিকের দ্যোতনাও স্পষ্ট হবে না। কেননা জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত ভাবাদর্শের বহুস্বরিক উপস্থিতি গড়ে ওঠে এদের অন্বয়, অনন্বয়, টানাপোড়েন, সংশ্লেষণ ও বিভাজনের ফলে। এদের মধ্যে কি সবচেয়ে প্রাথমিক প্রবণতার স্ফুরন দেখা যায় না? একে কি সংহতিমূলক নাকি বিকৃতিমূলক বলা যাবে? এই প্রসঙ্গে আমরা আলত্যুসেরের একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্যের কথা মনে করতে পারি যেখানে তিনি কল্পনার এমন দুটি স্তরের কথা বলেছেন যাদের একটি যথাপ্রাপ্তের বিকৃতি ঘটায় এবং অপরটি নিজেই তার বিকৃত প্রকাশ। মন্তব্যটি রয়েছে 'Lenin and

Philosophy and Other Essays' বইতে । সেখানে তিনি লিখেছেন: 'All ideology represents in its necessary imaginary distortion not the existing relationship of production (and the other relationship that derive from them) but above all the imaginary relationship of individuals to the relations of production and the relations that derive from them. What is represented in ideologies therefore not the system of the relations which govern the existence of individuals, but the imaginary relation of those individuals to the real relations in which they live.'(১৯৭১:১৫৫)! এখানে উৎপাদন-সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্ক থেকে অর্জিত অন্যোন্য-সম্পর্ক কীভাবে ব্যক্তি-অস্তিত্বের যাবতীয় কাল্পনিক সম্পর্ককে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করে—সে-বিষয়ে কিছু সংকেত দেওয়া হয়েছে। যথাপ্রাপ্ত উৎপাদন-সম্পর্কে কাল্পনিক বিকৃতির সূত্রধার নয় ভাবাদর্শ; ঐসব উৎপাদন-সম্পর্ক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সম্পর্ক যখন ব্যক্তি-অস্তিত্বের মধ্য দিয়ে পরিশীলিত হয়, কেবলমাত্র তখনই তা ভাবাদর্শের আলম্বন হয়ে ওঠে। এইজন্যে এখানে আলত্যুসের আবার জোর দিয়ে বললেন, ব্যক্তি-অস্তিত্বের নিয়ন্ত্রক প্রকৃত সম্পর্কগুলির বিন্যাস ভাবাদর্শে উত্থাপিত হয় না, জৈব সংগঠনের মধ্যে উপলব্ধ বাস্তব সম্পর্ক-বিন্যাসের মধ্যে ব্যক্তির ভাবনা-প্রতিভা ও কল্পনা-প্রতিভা যখন সঞ্চালক সম্পর্কের দ্যোতনা নিয়ে আসে—কেবলমাত্র তখনই তা ভাবাদর্শের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়। স্পষ্টত উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে সম্পৃক্ত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ও আমাদের মনোযোগ দাবি করে। কেননা এইসব অনুষঙ্গের সামগ্রিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যতক্ষণ স্পষ্ট না হচ্ছে, আমরা ভাবাদর্শের সম্পূর্ণ দ্যোতনা সম্পর্কে অনবহিত রয়ে যাব।

আট

সাম্প্রতিক গবেষকেরা ভাবাদর্শের প্রশ্নটিকে দার্শনিক নৃতত্ত্বের বিষয় বলে বর্ণনা করছেন। জীবন ও জগৎ থেকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সূত্রে উত্থাপিত পরিসর এবং কাল্পনিক পরিসর কীভাবে অন্যোন্য-সম্পৃক্ত, তা ঐ দার্শনিক নৃতত্ত্বের বিশ্লেষণ-পদ্ধতি দিয়ে আমরা আরো ভালোভাবে বুঝে নিতে পারি। এই সূত্রে আরো একটি কথা বলা যেতে পারে। ভাবাদর্শ সংক্রান্ত তাঁর বক্তব্য যেভাবে তুলে ধরেছেন আলত্যুসের, তাতে তাঁকে মানবতাবাদী চিন্তা-প্রস্থানের খুব সংলগ্ন বলে মনে হয়। 'For Marx' বইতে এই ধারণার প্রতি খানিকটা সমর্থন জুগিয়ে তিনি লিখেছেন: 'In a classless society ideology is the relay whereby and the element in which, the relation between men and their conditions of existence is lived to the profit of all men' (১৯৬৯:২৩৬)। মানবতাবাদ যদি শেষ পর্যন্ত এক চির সজীব স্বপ্নের নাম হয়ে থাকে, তাহলে শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থার দুর্মর স্বপ্নে দীক্ষিত আলত্যুসেরের বাচনে আমরা যেন খুঁজে পাই ঈপ্সিত পরমতারই বিন্দু। বারবার যাত্রীর

পথ হারিয়ে যায় কুয়াশায় ও অন্ধকারে, চোখের সামনে থেকে মুছে যায় আলোর রেখা; তবু কবি জীবনানন্দের অমোঘ উচ্চারণে বলা যায় :

> 'সকল মানব প্রেমে উৎসারিত হয়, যদি, তবে
> নব নদী নবনীড় নগরী নীলিমা সৃষ্টি হবে
> আমরা চলেছি সেই উজ্জ্বল সূর্যের অনুভবে।'

(অন্ধকার থেকে , বেলা অবেলা কালবেলা)

হ্যাঁ, ভাবাদর্শ আলত্যুসেরের কাছেও 'মানুষের কাছেও মানুষের মানবিক দাবির আশ্চর্য বিশুদ্ধতা'র অন্য নাম। ইতিহাসের ব্যাপক অবসাদের সূত্রপাত হয়ে গিয়েছিল তাঁর সময়েও তবু তিনি ভাবাদর্শের মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে খুঁজে পেয়েছেন 'নব নবীন প্রাক্ সাধনার' বার্তা। একটু আগে যে মানবতাবাদের কথা লিখেছি, তারই নির্যাস তিনি শ্রেণিহীন সমাজ-ব্যবস্থার সঞ্চালক ভাবাদর্শে লক্ষ করেছেন। এ হয়তো এক স্বপ্নেরই কথা, কিন্তু তা আলত্যুসেরের একক স্বপ্ন নয়; এ হলো যৌথ স্বপ্নের বাচন যেখানে নিয়ত উপস্থিত 'শুশ্রূষার শত শত জলঝর্ণার ধ্বনি' ('হে হৃদয়', বেলা অবেলা কালবেলা)। আলত্যুসেরের প্রাগুক্ত বক্তব্যে সেই উজ্জ্বল সমাজের জাগ্রত স্বপ্ন ফুটে উঠেছে যেখানে বিভিন্ন মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং অস্তিত্বের পরিসর জুড়ে অনুরণিত হয় সার্বিক কল্যাণের প্রতিশ্রুতি। আমরা যত সূক্ষ্ম তর্কই করি না কেন, এই হলো ভাবাদর্শের মৌল প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদনের নির্যাস উপেক্ষা করে ভাবাদর্শ সম্পর্কে অন্য কোনো কূট তর্কের বাচন তৈরি করা যায় না। শুধুমাত্র এই প্রাথমিক শর্তটুকু স্বীকার করে নিলে ভাবাদর্শের দৃষ্টান্ত, আকরণ, কৃৎপ্রকরণ, অবসংগঠন ও অধিসংগঠন সংক্রান্ত পরবর্তী আলোচনার সূত্রপাত করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, শুধুমাত্র ভাবাদর্শই ভাবাদর্শ সংক্রান্ত আলোচনার আয়ুধ ও অধিকারী।

এই শেষোক্ত মন্তব্য নিয়ে—মার্ক্সবাদী ও অমার্ক্সবাদী দুই পক্ষের পন্ডিতদের মধ্যেই যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। কিন্তু আলত্যুসেরের বক্তব্য : পূর্বসূরি মার্ক্সবাদী চিন্তাবিদদের মধ্যেও যেহেতু তাত্ত্বিক অসম্পূর্ণতা রয়েছে—ভাবাদর্শের বাচন দিয়েই ভাবাদর্শকে বুঝে নিতে চেয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত তিনি জানিয়েছেন, ইতিহাসের কৃত্য ঐতিহাসিক পরিস্থিতির প্রতিতুলনায় বিষমানুপাতিক বলেই মানুষের জগৎ ও জীবনকে বোঝার জন্যে ভাবাদর্শের প্রয়োজন এত বেশি। বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আত্তীকৃত না-হলে সমাজ-দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয় না এবং তাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুশীলনও করা যায় না। সম্পর্ক-বিন্যাসের অসামঞ্জস্য থেকে আমরা বিচ্ছিন্নতাবোধের তত্ত্বে পৌঁছাই। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত ব্যাখ্যা হয়তো প্রয়োজন কিন্তু এখানে আপাতত এইটুকু লক্ষ করতে পারি যে, আলত্যুসেরের মতে ভাবাদর্শের বিজ্ঞান তৈরি না-হওয়ার ফলেই প্রকৃত বাস্তব সম্পর্ক ও অবভাসের প্রায়োগিক দ্বন্দ্ব থেকে বিচ্ছিন্নতাবোধের বাচনে পৌঁছাই আমরা। যাই হোক, আগেই ইঙ্গিত দিয়েছি, এত-সব সম্পর্ক-বিন্যাসের মধ্যে লক্ষ্মণের রেখা অটুট রাখা কঠিন। সবচেয়ে বড় সত্য সমস্ত কথাই যেহেতু নিজের নিয়ম-নিজেই-সৃষ্টিকারী মানুষ নিয়ে, ভাবাদর্শের প্রাতিষ্ঠানিক স্বভাব ও প্রবণতা,

কৃৎপ্রকরণ ও পরিণতি বিষয়ক যাবতীয় আলোচনা শেষ পর্যন্ত তত্ত্বকেন্দ্রিক না-হয়ে প্রয়োগ-নির্ভর হতে বাধ্য।

'Ideology and Ideological State Apparatuses' শীর্ষক বিখ্যাত নিবন্ধে আলত্যুসের দেখিয়েছেন, রাষ্ট্রসংস্থার নিয়ামক বিধিবিন্যাসে নাগরিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং সামাজিক পদ্ধতির পুনরুৎপাদন ভাবাদর্শের প্রাথমিক লক্ষ্য। মার্ক্স বলেছিলেন সামাজিক উৎপাদনের কথা, আলত্যুসের 'পুনরুৎপাদন' কথাটি পারিভাষিক দ্যোতনায় ব্যবহার করেছেন। এতে ভাবাদর্শ প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র অর্জন করে রাষ্ট্রযন্ত্রের আয়তনে পরিণত হল। তবে তা প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য থেকে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারী। এই সন্দর্ভে আলত্যুসের খুব জোর দিয়ে কল্পনার অবভাস বিষয়ে বলেছেন। কখনও স্পিনোজা কখনও লাকাঁর ছায়া লক্ষ করি তাঁর বয়ানে। জগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, জীবনে তার অবস্থানের স্বরূপ কিংবা কাল্পনিক ও প্রতীকী সত্তার পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়ে আলত্যুসেরের বক্তব্য আরো পরিশীলিত হয়েছে। মার্ক্সের 'The German ideology'তে তিনি লক্ষ করেছেন, ভাবাদর্শকে বিশুদ্ধ অবভাস বা বিশুদ্ধ স্বপ্ন বলে ব্যাপ্ত নেতির আদলে গ্রহণ করা হয়েছে। আর, সমস্ত বাস্তবতাই যেহেতু বহির্বৃত, ভাবাদর্শকে কাল্পনিক নির্মিতি বলে ভাবা হয়েছে যা কিনা ফ্রয়েড-পূর্ববর্তী আলোচকদের প্রতিবেদনে প্রাপ্ত স্বপ্নের তাত্ত্বিক অবস্থানের কথা মনে করিয়ে দেয়। এর বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে আলত্যুসের বলেছেন, কাল্পনিকের বাস্তবতাই ভাবাদর্শের নিজস্ব বাস্তবতা। ভাবাদর্শ স্বভাবে অনৈতিহাসিক; এর মানে এই নয় যে তার কোনো ইতিহাস নেই। বরং ফ্রয়েডের চৈতন্যের মতো ইতিহাস সর্বত্র পরিব্যাপ্ত বলেই কোনো ধরনের সীমিত ঐতিহাসিক পর্বে তা রুদ্ধ নয় এবং পূর্ব-নির্ধারিত নিয়মে বদ্ধ নয়। 'The unconscious' নিবন্ধে ফ্রয়েড অবচেতনাকে বলেছেন সময়হীন কারণ সময়ের মাপ ও গ্রন্থি তৈরি হওয়ার আগেই এই ধারণার জন্ম! ভাষা-সংস্কৃতি-অতিপ্রাকৃতের সঙ্গে পার্থক্য-প্রতীতি তখনো দেখা দেয়নি। এই একই ধারণার ছাঁচে যেন আলত্যুসের বললেন ভাবাদর্শের কথা; সময়হীনতা ও চিরন্তনতা তাঁর কাছে সমার্থক হয়ে উঠল। তিনি স্পষ্টই লিখলেন: 'Ideology is eternal, exactly like the unconscious' (১৯৭১:১৫২)! সমস্ত সাংস্কৃতিক আকরণের মর্মমূলে যেমন যৌথ অবচেতনা, তেমনি প্রতিটি মানবিক প্রত্যয়-অনুভূতি-অভিজ্ঞতার প্রকাশে সক্রিয় রয়েছে ভাবাদর্শ।

যুক্তি ও পাল্টা যুক্তির কোনো শেষ নেই। আলত্যুসের-সংলগ্ন সময়ে যা সত্য ছিল, দ্রুত রূপান্তরপ্রবণ সাম্প্রতিক কালপর্বেও তা সত্য। তাঁর সময়কার প্রকৃত পৃথিবী এবং চিন্তাবিশ্ব দুই-ই বদলে গেছে; কিন্তু তাঁর ভাবাদর্শ-বিষয়ক বক্তব্যের বহুস্বরিকতা আজও বাস্তবের রূপকে এবং রূপকের বাস্তবে নিরবচ্ছিন্ন আলোক সম্পাত করে চলেছে।

উমবের্তো একো, তাঁর চিহ্নবিশ্ব

এমন-এক সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি আমরা যখন সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্য-সমালোচনা ও সাহিত্যকৃতির মধ্যবর্তী জল-বিভাজনরেখা অজস্র সমালোচক ও তাত্ত্বিকেরা ইচ্ছা করে ঝাপসা করে দিচ্ছেন। সব কিছুই তো সংযোগ গড়ে তোলার জন্যে পরিকল্পিত; অথচ সাম্প্রতিক জটিল দুনিয়ায় মুহূর্তের সংরাগ এত প্রাধান্য পাচ্ছে যে সংযোগের প্রয়োজনই হারিয়ে যাচ্ছে। বস্তুসর্বস্বতার পর্যায়ে প্রতিটি বস্তুই চিহ্নায়ক; কিন্তু কথাটা এখানেই থেমে থাকছে না এখন। বুদ্বুদের মতো ক্ষণস্থায়ী যাবতীয় চিহ্নায়ন প্রকরণ। সমস্ত ভাবাদর্শ যখন অবান্তর, কোন্ তাৎপর্যের জন্যে কীভাবে ঐসব অস্থির চিহ্নায়কদের ব্যবহার করব— এই প্রশ্ন আর এড়িয়ে যেতে পারি না। বাখতিন/ভোলোশিনোভ জানিয়েছিলেন, 'without signs there is no ideology ...Everything ideological possesses semiotic value' (১৯৭৩:৯)। চিহ্নতাত্ত্বিক মূল্য ও ভাবাদর্শ অন্যোন্য-সম্পৃক্ত: এই বার্তাকে কীভাবে গ্রহণ করব আজকের উৎকট বিয়োগপর্বে যখন কোথাও কোনো ধরনের ভাবাদর্শকেই প্রাসঙ্গিক বলে স্বীকার করা হচ্ছে না? এমন পরিস্থিতিতে চিহ্নতাত্ত্বিক অধ্যয়ন অর্থাৎ ভাষ্য-ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কোন পথ ধরে চলবে? জীবন-যাপনের আকরণই কেবল বদলে যাচ্ছে না এখন, আঙ্গিক ও অন্তর্বস্তু আমূল রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। অহরহ তাই সংকেত তৈরি হচ্ছে এবং মুছে যাচ্ছে। এ অবস্থায় সংকেত-সন্ধান, সংকেত-পাঠ এবং সংকেত-ভাষ্য ধরা-বাঁধা পথ ধরে চলতে পারে না। এসব বিষয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভঙ্গ এবং তাদের অধিকারের সীমা নিয়ে যিনি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রতিবেদন তৈরি করে চলেছেন, সেই উমবের্তো একোর কাছেই যেতে হয় চিহ্নবিশ্বের তাৎপর্য বোঝার জন্যে। আর, তাঁর বয়ানকে বুঝে নিতে হয় সমসাময়িক ভাবুকদের উদ্ভাসনী চিন্তার প্রতিতুলনায়।

নিউইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকার সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে (১৯৯৬) একো মন্তব্য করেছিলেন, 'আমার তো মনে হয় চিহ্নবিজ্ঞান এই শতাব্দিতে দর্শনের একমাত্র প্রকাশ।' ধীরে ধীরে আমরা যখন একুশ শতকের যাত্রা শুরু করেছি, তাঁর এই দাবির অনেকান্তিক তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা তলিয়ে ভেবে দেখতে হয়। প্রকৃত চিহ্নতাত্ত্বিকের কাছে জীবন তো চিহ্নের অগাধ অবাধ সমুদ্র। সমাজ-সময়-ইতিহাস-সংস্কৃতির অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ নিয়ে সার্থক প্রতিবেদন তৈরি করতে চাই যদি, চিহ্নায়কের নিত্য নবায়মান গ্রন্থনায় চিহ্নায়ন প্রকরণের বিচিত্র বিচ্ছুরণ সম্পর্কে আমাদের অবহিত হতে হবে। প্রশ্ন এই, নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্যে নির্দিষ্ট চিহ্নতাত্ত্বিক প্রকরণ কি ব্যবহার করব যেখানে যথাপ্রাপ্ত অনুপুঙ্খ ও অনুষঙ্গ আমাদের সিদ্ধান্তের উৎস হবে, নাকি সাধারণ চিহ্নবিজ্ঞান

যেভাবে নিজস্ব তাত্ত্বিক বয়ান ও দার্শনিক বর্গ নির্মাণের জন্যে বস্তুর নির্যাসের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়— তা অনুসরণ করব? যেহেতু মূল কথাটা হলো অভিপ্রেত সংযোগের বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে, তত্ত্বজ্ঞ এবং তত্ত্ব-অনভিজ্ঞ সাধারণজনের দৃষ্টিকোন আর তজ্জনিত সমস্যা মনে রাখতে হয় এই চিন্তাপ্রস্থানে। কেননা চিহ্নায়ক সার্বভৌম নয়; সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত বহির্ভূত কোনো চিহ্নায়ন প্রকরণ হতে পারে না। কীভাবে একজন সাধারণ মানুষ অর্থাৎ তত্ত্ব সম্পর্কে অনভিজ্ঞজন বস্তু-ঘটনা-সংকেত সম্পর্কিত উপলব্ধিতে পৌঁছাচ্ছেন এবং তত্ত্বজ্ঞানের অনুভব থেকে তা কেন ও কতটা আলাদা—চিহ্নবিজ্ঞান এই প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে পারে না। এই দায় কিন্তু অন্য কোনো তত্ত্বপ্রস্থানে দেখি না।

আরো একটি কথা আছে। যেভাবে বলি আবহমন্ডল কিংবা সামাজিক/ঐতিহাসিক/সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের কথা, ঠিক তেমনি য়ুরি লোটম্যান প্রস্তাবিত চিহ্নতাত্ত্বিক পরিমন্ডল বা Semiosphere এর কথাও বলতে চান একো এবং অন্য তত্ত্বজ্ঞেরা। এই পরিসরে বৈশ্বিক আবহ ব্যক্ত হয় বলে বস্তু ও চিহ্নের সংযোগ কিংবা বিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনেক কিছু প্রতিফলিত হতে পারে। ফলে যিনি ভাষ্যকার বা ব্যাখ্যাতা হতে চান, তাঁকে সংশ্লেষণী দৃষ্টিরও অধিকারী হতে হয়, কেবলমাত্র অন্তর্ভেদী রঞ্জনরশ্মির ওপর কর্তৃত্ব থাকলেই চলে না। অর্থাৎ গভীরতার সঙ্গে ব্যাপ্তিও আবশ্যিক। একোর মধ্যে সেই বিরল গুণের সমাবেশ ঘটেছে। একদিকে দ্বাদশ থেকে সপ্তদশ শতকের মধ্যযুগীয় আবহ তাঁর মনোযোগের বিষয়, অন্যদিকে তিনি আমাদের চমৎকৃত করে দিতে পারেন'The Name of the Rose', 'Foucault's Pendulum', 'The Island of the Day before'-এর মতো আধুনিকোত্তর উপন্যাস লিখে। এদের মধ্যে প্রাগুক্ত চিহ্নতাত্ত্বিক পরিমন্ডল উপস্থিত অন্তর্বয়ন ও পরা-আখ্যানের কৃৎকৌশল নিয়ে। ইতালীয় ও ইংরেজি ভাষায় চিহ্নবিজ্ঞান সম্পর্কে অজস্র প্রতিবেদন দিয়ে যিনি জিজ্ঞাসু পড়ুয়াদের জন্যে প্রতিনিয়ত চিন্তার নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছেন—তিনটি উপন্যাস যেন তারই পরীক্ষাগার। প্রতিটি বস্তুর মধ্যে নিহিত রয়েছে অনন্ত অন্তর্বৃত ভিন্নতা; বৈচিত্র্যের মধ্যে কেবল বিস্তার নেই, আততিও রয়েছে। একো উপন্যাসের প্রতিবেদনে অবভাস ও তত্ত্ববস্তুর দ্বিরালাপ যেমন সন্ধান করেন, তেমনি তাত্ত্বিক সন্দর্ভে সমকালের আকাঙ্ক্ষা-উৎকণ্ঠা-বিতর্ক এবং গোলকধাঁধার তাৎপর্য নির্ণয়ের জন্যে চিহ্নতাত্ত্বিক পরিমন্ডল গড়ে তোলেন। ১৯৬২ সালে 'Opera aperta' প্রকাশের মধ্য দিয়ে তাঁর চিন্তাবিশ্ব নির্মাণের সূত্রপাত হয়। যেহেতু ইংরেজি ভাষায় লিখিত প্রতিবেদন ছাড়া আমাদের অনেকের পক্ষে একোর চিন্তাবিশ্বের শরিক হওয়া সম্ভব নয়, পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাচ্ছি না তাঁর—এটা ধরেই নেওয়া যায়। এই সীমাবদ্ধতা মনে রেখেই একোর চিন্তাপ্রণালী বিশ্লেষণে এগোতে হবে। মুখ্যত নিম্নোক্ত বই ও নিবন্ধ থেকে একোর চিহ্নবিশ্ব সম্পর্কিত ধারণা তৈরি করে নিচ্ছি আমরা :

১। David Robey সম্পাদিত 'Structuralism; An Introduction' বইতে 'Social life as a sign system' শীর্ষক নিবন্ধ (১৯৭২)।

২। T.A.Sebeok সম্পাদিত 'The Tell-Tale Sign: A survey of Semiotics' বইতে 'Looking for a logic of culture' শীর্ষক নিবন্ধ (১৯৭৫)।

৩। 'A Theory of Semiotics' (১৯৭৬)।

৪। 'Drama Review' পত্রিকায় শীর্ষক নিবন্ধ (১৯৭৭)।

৫। 'Yale Italian studies' পত্রিকায় 'On level of literary form' শীর্ষক নিবন্ধ (১৯৭৭)

৬। 'Yale Italian studies' পত্রিকায় 'The code: Metaphor or interdisciplinary Category' শীর্ষক নিবন্ধ (১৯৭৭)।

৭। T.A Sebeok সম্পাদিত 'Sign, Sound and Sense' বইতে 'Semiotics : 'Semiotic of Theatrical Performance : A discipline or an interdisciplinary method ?' শীর্ষক নিবন্ধ (১৯৭৮)।

৮। 'The Role of the Reader' (১৯৭৯)।

৯। 'Poetics today' পত্রিকায় 'Two problems in textual interpretations' শীর্ষক নিবন্ধ (১৯৮০)।

১০। 'Versus' পত্রিকায় 'Guessing: From Aristotle to Sherlock Holmes' শীর্ষক নিবন্ধ (১৯৮১)।

১১। T.A.Sebeok এবং U.Eco সম্পাদিত 'The sign of three: Dupin, Holmes, Peirce' বইতে 'Horns, Hooves, Insteps: Some Hypotheses on Three Types of Abduction' (১৯৮৩)।

১২। U. Eco.V.Ivanov এবং M.Rector সম্পাদিত 'Carnival' বইতে 'The frames of Canic freedom' শীর্ষক নিবন্ধ (১৯৮৪)।

১৩। 'Semiotics and the Philosophy of Language' (১৯৮৪)। .

১৪ 'Postscript to the Name of the Rose (১৯৮৪)।

১৫। 'Daedalus' পত্রিকায় 'Innovation and repetition between modern and postmodern aesthetics' শীর্ষক নিবন্ধ (১৯৮৫)।

১৬। M.Blonsky সম্পাদিত 'On Signs' বইতে 'Strategies of lying' শীর্ষক নিবন্ধ (১৯৮৫)।

১৭। 'Substance' পত্রিকায় 'Casablanca: Cult movies and intertextual collage' শীর্ষক নিবন্ধ (১৯৮৫)।

১৮। 'Reflections on The Name of the Rose' (১৯৮৫)।

১৯। 'Art and beauty in the Middle Ages' (১৯৮৬)।

২০। 'Travels in Hyperreality' (১৯৮৬)।

২১। 'Faith in fakes' (১৯৮৬)।

২২। 'The open work' (১৯৮৯)।

২৩। 'The Aesthetics of Chaosmos: The Middle Ages of James

Joyce' (১৯৮৯)।

২৪। 'The Limits of Interpretation' (১৯৯০)।

২৫। 'Times literary supplement' পত্রিকায় 'Some paranoid readings' শীর্ষক নিবন্ধ (১৯৯০)।

২৬। J.Lotman রচিত 'Universe of the Mind: The semiotic Theory of Culture' বইয়ের ভূমিকা (১৯৯০)।

২৭। 'Interpretation and Overinterpretation' (১৯৯২)।

২৮। 'Modern Language Notes' পত্রিকায় 'Reading any readers' শীর্ষক নিবন্ধ (১৯৯২)।

২৯। 'Misreadings' (১৯৯৩)।

৩০। 'The search for the Perfect Language' (১৯৯৩)।

৩১। 'Apocalypse postponed' (১৯৯৪)।

৩২। 'How to Travel with a Salmon and Other Essays' (১৯৯৪)।

৩৩। 'Sir Walks in the Fictional Woods' (১৯৯৪)।

৩৪। 'G.Braodbent, R.Bunt এবং C. Jenks সম্পাদিত 'Signs, Symbols and Architecture' বইতে 'Function sign : The semiotics of Architecture' শীর্ষক নিবন্ধ (১৯৯৫)।

এছাড়া অন্য সহযোগীদের সঙ্গে চিহ্নবিজ্ঞান সংক্রান্ত কিছু প্রবন্ধ-সংগ্রহ তিনি সম্পাদনা করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'Meaning and Mental Representation' (১৯৮৮); 'On the medieval theory of signs' (১৯৮৯)। আগেই লিখেছি, এই তালিকার মধ্যে শুধু ইংরেজি ভাষায় রচিত বই ও নিবন্ধ রয়েছে। মূল ইতালীয় রচনা থেকে কিছু কিছু ইতিমধ্যে অনূদিত হলেও, বেশ বড় অংশই রয়ে গেছে মূল ইতালীয় ভাষায়। তবু এই তালিকার দিকে তাকালে বুঝি, জিজ্ঞাসা কত বিচিত্র পরিসরে ব্যাপ্ত হয়েছে। কিংবা পরিসরই নয় কেবল, সময়ের বিভিন্ন পর্বেও তিনি চিহ্নায়ন প্রকরণের প্রত্নতত্ত্ব ও নির্যাস সন্ধান করেছেন। মধ্যযুগের ইংরেজ মনীষী ডাঃ জনসনের দুটি বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি দিয়ে একোর জীবনাদর্শকে সম্ভবত ব্যাখ্যা করা চলে : 'Let observation with extensive view survey mankind, from China to Peru.'

ব্যক্তি-জীবনে ও সামাজিক ইতিহাসে যত ঘটনা-প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে, তাদের কেন্দ্রে রয়েছে মানুষ আর তার তাৎপর্য নির্ণয়ের প্রক্রিয়া। বস্তুপুঞ্জ কিংবা ঘটনাপুঞ্জ বহিরঙ্গে যেক্ষ্মঅভিঘাত তৈরি করে, তাকে অস্বীকার না-করেও বলা যায়, বস্তু বা ঘটনা থেকে অর্জিত সংকেত কিংবা চেতনা-নির্যাসই দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলে যায়। সার্থক চিহ্নতাত্ত্বিক তাই অনবরত বাহির ও ভেতরের মধ্যে সংযোগ ও অন্বয়ের সূত্রগুলি খুঁজতে থাকেন। বস্তুর স্বরূপ নিয়ে যখন কথা বলি, আমরা আসলে তার চিহ্নায়ক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা কিংবা অসম্ভাব্যতা খুঁজতে চাই। ১৯৬২ সালে'opera aperta' বইতে যে-যাত্রার শুরু

হয়েছিল, ধাপে ধাপে বিকশিত হয়ে আজ তা মানবিকী বিদ্যার নানা শাখা-প্রশাখায় শতপুষ্প বিকশিত করে চলেছে। সূচনা-পর্বে একোর চিহ্নতাত্ত্বিক ভাবনা কীরকম ছিল, ঐ বইয়ের নির্বাচিত অংশ ইংরেজি অনুবাদে 'The open work' (১৯৮৯) নামে প্রকাশিত হওয়ার পরে ইংরেজি-জানা পড়ুয়ারা বুঝতে পারলেন।

দুই

দেরিদার বিনির্মাণবাদী চিন্তাপ্রস্থান যখন সমান্তরাল ভাবে বিকশিত হচ্ছে, চিহ্নতত্ত্বের অধ্যয়ন কোনো ভাবেই তার প্রভাব অস্বীকার করতে পারে না। একদিকে পাঠকৃতির এবং অন্যদিকে ভাষ্যকারদের অধিকার কি পরস্পরের সঙ্গে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে অন্বিত? দ্বান্দ্বিকতা কি দ্বিরালাপের সম্ভাবনাকে ব্যাহত বা প্রত্যাখ্যান করছে? এরকম আরো কিছু প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে। বিনির্মাণের দীর্ঘায়ত ছায়ায় চিহ্নতাত্ত্বিক পাঠ কাকে বেশি গুরুত্ব দেবে—ভাষ্যকারকে না তার ভাষ্য-প্রক্রিয়াকে অথবা অন্বিষ্ট পাঠকৃতিকে? বয়ানের অন্তর্বৃত সম্ভাবনার দোহাই দিয়ে ভাষ্যের সাহায্যে পাঠকৃতির সীমানা কত দূর প্রসারিত করতে পারি আমরা? যখন পাঠকৃতির মুখোমুখি হই, সমস্ত পাঠক কি ভাষ্যকারের ভূমিকা নিতে পারেন? ভাষ্যের যেমন সীমা আছে, তেমনি তার সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় চরিত্রের বিচ্ছুরণও আছে। একো পরে যে আদর্শ পাঠক (Model Reader)-এর সন্ধান করেছিলেন, সেই ঈপ্সিত সত্তা কি মুক্ত-সমাপ্তি-সম্পন্ন পাঠেই শুধু নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে? একটু আগে যে পাঠকৃতির অধিকারের কথা বলেছি, তা কিন্তু আদর্শ পাঠকের মর্যাদাবান অবস্থানের নিরিখে খানিকটা জটিল হয়ে পড়ে।

১৯৯০ সালে প্রকাশিত 'The Limits of Interpretation' বইতে একো জোর দিয়ে বলেছেন: 'an open text is always a text and a text can elicit infinite reading without allowing any possible reading. It is impossible to say what is the best interpretation of a text, but it is possible to say which ones are wrong, ...Texts frequently say more than their authors intended to say, but less than what many incontinent (i.e. detementicist or deconstructionist) readers would like them to say.' (পৃ. ১৪৮)

অন্তঃসঙ্গতির শক্তিতে যা সুমিত ও সুসংবদ্ধ, তাকেই বলি প্রণালীবদ্ধ বয়ান। মুক্ত পাঠকৃতির ধারণা কি তাহলে এর বিরোধী? না, মোটেই তা নয়। মনে রাখতে হয় এই কথা যে, মুক্ত মানে বিশৃঙ্খল ও খাপছাড়া নয়। বয়ানও মূলত স্থাপত্য। তাই তার অস্তিত্ব পৌর্বাপর্য ও বহমানতার ওপর নির্ভরশীল। যথাপ্রাপ্ত সংস্থানে কোনো নতুন পাঠকৃতি যখন হস্তক্ষেপ করে, তখনও ছেদ ও ধারাবাহিকতার দ্বিরালাপে নিয়মই প্রতিষ্ঠিত হয়, বেনিয়ম নয়। একো যেহেতু মুক্ত পাঠকৃতিকে অনন্তপাঠের উৎস বলেছেন, কোনো একটি নির্দিষ্ট একক পাঠে বয়ানের আয়ু কখনো ফুরিয়ে যেতে পারে না। তার মৌল বৈশিষ্ট্যই হলো বর্তমানত্ব। কোনো-এক ভবিষ্যৎ সময়-পর্বে যদি তা ঝাপসা বা নিষ্প্রভ

হয়ে যায়, তখন তা আর বর্তমানের বিষয় থাকে না, হয়ে ওঠে প্রত্নবস্তু। ভাষ্যকার-পাঠক সেক্ষেত্রে ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করবেন। একোর মন্তব্য-সূত্রে বলা যায়, যত পাঠক তত পাঠ এবং তত ভাষ্য। এদের মধ্যে কোন্‌টি সর্বশ্রেষ্ঠ বা সত্যের সবচেয়ে ভালো উন্মোচক—তা বলা অসম্ভব। তবে কোন্ বিশ্লেষণ ঠিক নয়, সেগুলি নিশ্চয় চিহ্নিত করা চলে। আমাদের বাংলা সাহিত্য পাঠের অভিজ্ঞতায় এর যথেষ্ট সমর্থন মেলে।

বিশেষত ধ্রুপদী সাহিত্যের পুনঃপাঠে ভাষ্যের অতিরেকও যে স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যেই পড়ে, তাও মনে রাখা দরকার। প্রশ্ন হচ্ছে, ভাষ্যের সীমানা নির্ধারণ করব কীভাবে? একো এসম্পর্কে নিজস্ব প্রতিবেদন পেশ করেছেন যার সতর্ক ও নির্দিষ্ট অনুশীলন প্রয়োজন। ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের ভাষ্য কত আশ্চর্যজনক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে, সেই অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে। প্রাচীন গ্রিক সাহিত্যের ভাষ্য দেশে দেশে কালে কালে কত শিখর থেকে শিখরান্তরে পর্যটন করেছে—তাও স্মরণীয়। বস্তুত বিশ্বসাহিত্যে কালোত্তীর্ণ এমন কিছু পাঠকৃতি রয়েছে যা পরবর্তী প্রজন্মগুলির কাছে কার্যত চিহ্নায়কের আকর হয়ে উঠেছে। প্রমিথিউস বা অয়দিপাউস বা আন্তিগোনে বিষয়ক পাঠকৃতি এখন কি নিছক কাহিনি শুধু? নাকি আখ্যানের উপর বহু শতাব্দীর ভাষ্যকারদের অনেকার্থদ্যোতক পাঠের প্রলেপ পড়তে পড়তে বয়ানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে পড়েছে অন্তঃশায়ী চিহ্নায়ন প্রকরণও। তেমনি ঘটেছে প্যারাডাইজ লস্ট বা ফাউস্টের ক্ষেত্রে; হ্যামলেট-ম্যাকবেথ-কিং লীয়ার প্রভৃতির ক্ষেত্রেও তা-ই। বাংলা সাহিত্যেও রক্তকরবী-ডাকঘর-রাজা-অচলায়তন যদি পড়ি আজ, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভাষ্যও কি অলক্ষ্যে সম্পৃক্ত হয়ে যায় না মূল পাঠকৃতির সঙ্গে? আর, সেই সঙ্গে অন্য ভাষ্যকারদের বয়ানও! আসলে মানুষ চিহ্ন-উৎপাদক প্রাণী; বস্তুকে নিছক বস্তু হিসেবে দেখে তৃপ্তি নেই তার। বস্তু থেকে চিহ্ন তৈরি না-করা পর্যন্ত 'বস্তুস্বরূপ' সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না মানুষ।

বাংলা কবিতায় জীবনানন্দ প্রথম ব্যাপকভাবে ভাষাকে বিবরণ থেকে চিহ্নায়কের গ্রন্থনায় সরিয়ে আনেন। তাঁর কাজই ছিল, অনবরত নতুন-নতুন চিহ্নায়ন প্রকরণ গড়ে তোলা আর ভেঙে ফেলা। চিহ্নায়কের উদয় আর বিলয় এত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ঘটে গেছে তাঁর কবিতায় যে বিনির্মাণ শুধুই কৃৎকৌশল নয় তাঁর চিন্তাবিশ্বে, নান্দনিক দর্শনেরই অভিজ্ঞান। একো যে-পাঠকসত্তাকে আদর্শ পাঠক (Model Reader) বলে উপস্থাপিত করেছেন, প্রাগুক্ত সমস্ত বয়ানের পক্ষে তার উপস্থিতি আবশ্যিক। এই সত্তা ভাষ্যের রাজপথে ও শাখাপথে, প্রকাশ-অপ্রকাশের আলো-আঁধারিতে সমান সাবলীল ভাবে এগিয়ে যায়। প্রমাণ করে যে 'any act of interpretation is a dialectic between openness and form, initiative on the part of the interpreter and contextual pressure.'। প্রকরণ মানেই তো কোনো-না কোনো ধরনের রুদ্ধতা, যার উল্টো মেরুতে রয়েছে ভাষ্যকারের কাঙ্ক্ষিত মুক্ত পরিসর। এই দুইয়ের দ্বিবাচনিকতা মানে কি তবে প্রকরণের প্রতি অস্বীকৃতি? কিন্তু প্রসঙ্গের চাপ কীভাবে উপেক্ষা করতে পারেন ভাষ্যকার-পাঠক!

এরকম আরো কিছু প্রশ্নের প্রেক্ষিতে একোর 'সীমাহীন চিহ্নায়ন'(Unlimited Semiosis) বিষয়ক প্রস্তাবনা মনে আসে। উপন্যাস, প্যারডি এবং অন্য কল্পনা-প্রসূত বয়ানের ক্ষেত্রে ঐ তত্ত্ববীজ কতটা কার্যকরী—একোর বক্তব্য অনুসরণ করে আমরা বুঝে নিই। যে-ধরনের ভাষ্য রুদ্ধ আকরণে গিয়ে পৌঁছায় এবং চিন্তা ও প্রত্যয়কে সীমায়িত করতে চায়, তাদের প্রত্যাখ্যান করাই চিহ্নজিজ্ঞাসুর জরুরি কৃত্য। বিকল্প ভাষ্য ও বিকল্প তাৎপর্যের সম্ভাবনাকে প্রতিহত করতে চাইলে মুক্ত পাঠের প্রক্রিয়া ধ্বস্ত হতে বাধ্য। বয়ানে বিবরণের গুরুত্ব থাকবেই; কিন্তু বয়ানের অনন্যতা তার ওপর নির্ভর করে না। প্রতীক বা ভাবকল্প বা সংকেত যদি চিহ্নায়কের গ্রন্থনার মধ্য দিয়ে বিচ্ছুরিত হয়, তবেই সীমাতিযায়ী পাঠকৃতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কেননা এর মানে আদর্শ পাঠকের জন্যে নবায়মান প্রত্যাহ্বান, তাৎপর্যের অনন্ত বিস্তার ধারণ করার উপযোগী মননমুদ্রার সন্ধান। প্রতীক বা ভাবকল্প বা সংকেত বা রূপক আবশ্যিকভাবে বহুস্বরিক ও অনেকার্থদ্যোতক। চিহ্নায়ক কীভাবে আক্ষরিক বিন্যাসের মধ্য দিয়ে তাদের ধারণ করে, সেই রহস্য উন্মোচন করেন আদর্শ পাঠক। কোনো ভাষ্যবিশেষের কর্তৃত্ব দ্বারা নিশ্চয়ীকৃত অনন্য তাৎপর্য খুঁজতে হবে পাঠকৃতিতে—এ জাতীয় ধারণার মধ্যে আধিপত্যবাদের ছায়া লক্ষ করে আদর্শ পাঠক তার বিরোধিতা করেন। আবার কোনো পাঠকৃতির অন্তহীন ভাষ্য করা সম্ভব, এমন বক্তব্যও তিনি সমর্থন করেন না। এবার একটু অন্যভাবে জিজ্ঞাসা পেশ করা যায় : চিহ্নায়ন প্রকরণের সঙ্গে ভাষ্যকার-পাঠকের সম্পর্ক ঠিক কীরকম? অন্বিষ্ট তাৎপর্য কি অনেকটা পরিমাণে ঐ সম্পর্কের চরিত্রের ওপর নির্ভর করে না!

তিন

বলা বাহুল্য, এইসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মীমাংসা শুধুমাত্র প্রণালীবদ্ধ বিশ্লেষণেই সম্ভব। একোর বয়ান ধারাবাহিক ভাবে অনুসরণ করলেই কেবল বুঝতে পারি, তাঁর চিহ্নতাত্ত্বিক আবহমণ্ডল কীভাবে ধাপে-ধাপে গড়ে উঠেছে। অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় যিনি ইতালীয় ও ইংরেজি ভাষায় তাত্ত্বিক ও ঔপন্যাসিক প্রতিবেদন সহ অজস্র প্রাক্‌কথন, ভূমিকা, টীকা-টিপ্পনি ও স্মারক প্রবন্ধ লিখে গেছেন এবং প্রাগুক্ত দুটি ভাষা ছাড়াও যিনি ফরাসি, জার্মান ও স্পেনীয় ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন—সেই একোর বাচনে বৈদগ্ধ্য ও সূক্ষ্ম অনুভূতির মণিকাঞ্চন সংযোগ হওয়া প্রত্যাশিতই। বহুভাষাবিদ একো অস্তিত্ব ও জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার প্রকাশ হিসেবে বাস্তবতাকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার মধ্য দিয়েই চিহ্নায়ন প্রকরণে পৌঁছেছেন। দর্শনের সমগ্র ইতিহাসকে যিনি চিহ্নতাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে পুনঃপাঠ করতে চেয়েছেন, সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোন থেকেও তাঁর চিহ্নবিশ্বের নন্দনতত্ত্ব নিশ্চয় অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

মনে রাখা প্রয়োজন, ভাষ্য ও ভাষ্যকার মিলেই চিহ্নবিজ্ঞানের পরিসর গড়ে ওঠে। বোধ ও তাৎপর্যের মুক্ত ও চলমান উৎপাদন প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করে চিহ্নতাত্ত্বিকেরা কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। সাধারণ চিহ্নতত্ত্বের পরিসরের মধ্যেই

রয়েছে ভাষ্যের বিশেষ চিহ্নতত্ত্ব, রয়েছে সংকেতায়ন থেকে বিসংকেতায়নে পৌঁছানোর আলাদা চিহ্নতত্ত্ব। চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের সম্পর্কে রৈখিকতা অস্বীকার করে কেউ কেউ বলেছেন এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্কের বিপর্যাস ঘটে যাওয়ার কথাও। বস্তু থেকে সংকেতে পৌঁছানো মননের বিশেষ একটি প্রবণতা, আবার অন্য-এক প্রবণতায় সংকেতের অন্তর্নিহিত সাংকেতিকতা বিনির্মাণ করারও প্রয়াস দেখা যায় সাহিত্যে, সমাজে এবং দর্শনে। বহু শতাব্দী ধরে চলমান চিহ্নতাত্ত্বিক পরম্পরা থেকে একো কেন ও কতটা আলাদা—তা যেমন জানা জরুরি তেমনি সমসাময়িক দার্শনিক ও সাহিত্যতাত্ত্বিকদের চিহ্নায়ন বিষয়ক ভাবনার সঙ্গেও প্রতিতুলনা করা প্রয়োজন। কিন্তু এই দুটি বিষয় আলাদা নিবন্ধের পরিসর দাবি করে। অতএব এখানে সামান্য কিছু প্রাসঙ্গিক বক্তব্য উত্থাপন করছি মাত্র।

মধ্যযুগ ও তার সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলকে একো যেভাবে নিবিড় পাঠ করেছেন, তা থেকে বুঝতে পারি, বস্তু থেকে চিহ্নে পৌঁছানোর প্রবণতা সমস্ত যুগেই মানুষের মধ্যে বর্তমান ছিল। বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজে-কর্মে এর প্রকাশ ঘটেছে। তবে বিশ শতাব্দীর শুরুতেই এই প্রবণতা প্রণালীবদ্ধ ভাবে বিকশিত হতে শুরু করে। চার্লস স্যান্ডার্স পিয়ার্স এর কথা মনে রাখলে বলতেই হয়, উনিশ শতকের শেষ দিকে চিহ্নতত্ত্বের নতুন পর্যায় শুরু হয়েছিল। ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর ১৯১৫ সাল নাগাদ এই প্রক্রিয়ায় নতুন মাত্রা যোগ করেন। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, বিশেষত ষাটের দশক থেকে, চিহ্নতাত্ত্বিক আবহমন্ডলকে পুষ্ট করতে থাকেন মিখায়েল বাখতিন। মিশেল ফুকো, রোলাঁ বার্ত, মরিস ব্লাশোঁ, রোমান য়্যাকবসন, য়্যুরি লোটম্যান, জোনাথন কুলের, জন ডিলি, জাক দেরিদা, জুলিয়া ক্রিস্তেভা, জাক লাকাঁ, পল রিকো, মিশেল রিফাটেরে, টমাস সেবেওক প্রমুখ দার্শনিক ও ভাষ্যকারদের সম্মেলক উপস্থিতিতে গড়ে উঠেছে ঐ আবহমন্ডল। তাই এমন অন্যোন্য-নির্ভর চিন্তাপ্রস্থান আজকের পৃথিবীতে দুর্লভ।

জীবন ও মননের, সত্তাতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের অজস্র স্তর সমান্তরাল ভাবে ছুঁয়ে থাকে চিহ্নতত্ত্ব। একোর রচনা যেন হাজার-দুয়ারি প্রতিবেদন। এই চিন্তাপ্রস্থানের নিরবচ্ছিন্ন বিচ্ছুরণ তাঁকে কেবল সন্দর্ভ নির্মাণেই প্রাণিত করেনি, সংগঠক হিসেবেও বিপুল মান্যতা দিয়েছে। 'International Assoiciation for Semiotic Studies' নামক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংগঠনের সাধারণ সচিব (১৯৭২-৭৯), সহসভাপতি (১৯৭৯-৮৪) এবং সাম্মানিক সভাপতি (১৯৯৪ থেকে) হিসেবে তিনি গুরুদায়িত্ব পালন করে চলেছেন। এছাড়া সংগঠনের মুখপাত্র 'Semiotica' র সম্পাদক সমিতির তিনি স্থায়ী সদস্য। ১৯৬৯ সালের ২১-২২ জানুয়ারি পারিতে এই সংগঠনের যখন জন্ম হয়, একো ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। বিখ্যাত ফরাসি ভাষাতাত্ত্বিক এমিল বেনভেনিস্ত ও রোমান য়্যাকবসন্ এর প্রধান স্থপতি। য়্যুরি লোটম্যান আমৃত্যু এর অন্যতম সহসভাপতি ছিলেন(১৯৬৯-১৯৯৩)। জুলিয়া ক্রিস্তেভার সঙ্গেও সংগঠনের নিবিড় সম্পর্ক ছিল, যদিও তিনি বিদ্যাচর্চার অন্যান্য ক্ষেত্রে নিজেকে বেশি প্রসারিত করায় চিহ্নতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর অভিনিবেশ খানিকটা শিথিল হয়ে পড়ে। একোর ঘনিষ্ঠ

সহযোগী রোক্কো ক্যাপোজ্জি জানিয়েছেন, চিহ্নতত্ত্বের সাম্প্রতিক পরিসর যে যুগপৎ অনেকান্তিক ও নবায়মান—এর পেছনে ঐ সংগঠনের, বিশেষভাবে একোর, অবদান অসামান্য।

পিয়ার্সের প্রতিবেদন ধারাবাহিক ভাবে পুনঃপাঠ করে সি. কে. ওগডেন ও আই. এ. রিচার্ডস্ যে তাৎপর্যতত্ত্বে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন, তাকে আরো প্রসারিত করে গেছেন চার্লস মরিস, য়্যুরি লোটম্যান ও রোমান য়্যাকবসন্। একোর চিন্তাসৌধ গড়ে উঠেছে সহযাত্রীদের সমস্ত উপাদান ও বয়ান আত্মস্থ করে। জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক আলোচনাচক্রে (১৯৭৬) একো নিজেকে 'Peircist' বলে ঘোষণা করেছিলেন। অর্থাৎ ঐতিহ্য-পরম্পরাকে স্বীকৃতি জানিয়েই চিহ্নবিজ্ঞানী হিসেবে নিজস্ব ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তিনি। মানবিকী বিদ্যার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় কেবল চিহ্নবিজ্ঞানকে প্রসারিত করেননি একো, বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে তার অন্বয় তৈরি করার কথা ভেবেছেন। ইতালীর বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী জর্জিয়ো প্রোদি (১৯২৮-১৯৮৭) চিকিৎসাবিজ্ঞান, চিহ্নবিজ্ঞান ও জ্ঞানতত্ত্বের সঙ্গে ভাষাদর্শন ও যুক্তিবিদ্যার আশ্চর্য সমন্বয় সাধন করেছিলেন। তাঁর চেষ্টায় 'জৈবচিহ্নতত্ত্ব' নামে নতুন এক ঘরানার জন্ম হয়। বিভিন্ন বিদ্যাপরিসরের মধ্যে অন্যোন্য-উদ্ভাসন কী অমেয় উচ্চতায় পৌঁছাতে পারে, প্রোদি তা দেখিয়েছেন। একোর সঙ্গে তাঁর নিবিড় বন্ধুত্ব ছিল। দু'জনের সম্মিলিত উদ্যোগে ১৯৮৬-তে জৈবচিহ্নতত্ত্বেরও আরো একটি প্রশাখা প্রস্তাবিত হয় যাকে পন্ডিতেরা 'immunosemiotic' (ব্যাধি-নিরোধ- বিষয়ক চিহ্নবিদ্যা) বলেছেন। অর্থাৎ, জীবন ও মননের সম্ভাব্য সমস্ত অনুপুঙ্খ সম্পর্কে প্রগাঢ় কৌতূহল একোর। পিকাসোর মতো তিনিও এই বার্তা নিয়ে এসেছেন যেন, 'I am curious about every aspect, moment and phenomenon of life. I am curious about every dream. My curiosity crosses over every frontier of curiosity.'(Understanding Picasso: 1974:88)

আসলে এভাবে সংস্কৃতিতত্ত্বেও নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচনের সম্ভাবনা প্রসারিত করে যাচ্ছেন একো। এতে বিদ্যাচর্চার পরস্পর-ভিন্ন ক্ষেত্র থেকে বিশেষজ্ঞরা যোগ দিতে পারছেন অভাবনীয় উৎসাহে। চিহ্নবিশ্ব হয়ে উঠছে অন্তহীন সংশ্লেষণের আধার ও আধেয়। এতে ক্রমশ সমস্ত চিন্তা-প্রস্থানের আকল্প-নির্মাণে রৈখিকতা ভেঙে যাচ্ছে, প্রতিবেদনের সীমানা মুছে যাচ্ছে, ঐতিহ্য ও মৌলিকতার আততি নতুন তাৎপর্য নিয়ে আসছে এবং জ্ঞানের সন্ধিৎসায় অন্তর্বস্তু ও আকরণের চিরাগত আন্তঃসম্পর্কও পুনর্নির্ণীত হচ্ছে। সব মিলিয়ে আমাদের চোখের সামনে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে প্রকৃত অর্থেই বিশ্বব্যাপ্ত এক 'Semiotic Landscape!' এই শব্দটিও একো দিয়েছেন আমাদের। ১৯৭৪ সালে তাঁর নিজের শহর মিলানে 'International Association for Semiotic Studies'—এর প্রথম অধিবেশন যখন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেসময় তিনি কথাটি ব্যবহার করেন। পরে আলোচনাচক্রের ১২৩৮ পৃষ্ঠার বিপুলাকৃতি স্মরণিকায় তা প্রধান শিরোনাম হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছিল।

আজ আমরা ঐ চিহ্নতাত্ত্বিক দৃশ্যসংস্থানের বাসিন্দা। অর্থাৎ শুধু যে চিহ্নবিজ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতি ও অন্বিষ্ট অনুশীলন করছি, তা-ই নয়। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, সন্ধানক্রিয়া-সন্ধিৎসুজন-অন্বিষ্ট একই মহাপ্রসৃতির আবশ্যিক ও অপরিহার্য অনুষঙ্গ হয়ে পড়েছি। আজ ইতিহাস নিয়ে কথা বলি কিংবা সাহিত্য চিত্রকলা স্থাপত্য ভাস্কর্য সঙ্গীত নিয়ে, আর্থরাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতা কিংবা বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, তথ্য-বিনোদন আর বহির্বৃত উপস্থিতি নয়। সর্বতোভাবে চিহ্নায়িত অস্তিত্ব থেকে এক গণ্ডূষ চিহ্ন তুলে আনছি, হয়তো পরমুহূর্তে কিংবা পরবর্তী অবকাশে চিহ্নসাগরে বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যাওয়ার জন্যে। আমরা একদিকে কোনো-এক চিহ্নায়ন প্রকরণ দিয়ে নিজেদের সম্মোহিত করছি, আবার অন্যদিকে নতুন ধরনের বার্তা উৎপাদন করে সেই সম্মোহন থেকে নিষ্ক্রমণের প্রস্তাবনাও করছি। সর্বত্র একোর সঞ্চরমান ছায়া; বার্তা-সংকেত-ভাবাদর্শ কিংবা চিহ্ন-প্রতীক-ভাষ্য জুড়ে জীবন ও মননের গ্রন্থিল দ্বিরালাপের দিকে যখনই তাকাই, কোনো-না-কোনো ভাবে ঐ ছায়ার অভিজ্ঞান স্পষ্ট হয়। একোর ঘনিষ্ঠ সহযোগী রোক্কো ক্যাপোজ্জি তাই 'Reading Eco: An Anthology' বইয়ের সম্পাদকীয় মন্তব্য উপসংহার করেন এই বলে: 'Eco's fecund creativity and myriad enterprises evident as much in his life as in his writings, are bolstered by charm, wit and vigor. This book is offered as an unpretentious iconic index of his persona; the dynamic object and its multifarious symbols, taken together, certainly 'spice with exhilarating brio...' these propitious times of the sign.(১৯৯৭: ষোলো)

চার

আজকের সময় চিহ্নের অভূতপূর্ব বিস্তারের সময়। আধুনিকোত্তর সাম্প্রতিক বস্তুত চিহ্নের সন্ত্রাস ও উন্মত্ততা প্রত্যক্ষ করছে বিহ্বলভাবে। চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের রৈখিক সম্পর্কে বিপর্যয় ঘটে যাচ্ছে মুহুর্মুহু। চিহ্নায়ক-খচিত নিহিত পরাভাষ্য ও ভাষ্যকারের প্রস্তাবিত ভাষ্য ফলে সমান্তরাল, এমন কি, বিপ্রতীপ হয়ে পড়ছে। এ কেবল তাত্ত্বিকদের সমস্যা নয়, সাধারণ পাঠকেরও সংকট। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা থেকে কয়েকটি চিহ্নায়ন প্রকরণের দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি প্রাগুক্ত ঐ সমান্তরালতা ও বিপ্রতীপতার। কবিসত্তা ও কথকসত্তার লুকোচুরি কখনো কখনো বিভ্রান্ত করে পাঠককে। পাঠক বিভ্রান্ত হন, কারণ বয়ানে-নিহিত পরাভাষ্য কৌতুকী-বিষণ্ণ-সংক্ষুব্ধ কবির বহুস্বরিক কল্পনা ও প্রত্যাঘাতপ্রবণ চাতুর্যের যুগলবন্দির ফসল। সম্ভবত জীবনানন্দ এর আদি পুরোহিত। নিম্নোদ্ধৃত পঙ্ক্তিগুলি এবার লক্ষ করা যাক :

ক. 'জীবন: ভারতের, চীনের, আফ্রিকার নদী পাহাড়ে বিচরণের মূঢ় আনন্দময় নয় আর
বরং নির্ভীক বীরদের রচিত পৃথিবীর ছিদ্রে ছিদ্রে
ইস্ক্রুপের মতো আটকে থাকবার শৌর্য ও আমোদ;
তারপর চুম্বক পাহাড়ে গিয়ে নিস্তব্ধ হবার মতো আস্বাদ?

জীবন: নির্ভীক নারীদের সৌন্দর্যের আঘাতে
নিগ্রো সংগীতের বেদনার ধুলোরাশি?
কিন্তু এ বেদনা আত্মিক, তাই ঝাপ্‌সা—একাকী; তাই কিছু নয়—'
(জীবনানন্দ: আজকের এক মুহূর্ত)

খ.'এ-দেহ সঙ্কেতময় তুমি পড়ো, তুমি পাঠ করো
পাঁচটি আঙুলে ধরা অস্ত্রখন্ড, তবু মন ভয়ে জড়োসড়ো—
ললাট আলেখ্যপ্রায়, ধাতা জগতের এ প্রতিফলন,
দেহ, যার ক্ষয় নেই অশ্বহীন রণ,
সেতুহীন নদী, তার ঘাটে ঘাটে জ্বলছে শিবির,
গত রাত্রির যুদ্ধে, ক্ষপণক, তুমি নাকি বীর
প্রতিপন্ন হয়েছিলে? অন্য পাড়ে কারা ছিল—কাদের বিলাপ
এখনও শুনছ তুমি? জানো, যুদ্ধ শেষ। শুধু হিংসারা অবলীঢ় তাপ
কিছু অবশিষ্ট আছে। আছে বটবৃক্ষে মানত, বাঁধুনি
এবং দেয়াল ঘেঁষে, মৃত্তিকায়, ফেটে যাওয়া মূর্তি শাক্যমুনি।'
(উৎপল কুমার বসু: সংহিতা ২)

এই দুটি বয়ানে বাচনভঙ্গি আলাদা। কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই উদ্দিষ্ট গ্রহীতা-সত্তার অনুপস্থিত উপস্থিতি অনুভবগম্য। দুটি ক্ষেত্রেই কবিসত্তা নিজেরই অপর সত্তার সঙ্গে দ্বিরালাপে মগ্ন। শব্দের অন্তর্বর্তী শূন্যতা পাঠ করে মনে হয়, কবি নিজেই কিছু ইশারা দিতে চাইছেন। আবার, সেইসঙ্গে সংশয়ও সঞ্চারিত করছেন। দু'জন দু'রকমভাবে অস্তিত্বের অন্তর্বৃত বিপ্রতীপতার দিকে তর্জনি সংকেত করছেন। কিন্তু চিহ্নায়কের গ্রন্থনায় এমন কিছু দূরান্বয় রয়েছে যার ফলে বয়ানে-নিহিত-পরাভাষ্য আর পাঠকের নির্ণীত তাৎপর্যের মধ্যে বড়সড় সংঘাতও যেন অনিবার্য হয়ে যায়। এই সংঘাতকেও শেষ পর্যন্ত তাৎপর্য-প্রতীতির কৃৎকৌশল বলে বুঝতে পারি।

কখনো-কখনো কবি ঐ সংঘাতের সম্ভাবনাকে আড়ালে সরিয়ে দেওয়ার জন্যে নানা ধরনের ছদ্মবেশ পরে নেন। জয় গোস্বামীর বাচন থেকে একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি যেখানে অন্তর্নাট্যের আকরণে আপাত-অলংকৃত বাক্‌রীতি সূক্ষ্ম বিপ্রতীপতার দ্যোতনা নিয়ে এসেছে। পরাভাষ্য ও সম্ভাব্য ভাষ্যের মধ্যে অনন্বয়ই এই কবিতার শক্তির উৎস; এখানে বাচনের আপাত-সারল্য আসলে ছদ্মবেশ :

'নির্বাপণের একদিকে জলরাশি। অন্যদিকে
পোড়া মরুভুমি।
নির্বাপণের মাথায় একটা দাঁড়কাক বসে আছে।
ও-ই হল শেষ-হওয়া শিখা।
আমি বললাম: আমার তো
এখনও অনেক লেখা বাকি। আগুনের সঙ্গে
কথা বলা দরকার। সে কোথায়?

নির্বাপণ বলল : ওই হোথা।

নির্বাপণের অঙ্গুলি-নির্দেশের সামনে একটা পাহাড়।

বিষাদ-পাহাড়।

তার নিচু গুহায় আগুন বসে আছে। ঘুঁষিতে রাখা থুতনি।

জুতোয় জন্মেছে ঘাস। ঊরুতে জন্মেছে। মস্ত পিঠ আর বাহুর

পেশী থেকে নামছে শেকড়। চুলে দাড়িতে কাঁটালতা দৃষ্টি ফাঁকা।

এর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই'। (জয়ী: ও: স্বপ্ন)

পাশাপাশি রণজিৎ দাশের আগাগোড়া চিহ্নায়ক-খচিত বয়ানে আপাত-জটিলতা কবির আড়াল রচনার কৃৎকৌশল। জয়ের উল্টো মেরুতে রণজিৎ-এর বাচন, কিন্তু এখানেও বয়ানে-নিহিত-ভাষ্য আর সম্ভাব্য ভাষ্যের মধ্যে বিপ্রতীপতা অনিবার্য:

'বাস্তবতার একমাত্র প্রমাণ স্মৃতি। একটি বৃদ্ধ মাকড়সার স্মৃতি। আমি দেখছি সেই মাকড়সার জাল—যার মধ্যে আটকে আছে চাঁদ, জেলেনৌকো, কিশোরীদের গানের বই, অজস্র ডাকটিকিট, রঙিন প্লাস্টিকের গ্লোব, মৃত্যু-টেলিগ্রাম। আমি নিজে সেই জালের সরু তারের ওপর দিয়ে হেঁটেছি। হাততালির শব্দ, ক্লাউনের হাসি এবং রোগা সিংহের গর্জন আমার দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছে। এরপর আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে সার্কাসতাঁবুর বাইরে, এটাই নিয়ম। সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে দেখছি, কীভাবে বিহার জুড়ে গ্রীষ্মে লু বয়,....... কীভাবে পর্যটক বাঙালি দম্পতিরা আরো পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হয়ে শিমূলতলা থেকে ফিরে আসে।

সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে দেখেছি, আমিই সেই বৃদ্ধ মাকড়সা...' ('মাকড়সা': ঈশ্বরের চোখ)

এই যে চিহ্নায়ন প্রকরণের চার রকম উপস্থাপনা লক্ষ করলাম এতক্ষণ, প্রতিটি ক্ষেত্রে বিবরণ আমূল বিনির্মিত হয়েছে। এ এক নতুন আবহমন্ডল, যেখানে শব্দ কখনো জ্যোৎস্না, কখনো খর-রৌদ্র। পরিচিত ভূগোল ও ইতিহাসের, দৈনন্দিনের অতিতুচ্ছ অনুপুঙ্খও চিহ্নায়কে রূপান্তরিত হওয়ার পরে কেমন রহস্যমেদুর। আবার বিচিত্র উৎসজাত চিহ্নায়কগুলি যখন একটি পাঠকৃতি গড়ে তোলার জন্যে পরস্পর-সংলগ্ন হয়ে পড়ে, ঐ রহস্যমেদুরতাও আরো অজানা অচেনা গোলকধাঁধার সোপানে পরিণত হয়। লোটম্যান, একো ও তাদের সহযোগীরা যাকে 'Semiosphere' বলে বুঝেছেন, রহস্যের প্রগাঢ় উপস্থিতিতে সেই চিহ্নায়ন প্রকরণের মধ্যেও নতুন ধরনের দ্বিবাচনিক পরিস্থিতি প্রকট হয়ে ওঠে। মনে পড়ে, খুব চমৎকার ভাবে ভিক্টোরিয়া লেডি ওয়েলবিকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন পিয়ার্স (১২ অক্টোবর, ১৯০৪) : 'A sign of something by knowing which we know something more.' (হার্ডউইক: ১৯৭৭:৩১)। এর চেয়ে সহজ ও প্রাঞ্জলভাবে চিহ্নায়কের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করা যায় না। 'যাকে জেনে আরো জানার ইচ্ছে জেগে ওঠে, তাকে বলে চিহ্ন'। ঠিক কথা। শুধু উদ্ধৃত চারটে কবিতার বয়ানেই নয়, আমাদের পাঠ-অভিজ্ঞতায় অর্জিত যে-কোনো সার্থক চিহ্নায়কের মধ্যে ঐ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা যে-পদ্ধতিতে বস্তুর মধ্যে চিহ্ন খুঁজি এবং

সেই চিহ্ন থেকে অর্থ ছেঁকে নিই—তার কি ইতিহাস-নিরপেক্ষ কোনো অস্তিত্ব থাকা সম্ভব? সময় ও পরিসর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যদি কোনো ব্যাখ্যাতা চিহ্নবিজ্ঞানকে কাজে লাগান, বিশুদ্ধ (বা বিমূর্ত) জ্ঞানতাত্ত্বিক অধ্যয়ন হিসেবে তাঁর অধ্যবসায়কে গুরুত্ব দেওয়া যাবে কি? আজকের পণ্যায়ন-সর্বস্ব বিজ্ঞাপন শাসিত বিশ্বায়নের মাদক-আচ্ছন্ন পৃথিবীতে প্রতিটি ভোগ্য বস্তু যখন তথ্যপ্রযুক্তির সর্বাত্মক সন্ত্রাসের দাপটে মর্যাদা ও প্রতাপের প্রতীক হয়ে উঠেছে—বিলম্বিত পুঁজিবাদী পর্যায়ের মানুষজন 'Commodity-fetishism'-কে অস্বীকার করতে পারেন না। সমস্ত দ্রব্যই তাঁদের কাছে আধিপত্যবাদের চিহ্নায়ক হিসেবে হাজির হচ্ছে; চিহ্নের মূল্য নির্ধারিত হচ্ছে ভোক্তার বর্গগত পরিচয়ের সূত্রে।

এসম্পর্কে জাঁ বদ্রিলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রতিবেদন পেশ করেছেন; এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: The system of objects, The consumer society, For a Critique of the Political Economy of the sign, The Mirror of Production ইত্যাদি। রাজনৈতিক অর্থনীতি কীভাবে চিহ্নের মূল্য নির্ধারণ করে এবং বহুবর্গ-বিভাজিত সমাজে কীভাবে ঐ মূল্য অবস্থানের ওপর নির্ভরশীল—সে-সম্পর্কে বদ্রিলার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন : 'Sign values are generated through hierarchical ordering among commodities, in which, for instance, certain types of cars or perfumes attain varying prestige through signifying the rank, social position and status of their owners or consumers. Sign values are thus characterized by differences and hierarchy, and are produced by a sumptuary operation connected to expenditure and social prestige.' (Dauglas Kelner: 1991:22-23)

এই মন্তব্যের যথার্থতা উপলব্ধির জন্যে তত্ত্বজ্ঞ হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আজকের ভারতবর্ষের আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতের দিকে সাদা চোখে তাকালেই বর্গ-নির্ভর মূল্য-সূচকের অর্থ বুঝে নিতে পারব। মধ্যবিত্তের আওতায় যখন মারুতি ৮০০ বা ভ্যান এসে গেছে, ততক্ষণে মারুতি জেন ক্লাসিক ওয়াগন কিংবা মাতিজ ইন্ডিকা নির্ধারিত হয়ে গেছে উচ্চতর বর্গের অধিবাসীদের জন্যে। অন্যান্য ভোগ্যসামগ্রীও একইভাবে চিহ্নিত হয়ে গেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, চিহ্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতি ইদানীং অজস্র চিহ্নায়কের গ্রন্থনায় অন্তর্নিহিত হয়েই আছে। কী রাষ্ট্রীয় প্রতাপের শৃঙ্খলিত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে, কী শিল্প-সাহিত্যের নান্দনিক আবহে। কোনো ভাষ্যকারের পরিশ্রম ছাড়াই সময়ের সত্য (এবং সামাজিক ইতিহাসের সত্য) স্বয়ংপ্রকাশ এখন। বস্তুত সাম্প্রতিক আকরণোত্তরবাদী ও বিনির্মাণবাদী চিন্তাবিদেরা যে বলেছেন, মানবিকী বিদ্যার পার্থক্য-নির্দেশক সীমারেখা দ্রুত অবান্তর হয়ে যাচ্ছে— এই উপলব্ধিতে চিহ্নতাত্ত্বিকেরা স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই পৌঁছে যাচ্ছেন। তাই বাখতিন-বার্ত-দেরিদা- ফুকো- জেমসন-বদ্রিলার সাবলীলভাবে মিশে যাচ্ছেন একোর চিহ্নতাত্ত্বিক আবহমন্ডলে।

পাঁচ

বিমানবায়নের ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসে পীড়িত ও অজস্র বিয়োগ-প্রকরণে লাঞ্ছিত এ সময়ে একোর চিহ্নবিশ্ব পরিক্রমা কেন করব আমরা? করব এইজন্যে যে, তিনি চিহ্নায়কের নিবিড় পাঠে নন্দন, দর্শন ও সমাজতত্ত্বকে সার্থকভাবে মিলিয়ে নিয়ে প্রমাণ করেছেন, এই চিন্তাপ্রস্থানের মূল প্রেরণা সংযোগ। জীবন মানে যেহেতু অংশের সঙ্গে সমগ্রের নিরন্তর গ্রন্থনা, জীবনের মূল অন্বিষ্ট সংযোগ। এভাবে চিহ্নবিজ্ঞানের পাঠ হয়ে ওঠে জীবনের পাঠ। এ বিষয়ে একোর মন্তব্য যখন পড়ি, সংশয়ের বিন্দুমাত্র অবকাশও থাকে না : 'Semiotics studies all cultural processes as processes of communication, therefore each of these processes would seem to be permeated by an underlying system of signification.' (A Theory of Semiotics: 1975:8)। প্রতিটি সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে অন্তর্লীন চিহ্নায়ন প্রকরণ—এই উচ্চারণের গুরুত্ব অনেকখানি। পিয়ার্স বা সোস্যুর বা লেভিস্ট্রাউস বা চমস্কির মতো চিন্তাবিদেরা চিহ্নায়ন ও সংযোগের যত ধরনের আকল্প উপস্থাপিত করেছেন, তাদের সবগুলিকে আত্তীকরণ করেই নান্দনিক ও সাংস্কৃতিক চিহ্নবিজ্ঞান নিজস্ব তত্ত্বপ্রস্থান গড়ে তুলেছে। এই নিবন্ধের শুরুতে লিখেছি, একো এমন-এক ব্যাপক তত্ত্বপ্রস্থানের কথা ভেবেছেন যা এমন কি দর্শনেরও সার্থক বিকল্প হয়ে উঠবে। চিহ্নায়ন প্রকরণ ও সংযোগের মধ্যে মৌলিক কিছু পার্থক্য রয়েছে বলে এদের চিহ্নতত্ত্ব দুটি স্বতন্ত্র পথে বিকশিত হয়ে থাকে। কিন্তু একো এদের মধ্যে আপাত-স্বাতন্ত্র্য মাত্র দেখেছেন, বিরোধিতা স্বীকার করেননি। তাঁর মতে এরা 'mutually exclusive approaches in opposition' (তদেব) নয়।

সংযোগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে একোর বক্তব্য হল: এতে আছে (ক) বার্তার সঞ্চরণ (খ) নির্দিষ্ট উৎস (গ) নির্দিষ্ট সঞ্চার-পথ এবং উদ্দিষ্ট গ্রাহক। এক্ষেত্রে একো মূলত রোমান য়্যাকবসনের অনুগামী। তিনি ধরে নিয়েছেন যে, সংযোগের মুখ্য আধেয় অর্থাৎ বার্তা মোটামুটিভাবে পাঁচটি প্রধান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়। এই সূত্রে বলা যায়, চিহ্নায়ন প্রকরণ কেবলমাত্র তখনই সক্রিয় হতে পারে যদি আশ্রয় করার মতো সংকেত ইতিমধ্যে বর্তমান থাকে। মানে, কোনো-একটি বস্তু দিয়ে কোনো-কিছুর প্রতীতি যখন হয়, সংকেত দেখা দেয়। একটু আগে যেসব কবিদের বয়ান নিবিড় পাঠের জন্যে উদ্ধৃত করেছি, তাঁদের বাচনে এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। জয় গোস্বামী যখন কাব্যগ্রন্থের নামকরণ করেন 'ঘুমিয়েছো ঝাউপাতা'—নিশ্চয় তা সাধারণ ঘুম ও বা ঝাউপাতার কথা জানাতে চায় না। 'ঘুম' এবং 'ঝাউপাতা' দিয়ে কোনো বিশেষ তাৎপর্যের প্রতীতিতে আমাদের পৌঁছে দিতে চান জয়। তেমনি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'ভাত নেই, পাথর রয়েছে' কিংবা রণজিৎ দাশের 'জিপসিদের তাঁবু' ইত্যাদি। সংযোগ ঘটানো যখন অভিপ্রায়, উদ্দিষ্ট গ্রাহকের কাছে পৌঁছানোর জন্যে চাই সার্থক সঞ্চার-পথ এবং পরিবাহক। আর, অবশ্যই বহির্বৃত বস্তুর উপযুক্ত ও যুক্তিনিষ্ঠ বিকল্প। তবে এই প্রক্রিয়া সমস্যাশূন্য নয়। গ্রাহক-সত্তার কাছে কোন্‌টা তাৎপর্যবহ হবে, তা কিন্তু ঐ সত্তার প্রস্তুতি ও মানসিক

প্রবণতার ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। অর্থাৎ সংযোগ ঘটানোর প্রকরণ যুগপৎ উদ্দিষ্টকে প্রকাশ ও আড়াল করতে পারে। অন্যভাবে বলা যায়, অতি উদ্ভাসিত ও ঝাপসা করতে পারে একই সঙ্গে। আবার গ্রাহক-সত্তার দিক দিয়ে যদি ভাবি, তাঁর অর্থোপলব্ধি মানে সংকেতের রহস্য-মোচন। কিন্তু সংকেত বা চিহ্নায়ক পরম্পরার নিহিতার্থ সত্যিই উন্মোচিত হলো কিনা বা হলেও তা সবার কাছে সমান মান্যতা পাবে কিনা—তা জোর দিয়ে বলা যায় না। একো মনে করেন, সাধারণ চিহ্নবিজ্ঞানের তত্ত্ব যদি প্রতিটি চিহ্নের ক্রিয়াকে প্রণালীবদ্ধ ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে এবং চিহ্নায়ন প্রকরণের প্রতিটি উপাদানকে এক বা একাধিক সংকেতের নিরিখে অন্যোন্য-সম্পৃক্ত বলে দেখাতে পারে, তবেই তার সার্থকতা। চিহ্নবিজ্ঞানের প্রধান উপজীব্য দুটি: সংকেতের তত্ত্ব এবং চিহ্ন উৎপাদনের তত্ত্ব।

এ বিষয়ে একো লিখেছেন : 'In principle, a semiotics of signification entails a theory of codes, while a semiotics of communication entails a theory or sign production. The distinction between theory of codes and a theory of sign-production does not correspond to the ones between langue and parole, competence and performance, syntactics (and semantics) and pragmatics.' (তদেব : ৪)। অনেক চিহ্ন প্রয়োজনের খাতিরে কৃত্রিমভাবেও তৈরি করা যায়। যেমন সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনে তৈরি সংকেত কিংবা সমাজে তৈরি ভব্যতার সুনির্দিষ্ট কিছু বিধি-বিন্যাস। ইদানীং সামাজিক চিহ্নবিজ্ঞান নিয়ে স্বতন্ত্র ধরনের প্রতিবেদন যদিও রচিত হচ্ছে, অভিপ্রায়, সঞ্চরমানতা ও সত্তাতত্ত্ব বা জ্ঞানতত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কের নিরিখে বিচার্য সার্থকতা চিহ্নজিজ্ঞাসুদের কাছে বেশি গুরুত্ব পায়। তার ওপর রয়েছে সামান্য ও বিশেষের প্রচলিত দার্শনিক দ্বন্দ্বও।

একটু আগে চিহ্নায়ক খচিত বয়ানে নিহিত পরাভাষ্য ও ভাষ্যকারের প্রয়াসলব্ধ ভাষ্যের মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্যের কথা লিখেছি, পরবর্তী পর্যায়ে রচিত বইগুলিতে একো তা নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন। তবে 'A Theory of Semiotics' লেখার সময়ই তিনি ভাষ্যকারের অবস্থান ও পদ্ধতি সম্পর্কে সানুপুঙ্খ আলোচনার সূত্রপাত করেন। তাঁর এই মন্তব্যটি লক্ষ করতে পারি: 'The interpretant is not the interpreter (even if a confusion of this type occasionally arises in Peirce). The interpretant is that which guarantees the validity of the sign, even in the absence of the interpreter' (তদেব:৬৮)! বয়নে নিহিত পরাভাষ্যই যেহেতু চিহ্নায়কের বৈধতাকে নিশ্চিত করে, ভাষ্যকারের শারীরিক উপস্থিতিও অপ্রয়োজনীয়। বিশ্বসাহিত্যের সমস্ত ধ্রুপদী পাঠকৃতি এই মন্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করে। বাচনাতিরিক্ত উপস্থিতির প্রতি তর্জনি সংকেত করে ঐসব প্রতিবেদনে অন্তর্লীন পরাভাষ্য এবং এভাবে তা হয়ে ওঠে অদৃশ্য কিন্তু অমোঘ চিহ্নায়ক। একোর ভাষায়—'The interpretant becoming in turn a sign and so on ad infinitum.'

(তদেব : ৬৯)। অনন্ত এই বিচ্ছুরণই পাঠকৃতির শক্তি, কেননা এর শেকড় প্রোথিত রয়েছে সাংস্কৃতিক অণুবিশ্বে।

পিয়ার্স এবং বাখতিন—দুজনেই বিশ্বাস করতেন, মানুষ নিজেই চিহ্নায়ক। যত ভাষ্যই করি, মানুষ সমস্ত সম্ভাব্য ভাষ্যের চেয়ে বড়। অন্তহীন এই বিস্ময়ের উপলব্ধি যাঁর আছে, তিনি তো ভাষ্যের সীমাবদ্ধতাই লক্ষ করবেন। উপলব্ধি মানে নিত্য-নবায়মান প্রশ্নপরম্পরার মীমাংসা-প্রয়াস। বয়ানে নিহিত পরাভাষ্য যখন নিজে চিহ্নায়কে পরিণত হয়, দ্বিবাচনিকতার ক্ষেত্র আরো তীক্ষ্ণ ও প্রসারিত হয় মাত্র। চিহ্নায়ন প্রকরণের বিস্তার থামে না কখনো; চিহ্নবিজ্ঞানী এর বিভিন্ন অনুপুঙ্খের পারস্পরিক সম্পর্ককে জীবন-স্পন্দনে ঋদ্ধ বলে অনুভব করেন। পরাভাষ্য ও ভাষ্যের দ্বিরালাপে ঐ জীবন্ত সম্পর্কের অনুশীলনই করে চলেছেন একো।

চিহ্নবিজ্ঞান, কথনবিশ্ব ও পাঠকের নির্মিতি

তথ্যের অভূতপূর্ব বিস্তার আমাদের প্রতিটি মুহূর্তকে অস্থির, অনিশ্চিত ও বিকেন্দ্রায়িত করে দিচ্ছে। কুইজ এখন বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের কল্যাণে জ্ঞানের লোকপ্রিয় বিকল্প। সমগ্রতার উপলব্ধি নিয়ে মাথাব্যথা নেই কারও। টুকরো-টুকরো মুহূর্তের-অস্তিত্বের-অণুতথ্যের মধ্যে অভিনিবেশ ফুরিয়ে যাচ্ছে। হয়তো অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি খণ্ডায়নে। এ এক জটিল সংকটের প্রহর যখন তথ্য হয়ে ওঠে সত্যভ্রমের আকর এবং আচ্ছন্ন করে দেয় সত্যের প্রতীতিকে। কিন্তু তথ্যের অরণ্যে পথ খুঁজতে খুঁজতে একসময় আবিষ্কার করি, ঝোপ থেকে মহীরূহ অথবা লতা থেকে কাঁটাগুল্ম পর্যন্ত প্রতিটি অনুপুঙ্খের আলাদা অস্তিত্ব রয়েছে। আর, প্রতিটি অস্তিত্ব পৃথক তাৎপর্যের দ্যোতনা বহন করছে। ফলে আপাত-দৃষ্টিতে যাকে তথ্য বলে মনে হচ্ছে, তা আসলে সম্ভাব্য প্রতীকের আশ্রয়। কিংবা, বলা ভাল, তথ্যের ছদ্মবেশে প্রতীকের বয়ন ঘটেছে বলেই সত্যের উপলব্ধি নিরালম্ব হচ্ছে না। এইজন্যে বোদলেয়ারের মতো সংবেদনশীল কবি বলেছেন, প্রতীকের অরণ্যের মধ্য দিয়ে নিয়ত চলেছে মানুষ। চোখ তো আছে প্রত্যেকের, কিন্তু তা কেবল তাকিয়ে থাকার জন্যে নয়, দেখার জন্যে। যে-চোখ দেখে না তা কবির নয় কেননা দৃষ্টি ছাড়া সৃষ্টি হয় না। তাই শুধুমাত্র 'দ্রষ্টা' চোখের অধিকারীজনই তথ্যের খোসা থেকে সত্যের শাঁসকে চিনে নেন এবং এইভাবে আসলে পুনর্গঠন করেন বাস্তবকে। এখানে স্রষ্টা এবং ভাষ্যকার খুব কাছাকাছি, কেননা এঁরা উভয়েই পাঠকৃতিকে 'performance' হিসেবে প্রমাণ করেছেন। দুটি ভিন্ন অবস্থান থেকে তাঁরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন তথ্যের সত্য হয়ে ওঠায় এবং আমাদের বুঝিয়ে দেন, সম্ভাবনা মূলত সংগঠন।

চিহ্নবিজ্ঞান (Semiotics) আজকের তত্ত্ববিশ্বে অন্যতম প্রধান চিন্তাপ্রণালী। তার মুখ্য প্রতিপাদ্য, এই জগৎ অজস্র চিহ্ন-পরম্পরায় বিধৃত। বিভিন্ন চিহ্নায়কের মিথষ্ক্রিয়া থেকে জন্ম নেয় তাৎপর্য। যে-পৃথিবীতে আমরা বাস করি, তা নিছক তথ্যের আশ্রয়ভূমি নয়, তথ্যের ভিত্তিতে সংগঠিত স্বাধীন চিহ্নায়কের আকর বলেই এই পৃথিবী এত রহস্যময়। পাঠকৃতি এই রহস্যের ছোঁয়ায় দীপ্যমান। নানা পদ্ধতিতে সংকেত ও তথ্যের দ্বিবাচনিকতা ব্যক্ত হচ্ছে অহরহ। স্রষ্টা এবং ভাষ্যকার নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এই অভিব্যক্তির অংশীদার অর্থাৎ কখনও তাঁরা সংকেতকে তথ্যায়িত করছেন আর কখনও বা তথ্যকে সাংকেতিকতায় ঋদ্ধ করছেন। সমস্ত তাৎপর্য প্রসঙ্গনির্ভর ও ক্রিয়াত্মক। প্রতিটি মানবিক ক্রিয়ার প্রাসঙ্গিকতা প্রমাণিত হয় যখন তা তাৎপর্য বহনের উপযোগী

হয়ে ওঠে। তাই এমন-এক জগতে আমরা বাস করি যাতে কোনো শুদ্ধ বা সরল প্রসঙ্গ নেই। তাৎপর্যের সংকেত এইজন্যে নৈর্ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার বিষয় নয় কেবল, চিহ্নায়ক থেকে চিহ্নায়িতে পৌঁছানোর পথ অনবরত খুঁজে যাওয়াতেই ঘটে পাঠকৃতির বিস্তার। চিন্তার রৈখিকতা ভেঙে দিয়ে চিহ্নবিজ্ঞান কথার অন্তরালে অন্য কথা, রূপের অন্তরালে অন্য রূপ, সম্পর্কের অন্তরালে অন্য সম্পর্ক আবিষ্কার করতে শেখায়। এই স্বেচ্ছাবৃত বিপর্যাসের পরে দৃষ্টিও পুরোপুরি নতুন হয়ে ওঠে। যা এতদিন ছিল অন্ধকারে রুদ্ধ, সেখানে দেখা দেয় আলোর ঝলকানি। এই আলো কিন্তু চোখ ধাঁধায় না, দেখার দিগন্তকে বরং বাড়িয়ে দেয়। পুরোনো পাঠ থেকে ঝলসে ওঠে অভাবনীয় পাঠকৃতির নবীন রৌদ্রবলয়।

আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় যা জগৎ বলে জানি, সেই জানাকে বিভিন্ন সৃষ্টি-প্রকরণে রূপান্তরিত করি। এই প্রক্রিয়া পরিচিতকে অপরিচিত এবং অপরিচিতকে পরিচিত করে তুলছে। আমাদের জগৎ ভাষার জগৎ, বাচনের জগৎ, সংকেতের জগৎ, প্রতীকের জগৎ। ফলে যা আছে, শুধুমাত্র তার ভাষ্য করে নয়—যা নেই অথচ যার থাকা সম্ভব, তার ভাষ্য করেও গড়ে ওঠে আমাদের প্রতিবেদন। মানুষের চিন্তা ও অনুভূতি আসলে নিরবচ্ছিন্ন চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার ফসল। আবার, তা বিচিত্র ধরনের আকরণেরও সমষ্টি। বিমূর্তও মূর্ত হয়ে যায় এবং তাত্ত্বিকতাও তথ্যগত ধারণার বিষয় হয়ে ওঠে যখন তাকে আকরণের মধ্য দিয়ে জানি, বুঝি। স্বভাবত আকরণবাদ (Structuralism) এর পাঁজর থেকে জন্ম নিয়েছে চিহ্নবিজ্ঞান। ভাষা যেহেতু একক বাচন এবং সামূহিক বাচনের দ্বিবাচনিকতায় বিকশিত হয়ে চলেছে, চিহ্নবিজ্ঞানের মূল কাজ বাচনকে বার্তাবাহক ক্রিয়া হিসেবে উপস্থিত করা। আবার যখন বলছি বার্তার কথা, গ্রাহক ও প্রেরক সত্তার উপস্থিতিও অনিবার্য হয়ে উঠছে। কত বিচিত্র উপায়ে এবং কত সার্থকতায়-ব্যর্থতায়, আনন্দে-বিষাদে, আত্তীকরণে-প্রত্যাখ্যানে ঐ বার্তা তাৎপর্যবহ হয়ে উঠছে আমাদের কাছে। এ জগতে তাই মানুষের ভূমিকা মূলত সংযোগ স্থাপনের নিরিখে নির্ধারিত হয়ে থাকে। কখনো সত্তা বার্তা পাঠান, আর কখনও গ্রহণ করেন। কখনও তথ্য থেকে সংকেতের আকাশে পাখা মেলে দেন আবার কখনও সংকেত থেকে তথ্যের জমিতে ফিরে আসেন। এই সংযোগ যেমন বহির্বৃত তেমনি অন্তর্বৃত; তা যতখানি সংস্কৃতির চিহ্নায়নের ফলশ্রুতি ততখানি সামাজিক ক্রিয়ারও ফসল। জুলিয়া ক্রিস্তেভার প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এখানে স্মরণ করতে পারি : "What Semiotics has discovered is that the law governing or if one prefers, the major constraint affecting any social practice lies in the fact that it signifies: i.e. that it is articulated like a language"।[১] এই যে সব-কিছুর মূলে চিহ্নায়কের অস্তিত্ব আবিষ্কার, এতে ভাষার অর্থই আমূল বদলে গেছে। ভাষা সেতু গড়ে তোলে নিশ্চয়, তবে এই সেতু দিয়ে তথ্যের বিনিময় হয় না কেবল; সংকেতের চকিত উদ্ভাসন শ্রুত স্বরকে অশ্রুত স্বরের কাছাকাছি এনে দেয়। পরাভাষার সমান্তরাল অপর অস্তিত্ব ভাষার মধ্যে নিরন্তর নবীন পরিসর আবিষ্কারের প্রক্রিয়াকে শানিত করে তোলে। এই

প্রক্রিয়াতে চিহ্নায়কের সঙ্গে চিহ্নায়িতের সেতু গড়ে ওঠে।[২]

আকরণবাদের সূত্রে চিহ্নবিজ্ঞান মনোযোগের বিষয় হয়ে উঠেছে, কারণ জন স্টারোক কথিত 'Statics of dynamic systems'[৩] হিসেবে আকরণবাদ পরিমাপ করে দেখায়—সমগ্রের সংগঠন গড়ে তুলতে টুকরো টুকরো উপকরণ ও অনুষঙ্গগুলি কতটা কার্যকরী ভূমিকা নিচ্ছে। একথা অস্বীকার করা কঠিন যে, আমাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আসলে কতগুলো কাঠামোর সমাবেশ। আমাদের চিন্তা, উপলব্ধি বা ঘটনাকে যদি বিনির্মাণ করি, ওইসব কাঠামো বা আকরণের সংগঠন সম্পর্কে অবহিত হই। তাই আকরণবাদের প্রথম কাজ হল সেইসব উপকরণের অস্তিত্ব নির্ণয় করা যাদের সমবেত উপস্থিতিতে কাঠামোটি গড়ে ওঠে। যে-কোনো বিশ্লেষিতব্য বস্তুকে প্রাথমিকভাবে সমগ্র হিসেবে গ্রহণ করি যদিও, যতক্ষণ অংশের গুরুত্ব স্বীকার না-করছি অন্তত ততক্ষণ বস্তুটির তাৎপর্য বিমূর্ত হয়ে থাকবে। অন্যদিকে অংশগুলির তাৎপর্য আলাদা-আলাদা ভাবে না-বোঝা পর্যন্ত. সমগ্রের প্রতীতি অসম্ভব। একক অনুষঙ্গের সংকেত যখন যথার্থভাবে ব্যাখ্যাত হয়, অজস্র আকরণে বিন্যস্ত সমগ্রের জটিল আয়তন তখনই অর্থবহ হয়ে ওঠে। সুতরাং চতুর্দিকে বহমান জীবনপ্রবাহ তার অজস্রতা ও জটিলতা দিয়ে আমাদের প্রতীতিকে, ব্যাখ্যার প্রকরণকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করছে বলে উপলব্ধির যুক্তিগ্রাহ্য মান্যতার এত অনিবার্য প্রয়োজন। আকরণবাদ সমগ্রতার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় কার্যকরী বৌদ্ধিক কৃৎকৌশল হিসেবে আমাদের কাছে তাৎপর্য সন্ধানের নতুন নিবিড় পদ্ধতিকে তুলে ধরছে। এইজন্যে সাধারণভাবে মনে করা হয় যে আকরণবাদ ও চিহ্নবিজ্ঞান অভিন্ন তত্ত্ববিশ্বের দুটি বিশিষ্ট অঙ্গ। বহু আকরণে বিন্যস্ত বাস্তবতা কীভাবে অজস্র তাৎপর্যের অনুপুঙ্খ-বিন্যাসের মধ্য দিয়ে সমগ্রতার দ্যোতনা নিয়ে আসে, এই বিশ্লেষণ খুব কৌতূহল-ব্যঞ্জক। মানবিক জিজ্ঞাসামাত্রই গভীর দ্যোতনার সন্ধানী। এই সন্ধানকে প্রণালীবদ্ধ ভাবে লক্ষ্যাভিমুখি করে তুলেছে চিহ্নবিজ্ঞান। মূর্তকে বিমূর্ত করা এর উদ্দেশ্য নয়। বরং প্রাথমিকভাবে যা অস্পষ্ট, সুদূর, ধারণাতীত—তাকে গভীরতর প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তোলাই তার লক্ষ্য। এভাবে বিশেষের সঙ্গে নির্বিশেষের সেতু রচিত হয় এবং মানবিকী বিদ্যা হয়ে ওঠে আরও ভূমি-সংলগ্ন।

দুই

আকরণবাদ ও চিহ্নবিজ্ঞানের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর-এর বহুপঠিত গ্রন্থ 'Course in general linguistics' (১৯১৫)-এর মধ্যে। তাঁর দুটি যুগান্তকারী পারিভাষিক প্রয়োগ—সামূহিক বাচন (Langue) ও একক বাচন (Parole)-এর সূত্রে আমরা জেনেছি, ভাষার সামাজিক ও অবচেতন বৈশিষ্ট্য অন্যোন্য-নির্ভর। আর, বিবিধ উচ্চারণের সূক্ষ্ম ও জটিল আততিতে গড়ে উঠেছে ভাষার বিপুল আয়তন। সোস্যুর যেভাবে ভাষাতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য এবং শব্দ ও বস্তুর প্রকৃত সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন, তা অনুসরণ করে আমরা বুঝতে পারি, কোনো একক উচ্চারণের স্বাতন্ত্র্যও অনেকান্তিক সমগ্রতার আবহে নির্ধারিত হয়ে

থাকে। এই সূত্রে আমরা যখন কোনো কবিতা বা আখ্যান বা প্রত্নকথার প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করি, তাদের একক সত্তার ও উচ্চারণের বিশিষ্টতাকে কেবলমাত্র চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার প্রেক্ষিতে অনুধাবন করি। এই চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার নিয়ন্তা পদ্ধতিই অনুশীলনযোগ্য। সোস্যুর-এর মতে শব্দ হলো মূলত চিহ্ন। লেখ্য বা কথ্যভাষা নির্বিশেষে এই চিহ্নের একটি দিক হলো চিহ্নায়ক (Signifier) এবং অন্য দিক হলো চিহ্নায়িত (Signified)। কোনো শব্দ যখন সার্থক চিহ্ন হয়ে ওঠে, তাতে চিন্তাবীজ যেন শরীরী রূপ গ্রহণ করে। মানুষের পৃথিবী মূলত নানাবিধ উচ্চারণের বয়ানে নির্মিত। এইজন্যে চিহ্নায়নের মধ্য দিয়ে কার্যত মানুষের যাবতীয় অস্তিত্ব-সম্বন্ধীয় এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা ও রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে ভাষা প্রণালীবদ্ধ করে।

চিহ্নবিজ্ঞান ভাষার মূল প্রবণতাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে এবং ক্রমশ তা পাঠকৃতির অণুবিশ্বকে অনেকার্থদ্যোতনায় সমৃদ্ধ করেছে। উমবের্তো একো ও ইউরি লোটম্যান তাঁদের সংবেদনশীল ভাষ্যের মধ্য দিয়ে এই ধারাকে বিশেষভাবে পুষ্পিত করেছেন।[৪] এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে একটি প্রাজ্ঞ উক্তি: যখন আমরা কোনো পাঠকৃতির গভীরে যাই, প্রতিটি স্তরে সেসময় অলিখিত সাংস্কৃতিক বিশ্বকোষকে অনুসরণ করি। এদের মধ্যে সবটাই যে সজল মেঘের নীলাঞ্জন ছায়া, এমন নয়, বেশ কিছু ব্যাসকূটেরও মুখোমুখি হতে হয়। কিন্তু প্রতিটি তাৎপর্য যেহেতু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জনীয়, মরুবিজয়ের কেতনও ওড়াতে হয় পাঠককে। স্বভাবত চিহ্নায়কের আকল্প ও সামাজিক চর্চার মধ্যবর্তী সংযোগ খানিকটা প্রকাশ্য খানিকটা প্রচ্ছন্ন। চিহ্নায়িতের উপকূলরেখা যখন খুঁজব, একথা মনে রাখতে হবে। অনন্ত চিহ্নায়ন পদ্ধতির প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী হওয়া উচিত, এ বিষয়ে তাত্ত্বিকেরা নানা ধরনের সূক্ষ্ম আলোচনা করেছেন। আপাতত রোমান য়্যাকবসনের একটি মন্তব্য স্মরণ করতে পারি: 'Every message is made of signs; correspondingly, the science of signs termed semiotics deals with those general principles which underlie the structure of all signs whatever, and with the character of their utilization within messages, as well as with the specifics of the various sign-systems, and of the diverse messages using those different kinds of signs'।[৫] এখানে যেমন বলা হয়েছে, সমস্ত চিহ্নের অন্তর্নিহিত আকরণ সঞ্চালিত হচ্ছে যেসব সাধারণ নিয়ম দিয়ে, তাদের অনুশীলন করে চিহ্নবিজ্ঞান। প্রতিটি বার্তা যেহেতু চিহ্নায়কের নির্মিতি, সুনির্দিষ্ট ব্যবহার-উপযোগিতা এবং সংযোগের পরম্পরার ওপর নির্ভর করছে চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার সার্থকতা। পাঠকৃতির অন্তর্বর্তী স্তরবিন্যাসের ওপর ওই প্রক্রিয়া আলোকসম্পাত করে এবং অনেক আপাত-নিঃসম্পর্কিত অনুপুঙ্খের গ্রন্থনায় খুঁজে পায় নিবিড় ঐক্যবোধের প্রতীতি।

চিহ্নবিজ্ঞানের সূত্রে আমরা এই মৌলিক সত্য সম্পর্কে অবহিত হয়েছি যে ভাষা-চেতনা-সংস্কৃতি-শিল্পাভিব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে নিরবচ্ছিন্ন চিহ্নায়কের সমষ্টি। জীবন ও

জগৎ থেকে প্রতিনিয়ত যত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, সেসব নানা ধরনের চিহ্নায়কের গ্রন্থনায় সংকেতগূঢ় হয়ে ওঠে। অবশ্য এই গ্রন্থনার সরলীকৃত রূপ নেই কোনো। তাই এরা সর্বদা সরাসরি ও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় না। কোন্ প্রতিবেদনে কীভাবে এরা উপস্থাপিত হচ্ছে, তার ওপর এদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনেকটা নির্ভর করে। গ্রহীতাকে তাই মনে রাখতে হয়, জগৎ ও জীবনের বিবর্তনশীল পরিসর বিশেষ সময়ানুভূতিতে সংলগ্ন হয়ে বস্তুকে প্রতীক করে তুলেছে বলে সৃষ্টিশীল ভাষা কখনও একমাত্রিক হয় না। তেমনি অন্যদিকে প্রতীকও তো গৃহীত হচ্ছে বস্তুর প্রত্যক্ষতায়। যখন এই অন্তর্গূঢ় দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হন গ্রহীতা-পাঠক, সৃজনাত্মক প্রতিবেদনের অনেকান্তিক তাৎপর্য তাঁর দ্রষ্টা চক্ষুতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তবে বহুমাত্রিক চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার সূক্ষ্মতা ও সৌরভ সবচেয়ে চমৎকার ভাবে ধরা পড়ে কবিতার বয়নে।

তিন

পরাভাষার দ্যুতি কীভাবে কবিতার চিহ্নায়ক-খচিত ভাষায় প্রকাশিত হয়ে থাকে, তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এবার দেওয়া যেতে পারে।

দৃষ্টান্ত ক :

আমরা যাই নি মরে আজো—তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয় ;
মহীনের ঘোড়াগুলি ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে ;
প্রস্তরযুগের সব ঘোড়া যেন—এখনও ঘাসের লোভে চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডাইনোমোর পরে।
আস্তাবলের ঘ্রাণ ভেসে আসে এক ভিড় রাত্রির হাওয়ায় ;
বিষণ্ণ খড়ের শব্দ ঝরে পড়ে ইস্পাতের কলে[৬]

এই আশ্চর্য রহস্যদ্যোতক পঙক্তিগুলি যদি বিনির্মাণ করি, দেখব, চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বস্তু হয়ে উঠেছে প্রতীক। পদান্বয় ও শব্দানুষঙ্গ বদলে গেছে। আমাদের চেনা পৃথিবীর অনুষঙ্গ থেকে পাওয়া চিহ্নায়কগুলি যখন পূর্বাগত আকরণদের বিপর্যস্ত করে দিয়েছে—ভাষা পৌঁছে গেছে পরাভাষার আঙিনায়। এ ধরনের পরা-উপস্থিতিতে কল্পনা পেরিয়ে যায় বাস্তবকে এবং তথ্যের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সংকেত। স্বভাবত পরিচিত দৃশ্যের পাঁজর থেকে জন্ম নেয় অপরিচিত, এমনকি উদ্ভট ও অসম্ভব দৃশ্যাবলি। মহীন কে এবং মহীনের ঘোড়া কি সত্যিই সেই মহীন নামক সাংকেতিক অস্তিত্বের ঘোড়া—এসব জিজ্ঞাসা অবান্তর হয়ে পড়ে! শুধু কি তা-ই! আমরা ঘোড়া বলতে যে-প্রাণীটিকে বুঝি, তাকে না-বুঝিয়ে কেবলমাত্র গতি অর্থাৎ সময়ের চিহ্নায়ক হিসেবেও ধরে নেওয়া যায়। কার্তিকের জ্যোৎস্না কোনো মৃদুস্বরিক শান্ত আয়তনের সংকেত বা 'প্রান্তর' উচ্চারণের মধ্যে পাচ্ছি শব্দাতিগ বিস্তৃতি আর দ্যোতনার মায়া—পাঠক এমনও ভাবতে পারেন। প্রস্তরযুগের ঘোড়া বলতে কি তবে খন্ডকাল পেরিয়ে-যাওয়া মহাসময়ের বার্তা উঠে আসছে? কেনই বা কিমাকার ডাইনামোর মতো বাক্‌ব্যবহার? তাকে কি বলব যন্ত্রসভ্যতার কুশ্রীতা ও স্থূলতার প্রতি

জীবনানন্দ-সুলভ ধিক্কার! 'ভিড় রাত্রির হাওয়া'র মধ্যে যেটুকু আপাত-অসম্বদ্ধ ভাবনার গ্রন্থনা, তাতে চিহ্নায়কের সূক্ষ্মতা ধরা পড়েছে কি?

এই যে পরপর প্রশ্ন উঠে এল, চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া কি তবে এভাবেই প্রশ্নমালা তৈরি করে সম্ভাব্য মীমাংসার দিকে নিয়ে যায়? প্রশ্ন দিয়ে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে জীবন ও জগতের পাঠ বিশ্লেষণ করার জন্যে পরাবয়নের সম্ভাবনায় পৌঁছান সেই পাঠক, যিনি আসলে চিহ্নবিজ্ঞানী। সময় ও পরিসরের সূক্ষ্ম ও বহুমুখী আততিতে গড়ে ওঠে যে অন্যোন্য-নির্ভর গ্রন্থনা, তাকে ক্রনোটোপ নামক পারিভাষিক সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন এসময়ের অগ্রণী তাত্ত্বিক, মিখায়েল বাখতিন। লক্ষ করলে বুঝব, চিহ্নায়কের পরম্পরায় ওই আততি কত বিচিত্র অভিব্যক্তি পেয়ে চলেছে। জীবনানন্দের 'ঘোড়া' কবিতার সমাপ্তিবিহীন উপসংহারে চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত পরাভাষা সমে এসে পৌঁছেছে:

প্যারাফিন-লণ্ঠন নিভে গেল গোল আস্তাবলে
সময়ের প্রশান্তির ফুঁয়ে;
এইসব ঘোড়াদের নিওলিথ-স্তব্ধতার জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে।

আপাত-দৃষ্টিতে যারা পরস্পর-নিঃসম্পর্কিত তথ্যের দুনিয়ায়, চিহ্নায়কের পরাজগতে তাদের মধ্যে অভূতপূর্ব ও গোপন সুড়ঙ্গলালিত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। একেই বলি কবিত্ব, বলি নবীন সৃষ্টি। বিশেষ্য-বিশেষণ-ক্রিয়ার বিপর্যাস তখন প্রতিবেদনের মূলাধার হয়ে ওঠে।

বলা বাহুল্য, জীবনানন্দের আরও অজস্র কবিতায় চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার চমৎকার উপস্থিতি লক্ষ করা সম্ভব। এবার আমরা বরং পরবর্তী কবিদের দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারি।

দৃষ্টান্ত খ :

দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া
কেবল শুনি রাতের কড়া নাড়া
'অবনী বাড়ি আছো'?
বৃষ্টি পড়ে এখানে বারো মাস
এখানে মেঘ গাভীর মত চরে
পরাঙ্মুখ সবুজ নালিঘাস দুয়ার চেপে ধরে
'অবনী বাড়ি আছো?'[৭]

জীবনানন্দের মতো শক্তি চট্টোপাধ্যায়েরও বেশ কিছু কবিতায় শাব্দিক তথ্য অবান্তর হয়ে পড়েছে চিহ্নায়কের দ্যুতিতে। এই দৃষ্টান্তে যে আত্মনাট্যের সংকেত পাচ্ছি, কবিতা সেখানেই। জীবনানন্দের প্রাগুক্ত কবিতায় যেমন মহীনের ঘোড়া মানে নিছক মহীনের ঘোড়া নয়, তেমনি শক্তির কবিতাতেও অবনীর বাড়ি কেবল অবনীর বাড়ি নয়—এর চেয়ে আলাদা এবং বেশি কিছু। কবিতাটির মূল ভরকেন্দ্র কিন্তু সরল এবং প্রত্যক্ষগোচর। তবু এই অজটিল তথ্যগত ভিত্তি কবিতার নিয়ামক নয়। তথ্যের

ভিত্তিকে অনেক পেছনে ফেলে এসেছে যে চিহ্নায়কের গ্রন্থনা, আসলে তা-ই কবিতাটির আকর। নইলে গভীর রাত্রে কোনো ঘুমন্ত পাড়ার ছবি, অনবরত কড়া নাড়ার শব্দ এবং গভীর রাতে কোনো এতোলবেতোল মাতালের অবনী নামে বন্ধুর বাড়ি খোঁজা—এমন কিছু উল্লেখনীয় বৃত্তান্ত নয়। কিন্তু যখন কোনো অনিকেত সত্তাকে আর্তভাবে আশ্রয় খুঁজতে দেখি আমরা ওই তথ্যের আড়ালে, সেসময় গভীরতর মানসিক সংকেত আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই তথ্যাতিগ চিহ্নায়নের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় কবিতা। ঠিক তার পরবর্তী স্তবকে যেটুকু শান্ত প্রকৃতির অনুষঙ্গ রয়েছে, বিপ্রতীপের আবহ তৈরি করে বলেই কবিতার বাচনিক আকরণে তার গুরুত্ব। আবার 'পরাঙমুখ' বিশেষণটি যখন অপ্রত্যাশিত ভাবে 'সবুজ নালিঘাস'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়, নিছক নৈসর্গিক অনুপুঙ্খ বলে তাকে আর বিবেচনা করি না। সবশেষে কোনো-এক অবনীর প্রতি আর্ত প্রশ্ন যখন পুনরাবৃত্ত হয়, চিহ্নায়ন প্রক্রিয়াটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আধুনিক কালের পথভ্রান্ত সত্তার অমোঘ কণ্ঠস্বর যেন নীড়ে ফেরার ব্যাকুলতাকে প্রকাশ করছে—এমন মনে হয়। এ যেন ভ্রাম্যমান সত্তার তাৎপর্য সন্ধানের সন্দর্ভ হিসেবে কবিতার অন্তঃশায়ী চিহ্নায়িতকে আরও গভীরতর তাৎপর্যে যুক্ত করেছে। আর্ত সত্তার এই তাৎপর্য-সন্ধান শক্তির কাব্যভাষাকে অভূতপূর্ব দ্যোতনায় ঋদ্ধ করেছে। ভুবন পরিক্রমা শেষে বাচন ফিরে এসেছে পরাভাষার নীড়ে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে বাখতিনের প্রবাদপ্রতিম কাব্যিক উচ্চারণ: 'Every meaning has its own home coming festival'। এভাবে শক্তির অণুবিশ্ব জুড়ে চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া পর্যাপ্ত স্মরণীয় পঙ্‌ক্তির জন্ম দিয়েছে। নিবিড় পাঠ থেকে বুঝতে পারি, এই প্রক্রিয়ায় রয়েছে অসংখ্য প্রাকরণিক বিন্যাস। স্বভাবত এখানে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। এবার আমরা শক্তি-পরবর্তী কবিদের মধ্যে ভাস্কর চক্রবর্তীকে বেছে নিতে পারি।

দৃষ্টান্ত গ :

আমি কি পাহারা দেবো
ছোটো বোন ঘুমায় যখন
দুপুরে, আকাশ নীল
শরীরে শান্ত কলরব
আমি কি ঘুমাব পাশে
ছোট বোন ঘুমায় যখন[৮]

এই আশ্চর্য সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল কবিতায় চিহ্নায়কের দীপ্তিতে তথ্য যেন কুয়াশালীন ধূসর দিগন্তের মতো দূরে মিলিয়ে গেছে। প্রায় নীরবতার কাছাকাছি এর বাক্‌বন্ধ আগাগোড়া নিভৃত সাংকেতিকতায় মন্ডিত। কবিতায় সূত্রধার-সত্তা হিসেবে 'আমি' যদিও দু-বার উপস্থিত, উত্তমপুরুষের অবস্থান এখানে প্রায় দৃষ্টির অগোচর। মৃদু ও নিবিড় উচ্চারণের লাবণ্যে যুক্ত হয়েছে আশ্চর্য রহস্যমেদুরতা। প্রতিটি অনুষঙ্গ এতে চিহ্নায়কের মর্যাদা অর্জন করেছে বলে শব্দ এখানে নৈঃশব্দ্যের নামান্তর। সব মিলিয়ে কবিতার সামগ্রিক বাচন হিসেবে আমাদের কাছে চিহ্নায়কের বিন্যাস পৌঁছে দিয়েছে

তীব্র আত্মমুখী অনুভূতির বার্তা। ভাস্করের কবিতা একারণে আলাদাভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তথ্যের শৃঙ্খল ও চিহ্নায়কের বিন্যাসের মধ্যবর্তী জলবিভাজনরেখা তাঁর রচনায় স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। যেসব ক্ষেত্রে চিহ্নায়নের বিন্যাসে উত্তরণ ঘটেনি, সে-সমস্ত লিখন-প্রয়াসকে তথ্যপুঞ্জ শৃঙ্খল হয়ে পাকে পাকে জড়িয়ে নিয়েছে। স্বভাবত ভাস্করের কবিতায় এক ধরনের সাংবাদিকতা, তারল্য ও অগভীরতা প্রকট হয়ে পড়ে। সূক্ষ্মতা ও সংবেদনশীলতা স্পষ্ট হলে তা-ই হয়তো চিহ্নায়কের মর্যাদাবান পদবি পেতে পারত। শক্তি ও অলোকরঞ্জনের মতো বড়ো বৃত্ত নয় তাঁর, তাই চিহ্নায়কের বৈচিত্র্যও কম। তবু আত্মজৈবনিক স্থাপত্যে প্রোথিত চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ায় তীব্রতা ও গভীরতার অভাব নেই। প্রাগুক্ত পূর্বজদের তুলনায় নির্মিতিহীন নির্মাণের প্রতি ভাস্করের ঝোঁক বেশি। এর কারণ, তাঁর চিহ্নায়কের লক্ষ্য ও আধেয় সাম্প্রতিক বিবর্ণ ও পুনরাবৃত্তিময় জীবন। যেমন—

অসংখ্য ছেঁড়া চটিজুতোর পাশে বসে বসে, প্রত্যেক দুপুরে, অদ্ভুত খেলা আমার
আমি হাঁ করি, মুখ দিয়ে ধুলো বেরোয় আমার
আমি চোখ বুজি, চোখ খুলে যায় আমার ভেতর থেকে—
একলা থাকতে থাকতে থাকতে থাকতে
আমার গায়ে সবুজ শ্যাওলা গজিয়ে উঠবে একদিন
পোড়ো বাড়ির মতো, আমি অদ্ভুত দাঁড়িয়ে থাকবো একদিন,
গভীর জঙ্গলের মধ্যে[৯]

এখানেও চিহ্নায়ক বিনির্মাণপন্থী, তবে প্রাগুক্ত দৃষ্টান্তের তুলনায় প্রতীকই বস্তু হয়ে উঠেছে অর্থাৎ তথ্য সূচনা থেকেই প্রতীকায়িত। ফলে পাঠক যখন চিহ্নায়কের মুখোমুখি হচ্ছেন, কোনো ধরনের সাংবাদিকতার মোকাবিলা তাঁকে করতে হচ্ছে না। মাইকেল রিফাটেরের একটি মন্তব্য এক্ষেত্রে খুব প্রাসঙ্গিক: 'A poem says one thing and means another!'[১০] কবিতায় যে-অংশটি 'বলে', তাতে বিবৃতি অতিরিক্ত প্রাধান্য পেয়ে গেলে হয়ে ওঠে সাংবাদিকতা। কিন্তু বিবরণ ও তাৎপর্যের মধ্যে যে-ব্যবধানটুকু লক্ষ করেছেন তিনি, তা হলো চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্র। এছাড়া কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে রিফাটেরে বলেছেন ঐক্যবোধের কথা। জীবনানন্দ, শক্তি ও ভাস্করের কবিতা থেকে আমরা যে-দৃষ্টান্ত আহরণ করেছি, তাতেও এই মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে।

এ বিষয়ে আরও গভীরভাবে যখন ভাবি, কবিতা-পাঠ হয়ে ওঠে ঐক্যের সন্ধান। কবিতার বাচনে যা প্রতীয়মান ও বহির্বৃত, সংবেদনশীল পাঠক তার মধ্যে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখেন না। চিহ্নায়কের গ্রন্থনায় তিনি খুঁজে পান ঐক্যবিধানের পথ। তথ্যের প্রতীয়মান স্তর থেকে পাঠকৃতির তাৎপর্যের স্তরে পৌঁছানোয় যেহেতু উত্তরণের ইশারা পাচ্ছি, এতে জীবন ও জগতের বিভিন্ন অনুষঙ্গের মধ্যবর্তী আন্তঃসম্পর্কের বিন্যাসেও গুরুতর পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। আপাত-স্তর থেকে গভীর স্তরে পাঠকৃতির সঞ্চরণ আসলে পরিচিত জগতের রূপান্তরেরই সূচক। রিফাটেরে মনে করেন, 'This functional shift is the proper domain of semiotics. Everything related to this

integration of signs from the mimesis level into the higher level of significance is a manifestation of semiosis.'।[১১]

যেসব কবির রচনা থেকে দৃষ্টান্ত আহরণ করেছি, রিফাটেরে-কথিত 'functional shift' -এর প্রমাণ তাঁদের মধ্যে স্পষ্ট লক্ষ করা যায়। বলা বাহুল্য উৎপলকুমার বসু, বিনয় মজুমদার, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শামসের আনোয়ার, আল মাহমুদ, মোহাম্মদ রফিকের মতো কবিদের প্রতিবেদন থেকে অজস্র উদাহরণ সংগ্রহ করতে পারি। চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার কত বিচিত্র অভিব্যক্তি লক্ষ করি তাঁদের বাচনে। আরও পরবর্তী কবিদের মধ্যে পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, অমিতাভ গুপ্ত, মৃদুল দাশগুপ্ত, রণজিৎ দাশ ও জয় গোস্বামীর প্রতিবেদন চিহ্নায়কের দ্যুতিতে সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধ। এখানে দৃষ্টান্ত হিসেবে বেছে নিচ্ছি জয়ের একটি কবিতা।

দৃষ্টান্ত ঘ:

আসলে নখাগ্রে থাকে যা কিছু। শস্য, জ্ঞান, ছাই।
চাকার ঘূর্ণন, তীব্র কালো ঘোড়া, ব্যারাকপুরের
বাসের জানালা দিয়ে একদল স্কুলের কিশোরী....
ভাঙ্গা ও আস্ত ডানা, ধবল টাওয়ার
... ...
শুকনো জ্যোৎস্না, ভিজে পরিখার পাশে পড়ে আছে হাড়, দুর্গের মাথায়
লাফিয়ে পড়েছে চাঁদ, ওষ্ঠ রাখবে বলে চূড়ায়। কফির
কাপ থেকে ঠোঁট তুলে স্টিল চশমা যে মেয়েটি দ্বিতীয় স্তবকের শেষদিকে
জানালায় তাকিয়েছিল, এক্ষুণি সে, ফের ঠোঁট নামালো কফিতে।
... ...
তুমিও ওষ্ঠ রাখো, কালো ওষ্ঠ, সাদা নীল পীত
রাখো এই শুশ্রূষায়, কাচ নয়, ধাতব বাটিতে;
যে পাত্রে রয়েছে মদ, ঘনীভূত নাতি-শীত-উষ্ণ জলবায়ু আমাদের
বাস্প ও আরক।[১২]

এই প্রতিবেদনের মুখোমুখি হয়ে কেবল অজস্র চিহ্নায়কের স্বতন্ত্র দ্যুতিতে আবিষ্ট হই আমরা, তা কিন্তু নয়। অংশের দ্যোতনা সত্ত্বেও আমাদের অভিনিবেশ সমগ্রের প্রতীতিতে কেন্দ্রীভূত হয়। পরস্পর-নিঃসম্পর্কিত অনুপুঙ্খদের বয়ানে রহস্যের বলয় যদিও দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তবু কবিতার সামূহিক আকরণ শেষ পর্যন্ত সব কিছু ছাপিয়ে যায়। দৈনন্দিন অভ্যাসের অঙ্গ হিসেবে সাধারণ ভাষাকে যেভাবে গ্রহণ করি, জয়ের শব্দবন্ধকে যদিবা প্রথমে সেভাবে পড়ি, অনতিবিলম্বে বয়ানের অন্তর্বর্তী শূন্যায়তনগুলি প্রকট হতে শুরু করে। পাঠক তখন ওইসব আপাত-শূন্যায়তন সম্পর্কে মনোযোগী হয়ে ওঠে। আর, ঠিক সেই মুহূর্তে দীপ্যমান হতে দেখি চিহ্নায়ন প্রক্রিয়াকেও। চিরাচরিত যুক্তির বিন্যাস পেরিয়ে পরাবাচনের জন্ম হয় তখন। রিফাটেরে যাকে 'Ungrammaticalities' বলেন, ব্যাকরণের শৃঙ্খলা ভেঙে সেইসব পরাভাষার এককগুলি

পাঠকৃতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। প্রাগুক্ত দৃষ্টান্তে জয়ও বাক্‌ব্যবহারের প্রচলিত যুক্তিশৃঙ্খল ভেঙে দিয়েছেন। তথ্যাতিগ সংকেতে কীভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে বয়ান, তা প্রাথমিক পাঠেই অস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। টুকরো-টুকরো প্রতীকায়িত বিন্যাস নিশ্চয় মুগ্ধ করে, কিন্তু শুরু থেকেই যেন সামগ্রিক আকরণের প্রতি সচেতনতা তৈরি হয়ে যায়। পরিচিত বস্তুসম্বন্ধের বিপর্যাস যে ইচ্ছাকৃত অন্তর্ঘাত, একথা বুঝতে পারি বলে চিহ্নায়কের পরম্পরাকে সতর্কভাবে অনুসরণ করা আমাদের দায় হয়ে ওঠে যেন। বিবৃতির সীমানা পেরিয়ে যায় না শুধু এই কবিতা; বিচ্ছিন্ন ভাবে কতকগুলি চিহ্নায়কের গ্রন্থনা করে তার নির্মিতি অবসন্ন হয় না। বরং সামগ্রিক উপলব্ধির প্রতীতিতে যাবতীয় অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় ও জ্ঞানতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসাকে সমন্বিত করে। জয়ের কবিতাপাঠক যথার্থ চিহ্নবিজ্ঞানী অভিযাত্রী হিসেবে প্রতিপন্ন হতে পারেন। আরও একবার রিফাটেরেকে স্মরণ করতে পারি এখানে। তাঁর মতে, কবিতার সামূহিক আকরণকে পাঠক যখন অনুভবগম্য করে তোলেন, নিরন্তর উত্থাপিত প্রশ্নমালার মীমাংসাসূত্র সহ বয়ানের অন্তর্বর্তী রহস্যমোচনের দিশাও তিনি পেয়ে যান।

রিফাটেরে লিখেছেন: 'Then suddenly the puzzle is solved, everything falls into place, indeed the whole poem ceases to be descriptive, ceases to be a sequence of mimetic signs, and becomes a single sign, perceived from the end back to its given as a harmonious whole, wherein nothing is loose, wherein every work refers to one symbolic focus.'[১৩] এই মন্তব্যের সূত্রে বলা যায়, কোনো কবিতার সম্পূর্ণ অবয়ব তখনই স্পষ্ট হতে শুরু করে যখন পাঠক সমাপ্তিবিন্দুতে পৌঁছে দ্রষ্টা চক্ষু নিয়ে ফিরে তাকান। কবিতার সূচনাবিন্দু থেকে চিহ্নায়কের গ্রন্থনায় সময় ও পরিসরের যে-পর্যায়ক্রম আভাসিত হয়েছে, তাতে শেষ পর্যন্ত কোনো অনুষঙ্গই অপ্রয়োজনীয় থাকে না। আপাতদৃষ্টিতে যা বিবৃতি-সম্পৃক্ত, তাও গভীরতার তাৎপর্যের বিস্তারে অন্বিত হয়ে যায়। সার্থক কবিতার প্রতিটি শব্দ এইজন্যে প্রতীকী প্রেক্ষণ-বলয়ে অপরিহার্য।

চার

চিহ্নবিজ্ঞানকে কবিতার হয়ে-ওঠার প্রক্রিয়া অনুধাবনের পক্ষে খুব কার্যকরী কৃৎকৌশল হিসেবে যখন বিবেচনা করি, স্বভাবত পাঠক্রিয়া ও সমালোচনাতত্ত্বের পক্ষেও এর আলাদা গুরুত্ব অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অবশ্য ভাষ্যের বহুমুখী বিস্তারের ফলে কিছু সমস্যাও অনিবার্য হয়ে পড়েছে। উমবের্তো একো যাকে 'অতিভাষ্য' বলেছেন, ব্যাখ্যায়ন যাতে তার কবলে গিয়ে না পড়ে—এ বিষয়েও সচেতন থাকতে হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, প্রতিটি পাঠকৃতিতে কি একটিমাত্র কেন্দ্রীয় তাৎপর্য থাকে? আবার তাৎপর্যের বহুত্ব প্রতিবেদনে যদি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত না হয়, তাহলে ভাষ্যকার চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে গিয়ে কতটা স্বাধীনতা পেতে পারেন? পাঠক নিশ্চয় অভিযাত্রী ও আবিষ্কারক। কিন্তু এমন যদি হয়, তাহলে একটি পাঠকৃতি থেকে একাধিক অর্থের

প্রতীতিতে পৌঁছাবেন তিনি। তার মানে, চিহ্নায়কের গ্রন্থনায় অজস্র চিহ্নায়িতের সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। সুতরাং ভাষ্যও হবে ভিন্ন ভিন্ন। ভাষ্যের বহুত্ব পাঠকৃতির অন্তর্বর্তী শক্তির নিদর্শন। কিন্তু ভাষ্যের বহুত্ব আর অতিভাষ্য এক কথা নয়। অতিভাষ্যে চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে, এমনও হতে পারে, উদ্দিষ্ট সৃজনবর্গের আকরণ (যেমন কবিতা, ছোটোগল্প, উপন্যাস) ওই অতিভাষ্যের চাপে ঝাপসা হয়ে গেল। এখানেই তত্ত্বের নিয়ন্ত্রণ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। চিহ্নবিজ্ঞান তাই কেবল কবিতা এবং অন্য শিল্পমাধ্যমের হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে উদ্‌ভাসিত করে না, পাঠক-প্রতিক্রিয়ার আয়তনকেও দেয় পথের দিশা। পাঠকৃতিকে যদি দৃশ্যপ্রপঞ্চ বলে কল্পনা করি, তার পুনরভিনয়ে চিহ্নবিজ্ঞানই আবিষ্কারক পড়ুয়ার মঞ্চ-অবস্থানকে নির্ধারণ করে দেয়। অবশ্য জোনাথন কুলেরের সতর্কবাণীর ধরনে (The discourse which attempts to analyze metaphor does not itself escape metaphor.)[১৪] বলা যায়, চিহ্নায়ক থেকে চিহ্নায়িতে পৌঁছানোর তথ্যাতিযায়ী পথ খুঁজতে খুঁজতে ভাষ্যের মায়ায় যেন ভাষ্যকার হারিয়ে না যান।

ভাষা নিশ্চয় প্রাণিত করে, ইশারাও করে; কিন্তু বিবরণ পেশ করাও তার প্রাথমিক দায়ের মধ্যে পড়ে। তাই যখন ভাত নেই পাথর রয়েছে (শক্তি) বা শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা (ভাস্কর) বা ৯ ই ভাদ্র ১৩৯৫ (রাহুল)-এর পাঠকৃতিতে শুরু থেকেই প্রতীয়মান বিবৃতির স্তর পেরিয়ে যাওয়ার সংকেত পাই, বুঝতে পারি কেন কুলের সেই দ্বিধাহীন ও চমৎকার মন্তব্য করেছিলেন: 'Semiotics is a metalinguistic enterprise. It attempts to describe the evasive, ambiguous, paradoxical language of literature in a sober, unambiguous metalanguage!'[১৫] অর্থাৎ শক্তির ভাত যেমন ভাত নয়, পাথরও নয় পাথর। শব্দ নামক খাঁচার দরজা খুলে দিয়ে ওইসব শব্দের সাধারণ অর্থ মিলিয়ে গেছে সংকেতের আকাশে। তেমনি জীবনানন্দের বনলতা সেন বা অরুণিমা সান্যালদের মতো ভাস্করের সুপর্ণাও কোনো সুনির্দিষ্ট নারী নয়। তাঁর শীতকালও হিমঋতুর অনুষঙ্গকে সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করে গভীরতর দ্যোতনাগর্ভ হয়ে উঠেছে। এ এমন শীতকাল যখন তিন মাস ঘুমিয়ে থাকা যায় কোলাহলমুখর ব্যস্ত পৃথিবী থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে। তেমনি রাহুল পুরকায়স্থের ৯ই ভাদ্র ১৩৯৫ কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কোনো তারিখের পঞ্জীয়ন নয়। তাঁর 'শ্বাসাঘাত, তাঁতকল, পুরোনো হরফ'ও বিবরণ দেয়নি, সংকেতের দ্যুতি ছড়িয়েছে। কবিতার ভাষা যে মূলত পরাভাষা এবং চিহ্নায়কের গ্রন্থনা তার আশ্রয়, নামকরণ থেকেই সেই বার্তা পৌঁছায় আমাদের কাছে। শব্দের আধারে অর্থের আধেয় কত বিচিত্রভাবে ব্যক্ত হয়ে চলেছে, এ বিষয়ে কবিদের সৃষ্টিশীল উদ্ভাসন বারবার কার্য ও কারণের অন্বয় পেরিয়ে যায়। প্রশ্ন হচ্ছে, এই চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া কি সর্বতোভাবে ব্যক্তি-নির্ভর? পরিসর ও সময় কিংবা ইতিহাস ও সমাজের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক কি নেই?

উল্টোভাবে যদি বলি, এমন চিহ্নবিজ্ঞান আদৌ গড়ে উঠতে পারে কি যা সামাজিক অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির নিষ্কর্ষ নয়! এই সূত্র ধরে এগোতে এগোতে ক্রমশ মনস্তত্ত্ব,

সমাজতত্ত্ব, সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব প্রভৃতি পরিসরে চিহ্নায়নের প্রেরণাগত উৎস খুঁজে পাই। সুতরাং শুধুমাত্র কবিতা বা ছোটোগল্প বা কথকতার নান্দনিক তাৎপর্য সন্ধানের বলয়ে এই প্রক্রিয়া সীমাবদ্ধ থাকছে না। বহুস্বরসংগতির পক্ষে তারও যাত্রা অবধারিত হয়ে যাচ্ছে। আবার এমনও নয় যে বিশ শতকের শেষের কটি দশকে চিহ্নবিজ্ঞান প্রাসঙ্গিক। কিংবা শুধুমাত্র আধুনিক ইউরোপ এই চিন্তাধারাকে লালন করেছে। কেননা প্রাচীন ও মধ্যযুগেও তাৎপর্য-প্রতীতির প্রয়াস আমাদের নজরে পড়ে। বিস্তারিত আলোচনার যদিও সুযোগ নেই, এখানে এই উল্লেখমাত্র করে রাখছি যে খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকে প্রাচীন ভারতেও শব্দ ও অর্থের অন্যোন্য-সম্পর্ক নিয়ে সূক্ষ্ম চিন্তার সূত্রপাত হয়েছিল। যাস্কাচার্য তাঁর 'নিরুক্ত' বইতে এর প্রমাণ দিয়ে গেছেন। আর, খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ী বইতে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ-বিধি গ্রথিত করে যাননি কেবল, ভাষাকে দর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তাৎপর্য অনুশীলন সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য সূত্রও রেখে গেছেন। মধ্যযুগে ভর্তৃহরি এই ঐতিহ্যেরই বিস্তার ঘটিয়েছেন। আজকের এই পর্যায়ে যদি কোনো গবেষক প্রতীচ্যের তাত্ত্বিক বয়ানের সঙ্গে প্রাচ্যের ঐতিহ্যাগত পাঠ-অভিজ্ঞতার সৃষ্টিশীল সমীকরণ করতে পারেন—তাৎপর্য-সমন্বয়ের প্রয়াস যে আরও সূক্ষ্ম, গভীর ও বিচিত্রগামী হয়ে উঠবে, এবিষয়ে সংশয় নেই কোনো।

তাৎপর্যতত্ত্ববিদেরা সত্তর দশকেই চিহ্নবিজ্ঞানের অনেকান্তিক দ্যোতনা সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন হয়েছিলেন। তাঁরা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন গবেষণার মধ্যে অন্বয়সূত্র আবিষ্কার করে শৃঙ্খলা ও সংহতি স্থাপনের অনিবার্য প্রয়োজন সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। এই তাগিদে ১৯৭৪ সালে ইতালির মিলান নগরে চিহ্নবিজ্ঞান অনুশীলন-কারীদের আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যদিও এই মহাসম্মেলন থেকে কোনো নতুন দর্শন বা চিন্তাপ্রস্থানের ফতোয়া জারি করা হয়নি, তবুও প্রায় ছ'শো পঞ্চাশ জন প্রাজ্ঞ গবেষকের উপস্থিতি নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এর ফলে পরবর্তী দুটি দশকে চিহ্নবিজ্ঞানের চর্চায় আরও গতি সঞ্চারিত হলো এবং নতুন নতুন শাখা-প্রশাখায় তাৎপর্যতত্ত্বকে সঞ্চারিত করে দেওয়ার তাগিদও ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠল। দেখা দিল সংশ্লেষণের বহুমুখী প্রয়াস। তাই আজকের দিনে চিহ্নবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোন থেকে যদি কেউ সাহিত্যিক পাঠকৃতির চিহ্নায়নকে ঈপ্সিত গুরুত্ব দিতে চান, তাঁকে সহযোগী সমস্ত চিন্তা-প্রস্থান সম্পর্কেও সম্যক অবহিত হতে হবে।

চিহ্ন বা 'Sign' কথাটি যেহেতু গ্রিক 'Semeion' শব্দ থেকে উদ্ভুত, ইংরেজিতে 'Semiotics' ও 'Semiology' নামক দুটি পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগে মূল ভাববীজের পরিবর্ধিত অভিব্যক্তি লক্ষ করি। প্রথমোক্ত শব্দটিকে যেহেতু চিহ্নবিজ্ঞান বলছি, শেষোক্ত শব্দকে বলা যেতে পারে চিহ্নতত্ত্ব। এদের সূক্ষ্ম পার্থক্য এখানেই যে, প্রথমটি ক্রিয়াত্মক এবং দ্বিতীয়টি জ্ঞানাত্মক। অর্থাৎ চিহ্নবিজ্ঞানে পারদর্শিতা আমাদের শব্দ থেকে চিহ্নায়ক নিঙড়ে নেওয়ার প্রায়োগিক কৃৎকৌশল শেখায় আর চিহ্নতত্ত্ব এই প্রক্রিয়ার অধিবিদ্যাগত দিক সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে। আপাতদৃষ্টিতে চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের সার্বভৌম অবস্থান প্রতীয়মান হয় যদিও, সমাজ-নিরপেক্ষ ও

সময়-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব এদের নেই। তার মানে, সামূহিক বাচনের পরিধি-বহির্ভূত কোনো একক বাচনের সম্ভাবনা নেই কোথাও। এক্ষেত্রে রলাঁ বার্ত, জোনাথন কুলের ও উমবের্তো একোর তত্ত্বচিন্তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তবে, এঁদের অনেক আগে আমেরিকার দার্শনিক চার্লস স্যান্ডার্স পিয়ার্স (১৮৩৯-১৯১৪) চিহ্নবিজ্ঞান বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন।[১৬] একে তিনি বলেছেন বিজ্ঞানের বিজ্ঞান; তাঁর মতে এই হলো যুক্তিবিদ্যার আকর। এই বিশ্বব্রহ্মান্ড মূলত চিহ্ননির্মিত; বৈশ্বিক অভিব্যক্তির প্রতিটি স্তরে নিহিত রয়েছে চিহ্ন।[১৭] মানুষ নামক অস্তিত্বও তো অজস্র চিহ্নের সমষ্টি। বিভিন্ন চিহ্নের পার্থক্য নির্দেশ করার জন্যে তিনি বিচিত্র জটিল পদ্ধতির প্রস্তাবনা করেছেন। তাঁর প্রস্তাবিত বর্গীকরণ অনুযায়ী মোট ৫৯,০৪৯ ধরনের চিহ্ন হতে পারে। আবার হ্রস্বীকরণ প্রক্রিয়া অনুযায়ি এদের মাত্র ৬৬ টি বর্গেও বিন্যস্ত করা চলে। যাই হোক, এই জটিলতা স্পষ্টত পরবর্তী গবেষকদের বিভ্রান্ত করেছে।

পিয়ার্সের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য হলো, সব কিছুই আসলে চিহ্ন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে সোস্যুর সমস্ত চিহ্নকে নিয়মাতিযায়ী ও আকস্মিকতা-প্রসূত বলে মনে করতেন। ব্যবহারের রীতি অনুযায়ি এদের স্বাভাবিক মনে হয় কখনও, আর কখনও আরোপিত। তবে সর্বদা সমস্ত চিহ্ন সামাজিক বিধিবিন্যাস ও চিহ্নায়নের ঐতিহ্য দ্বারা নির্ধারিত হয়। পিয়ার্স প্রতীক, বাক্প্রতিমা, সূচক ইত্যাদি বর্গের আকল্প যদিও চিহ্নায়কের মধ্যে লক্ষ করেছেন—উপস্থাপনার ধরনে গুরুত্ব দিয়ে তিনি সোস্যুরের অনুরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। পরবর্তী চিন্তাবিদেরা বস্তু ও নিষ্কর্ষের সম্পর্ক নিয়ে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্বে ভাষার ক্রিয়া ও ভূমিকা নিয়ে আরও বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। যেহেতু ভাষার মতো মানুষের জগৎও বহুস্বরিক, চিহ্নায়ন প্রকরণের নিরবচ্ছিন্ন বিন্যাস ছাড়া এদের তাৎপর্য অনুধাবন অসম্ভব। 'উঠিলেও নিয়ম, নামিলেও নিয়ম'—এর মতো চিহ্নায়কের উপস্থিতি সমস্ত পরিসর জুড়ে রয়েছে। আমাদের জগৎ চিহ্নের জগৎ, আমাদের জীবনও চিহ্নখচিত। মনে রাখতে হয় কেবল একথা যে, এইসব চিহ্নের মধ্যে বৈচিত্র্য অন্তহীন—'Some more mental and spontaneous, others more material and regular।[১৮] আমাদের চিন্তা ও উপলব্ধি অভিজ্ঞতা-নির্ভর, একথা যেমন যথার্থ তেমনি অভিজ্ঞতার নির্যাসই যে আমাদের অনুভূতির আকরণকে গড়ে তোলে—একথাও সমান সত্য। তাই আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জগৎকে যদি বুঝতে চাই, বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অনুধাবন করার সঙ্গে সঙ্গে এদের ভিত্তিতে নির্মীয়মান প্রতীকী আকরণ এবং বস্তু ও প্রতীকের বহুমুখী সম্পর্ককেও বুঝতে হয়। 'সত্তা মনে সমান্তরালতার বোধ'—বাখতিনের এই মহাসূত্র অনুযায়ী মানববিশ্বের চিহ্নায়কগুলি যদি বিশ্লেষণ করি, দেখব, বস্তু ও ক্রিয়া বা বস্তু ও তাৎপর্য যুগপৎ স্বতন্ত্র ও পরস্পর-সম্পৃক্ত হয়েই মানববিশ্বকে গঠন করছে। মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা যে বস্তু-অতিযায়ী সংকেতের স্বরূপ উপলব্ধির দিকে, এবিষয়ে বিশ শতকের দার্শনিকেরা উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদন রচনা করেছেন। বস্তুত বিদ্যাবত্তার নানা ধারার সমন্বয়ে চিহ্নবিজ্ঞানের বহুমাত্রিক পরিসর গড়ে উঠেছে। তাৎপর্য ও সংকেত যেহেতু মূলত

সামাজিক প্রক্রিয়া, এ বিষয়ে গভীরতা ও ব্যাপ্তি যুক্ত হয়েছে সমাজতাত্ত্বিক, দার্শনিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও নন্দনতাত্ত্বিকদের যৌথ অবদানে। উনিশ ও বিশ শতকে মানুষের ভাববিশ্ব আমূল আলোড়িত হয়েছে যাঁদের দিগ্‌দর্শক বিশ্লেষণে, আজকের চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার অনুশীলন তাঁদের ছায়ায় লালিত না-হয়ে পারে না। এইজন্যে কার্ল মার্কস, এমিল ডুর্কহাইম, সিগমুন্ড ফ্রয়েড, মার্টিন হাইডেগার ও মিখায়েল বাখতিনের মতো যুগান্তকারী চিন্তাবিদদের অমোঘ উপস্থিতি চিহ্নবিজ্ঞানের চর্চায় অনস্বীকার্য।

সুতরাং চিহ্নবিজ্ঞানকে মানুষের চিন্তাবিশ্ব বিবর্তনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না। এ কেবল চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের সামাজিক ভাষ্য করার জন্যে নয়, যুক্তিবিন্যাসে নিহিত অন্ধতাকে পেরিয়ে দ্রষ্টা চক্ষুর উদ্ভাসনে পৌঁছানোর জন্যেও জরুরি। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ক্লদ লেভিস্ট্রস, মিশেল ফুকো, জাক লাকাঁ, লুই আলত্যুসের, রলাঁ বার্ত, জাক দেরিদার মতো চিন্তাবিদেরা বস্তু থেকে সংকেতে এবং সংকেত থেকে বস্তুতে পৌঁছানোর জন্যে অনেকান্তিক সংশ্লেষণী পথের নির্দেশ দিয়েছেন। চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার উদ্দিষ্ট প্রতিবেদনের আদল এর ফলে অস্থির ও সঞ্চরমান হয়ে পড়েছে। ভাষার বাচন, প্রত্নকথার ভাববীজ, চিহ্নের সংকেতসূত্র—সমস্ত কিছুকেই আজ আমরা একই সঙ্গে ব্যক্তিগত ও সামাজিক চেতনা ও অবচেতনের দ্বিবাচনিক নির্মিতি বলে বুঝতে পারছি। সাম্প্রতিক কালে বিকেন্দ্রায়িত সত্তার উপলব্ধি মানবিকী বিদ্যার বিভিন্ন ধারায় যে গ্রন্থিল সমস্যা তৈরি করেছে, চিহ্নবিজ্ঞানকে ইদানীং সেই সংকটের মোকাবিলাও করতে হচ্ছে। সত্তার পরিসর জুড়ে অনবরত হ্যাঁ ও না- এর সংঘর্ষ এবং সমসাময়িক বিমানবায়িত পৃথিবীর ধূসরতা হয়তো পূর্ববর্তী অনেক সিদ্ধান্তকে নতুন প্রশ্নের মুখোমুখি করে তুলছে। আসলে চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার উপযোগিতাকে তীক্ষ্ণ প্রশ্নে বিদ্ধ করছে চিহ্নবিজ্ঞানেরই নতুন প্রকরণ। যেন নিজেকে নিজেই বিশ্লেষণ করছে, আপন অস্তিত্বের তত্ত্বগত সমর্থন খোঁজার জন্যে বিবর্তনশীল বিশ্বের অভিঘাতে নতুন আধার ও আধেয় সন্ধান করছে। আর, এইজন্যে চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ায় কোনো উপসংহার থাকতে পারে না। নিয়ত সঞ্চরমান বলে আত্মপরীক্ষা ও আত্মসমালোচনার প্রকরণ নির্মাণ করে যাওয়াই তার গোত্র-লক্ষণ। এ বিষয়ে জুলিয়া ক্রিস্তেভার চমৎকার মন্তব্য স্মরণ করতে পারি: 'Semiotics cannot develop except as a critique of semiotics. At every moment in its development semiotics must theorize its object. Its own method, and the relationship between them: it therefore theorizes itself and becomes by thus turning back on itself, the theory of its own scientific practice. ...It is a direction for research, always open, a theoretical enterprise which turns back upon itself, a perpetual self-criticism.'[১৯]

কোনো সন্দেহ নেই যে সাম্প্রতিক বিশ্বপরিস্থিতির কূটাভাসপূর্ণ গ্রন্থিলতা শব্দ ও চিহ্নায়িতের যুগলবন্দিকে ক্রমাগত দুরধিগম্য করে চলেছে। পাঠককে আমরা অভিযাত্রী বলেছি; কিন্তু ইদানীং তাঁর সামনে যেন 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার'

উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। সাহিত্য চিহ্নবিজ্ঞানীদের জন্যে যেমন সবচেয়ে বেশি প্রত্যাহ্বান নিয়ে আসে, তেমনি চিহ্নায়ন প্রক্রিয়াও সাহিত্যেই সর্বাধিক স্বাধীন ও সার্বভৌম পরিসর পেয়ে থাকে। প্রত্যাহ্বানের কথা বলছি একারণে, সাহিত্যের তাৎপর্য কখনও স্পষ্টভাবে ধরা দেয় না। সোনার হরিণের মতো তা চিরকাল সন্ধানীদের নাগালের বাইরে থেকে যায়। শব্দের সহযাত্রী চিহ্নায়ক; আবার শব্দের আশ্রয় ছেড়ে দিয়ে সহসা যাত্রাবিরতি করে কিংবা শব্দের উপকূলকে বহুদূর পেছনে ফেলে এসে যাত্রার বিপুল বিস্তার ঘটিয়ে দেয় ওই চিহ্নায়ক। সাহিত্যের চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ায় এই কূটাভাস যেন সাধারণ নিয়ম। মোদ্দা কথা হলো পথ ও পাথেয় নির্ণয়ের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস, আত্ম-আবিষ্কারের সূত্রে জগৎ-বীক্ষণ, নিরন্তর অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির সৃষ্টিশীল সমীকরণের সূত্রসন্ধান। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গ্রহীতা-পাঠক আসলে সামাজিক ও আত্মিক অভিজ্ঞতার ভাষ্য রচনার প্রচলিত প্রকরণগুলির প্রাসঙ্গিকতাই অনবরত পরীক্ষা করতে থাকেন। ভাষার দায় যদিও উন্মোচনের প্রতি, বহু ক্ষেত্রে ভাষা সত্যের প্রকাশক না-হয়ে আচ্ছাদকও হয়ে থাকে। একদিকে রয়েছে তার সৃজনশীল স্বভাব, অন্যদিকে ‘মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ’ তা পেতে রাখে ‘নিপুন হাতে’। ভাষার এই অন্তর্বৃত দ্বিবাচনিক পদ্ধতিকে মনে রেখেই চিহ্নসন্ধানী পাঠক এগিয়ে যান পাঠকৃতির দিকে, পূর্বাগত বিশ্লেষণী প্রকরণ ও সংকেতসূত্রের মুখোমুখি হয়ে কিছুটা গ্রহণ করেন কিছুটা বর্জন করেন আর কিছুটা নতুন চিহ্নায়নের নির্মাণও করেন। সুতরাং প্রতিবেদনের তাৎপর্যে পৌঁছানো মূলত সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া। লেখক ওই তাৎপর্যের আদি-সূত্রধার মাত্র; শুধু সংবেদনশীল পাঠকই সাহিত্যের সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। এ বিষয়ে জোনাথন কুলের লিখেছেন: ‘Meaning is not an individual creation but the result of applying to the text operations and conventions which constitute the institution of literature.’[২০]

পাঁচ

মানুষিক অস্তিত্বের সাংগঠনিক রূপ দেখানোর বদলে আজকের চিন্তাবিশ্ব যদি তাকে চিহ্নসর্বস্ব হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চায়, তাহলে মানবসত্তা কি নিছক নির্মিতি হয়ে দাঁড়ায় না? কয়েকটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি-প্রকরণের মধ্যে বিচূর্ণিত হয়ে গিয়ে মানুষ কি আর তাৎপর্যের উৎস ও নিয়ন্তা বলে গণ্য হতে পারে? সেক্ষেত্রে উপন্যাসের কথাবয়ন থেকে মানুষের রহস্যময় উপস্থিতি আবিষ্কার ও পুনরাবিষ্কার করার বদলে কখনও খুঁজে পাব অবচেতনের চিহ্নায়ন, কখনও প্রত্নকথা ও সম্পর্ক-বিন্যাসের চিহ্নায়ক-পরম্পরা, কখনোও বা রাষ্ট্রযন্ত্রের ভাবাদর্শগত আকরণের ছায়া, কখনও ঐতিহাসিক সন্দর্ভের আততি। এই সবই নিশ্চয় অপরিহার্য আজ; কিন্তু চিহ্নসর্বস্বতার আবর্তে মানুষ ডুবে যাচ্ছে কি না—তা লক্ষ করার দায় আমরা এড়াতে পারি না। একটু আগে যেমন লিখেছি,আত্মসমালোচনার প্রবণতাকে নিয়ত জাগ্রত রেখে চিহ্নবিজ্ঞান নিজস্ব প্রকরণে অন্তর্বৃত স্ববিরোধিতা ও সম্ভাব্য ভ্রান্তিবিলাস সম্পর্কে সচেতন থাকতে পারে। এই

পদ্ধতির নিরন্তর চলিষ্ণুতা সত্ত্বেও কোথাও যে সীমারেখা মেনে নিতে হয়, এই উপলব্ধি অতিভাষ্যের বিপদ থেকে সতর্ক পাঠককে রক্ষা করতে পারে।

চিহ্নবিজ্ঞান যতক্ষণ কোনো-এক বিশেষ মানবিকী বিদ্যার চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ নান্দনিক পরিসরের নিবিড় অনুশীলন সত্ত্বেও তা প্রাগুক্ত স্ববিরোধিতা ও কূটাভাস এড়াতে পারে না। কিন্তু যখন তাকে সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে এবং ব্যাপকতর ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে স্থাপন করি তখন সাংস্কৃতিক চিহ্নতত্ত্বের ইতিবাচক প্রেরণা ব্যক্ত হতে থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, সূক্ষ্মতর গভীরতর ও ব্যাপকতর অপরতার অস্তিত্ব যখন স্বীকার করি, সত্তা ও সমান্তরালতার দ্বিবাচনিকতায় চিহ্নায়ক পরম্পরার তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মিখায়েল বাখতিনের উপন্যাসতত্ত্ব পর্যালোচনা করে আমরা তাই সাংস্কৃতিক চিহ্নবিজ্ঞানের উজ্জ্বল সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত হয়ে উঠি। সেসময় তাৎপর্য বা নিষ্কর্ষ উদ্ভাসনী বলয়ের অন্য নাম হয়ে ওঠে। দৃষ্টান্ত হিসেবে কয়েকটি ঔপন্যাসিক পাঠকৃতির উল্লেখ করছি যেখানে আখ্যান আগাগোড়া সামাজিক চিহ্নতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত। সেইসব পাঠকৃতির আপাত-সমাপ্তিতে পৌঁছে আমরা বহুমুখী চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার উদ্ভাসন সম্পর্কে নতুনভাবে সচেতন হয়ে উঠি। জীবনানন্দ দাশের মাল্যবান ও জলপাইহাটি, কমলকুমার মজুমদারের অন্তর্জলী যাত্রা ও খেলার প্রতিভা, অমিয়ভূষণ মজুমদারের রাজনগর ও চাঁদবেনে, মহাশ্বেতা দেবীর অরণ্যের অধিকার ও হাজার চুরাশির মা, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চিলেকোঠার সেপাই ও খোয়াবনামা, গুণময় মান্নার মুটে, নবারুণ ভট্টাচার্যের হার্বার্ট প্রভৃতির কথনবিশ্ব মূলত চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের দ্বিবাচনিকতায় গ্রথিত। এইসব রচনায় আখ্যান আলাদাভাবে নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ তবু এদের গ্রন্থনা এমন যে আখ্যানের চেয়ে অন্তর্বর্তী চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার বয়ন পাঠকের বেশি অভিনিবেশ দাবি করে। উপন্যাস পাঠ যখন শেষ হয়ে যায়, কোনো ঘটনার প্রসাধিত আড়ম্বরের বদলে সামাজিক চিহ্নায়নের তাৎপর্যই বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বাখতিন/ভোলোশিনোভের মন্তব্য 'The utterance is a social phenomenon' এইসব আখ্যানের কেন্দ্রীয় সত্যের প্রতি তর্জনি সংকেত করছে। উপন্যাসের কুশীলবদের অবস্থান ও মিথস্ক্রিয়া থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে সামাজিক চিহ্নায়নের বিচিত্র প্রক্রিয়া। নিবিড় পাঠে বুঝতে পারি, এই প্রক্রিয়ার আধার ও আধেয় হলো সামাজিক ভাবে নির্ধারিত ভাবাদর্শ। এক্ষেত্রে বাখতিন/ভোলোশিনোভের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য: 'Without signs there is no ideology...Everything ideological possesses semiotic value.'[২১]

এখানে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। কিন্তু প্রাগুক্ত উপন্যাসগুলির ঘটনাবিন্যাস ও বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর আততির মধ্য দিয়ে যে অনবরত 'encoding' ও 'decoding'-এর প্রক্রিয়া ব্যক্ত হচ্ছে—এ বিষয় আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। 'চিলেকোঠার সেপাই' এর ওসমান, 'খোয়াবনামা'র তমিজ, 'অন্তর্জলি যাত্রা'র বৈজুনাথ, 'মাল্যবান' ও 'হার্বার্ট এর নাম-চরিত্র যে ক্রমশ স্বর থেকে স্বরান্তরে আর চেতনা থেকে অধিচেতনায় বিবর্তিত হতে থাকে, তাতে ঘটনা তো নিছক নির্মোক; সাংকেতিক

দ্যোতনার বিচ্ছুরণই এদের পরিক্রমার মুখ্য আধেয়। এই পরিক্রমা যতখানি আত্মগত, ততটা সামাজিক: এর প্রমাণ করা যায় বারবার। সমস্ত তাৎপর্যই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জনীয়। ব্যক্তি-সত্তার সঙ্গে সামাজিক সত্তার বহুস্বরিক সংঘর্ষে আরও বুঝতে পারি, চিন্তা যেমন চিহ্ন তেমনি ঘটনাও মূলত চিহ্ন। আর, সমস্ত ভাববীজ ও ঘটনা-বিন্যাস আকরণ ও স্বভাবগত দিক দিয়ে মূলত দ্বিবাচনিক। বহির্বৃত আপাত-অভিব্যক্তিকে যখন গভীরতর আকরণের দর্পণে বুঝতে চেষ্টা করি, উপন্যাসের কথনবিশ্বেও প্রতীয়মান পাঠ ও প্রকৃত পাঠের দ্বিবাচনিক সম্পর্কটি অনুভব করি। চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া এই সম্পর্কেরই ফলশ্রুতি। বাস্তবতা ও সত্য, ভাষা ও পরাভাষা, আখ্যান ও তাৎপর্য তাই নিবিড় সামাজিক সংবিদ দ্বারা লালিত ও পরিশীলিত হচ্ছে। আমরা যখন উপন্যাসের পাঠকৃতিতে অবগাহন করি, স্তর থেকে স্তরান্তরে যাত্রার জটিলতা ও পথভ্রান্তির আশঙ্কা সত্ত্বেও চিহ্নায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত সময় ও পরিসরের বিপুল, সুদূরপ্রসারী ও মায়াবী ভূমিকায় মুগ্ধ না-হয়ে পারি না। কিন্তু মুগ্ধ হয়েও বিহ্বল হতে পারেন না চিহ্নবিশারদ পাঠক। কেননা তাতে তথ্য থেকে সত্যে, রূপ থেকে রূপান্তরে পৌঁছানোর সামাজিক ভিত্তি অস্পষ্ট হয়ে পড়বে। রবার্ট হোজ ও গুনথের ক্রেসের সিদ্ধান্ত : 'All semiotic activity takes place in time : all semiotic phenomena are diachronic, whether on a small scale the time to produce or interpret a single syntagm, the flow of syntagms in discourse on a larger scale, including the history of human semiosis.'[২২] আখ্যানের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আকরণকে ঐতিহাসিক সময়ের প্রেক্ষিতে স্থাপন না করা পর্যন্ত প্রতিবেদনের পরিসর থেকে জায়মান চিহ্নায়কের তাৎপর্য ও গুরুত্ব আমরা কখনও বুঝতে পারব না। যেমন আদিবাসী সাঁওতাল সমাজের উপনিবেশ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী সংগ্রামের প্রেক্ষিতকে যতক্ষণ বিশ্লেষণ না করছি, মহাশ্বেতা দেবীর অরণ্যের অধিকার-এ সঞ্চরমান চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া স্পষ্ট হবে না কখনও। প্রতাপের সহগামী ভাবাদর্শ কীভাবে প্রান্তিকায়িত জ্ঞানের অস্তিত্বকে পিষ্ট করে, এই বার্তা আমাদের কাছে পৌঁছাবে না। তেমনি হাজার চুরাশির মা উপন্যাসের পাঠকৃতিতে মাতৃ-অস্তিত্বও যে রাজনৈতিক অনুষঙ্গের নির্মিতি, এ কথা স্পষ্ট হতে পারে কেবল নকশাল আন্দোলনের ইতিহাস অনুধাবনের সূত্রে।

এইজন্যে কোনো তাত্ত্বিক যখন বলেন, 'তাৎপর্য সর্বদা প্রসঙ্গ-নির্ভর'—সেসময় তিনি সামাজিক চিহ্নতত্ত্বের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিই তর্জনি সংকেত করেন। চিলেকোঠার সেপাই-এর প্রতিবেদন এবং ওসমান, হাড্ডি খিজির, চেংটুর অস্তিত্বগত তাৎপর্য বাংলাদেশের জন্মকালীন সংঘর্ষের পটে দ্যোতনাগর্ভ হয়ে উঠেছে। আবার খোয়াবনামার বাচন ও পরাবাচনের দ্বিবাচনিকতায় ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে ভারত-বিভাজনের কালিক বলয়। একই ভাবে বলা যায়, মুটে বা হার্বার্ট বা তিস্তাপারের বৃত্তান্ত বা রাজনগরের বয়নে সঞ্চরমান চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া পাঠকের কাছে ধরা দেবে না কখনও যদি তিনি সময় ও পরিসরের অন্যোন্য-বিন্যাস সম্পর্কে অবহিত না হন। প্রসঙ্গের সঙ্গে পাঠকৃতির নিবিড় সাংগঠনিক ঐক্যকে আলোকিত করে তোলে চিহ্নায়ন

প্রক্রিয়া। গ্রহীতা-পাঠক তখন সক্রিয় পর্যবেক্ষক হিসেবে প্রতিবেদনের দ্বিবাচনিক আবহে যুক্ত হয়ে পড়েন। আখ্যানের বিভিন্ন স্তর কিংবা কুশীলবদের ধারাবাহিক উন্মোচন নিশ্চয় চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার অনন্ত বৈচিত্র্যকে আমাদের কাছে তুলে ধরে। তবে এদের মধ্যে অমোঘ হয়ে ওঠে ভাবাদর্শের তরঙ্গায়িত বিস্তার ও সামাজিক সংবেদনার অনেকান্তিক সম্পর্ক। এ প্রসঙ্গে সামাজিক চিহ্নবিজ্ঞানীর বক্তব্যকে ঔপন্যাসিক কেবল সৃষ্টিশীল সমর্থনই দেন না, তাকে রূপান্তরিত ও বিস্তৃততর করে তোলেন। অমিয়ভূষণ মজুমদারের চাঁদবেনের গ্রন্থনা বা কমলকুমার মজুমদারের খেলার প্রতিভার বহুস্বরিক অন্তর্বয়ন এর দৃষ্টান্ত।

জীবনের শেষ নেই তাই চিহ্নায়কের বিচ্ছুরণেও কোনো সমাপ্তিরেখা নেই। কখনও কবিতায় কখনও উপন্যাসে আর কখনও ছোটগল্পে আমরা তাৎপর্যের সঙ্গে সামাজিক প্রেক্ষিতের দ্বিবাচনিক সম্পর্কটি বুঝে নিই। চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের সম্পর্ক নির্মিতি-বিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি। সাহিত্যিক প্রতিবেদনে এই সম্পর্ক-বিন্যাসই কথনবিশ্বকে গড়ে তোলে। এই জগৎ চিহ্নের জগৎ। তবে গ্রহীতার অবস্থান ও প্রস্তুতির গভীরতার ওপর নির্ভর করে চিহ্নায়িতের প্রবাহ উদ্দিষ্ট মোহনায় পৌঁছাতে পারছে কি না! বাখতিন জানিয়েছেন, জ্ঞান ও অনুভূতির অন্যোন্য-সম্পৃক্ত। চিহ্নায়ক পরম্পরার মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে অস্তিত্ববিষয়ক জিজ্ঞাসা আর জ্ঞানতাত্ত্বিক সন্ধানের পারস্পরিক উদ্ভাসন। তাই পাঠকৃতির মুখোমুখি হই যখন, মানববিশ্বকে আরও একটু ভালভাবে জানি, চিনি। জীবন ও জগৎ অনবরত আমাদের কাছে নিরুচ্চার ও সোচ্চার বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে। এই উচ্চারণ-প্রবাহে সাড়া যদি দিতে পারি, তবেই অর্থবহ হয়ে ওঠে আমাদের অস্তিত্ব। এই সংযোগসূত্র গড়ে তোলা মূলত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দায়। চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়ে, প্রতিটি মুহূর্তে নিজেকে রচনা করতে করতে, আপন অনন্যতাকে স্বতঃসিদ্ধ করে তুলছেন চিহ্নতাত্ত্বিক পাঠক।

উল্লেখপঞ্জি

১. Julia Kristeva, 'The system and the speaking subject,' Times literary Supplement', 12 October 1973,p. 1249.

২. এ বিষয়ে আরও বক্তব্য এবং পারিভাষিক প্রয়োগ-সূত্রের জন্যে দ্রষ্টব্য : মদীয়, প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ২০১২, পৃ ৫৯-৯৬, ৩১১-৩০।

৩. John Sturrock, Structuralism, Fontana Press, London, 1993 (2nd edition). p.xiii.

৪. দ্রষ্টব্য : Umberto Eco, A Theory of Semiotics, Indiana University Press, Bloomington and London, 1976; The Role of the Reader: Exploration in the Semiotics of Texts, Indiana University Press, Bloomington 1979 ; Semiotics and the Philosophy of Language, Macmillan, London, 1984.

৫. Roman Jakobson, 'Language in relation to other communication systems' Selected Writings, Vol. II, The Hague, Moutan, 1971, p.698.
৬. জীবনানন্দ দাশ, 'ঘোড়া', সাতটি তারার তিমির, জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ, ভারবি, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ ২৫৫-৫৬
৭. শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'অবনী বাড়ি আছো', ধর্মে আছো জিরাফেও আছো, পদ্য সমগ্র (১ম), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ১৯৮৯, পৃ-৮৫
৮. ভাস্কর চক্রবর্তী, 'ছোট বোন', শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা, অধুনা, কলকাতা ১৯৭১, পৃ.৩০।
৯. তদেব, চব্বিশ বছর, আমি, তদেব, পৃ.-২৭।
১০. Michael Riffaterre, Semiotics of Poetry, Indiana University Press, Bloomington, 1978, p.1.
১১. তদেব, পৃ.৪।
১২. জয় গোস্বামী, 'ভ্রূণ', 'প্রত্নজীব', কবিতা সংগ্রহ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ ৫০-৫৪।
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ.১২
১৪. Jonathan Culler, The Pursuit of Signs, Routledge, London, 1992. p.xi.
১৫. তদেব
১৬. দ্রষ্টব্য : C. S. Peirce: Collected Papers (8 vols.) ed. Charles Hartshorne et al, Havard University Press, Cambridge : Mass 1931-58 এবং James K. Feibleman: An Introduction to Peirce's Philosophy, Allen & Unwin, London, 1960.
১৭. দ্রষ্টব্য : C. S. Peirce, Collected Papers, Vol. V,p. 448.
১৮. তদেব,Vol. vii,p.570/
১৯. Julia Kristeva, Semiotike, Paris, Seuil,. 1969,p.30
২০. Jonathan Culler, The Pursuit of Signs, Routledge, London, 1992, p.127.
২১. Mikhail Bakhtin/V.N. Voloshinov, Marxism and the Philosophy of Language, Seminar Press, New York, 1973, p.9.
২২. Robert Hodge and Gunther Kress, Social Semiotics, Pollity Press, Cambridge, 1991, p.35.

স্রষ্টা ও সৃষ্টি

হ্যামলেটের অণুবিশ্ব : বিনির্মাণের খসড়া

চার শতাব্দি পরেও হ্যামলেট নিয়ে ভাষ্য-ভাষ্যান্তরের অভাব নেই। নতুন কাল মানে নতুন পাঠ, নতুন চিহ্নতাত্ত্বিক অধ্যয়নের ঘরানা। সেইসব পাঠান্তরের বিনির্মাণ কিংবা তাৎপর্যতাত্ত্বিক খোঁজও বিপুল বিস্ময়ের কারণ। আসলে, ইলিয়াড-ঈনীড-ডিভাইনা কমেডিয়া-প্যারাডাইস লস্ট কিংবা অয়দিপাউস-আন্তিগোনে-ফাউস্ট-এর মতো হ্যামলেটও একক পাঠকৃতি নয় আর ; হ্যামলেটকে উপলক্ষ করে আজও প্রসারিত হয়ে চলেছে স্বয়ংসম্পূর্ণ এক সাহিত্যের ভুবন। ১৬০১ সালে হ্যামলেট লেখা শুরু হয়েছিল আর ১৬০২ এর প্রথম দিকে তা শেষ হয়েছিল। এর ঠিক আগে জুলিয়াস সীজার (১৬০০) আর পরে ট্রয়লাস অ্যান্ড ক্রেসিডা (১৬০৩) লেখা হয়েছে। এ সময় শেক্সপীয়ারের সৃষ্টিচেতনায় নতুন-এক পর্যায়ের সূচনা হয়েছে যখন ভাবুক ব্যক্তিসত্তার মননবিশ্ব ও জগতের সম্পর্ক, জ্ঞান ও জ্ঞাতার সম্বন্ধ, ভিন্ন দৃষ্টিকোনের সংঘর্ষ, স্বভাব ও বিকারের দ্বন্দ্ব ইত্যাদির উপর অন্তর্ভেদী আলো এসে পড়েছে। এইসব কিছুর প্রেক্ষিতে হ্যামলেট-পাঠ কখনও খুব সহজ ছিল না। বস্তুত হ্যামলেট-সাহিত্যে যত বৈচিত্র্য ও মতান্তর রয়েছে, শেক্সপীয়ারের অন্য কোনো নাটকের পাঠ-পাঠান্তরে ততখানি দেখা যায় না। হ্যামলেট-ভাষ্য সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে বহু খণ্ডের বিশ্বকোষ জাতীয় বই হয়ে যেতে পারে। এ নাটকে শেক্সপীয়ার আসলে কী বোঝাতে চেয়েছেন, এর মীমাংসা করতে গিয়ে প্রতিটি যুগের নতুন চিন্তাপ্রস্থান নিজ-গোত্রীয় সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। নাট্যকারের প্রকৃত অভিপ্রায় কী, এ বিষয়ে বিতর্ক নিরর্থক। বরং সাম্প্রতিক বিনির্মাণপন্থী পাঠতত্ত্ব অনুযায়ী চিহ্নসন্ধিৎসু পাঠকের সূক্ষ্ম বোধসম্পন্ন প্রতিক্রিয়ার ওপর নির্ভর করাই কাম্য।

ডেনমার্কের রাজপুত্র হ্যামলেট জ্ঞানী, অনুভূতিপ্রবণ, দ্রষ্টা চক্ষুর অধিকারী। কিন্তু চারদিকে ব্যাপ্ত জগৎ যে প্রতীয়মান আর সত্যভ্রমের সন্ত্রাসে সত্য যে বেপথুমান, এটা জেনেও বিভ্রমের কাছে স্বেচ্ছায় সমর্পিত হয় মানুষ—এই কেন্দ্রীয় বোধ হ্যামলেটের বিপন্নতার উৎস। মানুষ তার নিজের এবং জগতের নির্মাতা : নির্মাণের মধ্য দিয়েই রচিত হয় চিহ্নায়নের গ্রন্থনা। অথচ জীবনের স্থাপত্য দাঁড়াবে কিসের ভিত্তিতে, কোন্ উপকরণের নির্ভরতায় : তা নির্ণয় করতে পারে না সত্তা। যা-কিছু যথাপ্রাপ্ত তা-ই যদি প্রমাণিত হয় প্রতিরূপ, এমনকী প্রতিরূপেরও প্রতিরূপ বলে, পুনঃসৃষ্টি ও রূপান্তরের সক্রিয়তা হারিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে সত্তা—

'And thus the native hue of resolution
Is sicklied o'er with the pale cast of thought,

And enterprises of great pitch and moment.
With this regard their currents turn awry.
And lose the name of action....'

কিন্তু একবাচনিক ভাবে তো দেখা যায় না কিছুই যেহেতু এ জগৎ দ্বিবাচনিকতায় আধারিত আর জীবন দ্বিবাচনিকতার কর্মশালা। তবে বহু-আলোচিত (এবং বহু-বিতর্কিতও) এই স্বগত কথন যেভাবে গভীর দার্শনিক চেতনা-মন্থন দিয়ে শুরু হয়েছিল (To be, or not to be, that is the question), শেষ পর্যন্ত তার পারম্পর্য বজায় থাকল কিনা—এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতণ্ডার অভাব নেই। জীবন-মৃত্যুর দ্বিরালাপ কিংবা সত্তার বৈধতা নিয়ে আদৌ ভাবছিল কিনা হ্যামলেট—এই সংশয়ও প্রকাশ করেছেন কেউ কেউ। মৃত্যু ও ঘুম, ঘুম ও স্বপ্ন নিয়ে ভাবছে যে-মানুষ, উদ্যম বা কৃত্য নয়, হয়তো আত্মহননই অন্বিষ্ট তার। যদি এমন হয়, পুনঃসৃষ্টি ও রূপান্তর তবে কার, কিসের জন্যে? কোন্ 'enterprise' বা 'action' বা 'resolution'-এর কথা ভাবছিল হ্যামলেট : তা কি তার নিহত বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া নয়? অথবা হনন ও আত্মহনন একাকার হয়ে গিয়েছিল তার চেতনায়!

বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষার পরস্পর-বিরোধিতায় আক্রান্ত যে-মানব-সত্তা, চিন্তার এক স্তর থেকে অন্য স্তরে স্রোতের শ্যাওলার মতো সে কি মুহুর্মুহু ভেসে যায়! ভিন্ন দৃষ্টিকোনের সমান্তরাল অবস্থান যেহেতু অনিবার্য, ঐ ভাসমানতায় কেউ দেখে প্রণালীবদ্ধ উন্মাদনা, কেউ বা আর্ত বিলাপ করে : 'Oh, what a nobel mind is here o'erthrown'! একদিকে মানুষের অনন্ত সম্ভাবনা, অন্যদিকে তার সীমাহীন স্খলন : এই দ্বিমেরু-বিষমতার উন্মোচনই জীবন। কিংবা, শুধু উন্মোচন নয়—দ্বিরালাপের উদ্‌ভাসন ; এর শীর্ষবিন্দু যদিও উপলব্ধির আকাশ ছুঁয়েছে, ভালো ভাবে লক্ষ করলে শেকড়ে-লেগে-থাকা মাটির সংকেতও পাওয়া যায়। নইলে হ্যামলেটের বাচনে কখনও 'To grunt and sweat under a weary life'-এর মতো অভিব্যক্তি থাকত না। অবশ্য কেউ হয়তো বলতেও পারেন, ঘাম-ঝরানো ক্লান্ত জীবনের দুর্বহ বোঝা-র খবর ডেনমার্কের রাজপুত্রের তো জানার কথা নয়। 'Calamity of so long life'-এর বার্তাও জানাতে পারে শুধু প্রান্তিকায়িত নিম্নবর্গীয় জনেরা। তেমনই ওরা জানে কাকে বলে 'the oppressor's wrong, the law's delay, the insolence of office'। রাজপুত্র স্পষ্টত আধিপত্যবাদী বর্গের প্রতিনিধি, প্রতাপের কৃৎকৌশলে দক্ষ ; তার যথাপ্রাপ্ত অবস্থানে বিবেকের প্রাসঙ্গিকতা নেই কোনো। তাহলে বিবেক-প্রসূত ভীরুতা কাদের উদ্যম থেকে শুষে নেবে একান্ত আপন রঙের সুষমা? প্রান্তিক মানুষদের ভয়ের উৎস অন্তহীন কিন্তু রাজপুত্রের তো তা নয়। সহস্র-এক স্বাভাবিক যন্ত্রণাকে তবু সে রক্তমাংসের শরীরের উত্তরাধিকার বলে মান্যতা দেয় কেন? তার অধিবিদ্যাগত সংকট ও আতঙ্ক শেষ পর্যন্ত জীবনের সীমানা পেরিয়ে যায় : 'The dread of something after death/The undiscovered country, from whose bourn/No traveller returns, puzzles the will'। কিয়ের্কেগার্দ-কথিত আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠার কথা মনে আসে তখন।

কিন্তু এতে সমস্যা আরও জট পাকিয়ে যায়। মৃত্যু কি তবে জীবনকে বোঝার দ্বিবাচনিক দর্পণ নয়! এই দার্শনিক প্রশ্ন যুগপৎ আস্তিত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক নিশ্চয়। কিন্তু তার চেয়েও জরুরি জিজ্ঞাসা হলো, পিতৃঘাতক কাকার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার মতো ঘোর বাস্তবের মুখোমুখি হওয়ার বদলে অধিবিদ্যার পরিসরে আশ্রয় খোঁজে কেন হ্যামলেট? তবে কি সে বাবার প্রেতাত্মাকে ভুলে গেছে অথবা সেই অতিলৌকিক সাক্ষাৎকারে কোনো আস্থা রাখতে পারছে না! অন্তত এটা ঠিক, দ্বিধা-যন্ত্রণা-সংশয়ের ঊর্মিমুখর সাগরের মুখোমুখি রাজপুত্র বারবার পুনঃপাঠ করছে নিজেকে অর্থাৎ তার অস্তিত্বের ভুবন ও যাবতীয় সম্পৃক্ত পরিসরকে। সমস্ত সম্পর্কের বিন্যাস ও সত্তার অন্বিষ্ট নিয়ে তলিয়ে ভাবছে সে। ফলে কখন ভাবনার অতিরেক তৈরি হয়ে গেছে, নিজে তা টের পাচ্ছে না ; প্রকৃত উদ্যম ও উদ্যমের আকাঙ্ক্ষা একাকার হয়ে যাচ্ছে তার কাছে। আকাঙ্ক্ষার যে আছে নিজস্ব আয়ুষ্কাল, আছে অদ্ভুত কিছু অন্ধবিন্দু এবং প্রতীত ও প্রকৃত সক্রিয়তার জল-বিভাজন রেখা : সেইসব ঝাপসা যেন। তাই সাগরের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে সে বিশ্বাস করতে থাকে, ঢেউয়ের প্রতীতিই তাকে ঢেউয়ের মাঝখানে নিয়ে গেছে। যুদ্ধসাজ নিয়ে বা না-নিয়ে যুদ্ধের কথা ভাবতে পারলেই যুদ্ধ হয়ে গেল। 'And by opposing, end them' কথাটার দ্যোতনা এই যে, যন্ত্রণার দহনবেলার বিরোধিতা করতে পারা মানে বহুবিধ কষ্টের প্রতীত অবসান। বারবার যা ফিরে আসে, তা হলো প্রতীতির সর্বগ্রাসী উপস্থিতি অর্থাৎ অনিবার্যভাবে যথাপ্রাপ্ত বাস্তবের বিলীয়মানতা।

কিন্তু পরস্পর-বিরোধী অনুভূতি ও সীমায়িত চেতনার প্রেক্ষিতে জীবনের বাস্তবকে নেতিবাচক ধারণা দিয়ে নিরাকৃতও করা যায় না। জটিলতার গ্রন্থি খোলা যায় না বলে তাদের এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা তৈরি হয় অথচ আকাঙ্ক্ষা বাদ সাধে। এ ধরনের উচ্ছৃঙ্খল মানসিক অবস্থাতেই হয়তো নিজেকে নিজেরই বোঝাতে ইচ্ছে করে 'tis a consummation/Devoutly to be wished'! কিন্তু হ্যামলেট তো জ্ঞানদগ্ধ ফাউস্ট নয় যে ভাববে 'Consummatum est'। এই উচ্চারণে এমন কী 'the rest is silence' দিয়েও পৌঁছানো যায় না। দুইয়ের মাত্রা আলাদা, তাই তাৎপর্যও আলাদা। তামাম শোধ-এর ভাবনা হ্যামলেটের পক্ষে বেমানান, হওয়া আর না-হওয়া এবং করা আর না-করার মধ্যে বেপথুমান থেকেও হ্যামলেটকে বেঁচে থাকার সংজ্ঞা নির্ণয় করতে হয়। ভেবে নিতে হয় যে বেঁচে থাকা মানে 'bear the whips and scorns of time'। নিজেরই ভেতরে যার অজস্র পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ অহরহ সক্রিয়, তার মধ্যে সম্বোধক ও সম্বোধিতের চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে সম্বোধ্যমানতার অনুভব। ফলে বাস্তব ক্রিয়ায় সে লিপ্ত হতে পারে না, প্রতীত সক্রিয়তায় নিমজ্জিত হয় তার সত্তা। চিন্তা-বিবেক-সংবিদের আতিশয্য আচ্ছন্ন করে দেয় সব কিছুকে। আত্মসৃষ্ট জালে ক্রমাগত যে জড়িয়ে যায় হ্যামলেট, এর মানে কি বিভ্রমের কাছে মানবসত্তার পরাভব? এই উপলব্ধির সংকেত কিন্তু আগেও ছিল। 'The Merchant of Venice'-এর মতো কমেডিতেও পাই এমন দার্শনিক মনন-ঋদ্ধ উচ্চারণ : 'the seeming truth which

cunning times put on/to entrap the wisest' (iii, ii. 100-101)। সত্যের প্রতীয়মান অবয়ব হলো ক্রূর সময়ের ফাঁদ যা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীকেও বন্দি করে ফেলে : এই উপলব্ধি যদি আগেই হয়ে থাকে শেক্সপীয়ারের, হ্যামলেট লেখার পর্বে এতে ট্র্যাজিক গাঢ়তা ও সংরাগ কতটা যুক্ত হলো?

দুই

এই যে প্রতীয়মানতার প্রসঙ্গ, তার শেকড় বহুদূর অবধি ছড়ানো। এখানে সেই আলোচনার অবকাশ নেই। পর্বে-পর্বে শেক্সপীয়ারের লিখনবিশ্বে তার অভিব্যক্তিও রূপান্তরিত হয়েছে। সত্যভ্রমের বিচ্ছুরণ প্রতারক ও প্রতারিত : দু'পক্ষকেই প্রভাবিত করে। আত্মপ্রতারণার ক্ষেত্রে স্বভাবত এই বিচ্ছুরণের ভিন্ন মাত্রা দেখা যায়। যে-ছদ্মবেশ দক্ষ ও ধূর্ত এবং যা অনিচ্ছাকৃত অথচ দুর্মোচনীয়—তাদের একই নিরিখে দেখা যাবে কি? অর্থাৎ হ্যামলেটের অতি সূক্ষ্ম ও জটিল প্রতীয়মান উন্মত্ততা এবং ইয়াগো ও ক্রেসিডার প্রতারণাকে অভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করা যায় কি? অবভাস থেকে তত্ত্ববস্তুকে আলাদা করতে গিয়ে চিন্তার সাধারণ মানদণ্ডকে বিশেষ ধরনের আত্মপ্রতারণা সম্পর্কে প্রয়োগ করা কঠিন। অন্তত হ্যামলেটের মতো সূক্ষ্মদর্শী কখনও যথাপ্রাপ্ত আর প্রতিপন্ন জগৎ সম্পর্কে নিশ্চিত অবস্থানে পৌছাতে পারে না। সম্ভবত পৌছাতে চায় না বলেই পারে না। জীবন ও জগতের সঙ্গে যে-দ্বিরালাপ কাম্য, সত্যভ্রম বারবার তাতে হস্তক্ষেপ করে। এই পরিস্থিতিকে মান্যতা দিতে না-পারার জন্যেই অনন্বয়ের বোধ, ট্র্যাজিক চেতনার সূত্রপাত। দ্বিবাচনিকতা নেই বলেই প্রতীয়মানের সন্ত্রাস, মুক্তির বদলে রুদ্ধতা, উদ্যানে আগাছার বিস্তার। শেক্সপীয়ারের চিহ্নায়িত বাচন অনুসরণ করে বুঝতে পারি, ডেনমার্কের উদ্যানে আগাছা ছিল না; বহুমুখী গুল্মমূল ছড়িয়ে দিয়ে আগাছা যখন দেখা দিল, হ্যামলেটের মনে ও ডেনমার্কের রাষ্ট্রীয় পরিসরে পক্ষাঘাতের লক্ষণ একসঙ্গে প্রকট হতে শুরু করল। এই যুগলবন্দির তাৎপর্যও অনেকখানি।

আগাছা মানে বন্ধ্যাত্ব, কুসুমের ঋতু শেষ হয়ে যাওয়া। ব্যক্তি-জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে হঠাৎ যখন তাৎপর্য ঝরে যেতে শুরু করে, বাস্তব ও রূপক অর্থে পক্ষাঘাতসূচক নৈরাশ্যের সূচনা হয়। এই আগাছার অন্য নাম অমঙ্গল ও সত্যভ্রম : এদের সংক্রমণে দেখা দেয় অনিবার্য আত্মবিশ্বাস—'evil breeding evil, and leading to ruin'। ফলে আগাছার আক্রমণে একে-একে হ্যামলেটের অণুবিশ্বে ফুটে-ওঠা ফুলগুলি ঢলে পড়তে থাকে। ওফেলিয়া তো নিশ্চয় এর নিদর্শন ; তার আগে হ্যামলেট লক্ষ করে মায়ের মধ্যে মাতৃত্বের অবসান। প্রেতের আবির্ভাব সর্বব্যাপ্ত অমঙ্গলের ছায়া সম্পর্কে তাকে সচেতন করে তোলে : 'Something is rotten in the state of Denmark!' আসলে ডেনমার্ক কেবল রাষ্ট্রপরিসরের নাম নয়, সমগ্র অণুবিশ্বের চিহ্নায়কও। হ্যামলেট আগাছার অস্তিত্ব টের পায় কিন্তু এদের উপড়ে ফেলার উপায় তার জানা নেই। এই অসহায়তার ক্ষোভ ক্রমশ তার মনকে বিকল করে দেয় ; অথচ অবশতার প্রতিষেধক খোঁজার বদলে অনুভব করে, ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে

অমঙ্গলের পরিধি। উৎকণ্ঠা ও অবসাদের যুগ্ম-উপস্থিতিতে অমঙ্গলের অস্তিত্ব নিরাকৃত করার উদ্যম হারিয়ে যেতে থাকে ; তার প্রতিশোধ নেওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে সে যেন নিজেই আতস-কাঁচের নিচে ফেলে পরখ করতে থাকে। বাস্তব কৃত্যের পরিকল্পিত ব্যবস্থা করার মতো উত্তেজনা তাকে জাগিয়ে রাখতে পারে না ; অবসাদের কুহেলিতে আচ্ছন্ন হয়ে যায় তার আস্তিত্বিক বোধ ও সম্পর্কের মানবিক ভুবন। বাবার হত্যায় ও মায়ের অস্বস্তিকর পুনর্বিবাহে যে বিপুল মর্যাদাহানি ঘটেছে, তা পুনরুদ্ধার করার বদলে হ্যামলেট ক্রমশ তলিয়ে যায় বিশেষ ধরনের আত্মহননে, নিরালোকে। যেহেতু মর্যাদার আকল্প তার কাছে কোনো বিচ্ছিন্ন এককের প্রতিভাস নয়, বরং অস্তিত্বের নানা মাত্রা জড়িয়ে রয়েছে তাতে—এই সর্বগ্রহিষ্ণু প্রবণতা তাকে কোথাও স্থিতিশীল হতে দেয় না। শেষ পর্যন্ত সে নিজেই পৌঁছে যায় মৃত্যুর অনাবিষ্কৃত সেই পরিসরে—'from whose bourn/No traveller returns!' প্রত্যাবর্তনহীন সেই নৈঃশব্দ্যকে অধিকার করে আগাছার গুল্মজাল, অমঙ্গলের ধ্বংসাত্মক শক্তি। হ্যামলেট তাকে প্রতিহত করতে পারে না।

তাহলে, শেক্সপীয়ার কি দ্বিবাচনিকতার পরাভব দেখাতে চেয়েছেন? সংক্রামক ব্যাধির মতো অমঙ্গলের দুর্নিবার বিস্তার হ্যামলেটকে সাবলীলভাবে সর্বনাশের দিকে টেনে নিয়ে যায়। যেন স্বাধীন অস্তিত্ব বলে কোথাও নেই কিছু। বিনাশের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে ক্রমাগত নেমে যায় সে ; মনে হয়, অস্তিত্ব এক গোলকধাঁধা আর ধ্বংস এক সচলতা। একবার বিনাশের ক্রমপাঠ শুরু হলে তা ভালো ও মন্দকে সমান নিরপেক্ষতায় আবৃত করে। বিশেষ পরিসর বলে যেন নেই কিছু, সমস্তই নির্বিশেষ অপ্রতিরোধ্য নিয়তির কাছে। তবে কি গ্রিক বিশ্ববীক্ষা অনুযায়ী দৈবশক্তিকে শেক্সপীয়ারও মান্যতা দিয়েছেন? এরকম প্রশ্নের পরে প্রশ্ন প্রতিটি পাঠে উঠে আসে বয়ান থেকে। এমন নয় যে শুধুমাত্র হ্যামলেটের স্বগতকথনই সমস্ত জিজ্ঞাসার উৎস, যদিও পাঠকৃতিতে এদের বিশেষ গুরুত্ব মনে না রাখলে চলে না। নিজের গভীরে অসাড়তার বলয়কে যে প্রসারিত হতে দেখে হ্যামলেট, তা তো নিছক পর্যবেক্ষক সূত্রধারের চোখে নয়। এই প্রপঞ্চের ঘটমানতায় জড়িয়ে গেছে বলেই তো সত্তা রক্তাক্ত হচ্ছে তার। চূড়ান্ত বিবমিষা জাগছে জগৎ-প্রক্রিয়ার দিকে তাকিয়ে যেহেতু এর সঙ্গে মিশে গেছে মাতৃপ্রতিমার শোচনীয় স্খলন : 'O, most wicked speed to post/With such dexterity to incestuous sheets'। গ্রিকদের যৌন-নৈতিকতা থেকে এলিজাবেথীয় যুগ বহু দূরবর্তী। সমর্থন বা বিরোধিতার কথা নয়, অগম্যগমন সম্পর্কে চরম বিতৃষ্ণা সমাজমনে দৃঢ়প্রোথিত হয়ে গেছে। সৃষ্টিশীল কল্পনাতেও অয়দিপাউসের প্রত্নকথাকে ব্যবহার করা চলে না আর। এমন কি, আদিকল্পের ইশারাকেও প্রত্যাখ্যান করার তাগিদে মায়ের প্রতি অন্য কারও যৌন আকাঙ্ক্ষাকে বরদাস্ত করা যায় না—এই বার্তা উঠে আসছে স্পষ্টভাবে। পরিব্যাপ্ত অমঙ্গল ও বিদূষণের বড়ো প্রমাণ ঐ wicked speed। তাই হ্যামলেট নিজের অতি-সংলগ্ন পরিসরে 'rebellion hell'-কে লক্ষ করে অভিশাপ দেয় যৌন বাসনার উত্তাপকে : 'To flamming youth let virtue be as wax/And

melt in her own fire.'

ধুলো-মাটির বাস্তবে রক্তমাংসের নারী নিশ্চয় শরীরী তৃষ্ণা নিয়ে থাকে। কিন্তু সে তো শৃঙ্গারপিপাসু রমণী, কারও মা নয় কখনও। বিদূষণের নরককুণ্ডে দাঁড়িয়ে যে-মানুষটি শুদ্ধতা ও পূর্ণতা খোঁজে, সেই হ্যামলেটের মা তো কারও সম্ভোগ-বাসনা পরিতৃপ্তির ইচ্ছুক শরিক হতে পারে না। একদিকে আদর্শায়িত ভুবন, অন্যদিকে ভাবাদর্শরিক্ত ধৃষ্টচতুর জগৎ : এই দুইয়ের মধ্যে প্রলম্বিত হ্যামলেট কী করতে পারে? তার জ্ঞানদীপ্ত কবিমন পাশবিকতা থেকে মানবসত্তার উত্তরণ খোঁজে 'discourse of reason'-এ। অথচ তার নিজের মায়ের মধ্যে নেই যৌক্তিক সন্দর্ভের উপস্থিতি। অতএব আত্মগ্লানিতে, জগৎ-প্রপঞ্চের প্রতি ধিক্কারে শতধা-বিদীর্ণ হয়ে গেছে তার মন : 'O ! that this too too Solid flesh would melt./Thaw and resolve itself into a dew. ...?' কিন্তু চাইলেই কি আর শান্ত শিশিরের কণায়-কণায় মিলিয়ে যেতে পারে শরীরী উত্তাপ! অধোগতি হয়েছে যে-নারীর, তারই রক্তকণিকায় হ্যামলেটের জন্ম : অতএব বিদূষণ অনিবার্য : এই বিদূষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মানে অনেকটা পরিমাণে নিজেরও বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। অর্থাৎ উত্তরাধিকার সূত্রে যথাপ্রাপ্ত হিসেবে অর্জিত নিজস্ব অন্ধবিন্দুর জন্যে গ্লানিবোধ ও তিক্ত ধিক্কারের উচ্চারণ। ওফেলিয়ার সঙ্গে বিখ্যাত সেই সংলাপ ('Get thee to a nunnerry')-এর প্রেক্ষিত ঐ বিদূষণ-বোধে সম্পৃক্ত। শরীরী অস্তিত্ব যখন শারীরিক তৃষ্ণার মোহে আচ্ছন্ন হতে বাধ্য, প্রেম কীভাবে সৌন্দর্য ও সততায় সম্পৃক্ত থাকবে? নিবন্ধের সূচনায় যে-প্রবঞ্চনার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে, তারই প্রচ্ছায়ায় সম্পর্কগত বিদূষণের আরেকটি বিন্যাস তৈরি হবে। লুকিয়ে-থাকা পোলোনিয়াসের উপস্থিতি টের পেয়েছিল হ্যামলেট ; অতএব ওফেলিয়ার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সে দেখতে পেয়েছে বাজিকরের সুতোয় গাঁথা পুতুলকে। মা তার বাবাকে প্রতারণা করে দাম্পত্যের সৌন্দর্য ও আন্তরিকতাকে হত্যা করেছে ; তেমনই ওফেলিয়াও অসম্মান করেছে হ্যামলেটের প্রেমকে : তাহলে, সম্পর্ক কেবলই প্রতীয়মানের বিন্যাস আর প্রবঞ্চনার শিল্প!

এই বোধ থেকে খানিকটা হেঁয়ালির ধরনে কথা বলে হ্যামলেট। যখন সংযোগই বিধ্বস্ত, সংযোজক ভাষা তো সাধারণ মাপে ও ধরনে ব্যবহৃত হতে পারে না। ওফেলিয়ার মধ্যেও যে প্রতারক নারীর আদল দেখতে পায় হ্যামলেট, তাতে মায়ের প্রতি অনুভূত বিতৃষ্ণা ফিরে আসে আবার : '....the pc wer of beauty will sooner transform honesty from what it is to a bawd'! আর, সেই সূত্রে আসে পুঞ্জীভূত আত্মগ্লানি, নির্বেদ ও ঘৃণার উদ্‌গীরন : পারস্পরিক প্রবঞ্চনাময় জীবনে অভ্যস্ত হওয়া মানে অবভাসের পুষ্টি। প্রেম ও বিবাহের মধ্যে লুকিয়ে থাকে মৃত্যুফাঁদ। প্রতীয়মানের এই প্রপঞ্চ ছেড়ে সন্ন্যাসিনীদের সঙ্ঘে আশ্রিত হওয়া অনেক ভালো। নৈতিকতার বালাই নেই যেখানে, পাপের পরিধি ক্রমাগত বেড়ে যায়। প্রজন্মের পরে প্রজন্ম ধরে অক্ষুণ্ণ থাকে পাপের পরম্পরা। ওফেলিয়ার বিয়ে হলে সেও পাপীদের জননী হবে। তীব্র আত্মধিক্কারে হ্যামলেট জানায়, তার মা যদি তাকে জন্ম না দিত, সে-ই

ছিল ভালো, কেননা তাহলে প্রতীয়মান সংসারের বিদূষণ উত্তরাধিকার হিসেবে তাকে বইতে হত না। এই অংশে তার বাচনের অন্তিম অংশ খুব লক্ষণীয় : 'We are arrant knaves all, believe none of us. Go thy ways to a nunnery.' এই উচ্চারণের বহুবাচনিক উত্তম পুরুষ সর্বনামটি তাৎপর্যপূর্ণ। এ কোনও কথার কথা নয়, এ হলো সর্বজনীন যন্ত্রণার অভিব্যক্তি। আসলে এই বিন্দুতে আভাসিত হয়েছে জীবন থেকে নিষ্ক্রমণের বিন্দুটিও। প্রতীয়মানে অভ্যস্ত ও অজস্র মুখোশে আবৃত সভ্যতার কাছে হ্যামলেটের অভিব্যক্তি উন্মাদের পাঠকৃতি ; কিন্তু আসলে এই সবই বিপ্রতীপের দর্পণে বিদূষণক্লিষ্ট অপজীবনের সমালোচনা। এখান থেকে হয় জীবন পুনঃপ্রতিষ্ঠার যুদ্ধে এগিয়ে যেতে হবে অথবা দুর্নিবার আত্মহনন বা অবসানের দিকে স্খলিত হতে হবে।

মানুষ হয়ে ওঠাই মানব-অস্তিত্বের প্রধান ও চূড়ান্ত উপলব্ধি : এরকম কথা আমরা শুনেছি দার্শনিকদের কাছে। মানুষ কতটা স্বাধীন এবং নিজের উপলব্ধি-প্রসূত উদ্যমের ব্যবস্থাপনায় তার মৌলিক সৃষ্টিক্ষমতা ও স্বাধীনতা কতটা প্রকাশ পায় : এ সব নিয়ে চুলচেরা তর্কেরও অভাব নেই। মানুষ নিজেকে তার কর্ম থেকে আলাদা করে নিতে পারে এবং শুধু কর্ম নয়, সত্তাকেও চেতনার গভীর থেকে উঠে-আসা আলোয় রঞ্জিত করে : এই প্রতীতিও মানবিক পরিসরের চিহ্নায়ক। তাহলে, হ্যামলেট কি নিজেকে এই চিহ্নায়ন প্রকরণের বাইরে নিয়ে যেতে চেয়েছে? অথবা তির্যক পথে বিপ্রতীপের দর্পণে একবাচনিকতার প্রতিষেধক দ্বিবাচনিক চিহ্নবিশ্বকে বুঝে নিতে চেয়েছে! মানুষের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ হয় না কখনও, হ্যামলেটের যন্ত্রণা ঐ অসম্পূর্ণতার জন্যে। উদ্যমে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করে আস্তিত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিসরকে তবে কি অসমাপ্ত রেখে দিয়েছে হ্যামলেট? নাকি, তার জীবন-পাঠ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, অস্তিত্বের বোধ চূড়ান্ততাহীন! যেভাবে রচিত হোক না কেন পাঠকৃতি, স্তরে-স্তরে জেগে ওঠে শুধু প্রশ্নের পরে প্রশ্ন : প্রত্যুত্তরযোগ্যতা অর্জন করা যেমন বয়ানের সূত্রধারের দায় তেমনই বয়ানের পাঠকেরও। হ্যামলেট প্রত্যুত্তরযোগ্যতার জ্ঞান চেয়েছে, ক্রিয়া নয়, অথচ ক্রিয়াশূন্য জ্ঞান পরিণামে রিক্ত ও স্ববিরোধী হয়ে পড়ে। চিন্তাও অস্বচ্ছতা ও কূটাভাসে আক্রান্ত হয়। হ্যামলেটের তা-ই হয়েছিল। এতে প্রমাণিত হলো, জ্ঞান থেকে ক্রিয়াকে বিচ্ছিন্ন করা চলে না ; তাই জ্ঞান ও ক্রিয়া স্বতঃসিদ্ধ ভাবে দ্বিবাচনিক। আবার, সংলগ্ন বাস্তব জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে না। হ্যামলেটের প্রকৃত সমস্যা ও সংকট ঐখানে। তার কাছে বাস্তব মানে নিছক প্রতীয়মানের মিছিল ; এরা আসলে 'obstacles which impede man's full humanization.' (পাওলো ফ্রাইরে : ১৯৭০ : ৯১)।

তিন

জীবন যখন রক্তক্ষরণ করায় মুহুর্মুহু, আস্থার আধার খুঁজে পাওয়া যায় না কোথাও, হ্যামলেট বিচিত্র সব কূটাভাসের মুখোমুখি হয়ে আত্মিক পীড়ায় আক্রান্ত হয়। অপরতার প্রান্ত থেকে বলা যেতেই পারে, 'His madness is poor Hamlet's enemy' ; কিন্তু হ্যামলেট নিজে জানে, পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখের সময় এক অস্বাভাবিকতা

অন্য অস্বাভাবিকতার জন্ম দেয়—'As if increase of appetite had grown/By what it fed on....'। এমনই হয়, এমনই হয়ে থাকে অপ্রেমে, অবিশ্বাসে, অনুদ্যমে, যৌন অনাচারে, চক্রান্তের বিস্তারে। কী আর করতে পারে হ্যামলেট, ঐ প্রক্রিয়াকে যতটা সম্ভব দীর্ঘ-বিলম্বিত করে দেওয়া ছাড়া। এইজন্যে কেউ কেউ নাটকটিকে ভেবেছেন বিলম্বিত ক্রিয়ার বয়ান; কিন্তু এত সহজিয়া সমাধান-সূত্রকে মনে হয় বড়ো বেশি সরলীকৃত। এতে অন্তর্বয়নের যুগপৎ সমৃদ্ধি ও জটিলতা বোঝা যায় না। হ্যামলেট মানবিক নির্যাস-শূন্য জগতে প্রতিটি প্রতীয়মান সম্পর্কের মুখোশ ছিঁড়ে দেখতে চায়, কী আছে ভেতরে। কোন্ পরিস্থিতিতে নিমজ্জিত অস্তিত্বের শেকড়বাকড়, সত্তার আলো-অন্ধকার ; কোন্ উৎস থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে কোন্ অজ্ঞাত পরিসরে ফিরে যায় সব কিছু! বাস্তব মানে প্রত্যাহ্বানের পরম্পরা, এই জেনে কিছু-কিছু প্রত্যাহ্বান তৈরি করে নিতে হয় নিজেকেই। যৌনতার প্রতাপ কত অপ্রতিরোধ্য, এই উপলব্ধিতে রক্তাক্ত হ্যামলেটের মেধা ও হৃদয়। তবু মনন দিয়ে সে মোকাবিলা করতে পারে না। কাকা ক্লডিয়াসের সঙ্গে তার মায়ের শরীরী সম্পর্ককে ঘৃণায় বিবৃত করে বলে হ্যামলেটের বাচনও নেমে আসে প্রায় গালাগালির পর্যায়ে। প্রথম স্বগতকথনে সে যে 'Hyperion to a Satyr' এর তুলনা দিয়েছিল, বাচনের উচ্চাবচতায়ও ঠিক তা-ই ঘটে। 'Frailty, thy name is woman' এর মধ্যে বাচনিক উচ্চতা আছে, মায়ের প্রতি সরাসরি উচ্চারিত ধিক্কারে ঠিক তার বিপরীত স্তর দেখতে পাই যেন।

অথচ এ-কোনো কিশোরের উচ্চারণ নয়। শেক্সপীয়ার জানিয়েছেন, হ্যামলেটের বয়স তখন তিরিশ। ইতিমধ্যে প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের পাঠ নিয়েছে সে, জীবন সম্পর্কে উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা নিশ্চয় কম হয়নি। প্রৌঢ়া মায়ের যৌনতৃষ্ণা তখনও অতৃপ্ত, এই বোধ হ্যামলেটের সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতায় আঘাত করেছে। কিন্তু এহ বাহ্য। মানব-অস্তিত্বের সীমায়িত পরিস্থিতি (ফ্রাইরে-কথিত 'limit-situations' : ১৯৭০ : ৯২) থেকে নিষ্ক্রমণের ব্যর্থ আর্তি-ই কি তাকে বিচলিত ও সংক্ষুব্ধ করে তুলেছিল? মা যেহেতু তার শারীরিক অস্তিত্বের উৎস, মাতৃ-প্রতিমার বিদূষণ তাকেও অসুখের শরিক করে দিয়েছে। অতএব ঐ প্রতিমাকে ভেঙে দিয়ে সে প্রতীকী ভাবে নিজেকে অসুখ ও বিদূষণ থেকে মুক্ত করতে চায়। এইজন্যে মায়ের প্রতি হ্যামলেটের এই উক্তি বহুস্বরিক তাৎপর্যমণ্ডিত : 'You go not till I get you up a glass/Where you may see the inmost part of you'। এই আয়না নিছক তার মায়ের জন্যে নয়, নিজের জন্যেও প্রয়োজন। কী আছে ভেতরে—সত্তা ও অপরতার যাবতীয় প্রতীয়মানতার নির্মোক ভেদ করে দেখতে চায় হ্যামলেট। সত্তা ও শূন্যতার সীমানাকে সে রূপান্তরিত করতে চায় সত্তা ও উত্তরোত্তর জায়মান মানবিক পরিসরের সীমানায়। দৃশ্য ও অদৃশ্য প্রতাপের সমস্ত কৃৎকৌশল পরাভূত করতে পারি যখন ঐ রূপান্তরের জিজ্ঞাসা সম্পর্কে নিজেদের যোগ্য করে তুলি। হ্যামলেট জীবন ও জগৎকে যেহেতু অবভাসের বন্দিশালা বলে অনুভব করে, মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্নতার বোধ উদ্ভূত হয়। এতে সম্পৃক্ত হয়ে যায় নানা ধরনের পীড়া, বিকার ও বিদূষণের জটিল আকরণ।

দার্শনিক ফ্রাইরে বলেছেন 'To exist humanly...is to name the world, to change it.' (১৯৭০ : ৭৬)। বিদূষণ-ক্লিষ্ট ডেনমার্কে মানুষের মতো বেঁচে থাকার তাগিদেই নতুন এক জটিল অণুবিশ্বের নির্মিতি-প্রকল্প ভেবে নিতে পারত হ্যামলেটের মতো মননবিত্তে সম্পদশালী ব্যক্তি। তার ঈপ্সিত জগৎকে দিতে পারত নতুন অভিধা, দ্বিবাচনিকতার প্রকরণে বিন্যস্ত করে পরিবর্তনের উত্তরণে যুক্ত করতে পারত। দ্বিরালাপ যেহেতু আস্তিত্বিক প্রয়োজন, এর অভাবে হ্যামলেটের জগৎ চূর্ণ হয়ে গেল। ক্লডিয়াসের বিরুদ্ধে রণকৌশল নির্ণয়ে দ্বিধা ও গড়িমসি, সুনির্দিষ্ট প্রতিশোধ গ্রহণে অকৃতকার্যতা ইত্যাদি ট্র্যাজেডির বহিরঙ্গ কারণ মাত্র, এ কথা না-লিখলেও চলে। 'God-like reason' সম্পর্কে সচেতন হওয়া সত্ত্বেও কোন্ কূটাভাসের ছায়ায় নির্বেদ-তিক্ততা-আত্মঘৃণা- বিবিক্ততা তাকে গ্রাস করে : এর বহুধাব্যাপ্ত মীমাংসা-প্রয়াস সত্ত্বেও আস্তিত্বিক ট্র্যাজেডি আজও প্রহেলিকা হয়ে রয়েছে। প্রহেলিকা, কেননা হ্যামলেট অসচেতনভাবে আত্মসৃষ্ট আবর্তে বন্দী হয়নি। এর বহু প্রমাণের মধ্যে একটি পাচ্ছি নিম্নোধৃত বয়ানে :

> 'Of thinking too precisely on the event,—
> A thought which, quartered, hath but one part wisdom
> And ever three parts coward,—I do not know
> Why yet I live to say 'This thing's to do',
> Seth I have cause, and will, and strength, and means
> To do 't'

গভীর অনুভূতি যার আছে, শুধুমাত্র সেই মানুষই গভীর চিন্তাশক্তির অধিকারী। কিন্তু চিন্তা যখন উদ্যমের প্রতিদ্বন্দ্বী, সত্তা দ্বিধাবিভক্ত, এমন কী, অন্তরে-বাহিরে অনন্বয়-দীর্ণ হয়ে যেতে পারে। সেই অবস্থায় জ্ঞান ও ক্রিয়ার মধ্যে সঙ্গতি থাকে না। অসঙ্গতি ট্র্যাজেডির পথ প্রশস্ত করে ; অন্বিষ্টের আকাঙ্ক্ষা, অর্জনের শক্তি ও পথনির্দেশক জ্ঞান অবান্তর হয়ে দাঁড়ায়। এ আসলে বিশেষ ধরনের পক্ষাঘাতগ্রস্ত চেতনার বোধ যা হ্যামলেটের প্রতিটি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সঞ্চারিত হয়ে গেছে।

অর্থহীনতার ক্রমব্যাপ্ত বলয় ও সত্তাকে অসাড় করে-দেওয়া-বোধ নাট্য-পাঠকৃতির ভরকেন্দ্র। নাটকের শেষে রাজা-রানি-লেয়ারটেস ও স্বয়ং হ্যামলেট যে মৃত্যু-উপত্যকার অনিবার্য পথিক হয়ে পড়ে, তা বৈনাশিক কাল ও পরিসরের নাটকীয় অভিব্যক্তি। মূল চিহ্নায়ন প্রকরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত এইসব মৃত্যু কায়িক মৃত্যু নয় কেবল, সম্পর্কেরও শোচনীয় অবসান। পোলোনিয়াস ও ওফেলিয়ার আকস্মিক ও অপঘাত মৃত্যু যদিও একই গোত্রের নয়, প্রতীয়মান অবয়ব থেকে আরোপিত মুখোশ সরিয়ে দেওয়ার জন্যে এরা সংকেত হিসেবে কার্যকরী। হ্যামলেট ওফেলিয়াকে উপলক্ষ করে প্রকৃতপক্ষে সত্যভ্রমে আচ্ছন্ন সমগ্র জগতের বিরুদ্ধে অভিযোগের তর্জনি নির্দেশ করে বলে—'God has given you one face, and you make yourselves another !' এখানে হ্যামলেট খুব তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বহুবচন ব্যবহার করেছে (yourselves)। অর্থাৎ

নিশ্চিতভাবেই নিছক ওফেলিয়া তার লক্ষ্য নয়। সম্বোধক হিসেবে তার ভর্ৎসনাও সম্বোধিত সত্তাকে খোঁজে। কিন্তু সেই সত্তার অনুপস্থিতি দ্বিবাচনিকতাকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেয় না। ট্র্যাজেডির গভীরতম সংবেদনার উৎস এখানেই। তবু হ্যামলেটের আপাত-ব্যর্থ উদ্যমহীনতাও একেবারে লক্ষ্যহীন হয়নি। সম্বোধ্যমানতার প্রক্রিয়াই কেন্দ্রীয় গুরুত্বসম্পন্ন; শেক্সপীয়ার এই সত্যকে বহুস্বরিক ও অনেকার্থদ্যোতক নাট্য-পাঠকৃতির মধ্যে নিঃসন্দেহে শিরোপা দিয়েছেন। মনে পড়ে এই দার্শনিক সূক্তি : সমস্ত সত্যই সত্যভ্রম থেকে নিষ্ক্রমণের এবং ধূসর নিরালোক থেকে উদ্ভাসনে পৌঁছানোর বার্তা।

এর আগে হ্যামলেটের বাচনে যে লক্ষ করেছি—'I do not know/why yet I live to say 'this things to do'—এই বিমূঢ়তা এলিজাবেথীয় যুগে যে-সমস্ত বস্তুগত, নৈতিক ও অধিবিদ্যাগত পরিস্থিতির ফলে উদ্ভূত হয়ে থাকুক না কেন, আমাদের সাম্প্রতিক অনন্বয়ক্লিষ্ট জগতেও তা পুনরুচ্চারিত হতে পারে। জ্ঞান-কৃত্য-জীবনকে ঘিরে-রাখা রহস্যকুহেলি ভেদ করে মূল্যমান নির্ণয়ের প্রক্রিয়ায় বৈধতার উপলব্ধিতে পৌঁছানো খুব কঠিন। মৃত বাবার প্রেতাত্মা যে বিস্ফোরক সংবাদ দিয়ে যায় এবং মৃত্যুজনিত দেনা শোধ করার জন্যে আরও শোচনীয় মৃত্যু-পরম্পরার সূত্রপাত করতে হয় : এই গুরুতর ব্যাপারটিও কেন্দ্রীয় ভাববীজের তুলনায় গৌন। যৌন সম্পর্কের শুচিতা যারা অমান্য করেছে, হ্যামলেটের সেই মা ও কাকার শাস্তির ব্যবস্থা কীভাবে হবে : এই বিষয়টিও গৌন। আমরা জানি না কেন, বিপুল পাতকের অনিচ্ছুক পর্যবেক্ষক হয়েও, বেঁচে থাকতে হয় এবং বেঁচে থাকি বলেই কর্তব্য-অকর্তব্য সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয়। নানা বাচনে নানাভাবে ফিরে-ফিরে এসেছে মীমাংসাহীন প্রশ্নের বিচ্ছুরণ। শুধু স্বগত কথনেই নয়, সম্বোধিত নাট্যচরিত্রের সঙ্গে কথোপকথনেও, হ্যামলেট অবিরত নিজের মুখোমুখি হয়। নিজেকেই প্রশ্ন করে : জীবন কী, বেঁচে থাকা কাকে বলে, বাঁচাকে মর্যাদাময় করতে হলে কীভাবে সর্বব্যাপ্ত বিকার ও বিদূষণবোধের সঙ্গে লড়াই করে যেতে হয়? জ্ঞান যদি বিষাদ ও নিঃসঙ্গতা এনে দেয় শুধু, উদ্যম সম্পর্কে সংশয়ী করে তোলে—নিরর্থকতা ও অসাড়তার বোধ থেকে পরিত্রাণ কি নেই তবে? সত্তাতাত্ত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসায় যে-মানুষ বিধুর, তাকে প্রেত-অস্তিত্ব কখনও স্বচ্ছ দিবালোকে চলার মতো উদ্যমের পথ নির্দেশ করতে পারে কি? আমরা যেভাবে বাঁচি, আমাদের জ্ঞান ও কৃত্য তো সেই প্রক্রিয়ার উদ্ভাসন ও অন্ধবিন্দুর দ্বিরালাপে গ্রথিত হবেই। বাঁচার অর্থ খুঁজতে খুঁজতে, ঐ গ্রন্থনার অভাবেই কি, হ্যামলেটের বাঁচার মেয়াদ ফুরিয়ে গেল?

চার

মানুষের সম্ভাবনার যে শেষ নেই, ট্র্যাজেডির ভারাক্রান্ত আবহেও একথা লিখতে ক্লান্ত হননি শেক্সপীয়ার। হ্যামলেট নাটকে স্মরণীয় পঙ্‌ক্তির অভাব নেই যদিও, তাদের মধ্যেও মানুষের এই বন্দনা চমৎকার :

'What a piece of work is man ! how noble in reason !
how infinite in faculty! in form and moving how express
and admirable ! in action how
Like an angel ! in apprehension how like a god !'

মানুষের চেয়ে বড়ো শিল্পকর্ম আর কী আছে : এই উপলব্ধির সূক্ষ্মতা ও সৌন্দর্য তুলনাহীন। কিন্তু হ্যামলেট শুধুমাত্র এই আদর্শায়িত ভাবনার দৃষ্টান্ত নয় যে, তা রোজেনক্রানৎস্ ও গিল্ডেনস্টার্নের প্রসঙ্গে স্পষ্ট। সম্মান যখন বিপন্ন, মান্যতা কি পেয়ে যায় 'to find quarrel in a straw' ! কিন্তু এই বিষয়টি এখানে বিশদ করছি না। এই সবই প্রমাণ করছে যে প্রধান চলার পথ থেকে ক্রমাগত বিচ্যুত হয়ে হ্যামলেট সরে যায় শাখা-পথে অথবা বিপথে। রাজা ক্লডিয়াসের প্রতারক জগতের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয় নাট্য-প্রপঞ্চের মধ্যে সমান্তরাল প্রপঞ্চ তৈরি করে। অর্থাৎ ঘাতকের ছদ্মবেশ খুলে ফেলার জন্যে নিজেকে ছদ্মবেশ পরে নিতে হয়। যেহেতু হ্যামলেটের জগৎ স্বভাবধর্মে মধ্যযুগীয় ক্যাথলিক জগৎ, পাপ-পুণ্য প্রতাপ-লালসা উৎসারিত হয় মঙ্গল-অমঙ্গলের দ্বৈততা থেকে। ক্লডিয়াসের মধ্যে রাজকীয় প্রতাপ ও যৌন লালসা যেমন একাকার হয়ে গেছে, তেমন-ই বিপ্রতীপ অবস্থানে হ্যামলেটের সত্তায় অন্য ধরনের দ্বৈততা জটিল প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। প্রতীয়মানের প্রবঞ্চনা ও বিদূষণের বিকার জনিত অধিবিদ্যাগত সংকট সম্পর্কে বেশি মনোযোগী হওয়ার ফলে তার স্বভাবের ভারসাম্য বিচলিত হয়ে গেছে। এক ধরনের নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য, মাত্রাতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া, নিষ্ক্রিয়তার তাত্ত্বিক সমর্থন সন্ধান : এই সবই আস্তিত্বিক ট্র্যাজেডি অর্থাৎ বিনাশের দহনবেলার প্রতি ইঙ্গিত করে। 'I must be cruel only to be kind' যেন আত্মপক্ষ সমর্থনের মতো শোনায় ; আসলে এ তার আত্মপ্রতারণা যার আরও একটি বিচিত্র অভিব্যক্তি লক্ষ করি তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে। সেখানে প্রার্থনারত ক্লডিয়াসকে হত্যা না-করার পক্ষে যুক্তি ক্যাথলিক ভাববিশ্বের মধ্যে খুঁজে নেয় হ্যামলেট :

'that his heels may kick at Heaven,
And that his soul may be as damn'd and black ?
As Hell, where to it goes.'

কিন্তু তাতে মানুষের প্রাগুক্ত শিল্পসুষমা কি আচ্ছন্ন হয়ে যায় না? এই আচ্ছন্নতা আপাত, কেননা মানুষের অস্তায়মান সত্তার একবাচনিক উপস্থাপনা কাম্য নয় শেক্সপীয়ারের; তিনি লক্ষ করেন অস্তাচলগামী সূর্যের বিষণ্ণ মহিমা। নাটকের শুরুতে যে উত্তুঙ্গ বেদনাবোধে বাঁধা হয়েছিল বয়ানের সুর—'How weary, stale, flat and unprofitable./Seem to me all the uses of this world'—তারই বিচ্ছুরণ বজায় থেকেছে আগাগোড়া। শেষ পর্যন্ত যখন সমে পৌঁছেছে পাঠকৃতি, নৈঃশব্দ্য নেমে এসেছে চরাচরে। সম্বোধিত জগতের প্রতিনিধি হয়ে হোরেশিও বিদায় জানিয়েছে মহিমান্বিত মানুষকেই, বিচূর্ণিত টুকরো মানুষকে নয় :

'Now cracks a noble heart, Good
night, sweet prince :
And flights of angels sing thee to thy rest'!

নৈঃশব্দ্যময় এই চিরবিশ্রামের জন্যে কী ধরনের প্রস্তুতি নিতে পারে পতনশীল মানুষ? পতনের চিহ্নায়িত বাচন ব্যবহার করেছিল স্বয়ং হ্যামলেট এবং কথাটা বলেছিল হোরেশিও-কেই :

'There's a special providence in the fall of a sparrow. If it be now, 'tis not to come—if it be not to come, it will be now—if it be not now, yet it will come—the readiness is all'। এই যে বলা হলো বাচনের অন্তিম অংশে, প্রস্তুতিই সব, এর সঙ্গে কিং লীয়ারের একটি প্রবাদ-প্রতিম কথার কী আশ্চর্য সাদৃশ্য : 'Ripeness is all'। অর্থাৎ প্রস্তুতিই পরিণতি : এই দ্যোতনা স্পষ্ট। প্রশ্ন এই, হ্যামলেটের আপাত-দ্বিধা ও নিষ্ক্রিয়তা কি ছদ্মবেশ, সত্তার পরিণতি আড়াল করার জন্যে? তাহলে, পথ হারিয়ে পথ ফিরে পাওয়ার কেন্দ্রীয় রূপক প্রচ্ছন্ন রয়েছে কি প্রাগুক্ত ঐ 'readiness'-এর মধ্যে! কিন্তু বাস্তব নামক গোলকধাঁধা হ্যামলেটের আত্মিক সংকট বাড়িয়ে দেয় শুধু ; তার স্বভাব থেকে মানবিক মাধুর্য ও উত্তাপ ক্রমশ ঝরে যেতে থাকে। জি. উইলসন নাইট যেসব 'obvious symptoms of spiritual atrophy' (১৯৬৪ : ২৪) এর কথা উল্লেখ করেছেন, তাদের প্রভাবে ঈপ্সিত প্রস্তুতির প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হয় বারবার।

হ্যামলেটের মনে যে নিরবচ্ছিন্ন আত্মহননের প্রক্রিয়া শেষ পর্যন্ত সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে, তা তাকে নেতিবাচক চেতনার অন্ধপথে চালিত করে। ক্রিয়া থাকে না, ক্রিয়ার ভান থাকে কেবল ; জ্ঞান থাকে না, জ্ঞানের বিচূর্ণায়ন থাকে। বিদূষণের হেতুকে যদি আঘাত করতে পারত, হ্যামলেটের আত্মপীড়ার সঙ্গে ডেনমার্কের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিসরের বিকার থেকেও আরোগ্য হত। কিন্তু নেতি-চৈতন্য হ্যামলেটকে আরোগ্য ও পুনঃসৃষ্টির পথে যেতে দেয় না। অর্থাৎ মৃত্যু ও ক্ষয় থেকে জীবনে প্রত্যাবর্তন করতে পারে না সে। শেক্সপীয়ারের চিহ্নায়ন প্রকরণকে বিশদ করে এই পাঠ আমরা, সাম্প্রতিক বিকার ও নির্মাণবায়নে ক্লিষ্ট প্রতীত বাস্তবের পরিধিতে, নিতে পারি : অসুখ, তিক্ত নৈরাশ্য ও মৃত্যু-এষণা দিয়ে ব্যক্তি ও সমাজের বহুমাত্রিক পীড়ার উপশম করা যায় না। আরোগ্যে পৌঁছাতে হলে জীবনের পাণ্ডুলিপিতে আস্থা রাখতে হয়। এলিজাবেথীয় যুগেও তো পুনর্নির্মিত-ই হয়েছিল হ্যামলেটের আখ্যান। স্যাক্সো গ্রামাটিকাসের (১১৮০-১২০৮) এবং 'হিস্টরিয়া ডেনিকা'য় হ্যামলেটের প্রতিশোধমূলক উপাখ্যান আদিম যুগের রক্তপিপাসা থেকে উদ্ভূত হলেও শেক্সপীয়ার তার গদ্যরূপ (Hystorie of Hamlet) ও প্রত্ন-নাট্যরূপ থেকে ভিন্ন ধরনের সংকেত নিশ্চয় পেয়েছিলেন। আর, তাঁর নিজস্ব কালের মূল্যবোধ ও আপন সৃষ্টিশীল সূক্ষ্ম কল্পনা অনুযায়ী পুনর্বিন্যস্তও করে নিয়েছিলেন। প্রতিবার পুনঃপাঠে তাৎপর্য রূপান্তরিত হয়ে যায়। অতএব এখনকার পাঠকেরাও শেক্সপীয়ারের হ্যামলেট থেকে নতুন ধরনের চিহ্নতাত্ত্বিক বিন্যাস খুঁজে

নিচ্ছেন। এর নির্যাস নিয়ে বিতর্ক হোক ; বিতর্ক থেকেই বুঝে নেব, চার শতাব্দী আগের পাঠকৃতি থেকে কীভাবে জীবনের পাণ্ডুলিপিল বারবার আবিষ্কার করে নেওয়া যায়।

হ্যামলেট জীবনকে বন্দিশালা ভেবে নিজেই নিজের রুদ্ধতার হেতু হয়েছিল। তার চেতনা পক্ষাঘাতগ্রস্ত ; তাই অসাড়তা, মৃত্যু-ক্ষয়-বিকারের নিষ্করুণ অনুশোচনায় জীবন্মৃত হয়ে বেঁচেছিল বলে মুক্তি সে পায়নি। ‘thoughts beyond the reaches of our souls’ তাকে পীড়িত করেছিল বলে চিন্তা-পীড়া থেকে আরোগ্য এল না। এ সময় আমরাও চারদিকে দেখতে পাই স্বয়ংবৃত রুদ্ধতার অচলায়তন ; নিজেরাই নিজেদের চেতনাকে অসাড় ও নিষ্ক্রিয় করে ফেলি। আমাদের যাবতীয় বয়ানের লক্ষ্য যদি হয় নির্মাণবায়নের আশঙ্কায় বিপন্ন মানুষের মানব-প্রকল্প পুনরুদ্ধার করা, হ্যামলেটের পতনকে দেখব উদ্‌ভাসনের বিপ্রতীপ উপস্থাপনা হিসেবে। অন্তিম বাচন থেকে আহৃত নিগূঢ় সংকেত অনুযায়ী মৃত্যুও উৎসবের (felicity) আকর যখন, বাখতিনের প্রসিদ্ধ তাৎপর্যতত্ত্ব-বিষয়ক আকল্প অনুযায়ী, মৃত্যুর দ্বিবাচনিক দর্পণে দহনক্লিষ্ট জীবনের নতুন পাঠ শুরু হবে। হোরেশিও-র মধ্য দিয়ে প্রতিটি উত্তর-প্রজন্মে নবায়িত হচ্ছে এই বার্তা : ‘Absent thee from felicity awhile,/And in this harsh world, draw thy breath in pain/To tell my story...’

হ্যাঁ, হ্যামলেটের কাহিনি প্রতিটি নতুন প্রজন্ম দেশে-দেশে তার যথাপ্রাপ্ত অবস্থান অনুযায়ী নতুন ভাষায় নতুন ভাষ্যে বলবে। বলবে, ‘because the word has power to disclose a world variously expressed as a new mode of being or new forms of life.’ (ম্যাক্‌করমিক : ১৯৮৮ : ১৯৪)।

ডন কিহোতে, সময়ের এপার থেকে

নিতান্ত ছেলেবেলায় কিশোরদের উপযোগী কোনো-এক অতি-সংক্ষেপিত সংস্করণে পড়েছিলাম যখন, মনে হয়েছিল আজব বই। আমাদের ভাষিক সংস্কৃতি থেকে বাইরে, রূপকথা ও অ্যাডভেঞ্চার থেকে আলাদা একটু অন্য ধরনের বই। স্যাঙ্কো পাঞ্জা নামটা মনে গেঁথে গিয়েছিল। তখন কিহোতে জানতাম না, বলতাম কুইকজোট। বইয়ের আবহ বিচিত্র ও অদ্ভুত, এটাই মনে ছাপ ফেলেছিল। বয়স্কবেলায় জেনেছি, লেখকের নাম মিগুয়েল দ্য সার্ভেন্তেস সাভেদ্রা। এঁর জন্ম হয়েছিল ১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ অক্টোবর আর মৃত্যু হয় ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দের ২২ এপ্রিল। ইংরেজি সাহিত্যে শেক্সপীয়ারের যে-স্থান, জার্মানে গ্যয়ঠের কিংবা ইতালীয়তে দান্তের—স্পেনীয় সাহিত্যে সার্ভেন্তেসের ভূমিকা একই। একটু তফাত অবশ্য আছে। শেক্সপীয়ার বললেই হ্যামলেট-এর কথা মনে আসে বটে ; কিন্তু হ্যামলেট শেক্সপীয়ারকে গৌন করে দেয়নি। তবে ডন কিহোতে নিঃসন্দেহে সার্ভেন্তেসকে ছায়াবৃত করে দিয়েছে। দান্তে-শেক্সপীয়ার-গ্যয়ঠের মতো র‍্যাবেলে-স্তাঁদাল-বালজাক-প্রুস্ত-টলস্টয়-রবীন্দ্রনাথের ধ্রুব উপস্থিতি উত্তরসূরিদের পক্ষে যেভাবে অনিবার্য, সার্ভেন্তেসের সৃষ্টি ডন কিহোতে তেমনই পরবর্তী শতাব্দিগুলিতে কথাকারদের প্রভাবিত করেছে। এক্ষেত্রে অন্তত সার্ভেন্তেস সম্পর্কে লিখতে পারি না, 'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ।' সৃষ্টি যে এভাবে স্রষ্টাকে পেছনে ঠেলে দিয়েছে, এর তাৎপর্য কী?

আমার মতো পাঠক যাঁরা মূল স্পেনীয় ভাষায় বইটি পড়তে পারেন নি, ইংরেজি ভাষায় পড়েছেন এবং সেইসঙ্গে বয়স্কবেলার কৌতূহল নিয়ে বিদগ্ধ সমালোচকদের ভাষ্যও পড়েছেন—তাঁর পাঠ কীরকম হবে! অর্থাৎ বয়ানের স্তরের পর স্তর পেরিয়ে যেতে-যেতে তাৎপর্য-সন্ধানী যাত্রা কোনো চূড়ান্ত-বিন্দুতে নিয়ে যাবে কি? ইতিমধ্যে তো আমরা জেনে গেছি, কাহিনি মূলত প্রয়োজনীয় অস্থি-সংস্থান—তা হোক আধুনিক বা আধুনিকোত্তর বা প্রাক্-আধুনিক পর্যায়ের রচনা—তাৎপর্য থাকে কাহিনির উদ্বৃত্ততে। মূল প্রতিবেদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ভাষ্য-সমাবেশকে মান্যতা দিয়েই কোনো পাঠক তাঁর নিজস্ব অবস্থান, মনশ্চর্যা ও সাংস্কৃতিক পরম্পরা অনুযায়ী নিষ্কর্ষ খুঁজে নেবেন। বিশেষত চার শতকেরও বেশি দূরত্ব থেকে যখন লুপ্ত সময়ের রম্যকথা পড়ি, শুধু কি বিস্ময়-ভরা প্রায়-অলৌকিক বা পুরো-অলৌকিক বৃত্তান্তের শাখা-প্রশাখা লক্ষ করে মুগ্ধ

হব? ডন কিহোতে ও সাঙ্কো পাঞ্জার বন্ধুত্ব ও কথোপকথনকে গ্রহণ করব নিছক বহিরঙ্গে! সার্ভেন্তেস কাহিনির মধ্যে দেদার মজা ও কল্প-কথার আয়োজন করেছেন; ফলে বিভিন্ন ধরনের পাঠকের রুচি ও চাহিদার যোগান দিতে পারে এই বই। দিয়ে যাচ্ছেও শতাব্দির পরে শতাব্দি ধরে। তবে মানুষের সব চাহিদা তো বইয়ের নয়, সত্তার গভীরেও জাগে কত নিগূঢ় তৃষ্ণা। কালে-কালান্তরে যে-বই বহু প্রজন্ম ধরে পাঠকদের আকর্ষণ করে চলেছে, তার কাছে দাবিরও বুঝি শেষ নেই। ফলে বাহির ও ভেতরের সংজ্ঞাতেও ঘটে গেছে কত পরিবর্তন, যাদের নিরিখে তাৎপর্য নির্ণয়ের পদ্ধতিও অনবরত বদলে গেছে।

ডন কিহোতে ও স্যাঙ্কো পাঞ্জার সঙ্গে আমরাও কি অভিযাত্রী হতে পারি না? নিশ্চয় পারি। তবে তাতে মধ্যযুগীয় পশ্চিম ইউরোপের পরিবেশ হয়তো আমাদের সাহচর্য দেবে না। এর পরিবর্তে আমাদের সাংস্কৃতিক ভূগোলের অনুপুঙ্খ দিয়ে তৈরি করে নিতে হবে নিজস্ব বিকল্প। পরিবেশের এই রূপান্তর মানে চেতনারও রূপান্তর ; অবস্থান ও বীক্ষণ পদ্ধতিরও পরিবর্তন। কল্পনা ও বাস্তবের নতুন দ্বিবাচনিকতায় আমরা যে-ধরনের প্রকল্পনায় আশ্রয় নিতে পারি, তাতে পনেরো শতক বা তার আগেকার রোমাঞ্চকর পৃথিবীকে হয়তো খুঁজে পাব না। কিন্তু সম্ভ্রম-বিভ্রম-আকাঙ্ক্ষা-শ্লেষগর্ভ জগৎ নির্মাণের জন্যেও আমাদের মূলত নিজস্ব যৌথ নিশ্চেতনার ওপর নির্ভর করতে হবে। অর্থাৎ ডন কিহোতে ও স্যাঙ্কো পাঞ্জার অভিযাত্রার নিষ্কর্ষ থেকেই পুনর্নির্মাণের যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ করে নিতে হবে আমাদের। কাহিনির সমস্ত অনুপুঙ্খ নিশ্চয়ই আমাদের সময়ে ও পরিসরে পুনর্বিন্যস্ত করে নেওয়া সম্ভব নয়। সম্ভবত তার প্রয়োজনও নেই। বরং টমাস মান বা ফ্রান্ৎস কাফকা যেভাবে ডন কিহোতের অভিযাত্রায় নিজস্ব ধরনে সঙ্গী হয়েছিলেন, আমরাও তা অনুসরণ করতে পারি এবং নিজেদের বহুমাত্রিক অবস্থান অনুযায়ী নিজস্ব কিছু জিজ্ঞাসা ও তাদের সম্ভাব্য সমাধানে পৌঁছাতে পারি।

দুই

ডন কিহোতের পুনঃপাঠ মানে তাই কার্যত পুনর্লিখন। বিখ্যাত দার্শনিক মিগুয়েল দ্য উনামুনো তাই ডন কিহোতের আখ্যানে লক্ষ করেছেন উন্মাদনার অভিব্যক্তি। দীর্ঘ বিশ্লেষণে উনামুনো দেখিয়েছেন যে সার্ভেন্তেস তাঁর কাহিনির বিভিন্ন চরিত্রগুলিকে হয়তো বা প্রতীকায়িত করতে চাননি ; কিন্তু পাঠকেরা এদের মধ্যে নিজস্ব প্রত্যয় ও অনুভব অনুযায়ী প্রতীক নিশ্চয় খুঁজে নিতে পারেন। কেউ কেউ এমনও ভাবতে পারেন যে কিহোতে ও পাঞ্জা আলস্য-মন্থর আমোদ-প্রমোদের জীবনকেই মহিমান্বিত করেছে। কিন্তু তা প্রকৃতপক্ষে কাহিনির বহির্বৃত স্তর মাত্র। মধ্যযুগের পরিবেশে আমোদ-প্রমোদ কিংবা শৌর্য-আবেগ ইত্যাদির নায়কোচিত অভিব্যক্তি যেভাবে স্বতশ্চলভাবে স্বীকৃত হত, সেই পরিপ্রেক্ষিতকে মান্যতা দিয়েও লেখক নিশ্চয় সেই গণ্ডিকে পেরিয়ে যেতে

পেরেছিলেন। নইলে পরবর্তী প্রজন্মগুলিতে সৃষ্টিশীল লেখক ও দার্শনিকেরা নতুন নতুন অর্থের খোঁজে বেরিয়ে পড়তেন না। উনামুনোর নিম্নোক্ত মন্তব্য এই নিরিখেই আমাদের অভিনিবেশ আকর্ষণ করে : 'The passion to survive stifled in Don Ouixote the enjoyment of life, a capacity for enjoyment that is characteristic of Sancho. Sancho's wisdom was the result of his holding on to this life and this world in the measure that he could personally enjoy them, and the Sancho Panzesque heroism—for Panza is heroic—consisted in his following a madman, being himself sound of mind, an action more filled with faith than that of a madman following his own madness. Great was Don Quixote's madness, and it was great because the root from which it grew was great : the inextinguishable longing to survive was a source of the most extravagant follies as well as of most heroic acts.' (২০০১ : ৫)

বেঁচে থাকার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা কি আমাদের জীবন উপভোগের ক্ষমতাকে অনেকটা দুর্বল করে দেয়? পার্থিব জীবনের প্রতি নিবিড় সংলগ্নতা-বোধই যদি স্যাঙ্কোর জ্ঞান ও বীরত্বের উৎস হয়ে থাকে, সাধারণ মানুষের পরিধি-বহির্ভূত কিহোতেকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করে যাওয়ার মধ্যে কোন সংকেত দ্যোতিত হচ্ছে? এই জিজ্ঞাসা সম্ভবত মধ্যযুগে উত্থাপিত হতে পারত না কিন্তু সাম্প্রতিক কালে উত্থাপিত হয়েও কি তার সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান হয়েছে? ডন কিহোতের মধ্যে বেঁচে থাকার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা কখনও নির্বাপিত হয়নি। আকাঙ্ক্ষার এই অতিরেকই কি তাকে বিপুল উন্মাদনার দিকে সঞ্চালিত করেছে? আপাতদৃষ্টিতে সামন্তযুগের নায়কের মতো শৌর্যসূচক সক্রিয়তা দেখিয়েও কেন সে উৎকট নির্বোধ হিসেবে প্রতিপন্ন হয়? এর কি তবে প্রসঙ্গাতিযায়ী তাৎপর্য রয়েছে কিছু? উনামুনোর বিশ্লেষণ থেকেই এইসব প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে এবং ফলে সার্ভেন্তেসের গ্রন্থপাঠও বারবার বাচনের উদ্বৃত্তের দিকে ঝুঁকে পড়ে। জীবন যখন অপরিমেয়ভাবে জটিল হয়ে পড়েছে, আমরাও তো সমসাময়িক পৃথিবীতে উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষের বিচিত্র মিছিল দেখতে পাই। উনামুনোর দেওয়া সংকেত অনুযায়ী এদের প্রধানত দুটি বর্গে বিন্যস্ত করা যায় : যাদের নিজেদের ওপর বিশ্বাস আছে এবং যাদের একেবারেই আত্মবিশ্বাস নেই। আত্মপ্রত্যয়ের অভাব থাকলেই দুষ্কর্ম করেও 'খ্যাতি' অর্জনের তৃষ্ণা দুর্বার হয়ে ওঠে। এতে বিঘ্ন তৈরি হলেই হতাশা-ক্লিষ্ট অপ-ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়।

কিন্তু এই যুক্তিশৃঙ্খলা অনুযায়ী কিহোতে কি পড়ুয়ার মনে নিছক আক্ষেপ জাগিয়ে দেয় শুধু কিংবা, চূড়ান্ত হাস্যকর ছদ্ম-শৌর্যের প্রতিনিধি হওয়া ছাড়া অন্য কোনো সার্থকতা নেই তার : এমনও কি ভাবতে পারি! এধরনের একদেশদর্শী ভাবনাকে প্রশ্রয় না দিয়ে বরং উনামুনোর মতো বিবেচনা করতে পারি যে 'powerful expression of the root-quality of Quoixotism'! হলো 'absurd anxiety for eternal

renown.'। যশের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আসে অমরতার তৃষ্ণা যা প্রতাপের চুড়ো হয়ে ওঠার লোলুপতায় সম্পৃক্ত হলে জন্ম নেয় ফাউস্ট। মেফিস্টোফেলিসের কাছে আত্মবিক্রয়ের চেয়ে স্যাঙ্কো পাঞ্জা দ্বারা সঞ্চালিত হওয়া নিশ্চয় কাম্য। তাহলে কি ফাউস্টের বিপরীত মেরুতে ডন কিহোতেকে ভাবা যেতে পারে? হোরেশিও তো হ্যামলেটের নিঃসঙ্গতা দূর করতে পারেনি; ফলস্টাফের মতো জ্ঞানী বা প্রস্পেরোর মতো ঐন্দ্রজালিকের পরিণতিতেও সাহচর্যের ভূমিকা ছিল না কোনো। কিন্তু ডন কিহোতের জন্যে ছিল স্যাঙ্কো পাঞ্জার বহুমাত্রিক সংলগ্নতা। সার্ভেন্তেস স্পেনীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাসের অতলান্ত সঞ্চয়কে মন্থন করে নিজের প্রতিকল্প সত্তা কিহোতেকে সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর প্রতিবেদনের উপসংহারে তাই নিজের কলমকে সম্বোধন করে লিখেছিলেন সার্ভেন্তেস : 'Here you shall rest hanging from the rack by this bit of copper wire whether well or ill-cut, my goose quill, I do not know. And there you shall stay for long centuries... For me alone was Don Quixote born, and I for him ; he knew how to act, and I to write.'। আপন চেতনার গভীরে অবগাহন করে শুধু কি আপন সত্তার প্রতিকল্প নির্মাণ করেছিলেন তিনি? নাকি এর মধ্যে নিহিত ছিল গভীরতর তাৎপর্য!

তিন

স্পেনীয় যৌথ নিশ্চেতনা ও বিশ্ববীক্ষার স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সংবেদনশীল দার্শনিক উনামুনো তাই ভেবেছেন, দুরূহ জীবন-পথে কঠোর সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে এগিয়ে স্পেনীয়রা অস্তিত্বের রুদ্রভীষণ রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই তাঁদের ভাবনায় মৃত্যুবোধ ও বিনাশের শঙ্কা বিশেষভাবে সক্রিয়। কিন্তু এর মানে এই নয় যে তাঁরা জীবন সম্পর্কে নিঃস্পৃহ। বরং ঠিক তার উল্টো। উনামুনো মনে করেন, স্পেনীয়রা জীবনের প্রতি নিবিড় সংলগ্নতা বোধ করেন 'Precisely because it is hard on him, and that from his intense attachment to life spring what we call his cult of death. Our love of life is so great that we want it to last for ever, without end, and we cannot resign ourselves to losing it so that the hope of living on, or the fear of not surviving stifles in us the enjoyment of life, that joie de vivre—which so thoroughly characterizes the French.' (তদেব : ৭)

এই কেন্দ্রীয় উপলব্ধির উদ্দীপনায় সার্ভেন্তেস হয়ে ওঠেন ডন কিহোতে কেননা তিনিও চাইছিলেন, তাঁর নাম ও খ্যাতি চিরজীবী হোক। বলা যেতে পারে, 'He is Cervantes in the measures that the latter was a man of his time and people, he is the Spanish soul incarnated in Cervantes. And in this soul he represents the longing to leave behind a name. This longing to leave behind eternal name and fame is no more than one form of

the thirst for immortality that animates all those who are in love with life.' (তদেব)

এই যুক্তিশৃঙ্খলা অনুযায়ী জীবনকে প্রগাঢ় ভালবেসেই কায়িক অবসানের পরেও জীবনের বিস্তার চায় অনুভবপরায়ণ মানুষ। এরই অন্য নাম অমরতার তৃষ্ণা।

প্রতিটি প্রজন্ম নিজস্ব পুনঃপাঠের মধ্য দিয়ে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে : সার্ভেন্তেস ও তাঁর অনন্য সৃষ্টি অনতিক্রম্য। আখ্যানের তুমুল বিনির্মাণ যখন ঘটে চলেছে, তখনও কাহিনি-প্রধান একটি রম্যন্যাস সম্পর্কে কেন এত বিস্ময়? শুধু পাঠক-সমালোচকদের কথা লিখছি না ; হোর্হে লুই বোর্হেস ও কার্লোস ফুয়েন্তেস এর মতো ব্যতিক্রমী লিখিয়েরাও ডন কিহোতের বয়ানে লক্ষ করেছেন বিরল অন্তর্দীপ্তি কিংবা বহির্বাস্তবের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন অন্তর্বাস্তব। যথাপ্রাপ্ত জগৎ ও ঘটনা-সংস্থানকে কত বিচিত্রভাবে উপস্থাপিত করা যায় এবং তাদের মধ্যে আবহমান কালের সম্ভাব্য পাঠকদের জন্যে সঞ্চিত রাখা যায় কত ধরনের উদ্ভাসন—এইসব ভাষ্য-ভাষ্যান্তরে তার আভাস পাই। বিশ্বসাহিত্যের বেশ কিছু অমর চরিত্রের সঙ্গে তুলনা-প্রতিতুলনার পরেও যেন ডন কিহোতে আর স্যাঙ্কো পাঞ্জার থই পাওয়া যায় না। মনে-মনে ভাবি, এই কিহোতে কে? কে এই স্যাঙ্কো! প্রতিবেদনের ভেতর থেকে ডনের জবাব ভেসে আসে : 'I know who I am, and who I may be, if I choose ; not only those I have mentioned but all the Twelve peers of France and the Nine Worthies as well ; for the exploits of all of them together or separately, cannot compare with mine.'। বিশ্বসাহিত্যের যেসব চরিত্র অমরতার শিরোপা অর্জন করেছে, সচেতনভাবে মৃত্যুজিৎ হওয়ার জন্যে তাদের মধ্যে ক'জন চেষ্টা করেছিল? ডন কিহোতে কিন্তু জীবনাতিযায়ী জীবন চেয়েছিল এবং ভেবেছিল, 'আমি যা হতে চাই তা-ই আমি হতে পারি ; আমি তো জানি, আমি কী?' তাহলে তার কি আত্ম-অভিজ্ঞান নির্ণয়ের সমস্যা ছিল না কোনো! সামন্ততান্ত্রিক স্পেনীয় আবহের নির্যাস আত্তীকরণ করেও যে সুদূর ভবিষ্যতের বীক্ষণপ্রণালীর পক্ষে প্রাসঙ্গিক থাকতে পারল কিহোতের অভিজ্ঞান-নির্মাণ, এর চেয়ে আশ্চর্যের কথা কী আছে আর!

তবু ডনকে আমরা কখনও স্যাঙ্কোকে ছাড়া ভাবতেই পারি না। তাদের সাহচর্য যেমন চিহ্নায়িত, তেমনই আলাদা আলাদাভাবে দু'জনই প্রতীকী অস্তিত্ব। অবশ্য সেই সঙ্গে স্পেনীয় সময় ও পরিসর মন্থন-জাত বাস্তবের ওরা প্রতিনিধি এবং বাস্তবাতিযায়ী সমান্তরাল বাস্তবের নির্মাতাও। তাছাড়া বিশ্বসাহিত্যে ডন-স্যাঙ্কোর যুগ্মক আসলে পরবর্তী অজস্র যুগলবন্দি অস্তিত্বের উৎসভূমি। শুধু সাহিত্যই নয়, জনপ্রিয় লঘু আখ্যান সহ জনসংস্কৃতির নানা অভিব্যক্তিতে এই যুগ্মক-প্রকল্পের অন্তর্বর্তী আততি-ইচ্ছাপূরণ-বৈপরীত্য সহ নানা ধুপছায়া লক্ষ করা যায়। যাদুকর ম্যানড্রেক-বলশালী লোথার কিংবা মজাদার লরেল-হার্ডি হোক অথবা আমাদের বাংলা সাহিত্যে গোরা-বিনয় বা

নিখিলেশ-সন্দীপ বা শচীশ-শ্রীবিলাস হোক, ডন-স্যাঙ্কোর যুগলবন্দির দূরবর্তী প্রচ্ছায়া বুঝিবা আখ্যানকারদের যৌথ নিশ্চেতনায় ভাবনার বীজতলি হিসেবে সক্রিয়। সার্ভেন্তেস এদের কেবল পরস্পরের পরিপূরক ভাবেননি; কেননা এদের সত্তা নিছক অন্যোন্য- সম্পৃক্ত নয়, অন্যোন্য-নিবিষ্টও। এছাড়া, আগেই লক্ষ করেছি, কথাকার খেলাচ্ছলে নিজেকে বিভাজিত করে নিয়েছেন এবং এই বিভাজনকে বহুরৈখিক করে নিয়ে নির্মিত চরিত্র দুটির মধ্যে বিচিত্র মিথষ্ক্রিয়ারও আয়োজন করেছেন। ফলে পরবর্তী কালের বহু পাঠক-সমালোচকের মতো উত্তরসূরি কথাকারেরাও ডন ও স্যাঙ্কোর মধ্যে একজনের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছেন। কোনও কোনও সাহিত্যিক আবার পছন্দসই চরিত্রের মধ্যে ঐ যুগ্মককে একীভূত করে নিয়েছেন।

চার

বিখ্যাত সমালোচক হ্যারল্ড ব্লুম চমৎকার মন্তব্য করেছেন : 'Perhaps the Don was the writer in Cervantes and Sancho the reader in Cervantes ; perhaps they are the writer and the reader in each of us.' (২০০৫ : ৬) এই নিরিখে ভাবা যায় যে যথাপ্রাপ্ত বাস্তবকে অগ্রাহ্য না করেও আমরা যখন তা পেরিয়ে যেতে চাই, যুগ্মকের ঐ মৌল আদিকল্প থেকে প্রেরণা ও পদ্ধতি বিচ্ছুরিত হতে থাকে যেন। আবার এদের বিচিত্র কার্যকলাপে যে কার্নিভালের সমারোহ ব্যক্ত হয়, তা-ই সম্ভবত উত্তরসূরি রাবেলেকেও আখ্যানের লোকায়ত চলনে বিশেষ তাৎপর্য দিতে প্রেরণা দিয়েছিল। কিহোতের মৃত্যুর পরেও যে স্যাঙ্কোর ভূমিকা ফুরিয়ে যায় না, এতে বেশ কিছু পাঠকই তাকে তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। বস্তুত সার্ভেন্তেস তো শুধুমাত্র ডনের কীর্তিকলাপ বিবৃত করেননি, একই সঙ্গে স্যাঙ্কো পাঞ্জার চিত্তাকর্ষক কার্যকলাপও বিশদ করেছেন। এইজন্যে ফ্রান্ৎস কাফকার মতো সংবেদনশীল কথাকারও তাঁর একটি বিখ্যাত প্যারাবলে 'স্যাঙ্কো পাঞ্জার সত্য' শিরোনামে লিখেছেন : 'without making any boast of it Sancho Panza succeeded in the course of years, by devouring a great number of romances of chivalry and adventure in the evening and night hours, in so diverting from him is demon, whom he later called Don Quixote, that his demon there upon set out in perfect freedom on the maddest exploits, which, however, for the lack of a preordained object, which should have been Sancho Panza himself, harm nobody. A freeman, Sancho Panza philosophically followed Don Quixote on his crusades, perhaps out of a sense of responsibility, and had of them a great and edifying entertainment to the end of his days.' (২০০৫ : ৫)

সত্যিই তো, ডনের প্রাণপ্রাবল্য যাতে জগৎ-বিধি বা পার্থিবতার প্রবাহকে বিঘ্নিত

করতে না পারে, সেইজন্যেই স্যাঙ্কোর উপস্থিতি। সামঞ্জস্য বিধানের এই প্রক্রিয়াতেই প্রশমিত হয় সম্ভাব্য অতিরেকের শঙ্কা। আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের যৌথ চর্যায় এই সত্যের নিরন্তর বিচ্ছুরণ লক্ষ করা যায়। বিনোদনের আয়োজনকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না-করে সার্ভেন্তেস যে দার্শনিক অন্তঃসারের উদ্‌ভাসনও উপস্থাপিত করেছেন, তা তাঁর ম্যাগনাম ওপাসকে বহুস্বরিক করে তুলেছে। তাঁর রচনার মহত্ত্ব সম্পর্কে তিনি নিজে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন ; তবে এই আক্ষেপও ছিল যে প্রাপ্য মর্যাদা তিনি পুরোপুরি পাননি। বিখ্যাত ভারতীয় নাট্যকার ভবভূতি যেমন সমকালীন পাঠকদের প্রতি বিরক্তিতে জানিয়েছিলেন, 'উৎপৎস্যতে অস্তি মম কোহপি সমানধর্ম্মা/কালোহয়ং নিরবধিঃ বিপুলা চ পৃথ্বী'—প্রায় সে-ধরনের মনোভঙ্গিতে আত্মগৌরব প্রকাশ করেছিলেন সার্ভেন্তেসও, তাঁর 'Journey of Parnassus'-এ (১৬১৩) : 'I've given in Don Quixote, to assuage the melancholy and the moping breast, Pastime for every mode, in every age, I've in my Novels opened, for the rest A way whereby the language of castitle May season fiction with becoming zest ; I'm he who soareth, in creative skill' Bove many men :'

যেহেতু সার্ভেন্তেস স্বয়ং ডন কিহোতে ও স্যাঙ্কো পাঞ্জার যুগলবন্দি-অস্তিত্বের প্রকৃত উৎস, তাঁর উল্লাস-বিষাদ সঙ্গ-নিঃসঙ্গতা প্রাচুর্য-রিক্ততা সক্রিয়তা-নিষ্ক্রিয়তা উদ্দীপনা-শূন্যতা ব্যক্ত হয়েছে আখ্যানের নানা অনুষঙ্গে। আর, এইসব দ্বৈততা প্রকৃতপক্ষে ষোল শতকের স্পেনীয় জীবনেরই বহুস্বরিক অভিজ্ঞতা। বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্যের আততি যেন ব্যক্তির প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে নিয়ে উদ্ভট খেলায় মেতে উঠেছে, এরকম মনে হয়। আসলে লেখক তাঁর জীবনে এত বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার ঘূর্ণাবর্তের মুখোমুখি হয়েছিলেন যে কল্পনা ও প্রকল্পনার সংশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ডন কিহোতে ও স্যাঙ্কো পাঞ্জার যুগলবন্দি নির্মাণ তাঁর পক্ষেই বুঝিবা স্বাভাবিক ছিল। স্পেনীয় জাতির অন্তর্বৃত স্বপ্ন ও বহির্বৃত সক্রিয়তা নানা বিভঙ্গ নিয়ে এই প্রকল্পে সমন্বিত হয়েছিল। এমন ঘটনা যে সচরাচর ঘটে না, তা না লিখলেও চলে। তবে যে-বিষয়টি আলাদাভাবে লক্ষ করতে হয়, তা হলো বহু দূরবর্তী সময় ও পরিসরের অধিবাসী হয়েও এই নিবন্ধকারের মতো বাঙালি পাঠক কৈশোর থেকে বয়স্ক-বেলায় পৌঁছাতে-পৌঁছাতে অন্তত কয়েক ধরনের ডন কিহোতের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। প্রথম পাঠে আখ্যানের মজার সঙ্গে মিশেছিল অনুপলব্ধি জনিত কিছুটা ধোঁয়াটে অস্তিত্ব। সম্ভবত এর জন্যে দায়ী অতি সংক্ষিপ্ত বয়ান ও অপটু অনুবাদ। তরুণবেলার পাঠে নিঃসন্দেহে দক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ ডন কিহোতে ও স্যাঙ্কো পাঞ্জার কীর্তি-কাহিনিকে অনেকখানি আকর্ষণীয় করে তুলতে পেরেছিল। তারপর দীর্ঘ বিরতির পর্যায়ে পাঠকের সাহিত্যরুচি আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। সার্থক বয়ান তাকেই বলি যা চলমান ঐতিহ্যের অন্তঃসার এবং জাতীয় স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা দিয়ে তৈরি আর সবচেয়ে বড়ো কথা, যার অন্তর্বয়ন জুড়ে থাকে সাংস্কৃতিক বিশ্বকোষের অমোঘ উপস্থিতি। সেইসঙ্গে তা আশ্চর্যজনকভাবে উত্তর-

প্রজন্মগুলির উপরে সঞ্চরমান ছায়া ফেলে যায়। বয়স্কবেলার পাঠ এইজন্যে অনিবার্যভাবে হয়ে ওঠে বহুমাত্রিক ও অনেকার্থদ্যোতনার সন্ধানী।

পাঁচ

ডন কিহোতে পড়তে গিয়ে একই কারণে খুব বড়ো মাপের সমস্যাও তৈরি হয়। ঘটনাক্রম ও চরিত্র-নির্মাণ যেন নিজেরই অজ্ঞাতসারে গৌন হয়ে যায় ; পাঠকৃতির ছায়াঞ্চলের দিকে মনোযোগ বেশি হয়ে পড়ে। ঘটনার চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে অন্তর্নিহিত সম্ভাব্য প্রতীকিতা। কাহিনির চেয়ে মন বেশি প্রাধান্য দেয় চিহ্নায়ন প্রকরণকে। বিশ্বসাহিত্যের বিভিন্ন কালজয়ী রচনার সঙ্গে স্বতশ্চলভাবে প্রতিতুলনা করতে ইচ্ছা করে। সেইসঙ্গে স্বয়ং সার্ভেন্তেস আমাদের পাঠ-ক্রিয়াকে আরও খানিকটা অনিশ্চিত করে দেন। তাঁর মধ্যে লেখক-কথকের আততি প্রচ্ছন্ন নয় মোটেই, বরং প্রকট। তাছাড়া তিনি যেহেতু স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন—'Don Quixote was born, and I for him. He knew how to act, and I knew how to write'। স্রষ্টা যখন বলেন যে তিনি ও তাঁর সৃষ্টি এক ও অভিন্ন, তাকে কতখানি আক্ষরিক অর্থে নেওয়া যায়—এ বিষয়ে তর্ক কিছুতেই এড়ানো যায় না। সার্ভেন্তেস কখন ডন কিহোতের হয়ে কথা বলতে বলতে আলগোছে নিজেকে সরিয়ে নেন আবার সাবলীলভাবে ফিরেও আসেন : তা অসতর্ক পাঠে বোঝা মুশকিল। মধ্যযুগীয় কোনও-একটি আখ্যানে কীভাবে আধুনিকোত্তর পর্যায়ের উপযোগী লিখন-প্রণালীর পূর্বাভাস পাচ্ছি, এই প্রশ্নের মীমাংসা মোটেই সহজ নয়। আখ্যানের আকর্ষণ সম্পূর্ণ বজায় রেখেও লেখক যেভাবে বয়ানে আখ্যানের উদ্বৃত্ত অনায়াসে ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন, তার কোনও তুলনা নেই। সাধারণভাবে আখ্যানের বৈচিত্র্য খুবই মনোগ্রাহী ; তবে মূল দুটি চরিত্রের অটুট গ্রন্থির নির্মাণই সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয়। তাই মোটামুটিভাবে সমস্ত বর্গের পাঠকই কিহোতে ও স্যাঙ্কোর প্রতি অভিনিবেশ কেন্দ্রীভূত করেছেন আর এই সূত্রে লক্ষ করেছেন আকাঙ্ক্ষার আশ্চর্য সমারোহ।

ষোল শতকের শেষ কয়েকটি বছরে সার্ভেন্তেস নানা ধরনের প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছিলেন। সে-সময় স্পেনীয় ইতিহাসেরও সন্ধিক্ষণ। ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিচিত্র আবর্তের মধ্যেই আখ্যানের নানা আকল্প সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব সন্ধান অব্যাহত ছিল। বস্তুত আপন বহুমাত্রিক জীবনবীক্ষার মন্থনজাত সম্পদ হিসেবেই সার্ভেন্তেস তাঁর অমর রচনার প্রথম ভাগ ১৬০৫-এ প্রকাশ করলেন : 'The Ingenious Gentleman Don Quixote de al Mancha'। প্রকাশিত হওয়া মাত্র বইটি যে-জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, তা খুব কম ক্ষেত্রেই ঘটে। এক বছরের মধ্যে এর ছটি সংস্করণ হওয়াতে দেশে-দেশান্তরে দ্রুত খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। টমাস শেলটন ১৬১২-তে প্রথম ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করলেন 'The Delightful History of the Valorous and Witty Kinght-Errant Don Quixote of La Mancha' নামে। বিপুল যশ সত্ত্বেও সার্ভেন্তেসের ব্যক্তিগত জীবনে মসৃণতার পরিবর্তে আরও

আবর্ত তৈরি হলো। যেন বাংলা ভাষার মহত্তম স্রষ্টার মতো তিনিও বলতে পারতেন : 'আমার এ ধুপ না পোড়ালে/গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে/আমার এ দীপ না জ্বালালে/দেয় না কিছুই আলো'। তাই ১৬১৫-এর নভেম্বরে বেরোল মহাগ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ : 'The Second Part of the Ingenious Knight Don Quixote de La Mancha!' সম্পূর্ণ বইটির অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তার অন্যতম বড়ো কারণ নিশ্চয় এই যে তা স্পেনীয় পাঠকদের রোমান্সের তৃষ্ণা, বিশুদ্ধ আমোদের আগ্রহ এবং বারবার আকল্প থেকে মাটিতে ফিরে আসার ইচ্ছা : সব কিছুকেই সার্থকভাবে মেলাতে পেরেছিল। লেখক-কথকের যুগলবন্দি আগাগোড়া অক্ষুণ্ণ থাকায় স্বতশ্চলভাবে কল্পনার উপনিবেশই বৃহত্তর বাস্তব হয়ে উঠেছে।

তাই দূরবর্তী কালের বাঙালি পাঠকও ডন কিহোতের সঙ্গী হয়ে যান আর লা মাঞ্চার সাধারণ ঘরদোরের মতো নিজের দৈনন্দিন অভ্যস্ততা থেকে বেরিয়ে পড়েন। তখন ধীরে ধীরে আধুনিক কিংবা আধুনিকোত্তর কালের অভিজ্ঞানগুলি ভোজবাজির মতো মিলিয়ে যেতে থাকে। পাঠকও অ্যাডভেঞ্চারের শরিক হয়ে বাস্তবের বন্দিশালা থেকে মুক্তি খুঁজে নেন এবং তাঁর জন্যেও তৈরি হয়ে যায় কোনো-এক স্যাঙ্কো পাঞ্জা। ফলে 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর মেহের আলীর বিপ্রতীপে গিয়ে স্যাঙ্কো বাস্তবেই মায়া নির্মাণ করে এবং নিজেই আবার সেই কুহক ভেঙে দেয়। সৌজন্য-বীরত্ব-প্রেম-কীর্তি ইত্যাদির চিরাচরিত প্রতীতিকে অস্বীকার না-করেও প্রকৃতপক্ষে প্রতিটির নতুন ভাষ্য রচিত হয় যেন। এ সময়ের যে-পাঠক আকরণোত্তরবাদী ভাবনা অনুযায়ী পাঠকৃতির মধ্যেই স্বতঃপ্রবৃত্ত আত্ম-নিরাকরণের প্রক্রিয়া লক্ষ করেন, তাঁকে বিপুল বিস্ময়ে আবিষ্কার করতে হয়, মধ্যযুগের নির্মিতি হয়েও ডন কিহোতে নিজেই নিজেকে অনবরত পুনর্লিখন করে গেছে। যেন প্রকৃত লেখক সার্ভেন্তেস প্রয়োজনীয় সূত্রধারের চেয়ে বেশি কিছু নন। চিত্তবিশ্বে নিহিত সম্ভাবনাই স্যাঙ্কো পাঞ্জা সহ অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। নিজের সঙ্গে নিজেরই খেলা চলেছে নানাভাবে নানা আঙ্গিকে। আকাঙ্ক্ষার বিস্তার ঘটছে, কল্পিত বাস্তবের কৌতুকভরা উপস্থাপনা হচ্ছে; তারপর অবধারিতভাবে আসছে সেই অবরোহণের মুহূর্ত। কিহোতের উন্মাদনা ও মিথ্যার ঊর্ণাতন্তু রচনা : এই সবই কি পাঠকের বিনোদনের জন্যে?

যখন কল্পনার শক্তি অবসিত হয়ে যায়, কী অবশিষ্ট থাকে! মন্তেসিনোসের গুহা এই সূত্রে প্রতীকমূল্যে অনবদ্য হয়ে ওঠে। ডন কিহোতের এলোন্‌সো কিজানোতে রূপান্তর আর ঘরে ফিরে আসাও বিপুলভাবে চিহ্নায়িত। সাম্প্রতিক পাঠক নিঃসন্দেহে কাহিনি-অতিযায়ী এইসব চিহ্নায়কগুলি লক্ষ করবেন। স্যাঙ্কোর প্রতি কিহোতের নিম্নোধৃত উক্তিও আলাদা মনোযোগ দাবি করে : 'There are some who exhaust themselves learning and investigating things that once learned and investigated, do not matter in the silghtest to the understanding or the memory.'

না-লিখলেও চলে, বিশেষ প্রসঙ্গ-সম্পৃক্ত উচ্চারণ হলেও এর প্রসঙ্গাতিযায়ী

তাৎপর্য আছে বলেই কালান্তরের পাঠক এতে স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যতের সংকেত খুঁজে পান। মনে পড়ে, প্রখ্যাত কবি অক্টাভিয়ো পাজ আধুনিক উপন্যাসকে ভেবেছিলেন নিজেরই বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সমাজের মহাকাব্য। কিন্তু প্রাক্-আধুনিক যুগের আখ্যান হয়েও 'ডন কিহোতে' তো একইভাবে আপন সময় ও পরিসরের পিঞ্জরকে অস্বীকার করতে চেয়েছে। পার্থিব উপকরণের সঙ্গে রম্যন্যাসের অনুষঙ্গের সংশ্লেষণও ঐ অস্বীকৃতির অভিব্যক্তি। এ-প্রসঙ্গে জরুরি হলো এই অবিসম্বাদী সত্য যে ধর্মতন্ত্র-শাসিত মধ্যযুগকে বিমূর্তায়িত বা আদর্শায়িত করা ঠিক নয়। গ্যালিলিও-জিওর্দানো ব্রুনো যখন নিরেট ও সংগঠিত কুসংস্কার-গতিহীনতার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছেন, এক পা এগিয়ে তিন পা' পিছিয়ে যাচ্ছেন কিংবা পর্যুদস্ত হচ্ছেন—সেই পর্যায়ে সাহিত্যের কোনো মহাগ্রন্থ কীভাবে বিকল্প সত্যের সন্ধানে আপন প্রতিবাদের স্বর কৌশলে সন্নিবিষ্ট করছে বয়ানে? করছে কিনা আদৌ—এই সংশয় প্রকাশ করব না। কেননা আখ্যানের গভীরে ঐ প্রতিবাদ যদি প্রচ্ছন্ন না থাকত, তাহলে তা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত মানব-পরিস্থিতিগুলিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিগৃহীত ও বিশ্লেষিত হত না।

ফাউস্ট : একটি পাঠ-প্রস্তাবনা

প্রতিটি নতুন প্রজন্ম বিশ্বসাহিত্যের কালোত্তীর্ণ পাঠকৃতিকে নতুন ভাবে আবিষ্কার করে নেয় পুনঃপাঠের মধ্য দিয়ে। মহাসময়ের তাৎপর্য বুঝে নিতে চায় নিজস্ব খণ্ডসময় ও খণ্ডপরিসরের দর্পণে। এইজন্যে আমাদের হোমার-ভার্জিল-সফোক্লিস-দান্তে-শেক্সপীয়ার-মিল্টন নিশ্চয় পিতামহ-প্রপিতামহদের চেতনা অনুযায়ী আবিষ্কৃত হয় না। এমনকি সমসাময়িক কালেও একই ধ্রুপদী পাঠকৃতি গ্রহীতা-পাঠকের অবস্থান অনুযায়ী ভিন্ন-ভিন্ন তাৎপর্যের দ্যোতনা নিয়ে আসে। তা যদি তা হত, নারীচেতনাবাদী কিংবা উপনিবেশোত্তরচেতনাবাদী পাঠ অন্য সব গতানুগতিক পাঠ থেকে আলাদা হত না। জোহান হ্বলগ্যাঙ্গ ভন গ্যয়ঠের অমর নাট্যসন্দর্ভ ফাউস্ট সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। শুধু তাঁর নিজের দেশ জার্মানি বা মহাদেশ ইউরোপের পাঠকদের এই অভিজ্ঞতা নয়, পুরোপুরি ভিন্ন ভৌগোলিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিসরের বাসিন্দা বাঙালিদেরও উপলব্ধি সময়ের পর্ব থেকে পর্বান্তরে বদলে যেতে বাধ্য। ফাউস্টের মতো ধ্রুপদী পাঠকৃতিতে এত অজস্র স্তর, কৌনিকতা, অন্তর্বয়ন এবং প্রবেশবিন্দু ও নির্গমবিন্দুর সমাবেশ ঘটেছে যে উমবের্তো একো কথিত 'aesthetic dialectics between openness and closedness of texts' (১৯৮৪ : ৩৯) এর সাধারণ বিধি দিয়ে বহুস্বরিক তাৎপর্যের নাগাল পাওয়া শক্ত। গ্যয়ঠের ফাউস্ট একক পাঠকৃতি নিশ্চয় ; কিন্তু কিছুতেই এই তথ্য ভুলতে পারি না যে তা বহুরৈখিক ও বহুতলযুক্ত ফাউস্ট-আখ্যান-পরম্পরার কল্পনানিষিক্ত পরিণত ফসল। গ্যয়ঠে সর্বতোমুক্ত পাঠকৃতিতে দেশ-কালগত পরিমিতি পেরিয়ে গেছেন।

এইজন্যে, একোর বাচনে, বাঙালি পাঠকেরাও অন্য সব দেশের পড়ুয়াদের মতো বলতে পারেন : 'We see it as the end product of an author's effort to arrange a sequence of communicative effects in such a way that each individual addressee can refashion the original composition devised by the author.' (তদেব : ৪৯)। সংযোগসূচক পরিণামের ক্রম-বিন্যাসে লেখকের প্রয়াস হিসেবে যদি পাঠকৃতিকে গ্রহণ করি, প্রত্যেক নতুন গ্রহীতাই লেখক-রচিত মূল পাঠের তাৎপর্যকে পুনর্বিন্যস্ত করতে পারেন। কিন্তু ধ্রুপদী সন্দর্ভের ক্ষেত্রে কিছু বাধ্যবাধকতা থেকেই যায়। যেমন ফাউস্টের তাৎপর্য শুধুমাত্র গ্যয়ঠের মতো মহাকবির উত্তুঙ্গ কল্পনাপ্রতিভার ওপরও নির্ভর করছে না। এই ভাববস্তুর ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ ও নিরন্তর বিনির্মাণ কীভাবে হলো, সতর্কভাবে পাঠককে তা বিবেচনা করতে হয়।

নানা দেশে নানা কালে নানা অবস্থানে পড়ুয়ারা মুক্ত পাঠকৃতির দিগন্তকে যত প্রসারিতই করুন, ক্রমবিকশিত ও বিনির্মিত ভাববস্তুর সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত মনে রেখেই তাঁদের এগোতে হয়। বাখতিনীয় সমালোচনা ধারায় যাকে সম্বোধ্যমানতা বা প্রত্যুত্তরযোগ্যতা বলি, ধ্রুপদী পাঠকৃতির অনুশীলনে তা সম্ভবত বেশ জরুরি। আরো একবার একোর কাছে ফিরে যেতে পারি আমরা, যেখানে তিনি সম্বোধিত পাঠকের সংবেদনশীল গ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে লিখেছেন : 'As he reacts to the play of stimuli and his own response to their patterning, the individual addressee is bound to supply his own existential credentials, the sense conditioning which is peculiarly his own, a defined culture, as set of tastes, personal inclinations and prejudices. Thus his comprehension of the original artifact is always modified by his particular and individual perspective. In fact, the form of the work of art gains its aesthetic validity precisely in proportion to the number of different perspectives from which it can be viewed and understood.' (তদেব)

ফাউস্টের পাঠকৃতিও যদি একক সম্বোধিত পাঠকের মধ্যে নিজস্ব ধরনের প্রতিক্রিয়া তৈরি করে থাকে, তাহলে তাতে গ্রহীতার একান্ত অনুভূতি-লালিত অস্তিত্বের অভিজ্ঞানই খুঁজব আমরা। এই প্রতিক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি নেই কেননা নিজের ব্যক্তিগত রুচি-প্রবণতা-সাংস্কৃতিক বোধ-পছন্দ-অপছন্দ অনুযায়ী তা চেতনা ও অবচেতনার গ্রন্থনায় গড়ে ওঠে। একেকটি পাঠ মানে একেকটি প্রেক্ষিত। প্রেক্ষিত যেমন নির্দিষ্ট, উপলব্ধির মাত্রাও তেমনি। একজনের জীবন যেমন অন্য কেউ যাপন করতে পারে না, তেমনি একজনের মনন ও চেতনা মথিত তাৎপর্য আরেকজনের উপলব্ধিতে হুবহু আসতে পারে না। ফাউস্টের মতো মহৎ শিল্পকর্মের অন্তর্বস্তু ও প্রকরণ কোন্ ধরনের নান্দনিক মান্যতা পাবে, তা গ্রহীতার কালপর্ব ও সামাজিক পরিসর একান্ত নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী নির্ণয় করে। প্রেক্ষণবিন্দু যত বাড়ে, অর্থোপপত্তির ধরনও তো বেড়ে যায়। বাঙালির মধ্যে অগ্রণী পড়ুয়া রবীন্দ্রনাথ যেভাবে কোনো পাঠকৃতির বিচার করেছেন, আজকের বাঙালি পাঠক নিশ্চয় সেভাবে করবেন না। তাঁর জগৎ আমূল বদলে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তরিত হয়েছে প্রতিবেদনের অণুবিশ্বও। প্রতিটি নতুন পাঠ মানে নতুন অর্জন, নতুন ভাষ্য, তাৎপর্যের নতুন আলো ও ধুপছায়া। তাই 'Every reception of a work of art is both an interpretation and a performance of it, because in every reception the work takes on a fresh perspective for itself' (তদেব)। আমরা যারা মূল জার্মানে ফাউস্ট পড়ার সুযোগ পাইনি, ইংরেজি অনুবাদে পড়েছি—অনিবার্য খেদ সত্ত্বেও ঐ যুগপৎ 'interpretation' ও 'performance' হওয়ার মধ্যে অসামান্য পাঠকৃতির আশ্চর্য সজীবতার কারণ খুঁজে পাই। এ এমন সন্দর্ভ যেখানে পাঠক হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার অংশীদার নন কেবল, অন্যতম কুশীলব না-হয়ে তাঁর উপায় থাকে না। যত পড়ি, দ্রৌপদীর শাড়ির মতো অন্তহীন মনে হয় বয়ানকে,

মনে হয় দুরধিগম্য। একদিকে ফাউস্ট মানব-স্বরূপের জন্যে শ্রেয় ও প্রেয়োমার্গের ব্যবধান সম্পর্কিত জ্ঞানতাত্ত্বিক আকল্প তুলে ধরছে, অন্যদিকে তাকে প্রতিপন্ন করছে অজ্ঞেয় রহস্যের গ্রন্থনা বলে। কতদূর যেতে পারে মানুষ এবং কতটুকু পর্যন্ত ঔচিত্যের সীমা—গ্যয়ঠে কি দেখাতে চেয়েছেন? অথবা মানবতাকে তিনি কি আসলে কল্পনাপ্রতিভার নির্মিতি বলে বোঝাতে চান? জ্ঞান ও প্রতাপের জটিল আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে ফাউস্ট কি তাঁর প্রতিবেদন মাত্র?

সাইরাস হ্যামলিন 'Reading Faust' নিবন্ধে মন্তব্য করেছেন : 'The true subject of our greatest works, held upto us as if in a magic mirror to transform the image which we project unto them, is the ideal of our own humanity'। কিন্তু ফাউস্টে মানবতার কোন্ আদর্শ প্রতিবিম্বিত হয়েছে? ঐন্দ্রজালিক দর্পণ হয়ে কোন্ ভাবমূর্তিকে রূপান্তরিত করেছে? মানুষকে আমরা বুঝতে চাই সংযোগের জন্যে নিয়ত ব্যাকুলতায়। কিন্তু সেই মানুষ যখন বিয়োগের পথে যায়, নিজের অস্তিত্বের মধ্যে অনন্বয়ের বিষবীজাণু নিজেই সংক্রামিত করে—অতলান্ত ট্র্যাজেডি থেকে কোন্ নির্যাস আহরণ করি! প্রাজ্ঞজন যখন শয়তানের সঙ্গে আত্মবলুপ্তির চুক্তি করে, এই অ্যালিগরি কি কেবল মধ্যযুগের আবহে সীমিত হয়ে যায়, নাকি, নতুন-নতুন তাৎপর্য নিয়ে পৌঁছে যায় একুশ শতকের জটিল বেলাভূমিতেও! ফাউস্ট যেন দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতশিখরের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় আমাদের। প্রভূত পাঠ-অভিজ্ঞতা ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা ছাড়া ঐ শিখর আরোহণের দুর্গম পথে অভিযাত্রী হওয়ার কথা ভাবাই যায় না। বিপুল প্রত্যাশার ভার শুরুতেই আমাদের উপর চেপে বসে। কারণ, রচনায় নিহিত আকরণ-চেতনাও অর্থগত ঐক্যপ্রতীতিতে নিজে থেকে ধরা দেয় না, তাদের আবিষ্কার করে নিতে হয়। অভ্যস্ত পূর্বানুমান দিয়ে তা সম্ভব হয় না। এছাড়া এ বিষয়ে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা তৈরি করেছে পূর্বজদের পাণ্ডিত্য ও ধীমান সমালোচনা। অর্থাৎ গ্রহীতা-পাঠকদের ফাউস্ট-পরিশীলনের দীর্ঘ ইতিহাস মূল পাঠকৃতির উপর অনিবার্য প্রভাব ফেলেছে। আমরা ঐ ইতিহাস যদি বা সামান্যমাত্র জেনে থাকি, ফাউস্ট-পাঠ-পরম্পরার দীর্ঘায়িত ছায়া আমাদের পক্ষেও এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অন্যভাবে বলা যায়, ঐসব পরিশীলন মূল পাঠকৃতিতে প্রচ্ছায়ার মতো সংলগ্ন। প্রশ্ন এই, প্রতিটি পাঠক-প্রজন্ম কিংবা পাঠক-পরিসর যদি নিজের মনন-কল্পনা-বিশ্লেষণ-ইচ্ছাপূরণ দিয়ে পাঠকৃতিকে রঞ্জিত করে থাকে এবং পড়ার প্রাক্-প্রস্তুতি সমাধা করতে গিয়ে ঐ রঞ্জন ক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হয়ে যায়—তাহলে তো ফাউস্টের তাৎপর্য সর্বদাই গ্রহীতার নিজস্ব সময়ের অনুগামী হবে।

কিন্তু সময়ে সবটাই তো সূর্যালোক থাকে না, কুয়াশা আর ধুপছায়াও থাকে। ফলে ফাউস্ট-পাঠেও তার ছাপ পড়তে বাধ্য। একটু আগে 'interpretation' ও 'performance'-এর কথা লিখেছি। এই দুই প্রবণতার যুগলবন্দি শুধু পাঠকের নয়, স্বয়ং গ্যয়ঠে ষাট বছরেরও বেশি সময় ধরে তাঁর সৃষ্টিচেতনায় এদের দ্বিরালাপ অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। কতবার নির্মিতির উপকরণ ও আকল্প পুনর্গঠিত হয়েছে, তা ভেবে

বিস্মিত হতে হয়। পাঠকৃতির হয়ে ওঠার এই দীর্ঘ, অনন্য ও ধারাবাহিক ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত হওয়া যেহেতু জরুরি—ধৈর্য, অধ্যবসায় ও মেধাশ্রম ছাড়া ফাউস্টের মুখোমুখি হওয়া যায় না। যাঁরা জার্মান ভাষায় বইটি পড়েননি কিংবা যাঁরা নবার্জিত কৌতূহলে পড়তে শুরু করেছেন—তাঁরা কেউই বহু প্রজন্মব্যাপী পাঠ-পরম্পরা, পাঠকৃতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত এবং পাঠকৃতির হয়ে ওঠার ইতিহাস সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারেন না। তার মানে, ফাউস্ট পড়া মানে পাঠকেরও হয়ে ওঠা ; নিছক পাঠকসত্তার নির্মিতির কথা বলছি না, এ আসলে নিয়ত-গ্রহিষ্ণু সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের নির্মাণ। এভাবে গ্যয়ঠে আমাদেরও চেতনা থেকে অনেক অদৃশ্য ও অজ্ঞাত পর্দা সরিয়ে দেন ; জীবনের চিরকালীন নাট্যমঞ্চে জ্ঞান ও প্রতাপ, অস্তিত্ব ও আকাঙ্ক্ষা, প্রেম ও নৈতিকতা, একক নির্জনতা ও সামাজিক চর্যার জটিল গ্রন্থনা সম্পর্কে আমরা অবহিত হই। যুগপৎ জিজ্ঞাসু ও বিপন্ন হই হয়তো কিংবা ত্রস্ত ও বিহ্বল—কিন্তু এই পাঠকৃতি গহন নীল অরণ্য, ঊর্মিমুখর বিশাল সমুদ্র আর দুর্গম উত্তুঙ্গ পর্বতের মতো অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণও তৈরি করে। সাইরাস হ্যামলিন ঠিকই লিখেছেন : "The drama invites a constant revision of response because the unique history of its own composition so clearly involved the same kind of activity. The great books move through time like ships upon the sea, accumulating the effects of scholarship like barnacles and seaweed. Though the structure remains unimpaired, the appearance changes."।

যাকে 'প্রতিক্রিয়ার পুনর্বিবেচনা' বলা হলো, তা নিরন্তর ঘটমান পাঠ-প্রক্রিয়ার ঈপ্সিত ফসল। কিন্তু সমালোচক যাকে 'appearance' বলছেন, তা তত্ত্ববস্তু না অবভাস? কোনো বিশেষ ধারার পাঠক যে-তাৎপর্যে পৌঁছাচ্ছেন, তা কি নির্বিশেষ সত্য হতে পারে? অথবা নির্বিশেষ সত্যের ধারণাও সত্যভ্রম মাত্র! ফাউস্টের মতো কালজয়ী ধ্রুপদী পাঠকৃতি নিরন্তর বিশেষ সত্যের বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে যাবে। সেখানে তাৎপর্য-সঞ্চরণের কোনো নির্বিশেষ ভরকেন্দ্র খুঁজে লাভ নেই। এই নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিতর্ক হতে পারে নিশ্চয়, কিন্তু আপাতত তার প্রয়োজন নেই। আমরা লক্ষ করি, মোটামুটি তিনটি প্রধান ধারায় বিবর্তিত হয়েছে ফাউস্ট-ভাষ্য : দার্শনিক ব্যাখ্যা, ফাউস্ট-প্রত্নকথার উৎস বিষয়ে প্রাচীনপন্থী গবেষণা এবং ফাউস্টের সঙ্গে জার্মানির নিবিড় সম্পর্ক। গ্যয়ঠের সমসাময়িক চিন্তাবিদেরা যেসব দার্শনিক ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছিলেন, মূলত তাঁদের লক্ষ্য ছিল রচনার বিভিন্ন তাত্ত্বিক অন্বীক্ষাগত বিমূর্ততা। ফ্রিডরিখ শ্লেগেল, শেলিং ও হেগেলের ভাষ্য সেই সময়কার তত্ত্ববিশ্ব সম্পর্কে আলোকপাত করে নিশ্চয়, কিন্তু ধ্রুপদী সাহিত্যের সাম্প্রতিক পাঠে এদের প্রাসঙ্গিকতা খুব বেশি দেখা যায় না। ঐ দার্শনিক ব্যাখ্যাগুলির পরাপাঠ-প্রসঙ্গে একটু পরে আসতে চাই। আপাতত ফাউস্ট-প্রত্নকথার উৎসভূমি এবং তার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে, সেদিকে দৃষ্টি ফেরানো যেতে পারে।

দুই

ঠিক কবে যে ফাউস্ট-কিংবদন্তির সূত্রপাত হয়েছিল এবং কী ছিল তার প্রাথমিক রূপ—এখন তা আর নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। অপরিমেয় জ্ঞান ও প্রতাপের বিনিময়ে নিজের আত্মাকে শয়তানের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে কেউ—বিষয়টি খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের দুনিয়ায় একমাত্রিক ছিল না কখনো। নানা অনুষঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে মূল ভাববীজ বিভিন্ন তাৎপর্যে অঙ্কুরিত হয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। প্রাচীনতর পর্যায়ে যিনি হয়তো ছিলেন প্রাচ্যদেশ থেকে আগত যাদু-পুরোহিত ও সম্মানিত জ্ঞানী পুরুষ, খ্রিস্টীয় পরিমণ্ডলে তাঁর ভাবমূর্তি ক্রমাগত ম্লান ও জীর্ণ হয়ে শেষ পর্যন্ত ভণ্ড ও ভানসর্বস্ব হাতুড়ে বৈদ্যতে রূপান্তরিত হলো। এই ভ্রষ্ট মানুষটিকে ইহজীবনে যেমন শাস্তি পেতে হয়, তেমনি মৃত্যুর পরেও অনন্ত কালের জন্যে নরকে নিক্ষিপ্ত হতে হয়। মধ্যযুগ জুড়ে ডাইনি, যাদুকর, অপরাসায়নিক ও ভোজবাজি-প্রদর্শকদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষদের মনে যে সম্ভ্রম ও আতঙ্ক বিরাজ করত—সেই প্রবণতায় ফাউস্টের চরম দুর্বিপাক কল্পিত হয়েছে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে কিংবদন্তির উৎস কেবল ঘৃণা ও ভয় ; কেননা অমিতশক্তিধর মানুষটির পথ গোপনে অনুসরণ করার তাগিদও কম ছিল না তখন। সমাজ-মনের এই স্ববিরোধিতা থেকেই ফাউস্ট-কিংবদন্তি কালে-কালান্তরে শাখা-প্রশাখায় বিবর্তিত হয়েছে। বহুস্বরিক সত্তায় আত্মহনন ও কূটাভাসের পরিসর সন্ধান করেছে নানা যুগের মানুষ, তবে অবশ্যই তাদের নিজস্ব পরিভাষায়।

সাধারণত অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত জনতার মধ্যে অলৌকিক ও লোকনৈতিক উপাদান সম্বলিত জনপ্রিয় লোককথা হিসেবে বহুল প্রচারিত ছিল ফাউস্ট-আখ্যানমালা—তা সহজেই অনুমান করা যায়। সতেরো শতকের সংস্কারবাদী ও ডাইনি শিকারীরা ঐসব কিংবদন্তিকে বেছে নিয়েছিল নিজেদের প্রয়োজনে। সাধারণ মানুষকে যা পাওয়ার অনুমতি দেওয়া যায় না, এমন কি যা চাওয়াও গর্হিত, কালো যাদু দিয়ে সেই জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী হতে চাইলে ন্যায়ের রুদ্র দীপ্ত দণ্ড নেমে আসবে অবধারিত ভাবে—এই ছিল বার্তা। ফাউস্ট যত গুণী হোন না কেন, শয়তানের সঙ্গে চুক্তি করে তিনি ঈশ্বরের অভিপ্রেত বিধিবিন্যাস লঙ্ঘন করেছেন। অতএব তাঁর উপর বর্ষিত কঠোর দণ্ডাজ্ঞা ও শোচনীয় পরিণাম লক্ষ করে আমজনতা যেন জীবনে পালনীয় চর্যা সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করে। এভাবে ফাউস্ট হয়ে উঠেছেন অবিস্মরণীয় আদিকল্প। কেউ কেউ ভেবেছেন, ষোল শতকের শুরুতে জার্মানিতে সত্যিই একজন ব্যক্তি ছিলেন। পরে পূর্বতন সময়ের লোককথা ও কিংবদন্তি তাঁর জীবনকথার সঙ্গে জড়িয়ে যায় এবং নতুনভাবে পল্লবিত হতে শুরু করে। আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি, ইতিহাস কেবল তথ্যের বয়ন করে না ; কখনো কখনো প্রকল্পনা ও প্রণালীবদ্ধ কুহক দিয়ে সমান্তরাল প্রতিবেদনও তৈরি করে নেয়। ফাউস্ট-কথামালার ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটেছে। স্যাণ্ডি সুলমান লিখেছেন : 'The historical Faust may be regarded as little more than a pebble round which has gathered the moss of later legend' (১৯৮৫ : ৯২২)। একসময় ভাবা হত, জোহান ফুস্ট (বা ফাউস্ট) নামে মুদ্রাকর যাঁর

জন্ম ১৪০০ সালে এবং ১৪৬৬তে প্লেগ রোগে যাঁর মৃত্যু, ঐসব কিংবদন্তির ভিত্তি। কিন্তু সেই বক্তব্য পরে বাতিল হয়ে গেছে। মুশকিল এই যে, কুশাগ্রধী ও তথ্যসচেতন পণ্ডিতেরা অজস্রবার চুলচেরা বিশ্লেষণ বা বিতর্ক করেও 'বাস্তব' ফাউস্ট সম্পর্কে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি। এখনও তথ্যানুষঙ্গগুলি অস্পষ্ট এবং রহস্যের কুয়াশায় ঢাকা। প্রকল্পনা ও ইচ্ছাপূরণ যখন সূক্ষ্মভাবে বাস্তবকে নির্মাণ করতে থাকে, নথিপত্রগুলির বিপুল পরস্পর-বিরোধিতা কেবল সংশয়ের পরিধি বাড়িয়ে দেয়।

সমাধান হিসেবে ইদানীং বলা হচ্ছে, দু'ধরনের আপাতগ্রাহ্য পূর্বানুমান বিবেচনা করা যেতে পারে। সম্ভবত ফাউস্ট নামের 'বাস্তব' মানুষটি ডাঃ জেকিল ও মিঃ হাইডের মতো দ্বৈত ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন : একদিকে ধর্মতত্ত্বের সম্মানিত প্রচারক ও অন্যদিকে অশ্রদ্ধেয় কালো যাদুর সৌখিন অনুগামী। কিংবা ফাউস্ট উপাধি বিশিষ্ট দুজন আলাদা মানুষ ছিলেন ; তাঁদের একজন জর্জিয়াস, অন্যজন জোহান। ই. এম. বাটলার 'The Fortunes of Faust' বইতে (কেমব্রিজ : ১৯৭৯) এই তত্ত্ব দিয়েছেন যে জর্জিয়াস ও জোহান সম্ভবত যমজ ভাই। গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে জানা গেছে, কোনো-এক ফাউস্ট জানিয়েছিলেন, তাঁর নাম হলো জর্জিয়াস স্যাবেলিকাস ফস্টার জুনিয়র। এই ব্যক্তি দাবি জানাতেন, তিনি প্রেতাত্মার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে দক্ষ, জ্যোতিষী, অপরাসায়নিক, ভবিষ্যৎ-বক্তা এবং অলোকদৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন। জার্মানির স্পানহাইমের অ্যাবে ট্রিথাইম পদবিযুক্ত জনৈক ধর্মযাজক ১৫০৭ সালের একটি চিঠিতে ঐ ফাউস্টকে বিপুল ঘৃণার সঙ্গে 'নির্বোধ, বুজরুক, শূন্যগর্ভ, আত্মম্ভরী ও হাতুড়ে' বলে বর্ণনা করেছিলেন। ঐ সময়কার আরো কয়েকজন লেখক এই মানুষটি সম্পর্কে একই ধরনের খারাপ ধারণা পোষণ করতেন। তথ্য থেকে জানা যায়, চূড়ান্ত নিন্দনীয় লাম্পট্যের দায়ে অভিযুক্ত এই লোকটি স্কুলশিক্ষকের পদ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। আবার ১৫২৮ সালে হেল্‌ম্‌স্টেভ্‌থের ডাঃ জর্জিয়াস ফাউস্ট জ্যোতিষী হিসেবে উদ্ভট সব ঘোষণা করেছিল বলে জানা যায়। পরে ভবিষ্যৎ কথনের দায়ে ইঙ্গোলস্টাড্‌ড থেকে তাকে নির্বাসিত হতে হয়। আরো একটি নথিতে দেখা গেছে, ১৫৩২-এ নুরেমবার্গ নগরের কর্মকর্তারা ডাঃ ফস্টাস নামক প্রেতাত্মার সঙ্গে সংযোগস্থাপনকারী ও পায়ুকামী ব্যক্তিকে চারিত্রিক শংসাপত্র দিতে অস্বীকার করেছিলেন।

সে-সময়কার অন্য নথি থেকে জানি, ১৫৩৯ সালে কোনো-এক জোহান ফাউস্ট হাইডেলবার্গ থেকে ধর্মতত্ত্বে ডিগ্রি লাভ করেন। পাণ্ডিত্য ও বৌদ্ধিক উৎকর্ষের জন্যে ইনি যথেষ্ট সুখ্যাতিও অর্জন করেছিলেন। অথচ চার বছর পরে ১৫৪৩ সালে, জর্জিয়াস ফাউস্ট নামে এক ব্যক্তি হাইডেলবার্গের অধিদেবতা হিসেবে বর্ণিত হচ্ছেন। তাহলে, এসময় জোহানের কী হলো? নাকি জর্জিয়াস আসলে জোহান? এও জানা যাচ্ছে, সে-সময় এলাকার নানা সরাইখানায় ফাউস্ট উপাধিধারী কোনো ব্যক্তি অর্থহীন বাগাড়ম্বর ও বাড়াবাড়ি রকমের আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করেছে। ১৫২০ থেকে ১৫৪০ এর মধ্যে লিখিত বেশ কিছু নথিপত্রে ফাউস্টের উল্লেখ পাওয়া যায়। এতে সংশয় ও অনিশ্চয়তা বেড়েছে কেবল। জোহান ও জর্জিয়াসের মধ্যে কে যে আসল ফাউস্ট এবং

কীভাবে তার অভিজ্ঞান নির্ণীত হবে, এইসব প্রশ্নের কোনো মীমাংসা হয় না। একটু আগে যে দ্বৈত ব্যক্তিত্বের কথা লিখেছি, এসব কি তার প্রমাণ? নাকি নথিপত্রে দু'জন আলাদা মানুষের বিবরণ পাচ্ছি আমরা? লক্ষণীয় ভাবে ১৫৪০-এর পরে কোনো বাস্তবভিত্তিক অনুপুঙ্খ পাই না ; গুজব ও কিংবদন্তি বাস্তবের মানুষকে পুরোপুরি সরিয়ে দিয়েছে। সম্ভবত এই পর্যায়ে লোককথার স্রষ্টা নিম্নবর্গীয় সমাজ-মন ফাউস্টকে কায়াবান থেকে ছায়ামানুষে রূপান্তরিত করতে শুরু করে। উচ্চবর্গীয় অভিজাত চেতনায় স্বভাবত এই রূপান্তর ছিল গ্রহণের অযোগ্য। এই সূত্রে অত্যন্ত জরুরি একটি কথা বলা যেতে পারে। ফাউস্ট-কিংবদন্তি বা কথামালায় আধিপত্যবাদী বর্গের প্রতাপবাহিত জ্ঞানতত্ত্বের কৃৎকৌশল যখন কৃতকার্য হয়েছে, পাঠকৃতিতে তথাকথিত নান্দনিক পরিসর গড়ে উঠেছে। আর, ধারাবাহিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, ঐ কৃৎকৌশল যখন নিম্নবর্গীয় লোকায়ত মানুষের কাছে পরাভূত হয়েছে—ফাউস্টের অবনমন নথিবদ্ধ হয়েছে গাঢ় কালো রঙে। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে তখন ঐ প্রক্রিয়া আর অভিজাতসেব্য নান্দনিক পরিসরের বিষয় নয় ; প্রান্তিকায়িত লোকসমাজ আখ্যানকে ভিন্ন খাতে বইয়ে নিয়ে গেছে। এই আখ্যানের গভীরে এত অসংখ্য সূক্ষ্ম পর্বসন্ধি ও স্তরবিন্যাস রয়েছে শুধুমাত্র রূপান্তর-প্রক্রিয়ার অন্তর্বর্তী বর্গনির্ভর টানাপোড়েন ও ধুপছায়ার প্রভাবে। ফাউস্ট তো প্রতীকী অস্তিত্ব, যা আসলে বহুধা-অস্থির সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সমাজের মিথস্ক্রিয়ায় গড়ে-ওঠা 'rallying point'।

সুতরাং ফাউস্টের নামে যতটুকু বাস্তব বিধৃত হয়ে থাকুক না কেন, তার কার্যকলাপে উচ্চবর্গীয়দের অনুমোদন না থাকার ফলে ঐ বাস্তবের এবং সমান্তরাল প্রকল্পনারও শ্রেণিচরিত্র হয়ে গেছে ইতিহাস-নির্দিষ্ট। পরবর্তী পর্যায়ের কিংবদন্তিতে ফাউস্ট উপেক্ষিত ও ঘৃণিত অন্তেবাসীদের একজন। তাদের সঙ্গে মিশেছেন সেইসব ব্রাত্য পল্লিতে, ভাঙা সরাইখানায় যেখানে আলোর চেয়ে অন্ধকার বেশি গাঢ়। ভণ্ড পণ্ডিত, হাতুড়ে, বৈদ্য, বাজিকরদের ছায়াচ্ছন্ন জগতে ফাউস্ট নিজের ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা নিয়ে গর্ব করতেন, আশ্চর্য সব অলৌকিক কাজ করে দেখাতেন। এমনও হতে পারে, সেই ছায়াচ্ছন্ন জগতে কায়ার চেয়ে ছায়া দীর্ঘতর এবং একই কারণে অবয়বও রহস্যে-মোড়া। বাস্তবের সঙ্গে ইন্দ্রজাল মিশে গিয়ে সত্যভ্রম ও সত্য একাকার হয়ে গেছে। লোকমনে ক্রমশ তাতে যুক্ত হয়েছে আরো বিচিত্র উপাদান। এভাবে অন্তেবাসী নিম্নবর্গীয় লোকসমাজেই ফাউস্টের অলৌকিক ক্ষমতার খ্যাতি দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্বভাবত কিছু দিনের মধ্যেই এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হলো যখন প্রত্যেকে নিজের বিজ্ঞতা প্রমাণ করার জন্যে ফাউস্টের ভুতুড়ে কাজ করার শক্তি, ডাইনিবিদ্যায় পারঙ্গমতা, যাদুবিদ্যা ও ভোজবাজির ক্ষমতার বেশ কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে লাগলেন। তখনকার জনমানস বিনা প্রশ্নে এইসব কল্পকথা মেনে নিয়েছিল। উদ্ভট ও অযৌক্তিক বিষয়ের সহাবস্থান যখন স্বাভাবিক, উচ্চবর্গীয়দের জটিল ধর্মতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসার কোনো প্রাসঙ্গিকতা থাকে না। ধীরে ধীরে জনচিত্তে মান্যতাপ্রাপ্ত লোকযান-লোকশ্রুতি-লোককথা হিসেবে তাই ফাউস্ট-কিংবদন্তিমালার অবিসম্বাদী প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। কিন্তু সমাজের উঁচুতলার

বাসিন্দাদের বিশ্ববীক্ষায় এইসব প্রতিভাত হলো অপরিশীলিত অপর পরিসরের সীমাহীন স্থূলতা ও অজ্ঞতার অভ্রান্ত নিদর্শন বলে। এইজন্যে যাদুবিদ্যা সম্পর্কিত পরিশীলিত প্রতিবেদনে ফাউস্টের স্থান প্রায় হলোই না। অলৌকিক বিষয়কে যাঁরা প্রত্ন-যুক্তিবাদী বা প্রত্ন-মানবতন্ত্রী অবস্থান থেকে প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চায় সম্পৃক্ত করে নিয়েছিলেন—তাঁদের কাছে ফাউস্টের 'অলৌকিক' কার্যকলাপ ছিল অন্ধজনদের দৃষ্টিহীনতার প্রমাণপত্র। একজন জালিয়াত নিজেকে বাগাড়ম্বর দিয়ে বিরাট যাদুকর বলে জাহির করতে গিয়ে সমস্ত সীমা পেরিয়ে গেছে। নইলে কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের ব্যক্তি কি দাবি করতে পারে যে তার অলৌকিক ক্ষমতার কাছে, এমন কি যিশুখ্রিস্টও তুচ্ছ? কিংবা, প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের রচনা যদি কোনোদিন হারিয়েও যায়—সেসব কেবল পুনরুদ্ধারই করবে না ফাউস্ট, আরো উৎকৃষ্টও করে তুলতে পারবে!

তিন

ষোড়শ শতকের মোটামুটি বিশ্বস্ত তথ্যপঞ্জীয়ক ও দানবতত্ত্ববিদ জোহানেস হ্বিয়ের (১৫১৫-১৫৮৮) 'ডে প্রেস্টিজিস ডের্মোনুম' বইতে লিখেছেন, ফাউস্ট ভণ্ড পণ্ডিত, হাতুড়ে আর ছদ্ম-যাদুকর ছাড়া অন্য কিছু নয়। সাধারণ মানুষদের বিভ্রান্ত করার জন্যে সে প্রচার করেছে, স্বয়ং শয়তানের সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এতে ধূসর অতীতের কিংবদন্তিতুল্য যাদুকরদের ধারায় তার প্রতিষ্ঠা জনমানসে প্রোথিত হয়ে গেছে। কিন্তু আসলে ফাউস্ট হলো ভবঘুরে মাতাল ; সে ক্র্যাকো শহরে যাদু শিখে জার্মানির সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়ে চালাকি, প্রতারণা ও মিথ্যা কথার জাল বুনে গেছে। এসময়কার ধ্রুপদী বিদ্যার গবেষক জোয়াকিম ক্যামেরিয়াস (১৫০০-১৫৭৪) ফাউস্টের ভোজবাজি-কুশলতার কথা বলেছেন। আর, ১৫৩৯ সালে বেগার্ডি নামে এক চিকিৎসক ফাউস্টকে 'ধূর্ত, দুষ্ট, অকর্মণ্য, অশিক্ষিত, হাতুড়ে বৈদ্য' বলে বর্ণনা করেছেন। এরকম নিন্দাসূচক বয়ানের অভাব নেই। তাহলে, শেষ পর্যন্ত ফাউস্ট-কথা মান্যতা হারাল না কেন? উচ্চবর্গীয়দের 'নৈঃশব্দ্যের চক্রান্ত' যুগে-যুগে দেশে দেশে কত পাঠকৃতির ধারাকে আমূল রূপান্তরিত করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। শাদা হয়েছে কালো, কালো হয়েছে শাদা ; সোচ্চার হয়েছে নিরুচ্চার, নিরুচ্চার হয়েছে সোচ্চার। সুতরাং ফাউস্টের কাহিনিও অভিজাত উচ্চবর্গীয় চেতনায় নিরাকৃত হয়েছে। অথচ তার জনপ্রিয়তা বিরক্তির কারণ হওয়া সত্ত্বেও উপেক্ষা করা যাচ্ছিল না। এভাবে হয়তো তা জার্মানির লোককথা-ভাণ্ডারে আত্তীকৃত হয়ে যেত। নস্ত্রাদামুস, পারাসেলসুস, আগ্রিপ্পার মতো বিখ্যাত যাদুকর ও ভবিষ্যৎ-বক্তাদের প্রতিতুলনায় ফাউস্ট হয়তো ততটা উজ্জ্বল হতে পারতেন না, কিন্তু তবু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাঁর নাম আধুনিক কালে পৌঁছে যেত ঠিক। প্রাগুক্ত তিনজনও শয়তানের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে নিয়েছিলেন, এমন জনশ্রুতি রয়েছে। সুতরাং কোথায় সেই অনন্যতা কিংবা ইতিহাসের বাধ্যবাধকতা—যার ফলে প্রবল বিরোধিতাও ফাউস্ট-কথাকে ক্রমশ পরিশীলিত আখ্যানবীজে রূপান্তরিত হতে বাধা দিতে পারল না?

এর অন্যতম বড়ো কারণ সম্ভবত এই যে, নিম্নবর্গীয় মানুষদের কাছে ফাউস্ট-কথা শুধুমাত্র কিংবদন্তি বা যাদুবিশ্বাসের ব্যাপার ছিল না। তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের নানা দৃশ্য ও অদৃশ্য আয়তন ছুঁয়ে যেত ফাউস্ট-কথার চর্চা, গভীরে আলোড়িত করত। এছাড়া উচ্চবর্গীয়দের সবাই প্রতিরোধে শামিল হয়েছিলেন, তা কিন্তু নয়। প্রোটেস্টান্ট চেতনার উন্মেষ হলো যখন, ঐতিহ্যবাহিত ধর্মতত্ত্বের বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে ঐ মতাবলম্বীরা ফাউস্টের জ্ঞানতৃষ্ণা ও অনন্ত শক্তির আকাঙ্ক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিব্যক্তি দেখতে পেলেন। এছাড়া সমাজের নিচুতলার মানুষদের নতুন মতের প্রতি আকৃষ্ট করার সহজ উপায় তাঁরা ঐ ব্যাখ্যার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন। আজকের পরিভাষায় যাকে আমরা বলি সাংস্কৃতিক রাজনীতি, ষোল শতকের জার্মানিতে তারই অভিঘাতে ফাউস্ট-কথায় যুক্ত হলো তাৎপর্যের নতুন মাত্রা। এই প্রেক্ষিতেই স্যুইজারল্যান্ডের জোহান গাস্ট নামে জনৈক প্রোটেস্টান্ট যাজক প্রথম ফাউস্টের মধ্যে যথার্থ অলৌকিক ক্ষমতার বিভা লক্ষ করলেন। ১৫৪৮ সালে ধর্মমত প্রচারের এক সভায় তিনি ফাউস্টের সঙ্গে আহার করার সময় তাঁর আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করলেন। এমন কিছু খাদ্যদ্রব্য পরিবেশিত হয়েছিল, যা তখন পাওয়ার কথাই নয়। ফাউস্টের অলৌকিক শক্তি না-থাকলে তা সম্ভব হত না। ফাউস্টের ঘোড়া ও কুকুর প্রয়োজনমতো ভৃত্যের রূপ ধারণ করত কেননা এরা আসলে ছিল দৈত্য। না-লিখলেও চলে, লোকায়ত বিশ্বাসকে ব্যবহার করে প্রোটেস্টান্ট ধর্মমত নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছিল। শয়তানের সঙ্গে ফাউস্টের সম্পর্ককে তাঁরা ব্যাখ্যা করেছিলেন প্রাতিষ্ঠানিক প্রতাপের উপযুক্ত বিকল্প চর্যা হিসেবে। লুথার এবং বিশেষত তাঁর অনুগামী মেলাঙ্কথোন পুনঃকথনের মধ্য দিয়ে ফাউস্ট-কথাবৃত্তকে নতুন ধরনের মান্যতা দিলেন। শেষোক্ত জন বলেছিলেন, ফাউস্ট একবার তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী যাদুকরকে পুরোপুরি খেয়ে ফেলেছিলেন। অবশ্য ভেনিসে উড়ে চলে যাওয়ার চেষ্টায় তিনি ব্যর্থ হন।

বোঝাই যাচ্ছে এ ধরনের প্রচারের সাক্ষ্য-প্রমাণের কোনো প্রয়োজন ছিল না। কেননা উৎসুক শ্রোতারা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিশ্বাসের ভাণ্ডারে আরো রোমাঞ্চকর ও নতুন তথ্যের যোগান চায়। এজগতে বিশ্বাসই শেষ কথা, তর্ক বা সংশয় অবান্তর। সুতরাং ফাউস্টের মৃত্যু-বর্ণনায় দেখা গেল, স্বয়ং শয়তান তাকে পরলোকে নিয়ে যেতে এসেছিল। তখন সমস্ত ঘরদোর থরথর করে সশব্দে কেঁপে উঠেছিল। কেউ বা বললেন, ফাউস্টের শরীর বহুখণ্ড হয়ে গিয়েছিল ; কারো মতে, শবদেহ পাঁচবার উপুড় হয়ে গিয়েছিল যদিও প্রত্যক্ষদর্শীরা প্রাণপণে চিৎ করে রাখতে চাইছিলেন। এইসব অনুপুঙ্খই প্রমাণ দেয়, ফাউস্ট ইতিহাস ও বাস্তবের অনেক বাইরে ইতিমধ্যে চলে গেছেন ; তিনি হয়ে উঠেছেন জনগণের যৌথ সম্পত্তি যাকে যে-যেমন-খুশি ব্যবহার বা রঞ্জিত করতে পারে। কিন্তু এতসব পুঞ্জীভূত উপকরণের ভার সত্ত্বেও ফাউস্ট যে আসলে ঠিক কোন্ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন—সে-বিষয়ে তাঁর নিজের শতকই নিশ্চিত ছিল না। এই যে মৌল কূটাভাস—তা কথাবৃত্তের পরিণত পর্যায়েও অটুট থেকেছে। গ্যয়ঠের

নাট্য-পাঠকৃতি তাই এত রহস্যময়, এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দ্যোতনা সম্পন্ন। কয়েক শতকের ব্যবধানে ফাউস্ট এখন প্রত্নকথার নির্ঝর নিশ্চয় ; কিন্তু এই প্রবণতাও সূচনাপর্বে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। তাই ১৫৭০ থেকে ১৫৭৮ সালের মধ্যে পাঁচটি ফাউস্ট-কথার পাণ্ডুলিপি সংকলন বেরিয়েছিল। তবে এই কথামালার সর্বত্রব্যাপ্ত খ্যাতির সূচনা হয় অজ্ঞাতনামা লেখকের 'ফাউস্ট বুক' প্রকাশের পরে। ১৫৮৭ তে জোহান স্পাইস ফ্রাঙ্কফুর্টে বইটি প্রকাশ করেন। গবেষকেরা জানিয়েছেন, এই বইয়ের কিছু কিছু বৃত্তান্ত হেগেলের 'এরফুর্ট ক্রনিকল'-এ সরাসরি তুলে নেওয়া হয়েছে। আর, ভার্জিল-মেলিন-পোপ দ্বিতীয় সিলেভেস্টার আলবের্তুস ম্যাগনাস, সিমোন ম্যাগাস প্রমুখ কিংবদন্তি তুল্য ব্যক্তিদের সম্পর্কে প্রচলিত অতিলৌকিক কাহিনি এই বইতে ফাউস্টের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষে কৃষ্ণকথা যেমন নানা জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত অবদানে কার্যত দুই সহস্রাব্দেরও বেশি সময় ধরে বিকশিত হয়েছে এবং বিভিন্ন উৎসজাত অজস্র পরস্পরবিরোধী উপাদানের সংশ্লেষণ তাতে ঘটেছে তেমনি ফাউস্ট-কথাও নির্দ্বিধায় সব কিছু আত্মসাৎ করে নিয়েছে। এদের মধ্যে মাত্রা ও আয়তনের পার্থক্য থাকলেও প্রবণতার দিক দিয়ে সাদৃশ্য রয়েছে।

ফাউস্ট-বুকের সাহিত্যিক মূল্য হয়তো খুব বেশি নেই। কিন্তু পরবর্তী যুগের বহু সার্থক রচনার তা প্রেরণাস্থল। ফাউস্টের ভোজবাজি ও চাতুর্য সম্পর্কে যে পরিহাস বিজল্পিত প্রকাশভঙ্গি লেখক গ্রহণ করেছিলেন, তখনকার পরিবেশে সেই ভঙ্গিই ছিল তাঁর সমালোচনা। এর বেশি কিছু করা তখন সম্ভব ছিল না। কেননা তাহলে ঠিক উল্টো মেরুতে অর্থাৎ উচ্চবর্গীয় সুলভ প্রত্যাখ্যানসূচক মনোভঙ্গিতে চলে যেতে হত। অবশ্য একথাও লেখা প্রয়োজন যে অজ্ঞাতনামা লেখক স্পষ্টতই তাঁর বিবৃত কাহিনির সত্যতায় আন্তরিক ভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। কারণ, তিনিও তো মূলত ঐতিহ্যের পরম্পরাকে স্বীকৃতি জানাচ্ছেন ফাউস্ট-কথাবৃত্তের প্রণালীবদ্ধ পুনর্নির্মাণ করে। তাঁর কৃতিত্ব এখানেই যে অত্যন্ত সীমিত সুযোগ সত্ত্বেও নরক বর্ণনার স্বাচ্ছন্দ্যে এবং যাদুকরের উদ্বেগদীর্ণ মনের চমৎকার উপস্থাপনায় তিনি নিজেকে প্রত্ননাট্যকার বলে চেনাতে পেরেছেন। ট্রয়ের হেলেনকে নরক থেকে ডেকে আনার মধ্য দিয়ে ফাউস্টের আত্মিক সর্বনাশ চূড়ান্ত হওয়ার প্রকল্পটি ইংরেজ নাট্যকার ক্রিস্টোফার মার্লোর কল্পনা-প্রতিভাকে উদ্দীপিত করেছিল। 'ডক্টর ফস্টাস' নাটকের প্রাসঙ্গিক পঙক্তিগুলি রচনালাবণ্যের বিচারে সমগ্র ইংরেজি সাহিত্যের মধ্যে অবিস্মরণীয় অভিব্যক্তি ও চিরস্থায়ী সম্পদের অন্যতম :

> 'Was this the face that launched a thousand ships.
> And burnt the topless towers of Ilium ?
> Sweet Helen, make me immortal with a kiss !'

এছাড়া আধুনিক জার্মান উপন্যাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থপতি টমাস মানও 'ডক্টর ফস্টাস' (১৯৪৭) এর পাঠকৃতিতে মূল 'ফাউস্ট বুক' এর বেশ কিছু অংশ ব্যবহার করেছেন।

ফাউস্ট-কথাবৃত্তে মেফিস্টোফিলিসের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আঠারো শতকে তার নাম ঈষৎ পরিবর্তিত হয়েছে। মেফিস্টোফিলিসের ভীতি-উদ্রেককারী ব্যক্তিত্ব গহনশায়ী খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাসের সমর্থনে সাহিত্যে-শিল্পে নিজস্ব পরিসর গড়ে নিয়েছে। 'ফাউস্ট-বুক' এর অসামান্য জনপ্রিয়তার প্রমাণ মেলে প্রথমত বিভিন্ন ভাষায় তার অনুবাদ প্রকাশে এবং দ্বিতীয়ত একাদিক্রমে আরো কয়েকটি 'ফাউস্ট বুক' রচনায়। আদি গ্রন্থটি হাই জার্মান থেকে লো জার্মান, ড্যানিশ, ওলন্দাজ, ইংরেজি, ফরাসি, পোলিশ ও চেক ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। এছাড়া আরো কয়েকটি গদ্য-সংস্করণ ও একটি পদ্য-সংস্করণও ক্রমশ জার্মানির বিভিন্ন শহরে প্রকাশিত হয়। ১৫৯৯-এ বেরোল রুডল্ফ্ হ্বিডম্যান রচিত আরেকটি 'ফাউস্ট বুক'। মূল গ্রন্থনার খানিকটা শিথিলীকৃত রূপ দেখি এখানে। লেখক ধর্মীয় প্রচারমূলক বেশ কিছু অংশ যোগ করেছেন ; এতে ক্যাথলিক-বিরোধী ইহুদি-বিদ্বেষী অবস্থান তীব্রভাবে প্রকট। জোহান পিফিট্জের ১৬৭৪-এ বইটির সম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৭১২ সালে এই পুঁথির সর্বশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং জনপ্রিয়তায় তা এজাতীয় সমস্ত পুঁথিকে ছাড়িয়ে যায়। কোনো-এক অজ্ঞাতনামা লেখক 'খ্রিস্টবিশ্বাসী' অভিধার আড়ালে থেকে 'The League with the Devil Established by the World-Famous Archnecromancer and Wizard Dr Johann Faust' নামক বইটি লেখেন। অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করে তা অচিরেই আদি ফাউস্ট-পুঁথিকে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে দেয়। তবু, ইতিমধ্যে লক্ষ করেছি, সেই পুঁথির ইংরেজি অনুবাদ (১৫৯২) পড়ার পরেই মারলো তাঁর অসামান্য নাটকটি লেখেন। তিনি অবশ্য অতলান্ত ট্র্যাজেডির মধ্যেও খানিকটা কমেডির সুর যোগ করে দিয়েছিলেন। যাঁরা মারলোর মতো প্রতিভাশালী নন এবং 'intricate symmetry of art' কে বয়ানে বজায় রাখার মতো সংবেদনশীলতা যাঁদের ছিল না—পরবর্তী কালে তাঁদের হাতে ফাউস্ট-কাহিনির প্রহসনাত্মক সংস্করণ রচিত হয়। এদের মধ্যে উল্লেখ্য উইলিয়াম মাউন্টফোর্টের 'Life and Death of Dr Faustus with the Humours of Harlequin and Scaramouche' এবং জন থারমোণ্ডের মূকাভিনয় সংস্করণ 'Harlequin Dr. Faustus' যা ১৭২৪-এ দর্শক-সাধারণের কাছে পরিবেশিত হয়েছিল।

মারলোর নাটক সতেরো শতকের ভ্রাম্যমান ইংরেজ নাট্যগোষ্ঠীদের দ্বারা জার্মানিতে অভিনীত হয়েছিল। কিন্তু খুব কম মানুষই যেহেতু ইংরেজি ভাষায় রচিত সংলাপের কাব্যিক সূক্ষ্মতা বুঝতে পারত, অনুষ্ঠানের চটজলদি সাফল্যের জন্যে নাটকের প্রযোজক, পরিচালক এবং অভিনেতারা বিষমানুপাতিক ভাবে কমেডির উপাদানে বেশি জোর দিচ্ছিলেন। এর ফল দাঁড়াল এই যে এতে প্রভাবিত হয়ে প্রচুর জার্মান পাঠ তৈরি হয়ে গেল যেখানে ফাউস্ট-কথার ঐতিহ্য খোদ জার্মানিতেই গভীর ভাবে অনুসৃত হলো না। বরং সরলীকৃত সাফল্যের পথ ধরে চলতে গিয়ে লিখিয়েরা উৎস-পাঠ থেকে বিচ্যুত হলেন। বলা ভালো, বয়ানে বিকৃতি ঘটালেন। প্রহসন ও অলৌকিকতার অভিনব মিলনে উদ্ভূত হলো বকচ্ছপ মূর্তি যা কিনা জনমনোরঞ্জনের ফাঁদে পড়ে জনচিত্তে ফাউস্ট

পরিগ্রহণের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করল। ইউরোপের মঞ্চগুলিতে দুশো বছর ধরে ফাউস্ট বিষয়ক নাট্যবিনোদন যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। মারলোর নাটকের নবগৃহীত অবয়ব ও চরিত্র কেন এত নিরবচ্ছিন্ন জনসমর্থন পেয়ে গেছে, এর তাৎপর্য অনুসন্ধান অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু সেই কৃত্য এখানে নয়। এইটুকু শুধু বলা যেতে পারে, সময়-সংবিদের ভ্রান্ত পাঠ চিরকালই কুহক ও শিল্পকে সমার্থক করে তোলে। অন্যভাবে একে বলা যেতে পারে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরে কুহকি সময়ের অন্তর্ঘাত। আবার এই নতুন প্রকরণে হয়তো বা অন্বিষ্ট সেই মাধ্যমিক মার্গ যেখানে উচ্চবর্গীয়েরা গজদন্তমিনার থেকে নেমে এসে নিম্নবর্গীয় শিল্পচেতনার সঙ্গে বেশ খানিকটা সমঝোতা করে নিতে পেরেছেন। আর, নিম্নবর্গীয়েরা নিজেদের কথন-প্রকরণ বজায় রেখেই শ্লেষ-প্রহসন-পরিহাসের সূত্রে উচ্চবর্গীয় চেতনা-পরিসরে অনেকখানি ঠাঁই করে নিয়েছেন। প্রশ্ন নিশ্চয় পুরোপুরি প্রকরণের নয়, অন্তর্বস্তুরও ; কিন্তু সতেরো শতকের শেষে ও আঠারো শতকের গোড়ায় প্রকরণের আয়নায় ভাববিশ্বকে যাচাই করা ও পুনর্জীবন দেওয়ার প্রক্রিয়াকে দেখাই বড়ো হয়ে উঠেছিল। তাই ১৭২৮-এ ইংরেজি পুতুল-নাচের অনুষ্ঠানে ফাউস্ট-কথা বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। গোটা ইউরোপ জুড়ে এ-ধরনের অনুষ্ঠান বহুদিন খুব জনপ্রিয় ছিল। যদিও এতে প্রাকরণিক বাধ্যবাধকতার জন্যে ক্যাসপার নামক বিদূষকের ভাঁড়ামি মাত্রাতিরিক্ত প্রাধান্য পেত, তবু ফাউস্টের ট্র্যাজেডির কারুণ্য ও নরকের দহন দেখানোয় কোনো ত্রুটি থাকত না।

চার

নাটকে এবং সাহিত্যের অন্যান্য মাধ্যমে ফাউস্ট-কথামালার ক্রমবিকাশ যেহেতু বহুরৈখিক ও বহুমাত্রিক, এদের তাৎপর্য অন্বেষণের জন্যে বিদ্বজ্জনদের প্রয়াস অনেকান্তিক নয় কেবল—কার্যত তা অনন্তে পৌঁছে গেছে। ব্যালে এবং অপেরায় এর পুনঃপ্রয়োগও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। এছাড়া অল্পমেধা ব্যক্তিদের মধ্যে ঐন্দ্রজালিক গ্রন্থরচনার তাড়না ফাউস্ট নামক কামধেনুতুল্য নামকে আশ্রয় করে এমন উৎকটভাবে ব্যক্ত হয়েছিল যে সতেরো ও আঠারো শতক জুড়ে প্রবাহিত হলো উদ্ভট ও অর্থহীন ঘোলা জলের স্রোত। কূট প্রতারণা ও অন্ধ কুসংস্কারের সংযোগ ঘটল ঐসব ছদ্ম-প্রতিবেদনে। ইন্দ্রজাল-ভাবনা থেকে সূক্ষ্মতা ও মনন তখন পুরোপুরি নির্বাসিত। এই ধারাটিও লক্ষ করতে হয় আঠারো শতকের প্রেক্ষিতকে তার সমগ্রতায় বুঝতে চাই বলে। ১৭৪৯ সালের ২৮ আগস্ট জন্ম হলো যাঁর, সেই জোহান হুলগ্যাঙ্গ ভন গ্যয়ঠে এই প্রেক্ষিত ও ঐতিহ্যকে আপন সত্তায় শুষে নিয়েছিলেন। আঠারো শতকে ছিলেন লেসিং এর মতো লেখকও যিনি ফাউস্ট-কথার বহিরঙ্গে গুরুত্ব দেননি ; বরং অন্তর্বৃত তাৎপর্য সন্ধান করে ঐ কথাবীজে পুরোপুরি নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন। লেসিং এবং গ্যয়ঠে ছিলেন যথার্থ অর্থে আলোকপ্রাপ্ত সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিত্ব। তাই ঐতিহ্যবাহিত উপকরণ সম্পর্কে অবহিত হয়েও ইন্দ্রজালের মায়ার প্রতি মোটেই আকৃষ্ট হননি। তাঁরা ফাউস্টকথায় খুঁজেছিলেন মানবসত্তার অস্তিত্বতাত্ত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা-সংশয়-সমাধানের প্রতিবেদন।

এইজন্যে ফাউস্টের ক্রমিক বিপর্যয়-পরাজয়-নরকপ্রাপ্তিতে থেমে যাননি তাঁরা, ঈশ্বরের হস্তক্ষেপে নায়কের মুক্তিও দেখিয়েছেন। লেসিং যুক্তিবাদী মন নিয়ে ভেবেছিলেন, মানবজাতির ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে জ্ঞানের সন্ধানই মানুষকে সবচেয়ে বেশি গৌরব দিয়েছে। তিনি ফাউস্টকে নিয়ে একটি নাটক লিখেছিলেন যার অংশবিশেষ মাত্র আমাদের হাতে পৌঁছেছে। এর ভিত্তিতে বলা যায়, বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গে যাদুকরের অন্বয় পুনঃস্থাপনই কেন্দ্রীয় বার্তা হিসেবে প্রতিভাত হয়েছিল তাঁর কাছে। চোখ-ধাঁধানো মন-ভোলানো ভানুমতীর ভেল্কি দেখানো তো সাহিত্যিকের প্রাথমিক কৃত্য হতে পারে না। বরং পুঞ্জীভূত সত্যভ্রমের ভিড় থেকে সত্যকে আবিষ্কার করার মধ্য দিয়ে কালজীর্ণ গণ্ডি থেকে উত্তরণ ঘটে তাঁর, কালোত্তর বয়ান নির্মাণ করে তিনি নশ্বরতা থেকে বিষয়বস্তুকেও মুক্তি দেন।

এই উপলব্ধি বেশ কিছু উত্তরসূরি লেখকদের আলোড়িত করেছিল, যাঁদের মধ্যে গ্যয়ঠে প্রধান। ফাউস্ট-কথার বারবার পুনর্লিখন ও পুনর্বিন্যাস করে তিনি 'ফাউস্ট'-এর মৃত্যুহীন পাঠকৃতিতে পৌঁছেছেন। বইটির প্রথম খণ্ড ১৮০৮-এ এবং দ্বিতীয় খণ্ড, লেখকের মৃত্যুর পরে, ১৮৩২-এ বেরিয়েছিল। প্রথম খণ্ডের পূর্বলেখে মুক্তির প্রতিশ্রুতি আভাসিত হয়েছে; আর, দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ অঙ্কে সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে। এই অমর সাহিত্য-কীর্তি নিছক ভিন্নভাবে প্রস্তাবিত বহুসমাপ্তি বিশিষ্ট প্রাচীন কিংবদন্তির পুনর্লিখন মাত্র নয়। এ আসলে মানবজীবনের নিয়তি সম্পর্কে দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভাষ্য। ফাউস্ট হচ্ছেন জ্ঞানপিপাসু মানবাত্মার প্রতীক। জ্ঞান-সন্ধানের পথে বিভ্রান্ত মানুষ যত পাপই করুক না কেন, জ্ঞান ও সত্যের জন্যে অনুসন্ধিৎসাই তাকে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের ক্ষমা ও মুক্তির অধিকারী করে তোলে। বস্তুত গ্যয়ঠের ফাউস্টে এই কিংবদন্তির অন্তর্বর্তী শিল্প-সম্ভাবনা চূড়ান্ত শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে গেছে। অবশ্য অন্য খ্যাতনামা লেখকেরা সবাই যে লেসিং ও গ্যয়ঠের পথ অনুসরণ করেছিলেন, তা কিন্তু নয়। এঁরা মূলত পরম্পরাগত চিন্তাপ্রস্থানের অনুসারী ; বিশেষত মারলো যেভাবে নিরয়-প্রাপ্ত ফাউস্টের ট্র্যাজিক পরিণতি চিত্রিত করেছেন—তা তাঁদের শিল্পবোধের প্রেরণা ছিল। তাই সেসব পাঠকৃতিতে নায়কের মুক্তির কোনও সম্ভাবনাই নেই। এইসব লেখক গ্যয়ঠের রচনার উপসংহার মেনে নিতে পারেননি। ফাউস্টের জগৎ তাঁদের কাছে নিরন্ধ্র অন্ধকারের জগৎ বলে প্রতিভাত হয়েছিল ; অন্ধকারের উৎস থেকে উৎসারিত কোনো আলোর রেখা তাঁদের কল্পনায় ধরা দেয়নি।

১৯৪৬ সালে প্রকশিত 'মন ফাউস্ট' বইতে পল ভালেরি বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলেন সেই অপূরণীয় ক্ষতির ওপর যা চূড়ান্ত জ্ঞান অর্জন করতে গেলে অবধারিত, কারণ তা অফুরন্ত শক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত। তেমন শক্তির কাণ্ডজ্ঞানহীন অপপ্রয়োগও অনিবার্য। তার মানে ব্যক্তিগত ও সামূহিক স্তরে অভাবনীয় বিপর্যয়, সমস্ত সামঞ্জস্যবোধের অবসান। ইতিমধ্যে টমাস মানের অসামান্য উপন্যাস 'ডক্টর ফস্টাস'-এর কথা উল্লেখ করেছি। এই জটিল উপন্যাসের প্রতীকীবিশ্বে ইতিহাসের মৌল তাৎপর্য যেমন পরীক্ষিত হয়েছে, তেমনি শিল্পস্রষ্টার স্বভাবে ও জীবনে নিহিত

কূটাভাসগুলিও বিশ্লেষিত হয়েছে। মানের উপন্যাসবিশ্বের প্রধান কুশীলব আদ্রিয়ান লিভারকুহন্ চিরাগত ফাউস্টকথার সময়োচিত পুনর্নির্মাণের সূত্রধার। ফাউস্ট ও মেফিস্টোফিলিসের অত্যন্ত জটিল সম্পর্ক মানের প্রতিবেদনে খানিকটা কার্নিভালের সুরে বেজে উঠেছে। যুগের প্রয়োজনে শয়তানেরও রূপবদল হয়েছে। আভাঁগার্দ সঙ্গীতের পুঁজিপতি ইম্‌প্রেশারিও সাউল ফিটেলবের্গ পার্থিব ও ব্যঙ্গাত্মক ভূমিকায় শয়তানকে বিনির্মাণ করে নিয়েছেন যেন। ধর্মতত্ত্ব থেকে সঙ্গীতের জগতে চলে এসে আদ্রিয়ানও চিন্তাশৈত্য ও অবসাদের শিকার। সাধারণভাবে শিল্পকলা ও বৌদ্ধিক পরিসরের এবং বিশেষভাবে সঙ্গীত জগতের সাম্প্রতিক বাস্তব পরিস্থিতি তার অজানা নয়। বর্তমান সময় প্রতিটি অনুষঙ্গের শিল্প ও সঙ্গীত সৃষ্টির প্রতিকূল ; তাহলে সময় নামক পিঞ্জর থেকে মুক্ত না-হয়ে এবং সক্রিয় ও দৃঢ়ভাবে তাকে প্রত্যাখ্যান না-করে কীভাবে যথার্থ উঁচুদরের সঙ্গীত সৃষ্টি করা সম্ভব? পুঁজিবাদী সমাজের পক্ষে মানানসই স্পেকুলেটর হিসেবে শয়তানের প্যারডিকৃত অবস্থানে সাউল ফিটলবের্গের ভরসা হলো 'the scandalous today which tomorrow will be the fashion the dernier cri the best seller in short art'। সে আদ্রিয়ানের জন্যে কিছু করার প্রস্তাব দেয় : 'And still figures-vous, I have come to tempt you away to betray you to a temporary unfaithfulness, to bear you on my mantle. Through the air and show you the kingdom, of the earth and the glory of them today them, at your feet' অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে বাস্তবের চেহারা বদলে যাবে, বাস্তবের সঙ্গে বাচন; কিন্তু নির্যাস একই থাকে।

আদ্রিয়ান অবশ্য সাউলের প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। কারণ, সে আত্মগত ধরনে বিশ্বাস করে ; তার শিল্পের বাস্তবে সামাজিক ভিত্তি আছে কি নেই, এ নিয়ে মাথা ঘামাতে সে রাজি নয়। কিন্তু প্যারডির সঙ্গে শ্লেষ ও বিষাদ মিশে যায় যখন দেখি ঐ ঘৃণা ও বিরোধিতা সত্ত্বেও তার শিল্পও শেষ পর্যন্ত সামাজিক ভিত্তি ও সাংস্কৃতিক আবহেরই ফসল। আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে অনিবার্য নিয়মকে সে এড়িয়ে যেতে পারে না। অথচ আদ্রিয়ান এই অবভাসের মধ্যে থেকে তর্ক করে যায় যে সমসাময়িক সামাজিক প্রেক্ষাপট ও ঘটনাবলি থেকে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। কোনো কিছুই সে মেনে নিচ্ছে না বা ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে না। কিন্তু প্রকৃত সত্য তার বিপরীত। জীবনের মর্মমূলে প্রচ্ছন্ন কূটাভাস সম্পর্কে অবহিত বলেই আদ্রিয়ান সব কিছুর মধ্যে প্যারডির ছায়া দেখতে পায়। প্রশ্ন করে নিজেকেই : 'Why does almost everything seem to me like its own parody, why must I think that almost all, no, all the methods and contentions of art today are good for parody only.' অত্যন্ত মৌলিক এই জিজ্ঞাসা আধুনিক শিল্পকলা ও সাহিত্য সম্পর্কে উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু আধুনিকীকৃত ফাউস্টেরও কোনো প্রতিরক্ষাব্যূহ নেই। তাকেও শেষ পর্যন্ত হার মানতে হয় সময়ের নিষ্ঠুর সাঁড়াশি-আক্রমণে। গিয়র্গ লুকাচ আদ্রিয়ানের প্রতিবেদনে আধুনিক শিল্পকলার ট্র্যাজেডি লক্ষ করেছিলেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন : 'Why this

defencelessness? Whence this impotence of insight. conviction and sentiment ?' (Essays on Thomas Mann : 1964 : 91).

নিজেই অবশ্য উত্তর দিয়েছেন লুকাচ, নির্দিষ্ট সময়-পরিধির ভাবাদর্শগত অবস্থানই সাহিত্যে ও শিল্পে নানা রূপকে ও চিহ্নায়কে ব্যক্ত হয়। নতুন ফাউস্টের ট্র্যাজেডি আসলে কালস্রোতে ভেসে-যাওয়া সেই জাতির সামূহিক বিপত্তির সন্দর্ভ যারা 'deliberate rebarbarization' -এর শিকার। এখন কোন্ উৎকেন্দ্রিক শিল্পকলার পক্ষে কথা বলা যাবে? আদ্রিয়ান তো এক দর্পণ যার চিন্তায় সেরেনুসের মতো আমরাও কঠোর ঐতিহাসিক সত্য প্রতিফলিত হতে দেখি : 'How near aestheticism and barbarism are to each other, aestheticism is the herald of barbarism' ! রাজনৈতিক সময়ের হলাহল যখন কোনও জাতির ইন্দ্রিয়চেতনাকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দেয়, চিত্তবিদারক হাহাকারের মতো বেজে ওঠে সেরেনুসের আর্ত বিলাপ : '...liars lickspittes mixed us a poison draught and took away our senses. We drank—for we Germans perennially yearn for intoxication and under its spell through years of deluded highliving., we committed a superfluity of shameless deeds, which must now be paid for.'। এই উচ্চারণে আধুনিকীকৃত ফাউস্ট-কথার অসামান্য রাজনৈতিক সম্ভাবনা ব্যক্ত হয়েছে। নবীন ফাউস্ট হিসেবে আদ্রিয়ান এমন এক সময়ের সূত্রধার যখন পৃথিবীতে নেমে এসেছে অদ্ভুত আঁধার। চিন্তায় অনুভূতিতে ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন জার্মানির সর্বোত্তম বুদ্ধিজীবীদেরও প্রতিরক্ষাহীন করে দিয়েছিল। তাঁদের মানবিক ও নৈতিক ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। আত্মিক বন্ধ্যাত্বের সেই পর্যায়ে সাউল ফিটেলবেটের মতো নব্য-মেফিস্টোফিলিসের কাছে আত্মবিক্রয়ই তো অবধারিত। টমাস মানের পুনর্নির্মিত বৃত্তান্ত সম্পর্কে এই মন্তব্যটি দিগ্‌দর্শক : 'The intellectual dramatis personae of his writing are the disintegrating bourgeois humanism and the reactionary, mystifying demagogic power, which utilise this disintegration on behalf of monopoly capitalism.' (প্রাগুক্ত : ৯৬) প্রশ্ন এই, মানবসত্তার যাবতীয় আদিকল্প কি দুর্নিবার ট্র্যাজেডির অভিঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে? এই কি তবে একালের ফাউস্ট-চর্চারও সিদ্ধান্ত, যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কেবল বিভ্রম মাত্র! না, অন্তত মান এরকম ভাবেননি। নইলে চূড়ান্ত ট্র্যাজিক অন্তর্দৃষ্টি প্রসূত সংবিদ নিয়ে আদ্রিয়ান ভবিষ্যৎ কালকে সম্বোধন করেই যেন একথা বলত না : '...instead of shrewdly concerning themselves with what is needful on earth that it may be better there, and discreetly doing it, that among men such order shall be established that again for the beautiful work living soil and true harmony be prepared, man playeth the truant and breaketh autan hellish drunkenness, so giveth his soul thereto and cometh among the carrion.'

তৃতীয় সহস্রাব্দের সূচনামুহূর্তে, নিরবচ্ছিন্ন ভোগ ও বিনোদনের কুহকে উন্মাদ, তথাকথিত আধুনিকোত্তর মানুষজনেরাও কি ঐ 'hellish drunkenness'-এ স্বেচ্ছাবন্দি

নয়? তথ্য-প্রযুক্তির অভাবনীয় বিস্ফোরণে জ্ঞান হোক বা না হোক, তথ্যের প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় ভার পুঞ্জীভূত হচ্ছে। এইসব তথ্যের অংশীদার করা বা না-করা পুরোপুরি নির্ভর করছে উপগ্রহ-প্রযুক্তির একচ্ছত্র অধিপতি বিশ্বপুঁজিবাদের ওপর। অর্থাৎ তথ্য এখন প্রতাপের কৃৎকৌশল। গ্রহীতা-ভোক্তার ইচ্ছা অবান্তর ; কাকে কতটুকু দেওয়া হবে তা ঠিক করে দিচ্ছে নব্য-মেফিস্টোফিলিসেরা। জ্ঞান নয়, তথ্যের অধিকার পাওয়ার জন্যে লালায়িত তৃতীয় বিশ্বের নব্য ফাউস্টেরা। কারণ, এর মধ্যে ওরা দেখতে পায় মর্যাদার, সমৃদ্ধির, প্রতাপের পঙ্ক্তিভোজনে বৃত হওয়ার ছাড়পত্র। এভাবে ফাউস্ট-কথার আকরণ কালে-কালান্তরে বিনির্মিত হচ্ছে ; কিন্তু প্রতিবেদনের নির্যাস ও আধেয় কালোত্তর চিহ্নায়িত হিসেবে পুনর্গৃহীত হচ্ছে। একটি আপাত-মোহনায় দাঁড়িয়ে যখন উৎসের দিকে ফিরে তাকাই, পাঠ থেকে পাঠান্তরে ফাউস্ট-কথার নিরবচ্ছিন্ন যাত্রাকে মনে হয় মানব-ইতিহাসের চিরসঙ্গী। মানুষের মৃত্যু হলেও মানব বেঁচে থাকে ; যন্ত্রণার তীব্র দহন সইতে-সইতে কিংবা পরাজয়ের মাত্রা-বদল দেখতে-দেখতে অভিযাত্রী মানবসত্তার উপলব্ধি গাঢ়তর হয়। কিন্তু তার নির্মোককে নির্মোক বলে চেনার প্রক্রিয়া জানা থাকে না, সময়ের প্রয়োজনে পথের বদল হয় মাত্র। এখানে মনে করতে পারি স্যান্ডি শুলম্যানের প্রাজ্ঞ সিদ্ধান্ত : 'From the shadowy reality of a charlatan, whose posthumous career took him through great as well as tawdry works of art, emerges not only the character of the legendary black magician, but also the apotheosis of mankind's dilemma. There are two choices of thought open to those who wish to delve into the tangled of Faustian legend : either that of the traditionalist who believes that man is inescapably doomed to destroy himself through his thrist for knowledge and power, or that of the salvationist. Who must belive that no matter what transgressions mankind commits in his attempt to attain wisdom, God has vowed to redeem him.' (প্রাগুক্ত : ২৭)।

পাঁচ

অর্থাৎ সেই আদি ও অকৃত্রিম পুনরুচ্চারণ : ধ্রুপদী পাঠকৃতির মুখোমুখি হব কীভাবে? কোন্ তাৎপর্য বা নির্যাস পাওয়ার আশায়! ফাউস্ট-কথার উত্তরোত্তর শিল্প-পরিণতির দিকে যাত্রা মূলত মৌলিক ও উদ্দীপক চিহ্নায়ন প্রকরণ নির্মাণের প্রক্রিয়া যা 'allows for a greater interplay and mutual convergence of concept, life-views and attitude' (একো : ১৯৮৪ : ৫৩)। প্রসঙ্গত আরো-যা বলা হয়েছে, গ্যয়ঠের ফাউস্ট-পাঠের ক্ষেত্রেও তার প্রাসঙ্গিকতা যথেষ্ট রয়েছে : 'When a work offers a multitude of intentions, a plurality of meaning and above all a wide variety of different ways of being understood and appreciated, then under these conditions we can only conclude that it is of vital interest.' (তদেব)। এই অন্তর্বৃত অনেকার্থ-দ্যোতনার জন্যে

অনিবার্যভাবে ফাউস্টের বহু দার্শনিক ভাষ্য উপস্থাপিত হয়েছে। গ্যয়ঠের জীবৎকালে দার্শনিক জিজ্ঞাসার সূচনা হয়েছিল। কবি স্বয়ং অবশ্য দার্শনিক তাৎপর্য অন্বেষণকে খুব একটা গুরুত্ব দিতে চাননি। কিন্তু পাঠকৃতির গভীরে নিহিত ছিল বিভিন্ন জিজ্ঞাসার বীজ যেহেতু বহু শতাব্দীর লোকমানস নিজেদের উপলব্ধি দিয়ে আখ্যানবৃত্তকে নানা দিকে নানা মাত্রায় প্রসারিত করে গেছে। সুতরাং গ্যয়ঠে নিজে যা-ই বলে থাকুন না কেন, বিষয়কে প্রয়োজনীয় আধার হিসেবে ধরে নিয়ে পাঠকেরা নিজেদের সময় ও পরিসরের দাবি অনুযায়ী অন্তর্বস্তুর নিয়ত পুনর্বিন্যাস করে গেছেন। ফলে ফাউস্ট-কথার বলয়ে জন্ম নিয়েছে অজস্র সম্ভাব্য জগৎ—'Cultural universe of meanings' (একো : ১০২)।

তবু গ্যয়ঠের বক্তব্য জানার জন্যে আমরা তাঁর চিঠি ও কথোপকথনের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে পারি। তাঁর জীবনের প্রগাঢ় সাহচর্যের ভিত্তিতে জোহান পিটার একেরমান (১৭৯২-১৮৫৪) 'Conversations with Goethe' প্রকাশ করেন। ১৮২৭ সালের ৬মে কথাপ্রসঙ্গে খানিকটা কৌতুকের ভঙ্গিতে গ্যয়ঠে বলেছিলেন, 'জার্মানরা নিশ্চিতই অদ্ভুত। তারা সব সময় সব কিছুতে গভীর চিন্তা আর দার্শনিক ধারণা খোঁজে এবং সেসব আরোপ করে। এতে তো তারা জীবনকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি দুর্বহ বোঝা করে তোলে। তোমাদের ধ্যানধারণাগুলি একবার সাহস করে ছেড়ে দাও, নিজেদের একটু অন্তত আনন্দ পেতে, আলোড়িত ও উদ্দীপিত হতে দাও। বা, মহৎ কিছুর জন্যে শিক্ষিত ও অনুপ্রাণিত হও। কিন্তু দোহাই তোমাদের, বিমূর্ত চিন্তা বা ধারণা খুঁজে না পেলে এটা কল্পনা করে নিয়ো না যে সমস্তই শূন্যগর্ভ, ব্যর্থ।' তারপর তিনি বলেন যে সমগ্র রচনার ভিত্তি হিসেবে একটিমাত্র পূর্বনির্দিষ্ট ধারণাকে খুঁজে লাভ নেই কিংবা এমনও নয় যে প্রতিটি দৃশ্যে কোনো চিন্তাবীজের উপস্থিতি রয়েছে। ফাউস্টের বিপুল বৈচিত্র্যসম্পন্ন ও বহুস্তরান্বিত জীবনকথায় কোনো একবাচনিকতার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। গ্যয়ঠে জানিয়েছিলেন : 'It was, in short, not in my line as a poet, to strive to embody anything abstract. I received in my mind impressions, and those of a sensuous, animated, charming, varied hundred-fold kind—just as a lively imagination presented them, and I had, as a poet, nothing more to do than to round off and elaborate artistically such views and impressions, and by means of a lively representation so to bring them forward that others might receive the same impression in hearing or reading any representation of them..... I am rather of the opinion, that the more incommensurable and the more incomprehensible to the understanding, a poetic production is, so much the better it is.'

এই বক্তব্যে নিঃসন্দেহে গ্যয়ঠের নিজস্ব নন্দনচিন্তা ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু বহুস্বরিক ধ্রুপদী বয়ানের গ্রন্থনায় দুর্বোধ্যতা ও অমেয়তার প্রসঙ্গ যেভাবে উত্থাপিত হলো, তার

নিবিড় বিশ্লেষণ প্রয়োজন। নইলে বিতর্কসূচক প্রতিপ্রশ্ন উঠে আসবে নিশ্চয়। লেখকের বক্তব্য সর্বদা পাঠ-প্রতীতির সহায়ক হয় না, অনেক সময় আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করলে সমস্যাও দেখা দেয়। যেমন ১৮২০ সালের ৫ জুলাই কথাপ্রসঙ্গে জার্মান সমালোচকদের সম্পর্কে পরিহাস বিজল্পিতভাবে গ্যয়ঠে বলেছিলেন : 'Imagination has its own laws, to which the understanding cannot and should not penetrate. If imagination did not originate, things that must ever be problems to the understanding there would be but little for the imagination to do. It is this which separates poetry from prose–in which understanding always is, and always should be, at home.'। তাহলে মোটামুটি দু'মাসের ব্যবধানে, গ্যয়ঠে কি রচনার প্রতীতি ('understanding') সম্পর্কে কার্যত দুটি ভিন্ন সুরে কথা বললেন? আসলে, কবিসত্তা সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় ব্যাপৃত থাকার সময় প্রতীতি নিয়ে ভাবিত হয় না, হয়ে ওঠার আনন্দ-বেদনায় মগ্ন থাকে। প্রতীতির ভাবনা আসে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া থেকে তাঁর বিযুক্তির পরে। তখন ঐ পাঠকৃতির স্রষ্টা হওয়া সত্ত্বেও তিনি কার্যত পাঠকসত্তার অধিকারী। অন্য সংবেদনশীল পাঠকদের মতো তিনিও প্রতীতি বিষয়ে ভাবছেন, এইমাত্র। বস্তুত অনুরূপ ভাবনায়, অন্য আরেক যুগে অন্য আরেক দেশে, বাল্মীকিও উচ্চারণ করেছিলেন : 'কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া' : এ আমি কী বললাম! কিন্তু বাচনের তাৎপর্য যে খোঁজে, সে কবিসত্তা নয়, পাঠকসত্তা। তাই ভিন্ন-ভিন্ন মুহূর্তে ভিন্ন-ভিন্ন চিন্তার বিচ্ছুরণ হওয়া স্বাভাবিক। গ্যয়ঠে বিভিন্ন চিঠিতে এবং কথোপকথনে নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে যা বলে গেছেন, তার নিবিড় পাঠ নিশ্চয় জরুরি কৃত্য। শুধু মনে রাখতে হবে, পরবর্তী প্রজন্মের পাঠকদের কাছে তাঁর পাঠকৃতি যেমন অনুশীলনের বিষয়, তেমনি বিভিন্ন সময়ের বয়ানও। কোনো-একটিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখব না আজ, বিষমানুপাতিক গুরুত্বও দেব না প্রসঙ্গ-নির্ধারিত কোনো উচ্চারণকেও।

এই প্রতীতির সূত্রেই আরো একটি জিজ্ঞাসা জাগে। ফাউস্ট-কথা ও কিংবদন্তিমালার বহুস্তরান্বিত বিবর্তন সম্পর্কে কিছুমাত্র অবহিত না-হয়ে কি গ্যয়ঠের 'ফাউস্ট' পড়া সম্ভব নয়? ইতিহাস-নিষ্পন্ন আরো অনেক সাহিত্যিক সন্দর্ভের কথা আমরা জানি, যাদের গভীরে প্রবেশ করার জন্যে দক্ষ ইতিহাসবিদ না হলেও চলে। কিন্তু সমগ্র জাতির চেতনা ও অবচেতনা, আলো ও অন্ধকার, সংস্কৃতি ও সমাজ যে-মহাসন্দর্ভের কোষে-কোষে সঞ্চারিত হয়ে যায় বহুকাল ধরে, তাকে ঠিকমতো পড়তে হলে ঐ প্রক্রিয়া সম্পর্কে উদাসীন থাকা সম্ভব কি? বলা ভালো, প্রশ্নটা ঔচিত্যেরও। অতএব সাইরাস হ্যামলিনের মন্তব্য—'The burden of scholarship...can mislead the unwary reader' সাধারণভাবে মেনে নিয়েও বলব, যে-কেউ চাইলেই হঠাৎ একদিন 'ফাউস্ট' পড়তে পারে না। সেইজন্যে দীর্ঘ অনুশীলন ও অধ্যবসায় আবশ্যিক। অতএব তাঁর এই মন্তব্যের সঙ্গে মোটেই একমত হওয়া যাচ্ছে না : 'We must never forget that Faust is the masterpiece of a poet writing during the Romantic era and that we need not actually know anymore about the legend than

Goethe did in order to understand his drama.' (তদেব)। যখন বহুস্বরিক ঐতিহ্যের আয়তন আবহমণ্ডলের মতো স্বাভাবিক, তাতে সম্পৃক্ত হওয়া বা না-হওয়া কোনো মহামনীষীর পক্ষেও তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। তিনি অনুপম কল্পনা-প্রতিভার কিরণ দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঐ আয়তনকে আলোকিত করেন। যে-মুহূর্তে তিনি সবচেয়ে বেশি সম্পৃক্ত, সেই মুহূর্তেই তিনি সর্বাধিক স্বাধীন পরিসরের সূত্রধার। এই দ্বিবাচনিকতাই প্রভাবের প্রতীতিকে সৃষ্টির উদ্ভাসনে রূপান্তরিত করে। গ্যয়ঠের ফাউস্টের ক্ষেত্রেও এরকম ঘটেছে। কোথায় ও কীভাবে তিনি নতুন জগতের নির্মাতা, নতুন বিশ্ববীক্ষার স্থপতি—তা উপলব্ধির জন্যে ঐতিহ্যের আয়তনকে বুঝে নিতে হয় বৃহৎ বা উচ্চবর্গীয় এবং লঘু বা লোকায়ত বা নিম্নবর্গীয় পরম্পরার নিরন্তর ঘাত-প্রতিঘাতে, অনন্বয়-অন্বয়ে এবং পরম্পরায় হস্তক্ষেপের বিচিত্র ও জটিল প্রক্রিয়ায়।

এমন কি, ফাউস্টের গ্যয়ঠে-কৃত রূপ তৈরি হওয়ার পরেও ইতিহাস বারবার পাঠকৃতির উপলব্ধি ও পরিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করেছে। এমন একটি অভিমতও প্রচলিত যে ফাউস্টের ভাগ্য অনেকটা পরিমাণে জার্মান জাতির ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। উনিশ শতকে জাতীয়তাবাদের ক্রমাগত উত্থানের পর্বে ফাউস্টের ভাষ্য যা ছিল, বিশ শতকে সেই জাতীয়তাবাদ ফ্যাসিবাদে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে পাঠকৃতির তাৎপর্য গ্রহীতার কাছে বদলে গেল। এছাড়া নানাধরনের সাংস্কৃতিক ও নান্দনিক চিন্তাপ্রস্থান যত পাঠতত্ত্বের খোলনল্‌চে পাল্‌টে দিয়েছে, গ্রহীতা পাঠকেরা ততই নতুন-নতুন তাৎপর্যের উপকূলরেখা তৈরি করে নিয়েছেন। পর-পর দুটি বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি যখন বিধ্বস্ত, মেফিস্টোফিলিসের কাছে ফাউস্টের আত্মবিক্রয় এবং পরিণামে সার্বিক বিনাশ ব্যাখ্যাত হলো রাজনৈতিক চেতনার পরিভাষায়। নিছক অসামান্য সাহিত্যকীর্তি হিসেবে পরিগ্রহণের ধারাটি স্তিমিত হয়ে গেল। জার্মান রাষ্ট্রের ধ্বংস ও জার্মান জাতির আত্মিক বিনাশের সমান্তরাল উপস্থাপনা হিসেবে ফাউস্ট হয়ে উঠল অদ্বিতীয় চিহ্নায়ক। এমন কি, 'জার্মান সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার ফাউস্টীয় বৈশিষ্ট্য' জাতীয় শব্দবন্ধও উঁচুদরের গবেষণাকর্মে দেখা গেল। ইতিমধ্যে টমাস মানের 'ডক্টর ফস্টাস' নামক উপন্যাস-প্রসঙ্গে দেখেছি, কতটা গভীরে ও ব্যাপকতায় ফাউস্ট-কথার বিনির্মাণ হতে পারে! বস্তুত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জার্মান ইতিহাসেও এই পাঠকৃতির বিনির্মাণপন্থী ভাষ্য অব্যাহত রয়েছে। ব্যক্তি-প্রতীক যখন জাতীয় প্রতীকে রূপান্তরিত হয়ে যায়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের নতুন নতুন অনুষঙ্গে পাঠকৃতি পুনঃগৃহীত হতে থাকে। বিশ্বসাহিত্যে ফাউস্টের মতো এমন বয়ান অল্পই আছে, যাকে জাতীয় ইতিহাসের আলো-অন্ধকার ও উত্থান-পতন শুধু পুনর্নির্মাণই করেনি—এই রূপান্তর প্রকরণকে উপলব্ধির সূচক হিসেবেও গভীরতর অর্থে গ্রহণ করা যায়।

ছয়

কিন্তু আমরা যারা তৃতীয় বিশ্বের অপর পরিসর থেকে, বিশেষত ভারতীয় উপমহাদেশের বাঙালি-পরিসরে ক্রমাগত ঘটমান আত্মহননের প্রেক্ষিত থেকে 'ফাউস্ট'

পড়ছি—আমাদের সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক পাঠ কি তাতে নিজস্ব চিহ্নায়ক খুঁজে নিচ্ছে না? শুধু কেন্দ্রীয় রূপকের কথা বলছি না, বিভিন্ন অনুপুঙ্খের ভাষ্য করতে গিয়েও আমাদের অবস্থানগত দূরত্ব দিচ্ছে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র চিন্তার সুযোগ। এছাড়া এমন-এক মুক্ত সংযোগের অবতল আমাদের অনুভূতিতে ধরা দিচ্ছে যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা সম্ভবত আরো প্রত্যক্ষ ও জোরালো ভাবে নিজেদের অভিজ্ঞতাকে ফাউস্ট-কথার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারব। বারবার সামূহিক বাঙালি-সত্তা মেফিস্টোফিলিসের নানা অভিব্যক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাজনের পেছনে যে দ্বিজাতিতত্ত্বের কুহকি মায়া ছিল, তা গত দুই দশকের মৌলবাদী তৎপরতায় বিকট থেকে বিকটতর ভাবে ব্যক্ত হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় প্রতাপের পঙ্‌ক্তি-ভোজনে ঠাঁই পাওয়ার তাড়নায় বাঙালি সত্তা মেনে নিয়েছে বানিয়ে-তোলা হিন্দুত্বের সন্ত্রাস কিংবা ঐশ্লামিক মৌলবাদের বিষবাষ্প। ধাপে-ধাপে নেমে গেছে বাঙালিত্বের বোধ, বিশ্বপুঁজিবাদের সাম্প্রতিক মগজ-ধোলাইয়ের পর্বে সামনে এখন কেবল গোলকধাঁধার অন্তহীন সিঁড়ি। ফাউস্টের দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম অঙ্কে দেখি, গভীর রাত্রে বারান্দায় দাঁড়িয়ে নায়ক বলছে :

'The shine and glance of stars is veiled.
The flames are dwarfed, the fire has paled ;
A creeping wind the embers lifts
And brings me smoke and reek in drifts.
Command too rash too soon obeyed !
What means this shape of hovering shade ?'

রূপকের এই পর্যায়ক্রমিক গ্রন্থনা এবং সেই গ্রন্থনার অন্তর্বর্তী বেদনা ও নিয়তিবোধ আশ্চর্যভাবে আমাদের সামূহিক সত্তার তিমিরায়নে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। পর্বে-পর্বান্তরে বাঙালিরাও নান মোহে স্বাভাবিক চলার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে ; ছদ্মবেশী মেফিস্টোফিলিসদের অতি স্থূল ও অতি চতুর অনুরাগকে কোনো বিবেচনা ছাড়াই অতি দ্রুত মান্যতা দিয়েছে। জাতির আকাশ থেকে হারিয়ে গেছে তারার আলো, আগুন ক্রমশ নিভে গিয়ে ধোঁয়ার আড়াল তৈরি করেছে। সঞ্চরমান ছায়ায় সমস্ত অবয়বই প্রেতায়িত এখন। এই ছায়ার মানে কী : আমরা তা বলতে পারছি না।

ফাউস্টের তবু চেতনা অবশিষ্ট ছিল। মধ্যরাত্রে রুদ্ধকক্ষে নিজের অতলান্ত সর্বনাশের মুখোমুখি হয়ে সে অন্তত এই উচ্চারণটুকু করতে পেরেছিল :

'A hollow, muted note of specral night
I'm left to struggle still towards the light :
Could I but break the spell, all magic spuring,
And clear my path, all soveeries unlearning,
Free then, in Nature's sight, from evil ban,
I'd know at least the worth of being man'

সর্বব্যাপ্ত অন্ধকার রাত্রির বোবা নিস্তব্ধতা যখন গ্রাস করছে বাঙালি সত্তাকে, হাঁসজারু ও বকচ্ছপদের ভিড়ে আত্মাবলুপ্তির মাদকতা বিনা বাধায় প্রসারিত হয়ে চলেছে—তখন কেউ কি কোথাও বলছে : আলোর দিকে যাওয়ার লড়াই থেকে সরে আসিনি এখনো! মানুষ হয়ে জন্মানোর মূল্য শেষ পর্যন্ত জানব—ফাউস্টের এই উচ্চারণের মতো বলতে কি পারব : বাঙালি হয়ে জন্মানোর অর্থ শেষ পর্যন্ত আমরা ঠিক খুঁজে নেব! কিন্তু তবু কেন এমন হয় যে অদৃশ্য ছিদ্রপথে 'black care' ঢুকে পড়ে, সব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অকার্যকরী হয়ে যায়? ঐ ভৌতিক অস্তিত্ব ফাউস্টকে জানিয়েছিল যে তার শয়তানি প্রভাবে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত থাকে না, থাকে শুধু অন্তহীন নারকীয় অন্ধকার। এ যেন 'অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতা' (ঈশোপনিষদ : ৩)-এর প্রভাবে :

'Though in his outward senses whole,
He harbours darkness in his soul ;
No matter what the treasure is,
He lacks the power to make it his.
.....
Faced with bliss or faced with sorrow,
He defers it to the morrow,
Always on the future waiting,
Nothing ever consummating.'

এই বয়ানের প্রতিটি অনুপুঙ্খ যেন নিয়তিতাড়িত বাঙালি-সত্তার হুবহু প্রতিকৃতির একেকটি উপকরণ। আমাদেরও শুধু বাহ্যিক সমগ্রতা, আত্মায় অন্ধকার। ঐশ্বর্যের সম্ভাবনা যতই থাকুক না কেন, তাদের নিজের করে নেওয়ার মতো ক্ষমতা বা অধ্যবসায় নেই। আনন্দ বা বিষাদ, সব কিছুকে আমরা আগামী কালের বিষয় করে তুলি। অনির্দেশ্য ভবিষ্যতের জন্যে প্রতীক্ষা করি কিন্তু বাস্তবে সব সোনার হরিণ। এভাবে সব কিছু মুছে যায় আমাদের, ভূগোল এবং ইতিহাস, পড়ে থাকে কেবল কাঁটাতার ঘেরা মানচিত্র। যা আছে, তাকেও ধরে রাখতে শিখিনি। শিখিও না কখনো।

কেয়ারের ভাষায় বলা যায় : 'Ever straying, ever thwarted/He beholds a world distorted'! বিকৃত ও পঙ্গু জগতের মুখোমুখি হয়ে দেখি, আমরাও কখন যেন ঈপ্সিত ইতিহাসের ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছি। কারণ, চোখ থাকলেও কার্যত অন্ধ ছিলাম আমরা 'For mortal men through all their life are blind'। কেয়ারের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে অন্ধই হয়ে গিয়েছিল ফাউস্ট। বলেছিল, 'Deep falls the night, in gloom precipitate'। তবে ঐ দৃশ্যে ফাউস্টের শেষ কথাগুলি আমাদের বর্তমান পাঠের জন্যে বিশেষ সংকেতবহ, কারণ সেখানে বুঝি, মানুষ পরাজিত হলেও পর্যুদস্ত হয় না। ঘনঘোর অন্ধকারের মধ্যেও জাগিয়ে রাখে তিমির-বিনাশের আকাঙ্ক্ষা।

সামূহিক বাঙালি সত্তার জন্যে এ মুহূর্তে এই উচ্চারণের প্রয়োজনই বেশি ; বিশেষত অন্তিম পঙক্তিতে রয়েছে আবশ্যিক আয়ুধের ইশারা :

'Man all the tools, spade, shovel, as is due.
The work marked out must straight carried through.
Quick dilligence, firm discipline,
With these the noblest heights we win.
. To end the greatest work designed,
A thousand hands need but one mind.'

অথচ আমাদের হাজার হাতের সঞ্চালক হাজার মন। অজস্র চিন্তাকেন্দ্র কিংবা কেন্দ্রের অবভাস। বস্তুত এই বহুত্ব মেকি বলেই অবভাসের সূত্র ধরে পর্বে-পর্বে মেফিস্টোফিলিস এবং তার পার্শ্বচরদের আবির্ভাব হয়েছে। আমাদের সত্তাকে অধিকার করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। অথচ একদেশদর্শী ও অপরিণামদর্শী হয়ে আমরা নিজগৃহপথ তস্করকে দেখিয়ে গেছি বারবার। শুধু আমাদের সতর্ক করে দেওয়ার জন্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদ ছিল না কোথাও। ছিল না কোনো জ্ঞানী ফাউস্টও, জীবনের শেষ সংলাপে যে এই উপলব্ধি-মথিত উচ্চারণ করতে পারে :

'None is of freedom or of life deserving
Unless he daily conquers it anew.'

এবং, এই দুটি পঙ্‌ক্তি হতে পারে সেই মোহানার সূচক যে-বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আমরা ফিরে যেতে পারি গ্যয়ঠে-পরিকল্পিত কথনবিশ্বের উৎসে। তাৎপর্যের পুনঃগ্রন্থনাও শুরু হতে পারে এখানে। প্রত্যেক পাঠক প্রত্যেকের পরিসর মতো এই অভিযাত্রায় অংশ নেবেন, এটাই প্রত্যাশিত। লেখা বাহুল্য যে অনেকান্তিক ও বহুরৈখিক এই প্রক্রিয়া। ফলে ফাউস্ট-পাঠও বহুমাত্রিক না হয়ে পারে না। হতে পারে একাধিক দার্শনিকের পাঠ, একাধিক সমাজতাত্ত্বিকেরও, তেমনি সাংস্কৃতিক রাজনীতির পড়ুয়াও অজস্র পাঠের কথা বলতে পারেন, যাদের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন দেশে-কালে প্রস্তাবিত নান্দনিক পাঠের সম্পর্ক না-ও থাকতে পারে। তবে, এতক্ষণে একথা নিশ্চয় স্পষ্ট হয়েছে যে ফাউস্ট চিরকালই থাকবে সম্পূর্ণ আবিষ্কারের বাইরে। অতএব সংশ্লেষণী পাঠ ছাড়া অন্য বিকল্প নেই।

বস্তুত প্রতিটি দৃশ্যে রয়েছে এমন বাচন যা আমাদের বহুস্বরিক ব্যক্তিসত্তা ও সামূহিক জীবন সম্পর্কে নতুন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে। তাই ফাউস্ট দেশে-দেশে পর্বে-পর্বে সাহিত্য-সমালোচক ও ভাষ্যকারদের আলোচনাকে উসকে দেয়নি শুধু, দার্শনিকদেরও উদ্দীপিত করেছে। ফাউস্ট স্বয়ং এবং মেফিস্টোফিলিস, গ্রেটচেন, হেলেনা, সম্রাট হ্বাগনের তো বটেই, নিতান্ত ক্ষণিকের উপস্থিতি যাদের—সেইসব নাট্যকুশীলবদের বাচনও অণুবীক্ষণিক ব্যাখ্যার জন্ম দিয়েছে। ফাউস্টের নাটক এদিক দিয়ে নিশ্চয় দার্শনিক প্রতিবেদন। এছাড়া এর প্রাকরণিক দিক নিয়ে (আকরণ, দ্বিরালাপ, একক বাচন, পর্বসন্ধি, ভাষাবিন্যাস প্রভৃতি) যাঁরা আলোচনা করেছেন, সন্দর্ভের দার্শনিক স্তরপরম্পরার

কথা মনে রেখেই তাঁদের এগোতে হয়েছে। সাইরাস হ্যামলিন লিখেছেন, সব কিছুর নিয়ামক হলো—'The problem of Faust which Goethe is exploring in his drama indeed constitutes a profound dilemma of the self as it struggles to live in the world and to achieve understanding of itself in relation to the world.' (প্রাগুক্ত : ৩৭২)। আর, হয়তো, এইজন্যে অসামান্য এই সাহিত্যকীর্তির উদ্দিষ্ট পাঠকবৃত্ত খুব বড়ো নয়। দার্শনিক ও নাটকীয় প্রেক্ষিতের অন্তর্বয়ন উপলব্ধির জন্যে যে পূর্বপ্রস্তুতি আবশ্যিক, তা সর্বসাধারণের অধিগত নয়। এভাবে আরো-একটি মৌলিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় আমাদের। ফাউস্ট-কথার আদি পর্যায়ে উদ্দিষ্ট নিম্নবর্গীয়জনেরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বয়ানের শরিক হতে পারত, বিদ্যাবত্তার কোনো প্রয়োজন তখন অনুভূত হত না। কিন্তু গ্যয়ঠের পাঠকৃতি হয়ে উঠল মুখ্যত বিদ্বজ্জন-মুখাপেক্ষী ; স্বভাবত সেখানে পাঠক-সাধারণের পৌছানো কঠিন, কিংবা অসম্ভব।

কোনো সন্দেহ নেই যে গ্যয়ঠের কল্পনাপ্রতিভা বহুলাংশে পাঠকের কল্পনাকেও উদ্বোধিত করে যাতে কবিতা, সংস্কৃতি, প্রকৃতি, সত্তার রহস্য, সমাজের নৈতিক ও রাজনৈতিক মাত্রার সীমানা এবং অন্যোন্য-সম্পর্ক তা আবিষ্কার করতে পারে। 'ফাউস্ট'কে যে 'Cosmic drama' বলা হয়েছে, তা যথার্থ। প্রতীকিতা বা প্রত্ন-উল্লেখের ধরন যত জটিল হোক না কেন, নাট্য-পাঠকৃতির অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে। এতে বিচিত্র ও পরস্পরবিরোধী উপাদানের সহাবস্থান সত্ত্বেও মানুষের মৌল মানবস্বরূপ সম্পর্কিত জ্ঞান ও বিশ্বাস কখনো পুরোপুরি হারিয়ে যায় না। পাঠকৃতি যেন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এক সমুদ্র, যার এক উপকূল থেকে অন্য উপকূলে যাওয়ার জন্যে সাহসী নাবিকের মতো পাঠককে ভেলা ভাসিয়ে যেতে হয়। জীবন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিস্তৃত তাৎপর্য-সন্ধানের জন্যে আমাদের সচেতন বা অর্ধচেতন যাত্রাকে যেন আমরা চিনে নিই। গ্যয়ঠে শুধু আমাদের কর্ম ও মননের সীমার প্রতি, চূড়ান্ত ব্যর্থতার মধ্যেও প্রতীতির উদয়মুহূর্তের প্রতি, তর্জনি সংকেত করে যান। এই বৃত্তান্ত যতটা সাহিত্যের, ততটা দর্শনের। অন্বিষ্ট শুধু দেশাতীত কালাতীত মানবপরিস্থিতির সত্য। ঠিকই লিখেছেন হ্যামলিন : 'Like all great myths of the self, Faust constitutes a drama of discovery moving through the totality of its lifetime with limited means and with compromising commitments, accompanied by the devil and ultimately failing to achieve fulfillment or satisfaction, perhaps failing even to secure the validity of its own convictions' (তদেব : ৩৭৯)

মানুষের জীবনে আরম্ভ আছে, সমাপ্তি আছে, সাফল্য আছে ; তবু তা সমগ্র হয় না কখনো : এই প্রতিপাদ্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই কি 'ফাউস্ট' পড়ব, এমন কি, আমরাও ?

টমাস মান : নির্বাসিত সত্তার কথাকার

ইদানীং অন্তর্জালের অতিসুলভ ঔদার্যে আমাদের সাহিত্য পাঠও সহজিয়া মার্গের উপাসক হয়ে পড়েছে। প্রশ্ন ভালোভাবে পিনদ্ধ হওয়ার আগেই সম্ভাব্য উত্তরগুলি এসে যাচ্ছে হাতের মুঠোয়। প্রয়োজনের দায় চটজলদি মেটাতে গিয়ে গভীরে অবগাহনের তাগিদ হারিয়ে যাচ্ছে চোরাবালিতে। অথচ সাম্প্রতিক দুনিয়ায় বিশ্বনাগরিক হওয়ার আকর্ষণ এত অপ্রতিরোধ্য যে মঞ্চসাজে তৃপ্ত হয়ে যাওয়াই সর্বজনীন নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন। তবুও পশ্চিমের জানালা না খুলে উপায় নেই আর। গণ্ডূষ মাত্র জলে সফরি সঞ্চরণে যেন ফুরিয়ে না যায় অধ্যবসায়, এই সতর্কতা বজায় রাখাই প্রকৃতপক্ষে বড় মাপের বৌদ্ধিক ও সাহিত্যিক যুদ্ধ এখন। কিন্তু সমস্যা এই যে ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বপ্রান্তে, বহুধাখণ্ডিত বঙ্গীয় পরিমণ্ডলের শরিক হিসেবে বুঝতে পারি, আমাদের কাছে যা পৌঁছায়, তা ঘটাকাশ মাত্র। মহাকাশের বার্তা দূরে থাক, ঈষৎ অদূরবর্তী আকাশের খবরও ঠিকমতো পৌঁছায় না। কূপমণ্ডূকতায় অভ্যস্ত হয়ে সব কিছুকে টুকরো করে আনাই আমাদের পদ্ধতি। তাহলে প্রতীচ্যের কোনও দিকপাল সাহিত্যিককে কীভাবে গ্রহণ করব? প্রথমত ইংরেজি অনুবাদ ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। মূল ভাষা যদি হয় রুশ-জার্মান-স্প্যানিশ-ফরাসি-পর্তুগীজ, ইংরেজি ভাষান্তরে তার সূক্ষ্মতা ও সংকেত-গর্ভ দ্যোতনা আমাদের কাছে পৌঁছেছে কিনা, এর নিশ্চয়তা কোথায়? দ্বিতীয়ত সাহিত্য অমূল তরু নয় বলেই স্রষ্টার উৎস-ভুবনের নিয়ন্তা ইতিহাস-সমাজ- সংস্কৃতি-মনস্তত্ত্বের দীর্ঘ পরম্পরা সম্পর্কে অবহিত হওয়াও আবশ্যিক। অথচ আমরা ভাষান্তরে উপন্যাস-ছোটগল্পের কাহিনি, কবিতায় ব্যক্ত কল্পনা-প্রতিভা, নাটকে উদ্ভাসিত দ্বান্দ্বিক বিন্যাসের অবয়ব লক্ষ করি কেবল। সেইসব শিল্প-মাধ্যমের সময় ও পরিসর লালিত নিষ্কর্ষ কি বুঝতে পারি!

এই কথাগুলি বিশেষভাবে মনে এল পাউল টমাস মান (৬ জুন ১৮৭৫-১২ আগস্ট ১৯৫৫) এর কথাভুবন পরিক্রমা করতে গিয়ে। তবে বলে নেওয়া ভালো, এই পরিক্রমা সমকালীন পেশাদারি টুরিস্ট এজেন্সির কন্ডাক্টেড ট্যুর-এর মতো পূর্ব-নির্দিষ্ট পথেই সীমিত থাকবে। তাছাড়া পাঠক হিসেবে আমাদের মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাস এরকম যে মাতৃভাষায় রচিত হলেও কদাচিৎ আমরা কোনও স্রষ্টার সমগ্র সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে সমান মনোযোগী হই। তাই নিবিষ্ট পাঠকেরাও অনিবার্য ভাবে তৈরি করে নেন স্বনির্বাচিত রবীন্দ্রনাথ কিংবা বিভূতিভূষণ কিংবা তারাশঙ্কর কিংবা জীবনানন্দ। তেমনি স্বনির্বাচিত শেক্সপীয়ার বা কাম্যু বা টমাস মানও। এতে বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ মেলে, একথা লিখব না। তেমনি এও লিখব না যে খণ্ডদৃষ্টিতে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে স্রষ্টার সমগ্র

অবয়ব। এমনকী ভাষান্তরিত পাঠের সম্ভাব্য বিভ্রাট সত্ত্বেও নির্বাচনের সামঞ্জস্যবোধ আংশিকতার আশঙ্কাকে অনেকখানি সামাল দিতে সমর্থ। অবশ্য আরেকটি জরুরি কথাও মনে রাখা প্রয়োজন। সময়ের ব্যবধানে নির্বাচিত সাহিত্যকৃতির পুনঃপাঠের ধরনই শুধু বদলে যায় না, অন্তঃসার ও তাৎপর্য সম্পর্কিত উপলব্ধিতেও মৌলিক পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। অন্তত তিনদশক আগে টমাস মানের রচনার সঙ্গে এই নিবন্ধকারের প্রাথমিক পরিচয় হয়েছিল। বইটি ছিল তাঁর প্রথম উপন্যাস 'Buddenbrooks' (১৯০১)। ক্রমশ হাতে এল আরও কিছু ছোটবড় উপন্যাস ও গল্প সংকলন : Tonio Kroger (১৯০৩), Royal Highness (১৯০৯), Felix Krull (১৯০৯), Death in Venice (১৯১২), The Magic Mountain (১৯২৪), Mario and the magician (১৯২৯), Joseph and his Brothers (১৯৩৩-৪৩), Lotte in Weimar (১৯৩৯), Doctor Faustus (১৯৪৭), The Holy Sinner (১৯৫১)। এছাড়া মানের বিশিষ্ট চিন্তা-প্রণালীর প্রতিফলন পাই 'Reflections of an unpolitical man' (১৯১৮), A sketch of my life (১৯৩০), The problem of freedom (১৯৩৭), Essays of three decades (১৯৪৭) ইত্যাদি বইতে।

তথ্য হিসেবে উল্লেখযোগ্য যে তাঁর প্রথম উপন্যাসের জন্যেই ১৯২৯-এ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন মান। জীবনের প্রথমপর্বে তাঁর চিন্তায় যে দক্ষিণপন্থী ঝোঁক ছিল, তা পরবর্তী পর্যায়ে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর্যায়ে মান কাইজের হ্বিলহেল্ম (২য়)-এর রক্ষণশীলতার সমর্থক হিসেবে উদারনীতিবাদকে আক্রমণ করেছিলেন। আবার ১৯২৩-এ তিনিই সংসদীয় গণতন্ত্রের মুখপাত্র হয়ে উঠেছিলেন। এই বছরটি কারো কারো মতে মানের জীবনের জলবিভাজন-রেখা কেননা এর আগে তিনি বিভিন্ন লেখায় ও ভাষণে হ্বাইমার রিপাবলিকের পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছেন। এরপর থেকে ক্রমশ তাঁর রাজনৈতিক ভাবনা উদারনৈতিক বামপন্থা ও গণতান্ত্রিক নীতির পক্ষে ঝুঁকে পড়তে থাকে। ১৯৩০-এ ১২ মে মান 'যুক্তির প্রতি আবেদন' শীর্ষক বক্তৃতায় অত্যন্ত তীব্র ভাষায় নাৎসিদের জাতীয় সমাজতন্ত্রকে আক্রমণ করেন এবং এর বিরুদ্ধে শ্রমজীবী শ্রেণীর মানুষদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। পরবর্তী তিন বছরে তিনি অজস্র প্রবন্ধ ও ভাষণে নাৎসি মতবাদকে শানিত আক্রমণ অব্যাহত রাখেন। ১৯৩৩-এ হিটলার যখন ক্ষমতা দখল করেন, মান ও তাঁর স্ত্রী সুইজারল্যান্ডে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন। যদিও চার বছর আগে সাহিত্য-কীর্তির জন্যে নোবেল পুরস্কার পেয়ে তিনি জার্মান জাতির পক্ষে গর্বের কারণ হয়ে উঠেছিলেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে স্বদেশে তাঁর আর ফেরা হল না। শুরু হল তাঁর নির্বাসিতের জীবন। ১৯৩৬-এ নাৎসি সরকার তাঁর নাগরিকত্ব সরকারিভাবে খারিজ করল। কয়েকমাস পরে মান পাড়ি দিলেন আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায়।

১৯৩৯-এ যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল, তিনি দেশবাসীর জন্যে নিয়মিত

উদ্দীপক বেতার-ভাষণ দিয়েছেন। ১৯৫২-তে তিনি সুইজারল্যান্ডে ফিরে এসেছিলেন কিন্তু পাকাপাকি ভাবে কখনও আপন দেশে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবেননি। শুধু ১৯৪৯-এ মহাকবি গ্যয়ঠের জন্ম-দ্বিশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে অল্পদিনের জন্যে ফ্রাঙ্কফুর্টে গিয়েছিলেন। এসময় তিনি বলেছিলেন, জার্মান সংস্কৃতি ইতিহাসের তৈরি কৃত্রিম রাজনৈতিক সীমান্তে রুদ্ধ নয়। এই কথাটি স্পষ্টতই ইতিহাসের দ্বারা ধ্বস্ত ও মর্দিত বৃহত্তর বঙ্গীয় সংস্কৃতি সম্পর্কেও প্রযোজ্য। ১৯৩৩-কে যদি টমাস মানের সৃষ্টি-জীবনের পক্ষে জলবিভাজন-রেখা গণ্য করি, তবে তাঁর নির্বাসিত জীবন-যাপনের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পর্যায়কে মনে হয় অখণ্ড আস্তিত্বিক মানচিত্রের দুটি ছিন্ন অংশ। এরা পরস্পর-সম্পৃক্ত হয়েও অনন্বয়ক্লিষ্ট। আমরা যারা পৃথিবীর অন্য একটি প্রান্তে ছেঁড়া মানচিত্রের ঈষৎ ব্যক্ত যন্ত্রণা-স্বপ্নভঙ্গ-ঔদাসীন্য-স্মৃতিলোপ সম্পর্কে কিছুটা অবহিত, টমাস মানের সৃষ্টিজীবনের শেষ দুটি দশকে নির্বাসিতের সৃজনী প্রকল্পগুলিকে বুঝতে চাইব সূক্ষ্মতর কোনও ব্যক্তি-প্রতিভার একক বাচন নয় ; ভূগোল-ইতিহাস-সংস্কৃতি- রাজনীতি-মনস্তত্ত্ব-দার্শনিকতার সমবেত মন্থনের ফলে উদ্ভূত সামূহিক বাচনও বটে তাঁর রচনাবলী।

দুই

একথা এখন আর অস্বীকার করতে পারি না যে আমাদের মান-পরিশীলনে গিওর্গ লুকাচের ভূমিকা অনেকখানি। বিশ শতকের প্রারম্ভিক বছরে রচিত হয়েছিল যে 'Buddenbrooks', তাকে বঙ্গীয় পাঠ-সংস্কারে মূলত মহাকাব্যিক ধাঁচের আখ্যান হিসেবেই গ্রহণ করেছিলাম। লুকাচের যুক্তিনিষ্ঠ বয়ান অনুসরণ করে যে আধুনিক বুর্জোয়া মানুষটিকে মানের পরবর্তী রচনাগুলিতে খুঁজলাম, তা আমাকে কোনও স্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয়নি। হয়তো বা সুনির্দিষ্ট কিছু সাহিত্য-সংস্কারের দুর্মর প্রভাবে 'Doctor Faustus' (১৯৪৭)-এর মতো জটিল কিন্তু সুলিখিত উপন্যাসের কথন-বিশ্বের পক্ষে রয়ে গেছি দূরীকৃত অপর মাত্র। একটু আগে যেমন লিখেছি, বহুমাত্রিক জার্মান সাহিত্য ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য সম্পর্কে প্রণালীবদ্ধ পাঠ না-থাকার ফলে বিবরণের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন গভীর অন্তঃস্বরগুলি অপ্রকট রয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃত সমস্যা হয় 'The Holy sinner' (১৯৫১) এর মতো মধ্যযুগীয় আবহের আধুনিকতাবাদী বিনির্মাণ নিয়ে। না, এর বিষয়বস্তু সাম্প্রতিক পাঠকের জন্যে অন্তত কোনও নৈতিক সংকট তৈরি করে না। ভাবতে ইচ্ছে করে, টমাস মানের নির্বাসিত জীবন কি প্রচ্ছন্ন আত্মনির্বাসনের উপলব্ধিতে অনেক আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল? তাই ১৯২৪-এ প্রকাশিত 'The Magic Mountain' নামক উপন্যাস লেখা শুরু হয়েছিল আরও বারো বছর আগে। সাম্প্রতিক এক বাঙালি কবি যেমন বলেন, প্রতিটি বাস্তবতাই রূপকের বাস্তবতা—মানের এই উপন্যাসেও বাস্তবতা ও প্রতীকিতার বিচিত্র সহাবস্থান ও মিথস্ক্রিয়া গভীর তাৎপর্যবহ।

ইউরোপীয় বুর্জোয়া সমাজের প্রচ্ছন্ন পীড়া ও বিকারের প্রতি তর্জনি সংকেত যিনি করেন, সেই লেখক কি জায়মান সমাজ ও পরিসর থেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসিত নন! বহুমাত্রিক ঐতিহ্যে যে জার্মান জাতির বিশ্ববীক্ষার শিকড় প্রোথিত, তাদের অন্তর্বৃত অনন্বয় ও অসঙ্গতির প্রতি মানের অভিনিবেশ ছিল। তাঁর আপন চিত্তলোকে যেমন নিগূঢ় পরিবর্তনের অভিঘাত তিনি অনুভব করেছিলেন, তেমনি উনিশ শতকের শেষ দুটি দশক থেকে বিশ শতকের প্রথম দুই দশক পর্যন্ত বিস্তৃত সময় ও পরিসরের আমূল রূপান্তর তিনি জার্মান সমাজের উচ্চ-মধ্যবর্গীয়দের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছিলেন। রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী অহমিকা যেমন স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, অন্যদিকে দার্শনিক ও বৌদ্ধিক চেতনার মধ্যে শুরু হয়েছিল অবরোহণ ও অবক্ষয়ের প্রবণতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির রাষ্ট্রীয় গর্বই কেবল আহত হয়নি, বৌদ্ধিক সমাজের মধ্যেও শুরু হয়েছিল আত্মসন্ধানের নতুন পর্ব। অবশ্য এর প্রতিক্রিয়া যে সব ক্ষেত্রে সমান হয়নি, ইতিহাসই তার প্রমাণ দিচ্ছে। তাই একই সময়পর্বে হাইদেগার ও টমাস মানকে দেখতে পাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একদশক পরে মান রিচার্ড হ্বাগনের সম্পর্কে যে-মন্তব্য করেছিলেন, তা একই সঙ্গে জার্মান বুর্জোয়াবর্গ এবং তাঁর নিজের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য : 'later repenting of his abandoned optimism, in face of the fait accompli of Bismark's empire, he minimizes his share in it as best he could with the realization of his dream. He went the way of the German bourgeoisie : from the revolution of disillusionment, to pessimism and a resigned power-protected inwardness.'

মাত্র বাইশ বছর বয়সে ১৮৯৭-এর অক্টোবরে, মান Buddenbrooks লিখতে শুরু করেন ; ১৯০০-এর জুলাই মাসে লেখা শেষ হয় এবং বিশ শতকের প্রথম বছর অর্থাৎ ১৯০১-এর অক্টোবরে তা বই হিসেবে বেরোয়। বাডেনব্রুকস্ পরিবারের তিন প্রজন্ম জুড়ে যে ক্রমিক আর্থ-সামাজিক, আত্মিক ও চেতনাগত দৈন্য ও ক্ষয়ের ছবি প্রকট হয়েছে তাতে রূপান্তরশীল সময়ের নিষ্কর্ষ ও শৈলী আমাদের মনোযোগ দাবি করে। দুই শতকের সন্ধিক্ষণে সর্বত্র ব্যাপ্ত ধুপছায়ার আখ্যানতাত্ত্বিক তাৎপর্য সহ সামাজিক অস্তিত্বের অন্তঃশায়ী স্ববিরোধিতা ও কূটাভাস লক্ষ করতে হয়। কিন্তু আখ্যান-ভাবনায় শিক্ষিত পাঠক সহ সব ধরনের জিজ্ঞাসু পাঠকের কাছে প্রাথমিকভাবে যে-কথাটি গুরুত্বপূর্ণ, তা হল, সময়-চিহ্নিত কাহিনির মধ্যেও মানুষের একান্ত নিজস্ব জগৎ যেন যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় এবং মৌলিক গল্প-মূল্যে সন্ধান ও সমাজজিজ্ঞাসাকে ধারণ করতে পারে। 'Buddenbrooks'-এর মতো মহাকাব্যিক গ্রন্থনা সম্পন্ন অজস্র অনুপুঙ্খ-বিন্যাসে মানবিক পরিস্থিতির বিপুল বৈচিত্র্য খুবই জোরালো ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। তিন প্রজন্মের পারিবারিক আবহে রূপান্তরের উপস্থাপনা হবেই ; বড় কথা হল, ব্যক্তির দর্পণে চলমান ইতিহাসের প্রতিষ্ঠা। প্রবহমান সময়ের অভিব্যক্তিতে প্রতীয়মান বিবরণ ও ঘটনাপ্রবাহ নির্মোক মাত্র ; অন্তরালে রয়ে যায়

জীবনের সার্থকতা-ব্যর্থতা-পতন-অভ্যুদয়-উজ্জ্বলতা-ছায়াচ্ছন্নতায় বিধৃত জীবনের বহুমাত্রিক সত্য।

উপন্যাসের একাদশ খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে বিপুলায়তন উপন্যাসটি যখন সমাপ্তিরেখায় পৌঁছাল, ছোট্ট হান্নোর মৃত্যুতে বাডেনব্রুক পরিবারের ইতিকথা ট্র্যাজিক কারুণ্যে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। পুত্রশোকে আচ্ছন্ন গের্দা বাডেনব্রুক চিরকালের মতো চলে যাচ্ছে আমস্টারডামে ; ফলে বিদায় ও বিচ্ছেদের কথকতা আখ্যানের অন্তিম পর্বে অন্যতর মাত্রা অর্জন করেছে। যেহেতু দ্যোতনাগর্ভ আখ্যানের ঘটনা ও বিবরণ গভীরভাবে চিহ্নায়িত হয়ে থাকে, অন্তিম অধ্যায়ের অনুপুঙ্খ ও অনুষঙ্গগুলি আমাদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। ছোট্ট হান্নোর স্মৃতিতে ফ্রাউ পেরমানেদের অশ্রুসিক্ত বিলাপ মহাকাব্যিক উপন্যাসের উপস্থাপনায় নিহিত বহতা সময়ের নিষ্ঠুর সত্য সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে তোলে যেন : 'Tom, father, grandfather, and all the rest ! Where are they ? We shall see them no more. Oh, it is so sad, so hard !' এই সংলাপে বাডেনব্রুকস্ পরিবারের গতায়ু পূর্বজদের জন্যে যে-আর্তনাদ ব্যক্ত হয়েছে, তা কার্যত সর্বজনীন আর্তি। ক্ষয়, মৃত্যু ও বিচ্ছেদ এত দুর্নিবার যে পুনর্মিলনের আশা আত্মপ্রতারক সান্ত্বনা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। তাই ফ্রিডেরিকের সান্ত্বনায় ফ্রাউ এভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে : 'Yes — they say so — oh, there are times, Friederike when that is no consolation. God forgive me ! When one begins to doubt — doubt justice and goodness and everything. Life crushes so much in us, it destroys too many of our beliefs ! A reunion if that were so-'।

কিন্তু এই বিষণ্ণ ও সংশয়ী উচ্চারণে টমাস মানের পরিকল্পিত আখ্যান তো চূড়ান্ত বিন্দুতে যেতে পারে না। পারে না, কারণ, জীবন-মৃত্যুর ছন্দময় বিন্যাসে যে মহাকালের প্রতিবেদন নির্মিত ও বিনির্মিত হচ্ছে অহরহ, তাতে বিষাদ ও সংশয় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হলেও অন্তিম বাচন নয়। তাছাড়া উপন্যাস নামক শিল্প-মাধ্যমকে শেষ পর্যন্ত অবলম্বিত বিষয়বস্তুর গণ্ডির বাইরে যাওয়ার সঙ্কেত দিতেই হয়। সেইজন্যে ফ্রাউয়ের কথা থামিয়ে দিয়ে বৃদ্ধা সেসেমি দৃঢ় প্রত্যয়ে, যেন সময়কে প্রত্যাহ্বান জানিয়ে, ঘোষণা করে : কোথাও না কোথাও পুনর্মিলনের সম্ভাবনা থেকেই যায়। এবার উপন্যাসও পৌঁছে যায় কাঙ্ক্ষিত সেই আপাত-সমাপ্তিতে, যে-বিন্দুতে সম্ভাব্য কোনও নতুন সূচনার দূরাগত আভাস পাওয়া যায় এবং সেসেমির মতো কোনো-এক সময়-শীলিত ব্যক্তি-সত্তায় অপম্রিয়মাণ আখ্যানের অন্তর্দীপ্ত আলো এসে পড়ে : 'She stood there, a victor in the good fight which all her life she had waged against the assaults of Reason : hump-backed, tiny, quivering with the strength of her convictions, a little prophetess, admonishing and inspired.'

তিন

উপন্যাসের একাদশ খণ্ডের চারটি অধ্যায়ের গ্রন্থনা সহ গোধূলি বলয়ের ম্লান ছায়ায় সঞ্চরমাণ কুশীলবদের যখন লক্ষ করি, আখ্যানের গভীর থেকে উঠে-আসা বার্তা যেন ঘটনা-বিবরণ-পাত্র-পাত্রীদের দ্বারা নির্দেশিত সীমা পেরিয়ে যায়। এই অন্তিম পর্বের প্রথম অধ্যায়ের শুরুতে মৃত্যুর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায় আর্থিক ক্ষতি ও ক্ষয়ের অনুপুঙ্খগুলি। পূর্ববর্তী অর্থাৎ দশম খণ্ডের শেষ দুটি অধ্যায়ে (অষ্টম ও নবম) সেনেটর টমাস বাডেনব্রুক-এর মৃত্যু ও পারিবারিক বৃত্তে তার প্রতিক্রিয়া আসলে উপন্যাসের অবধারিত অন্তিম পর্বের ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছে। পারিবারিক শোক ও অন্তিম সংস্কারের সানুপুঙ্খ বর্ণনা মহাকাব্যিক উপন্যাসের পক্ষে উপযুক্ত। একাদশ খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে জানা গেছে, টমাস বাডেনব্রুক মৃত্যুর আগে যে-উইল করে গেছেন, সেই অনুযায়ী তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ার কথা। কিন্তু বিপুল আর্থিক ক্ষতির মধ্য দিয়ে তা হল বলে বাডেনব্রুক পরিবারের বৈষয়িক প্রতিপত্তিও ধসে পড়ল। এর বহুমুখী প্রতিক্রিয়ার সানুপুঙ্খ আভাস দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতা, জীবনের নিরাপত্তা বড়ো আশ্চর্যজনকভাবে অন্যোন্য-সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। শোপেন হাওয়ারের দর্শনে নিষ্ণাত টমাস বাডেনব্রুকের আকস্মিক পক্ষাঘাত ও তজ্জনিত মৃত্যুর বর্ণনা যেন পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুর-নির্মাণের পর্যায়ক্রমিক ধরনে উপস্থাপিত হয়েছে। Point-counter point-এর বিন্যাসে বৈষয়িক বাস্তবের ক্ষয় ও অবসাদ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গেছে বহুমাত্রিক ক্ষয় ও অবসাদের বিবরণে। বাডেনব্রুক পরিবারের আভিজাত্য ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার সমুন্নত মহিমা সময়ের নিষ্ঠুর আঘাতে যেন প্রতীকীভাবে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে যখন টমাস হঠাৎ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে পথের ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে।

তবে মহাকাব্যিক আখ্যানেরই ধরনে এর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে আরও একটু আগে। যেন ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের মূর্ছনা স্থায়ীর উৎস-বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে অন্তরা ও সঞ্চারী হয়ে আভোগের মোহনায় পৌঁছাচ্ছে। দশম খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে ঈষৎ-বয়স্ক টমাস বাডেনব্রুকের সঙ্গে তার তরুণী স্ত্রী গের্দার দাম্পত্যের অন্তর্বর্তী শীতলতা দিয়ে যার সূত্রপাত, সেই কাহিনি আগাগোড়া চিহ্নায়িত হয়েই আরোহী পথে চূড়ান্ত-বিন্দুতে পৌঁছেছে। পাঠক বুঝতে পারেন, এই কাহিনি নিছক ব্যক্তির নয়—নয় কোনও ক্ষয়িষ্ণু একক পরিবারেরও, তা আসলে পক্ষপাতহীন সময়ের প্রহারে বিক্ষত পরিসরেরই কথকতা। আর, এইজন্যেই টমাস মানের এই উপন্যাসটি শুধুই উনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিলগ্নের প্রতীকী আখ্যান নয়, এর চেয়েও অনেক বেশি। টমাসের পরম্পরাগত আভিজাত্য বহতা সময়ের অভিঘাতেই শূন্যগর্ভ হয়ে পড়েছিল। স্ত্রী গের্দার সঙ্গে সৈন্যবাহিনীর রেনে মারিয়া ভন থ্রোটার গোপন সম্পর্ক সেনেটর টমাসকে কতদূর মনঃপীড়া দিয়েছে, তার প্রথাসিদ্ধ বর্ণনা করেননি লেখক। তিনি বরং এই ঘটনাকে অন্তর্ঘাত-প্রবণ সময়ের ব্যাধির লক্ষণ বলেই শনাক্ত করেছিলেন। আত্মিক বন্ধ্যাত্বই টমাসকে অনিবার্য পক্ষাঘাতের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। তাই মান লিখেছেন কীভাবে

টমাস বাডেনব্রুক লোকচক্ষুর আড়ালে রেখেছিল 'his mortification, his hatred, his powerlessness, that was so cruelly hard' ! সমাজের চোখে যাতে হাস্যকর ও করুণার পাত্র না হতে হয়, সেইজন্যে টমাসকে আত্মশক্তির শেষবিন্দু পর্যন্ত নিঙড়ে নিতে হয়েছিল। লেখক জানিয়েছেন তার প্রখর সংবেদনশীলতার কথা : 'he had seen it coming long before, he had felt it beforehand, before anyone else had such an idea in his mind !'

গের্দা ও ভন থ্রোটা সঙ্গীতের দুনিয়ায় মগ্ন থাকত আর টমাস থাকত নৈঃশব্দ্যে। তার পক্ষে 'The worst, the actually torturing thing, was the silence........simply a soundless, speechless, deceiving secret silence'। নৈঃশব্দ্যের এই পীড়ন টমাসের জন্যে শুধুমাত্র গের্দার দাম্পত্য-বহির্ভূত প্রণয়ের জন্যেই নয় ; ঔপন্যাসিক স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে পরিবারিক আভিজাত্যের বিলীয়মান মহিমা অসহায়ভাবে প্রত্যক্ষ করতে হচ্ছে এবং শিথিল মুঠো থেকে অনবরত ঝরে যাচ্ছে বর্তমান—এই বোধই নৈঃশব্দ্যের দহন তৈরি করছে : 'he looked up sometimes.......at the jubilee present hanging above his desk with the portraits of his forefathers : he thought of the history of his house, and said to himself that this was all that was wanting : that his person should become a byword, his name and family life a scandal among the people'! এই 'mysterious disgrace' থেকে নিজেকে বাঁচানোর কোনও উপায় খুঁজে পায়নি মধ্যবয়স্ক টমাস। কোনও অতিনাটকীয় প্রতিবিধানের কথাও ভাবতে পারেনি ; তাৎপর্যপূর্ণভাবে 'he only felt a slight anxiety, a harassing worry over the whole thing'। এও লক্ষণীয় যে নিজের ছেলে হান্নোর সঙ্গে ক্ষণিকের জন্যে হলেও টমাস একাত্মতা বোধ করেছে। আর, সেই মুহূর্তেই কথক-স্বর আমাদের আগাম জানিয়ে দিয়েছে যে আটচল্লিশ বছর বয়সেই টমাস তার আসন্ন মৃত্যুকে অনুভব করছে। জীবন সম্পর্কে গভীব নৈরাশ্যবোধই যেন তার স্বাস্থ্যের ক্ষয়কে ত্বরান্বিত করেছে। চিকিৎসকের দেওয়া নির্দেশগুলিও টমাস মেনে নেয়নি। তার ক্ষুধামান্দ্য, নিদ্রাহীনতা, দুর্বলতার বোধ ও সিগারেটে আসক্তি—এর কোনও কিছুই যেন নিছক শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যের অভিব্যক্তি নয়। এই সবই জীবন নামক অতলান্ত রহস্যের চিহ্নায়ক, যাদের কাহিনির অনুষঙ্গে সাজিয়ে নিলেও শেষ পর্যন্ত অধরা থেকে যায়। ইচ্ছাশক্তি, সম্ভাবনা, ব্যর্থতা, নৈরাশ্য, প্রতিষ্ঠা, আত্মমর্যাদা ইত্যাদি শব্দের চক্রব্যূহে বন্দী মানুষ আসন্ন অবসানের মুখোমুখি হয়েও সন্তানের মধ্যে নিজের সম্প্রসারণ দেখতে চায়। টমাস যেমন হান্নোর মধ্যে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে।

তবে শুধু সন্তান ও পরিবারের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবেনি সে; ভাবনার নিয়ন্তা মানের এই সময় প্রতীকী সৃষ্টি। মৃত্যুচেতনা তাকে নিয়ে গেছে দার্শনিক আত্মজিজ্ঞাসায়। আর, ঔপন্যাসিক আভাস দিয়েছেন যে এর মধ্যেও প্রচ্ছন্ন রয়েছে বাডেনব্রুকদের পারিবারিক

ঐতিহ্য। চিরসময় ও অমরতার আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তাৎপর্য নিয়ে ভাবিত ছিলেন টমাসের পূর্বজেরা। আর শোপেনহাওয়ারের দার্শনিক সন্দর্ভের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে যেন মৃত্যুর সঙ্গে মোকাবিলার তাগিদে যথার্থ বৌদ্ধিক আশ্রয় খুঁজে নিতে চাইলেন নিঃসঙ্গতা ও নৈঃশব্দ্য দ্বারা আক্রান্ত টমাস। ঔপন্যাসিক মান তাই জীবনের তাৎপর্য সম্পর্কিত উদ্ভাসন উপস্থাপিত করে আখ্যানের নান্দনিক ও আস্তিত্বিক সম্ভাবনাকে বহুদূর প্রসারিত করে দিয়েছেন। ভাবতে বিস্ময় লাগে, কীভাবে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের নবীন লেখক বয়ানে এত আশ্চর্য গভীরতার কর্ষণ করেছেন :

'What was death ? The answer came not in poor, large-sounding words : he felt it within him, he possessed it. Death was a joy, so great, so deep that it could be dreamed of only in moments of revelation like the present'। বয়ানের এই পর্যায়ে কথক-স্বর যেন দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের প্রতিনিধি হয়ে জানিয়েছে যে বর্ণনাতীত ও যন্ত্রণাময় এলোমেলো ভ্রমণের পরে সত্তা যখন মৃত্যুর উপকূলে পৌঁছায়, তা আসলে হয়ে ওঠে আপন নীড়ে প্রত্যাবর্তন—যেন ভয়ঙ্কর এক ভ্রান্তির শুদ্ধীকরণ, অভ্যাসের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি, রুদ্ধ তোরণগুলি উন্মোচন।

চার

কাকে বলব সমাপ্তি বা অবসান! কোনো কিছু কি আদৌ শেষ হয়? মানুষের শরীর তো বিভ্রমময় ও বিরক্তিপূর্ণ প্রতিবন্ধক যা সম্ভাব্য উচ্চতর স্তরে সত্তাকে উত্তীর্ণ হতে দেয় না। বৌদ্ধিকতার ক্ষীণ ও সঞ্চরমাণ আলো দিয়েই বন্দীশালাকে আলোকিত করে তুলতে হয়। পরিসরহীন, সময়হীন অনন্ত রাত্রির মধ্যে ইচ্ছাশক্তি মুক্ত বিহঙ্গের মতো পাখা মেলে দেয়। টমাস এই উপলব্ধিতেই অনন্য হয়ে উঠেছে যে তার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে সকল সামর্থ্য ও অর্জনের বীজ, প্রবণতা ও সম্ভাবনা। মানুষ হিসেবে জন্ম না নিলে তো অস্তিত্ব ও চেতনার বহির্বৃত অভিব্যক্তি স্পষ্ট হত না কোনওদিন। এই ভাবনায় সে আমাদের ভারতীয় দর্শনভূমির খুব কাছাকাছি চলে আসে। আর, আখ্যানের বিশেষ কেন্দ্রীয় সত্তা উপন্যাসের সীমানা পেরিয়ে গিয়ে হয়ে ওঠে কয়েক দশক পরবর্তী অস্তিত্ববাদী পাঠকৃতিগুলির পূর্বলেখের সূত্রধার : 'was not every human being a mistake and a blunder? Was he not in painful arrest from the hour of his birth? Prison, prison, bonds and limitations everywhere! The human being stares hopelessly through the barred window of his personality at the high walls of outward circumstances, till Death comes and calls him home to freedom !'

কথকস্বরের এই বয়ানের মুখোমুখি হয়ে যে-কোনও পাঠকই স্তব্ধ হতে বাধ্য। টমাসের এই উপলব্ধিতে মৃত্যু তো মহাজীবনের অন্য নাম অর্থাৎ মানবসত্তা এমন-এক চিরমুক্ত অস্তিত্ব যাকে সাফল্য ও ব্যর্থতার কৃত্রিম লক্ষ্মণরেখাগুলি রুদ্ধ করতে পারে না। এবং, এই উপলব্ধির উদ্ভাসনের পরে টমাসের আকস্মিক মৃত্যু ও তার শিশুপুত্র

হান্নোর অকালমৃত্যুকে যদি চিহ্নায়িত বলে ধরে নিই, সত্তাকে সব ধরনের প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম সীমাবদ্ধতার বন্দীশালা থেকে মুক্ত বলেই বুঝে নিতে হবে। জাগতিক প্রতিপত্তি, পারিবারিক আভিজাত্য, বৈষয়িক ক্ষয়—সমস্তই অবান্তর হয়ে পড়ে যেহেতু মৃত্যু নিয়ে আসে নবীন সমগ্রতার অভিনব প্রতিশ্রুতি : 'The deceptive perception of space, time and history, the pre-occupation with a glorious historical continuity of life in the person of his own descendants, the dread of some future final dissolution and de-composition all these spirit now put aside. He was nolonger presented from grasping eternity. Nothing began, nothing left off. There was only an endless present'। এ যেন ঋক্‌বেদের দশম মণ্ডলের বিখ্যাত নাসদীয় সূক্তের দূরবর্তী প্রতিধ্বনি : 'নাসদো সদ্ অজায়ত'। অবশ্য অস্তিত্বহীনতা ও অস্তিত্বের দ্বিরালাপে মগ্ন থাকতে পারে না টমাসও। কেননা তার স্রষ্টা জানেন যে বাস্তবের পাথুরে জমিতে ফিরে আসতেই হয়। সেনেটর টমাসকে ফিরে ফিরে আসতে হয় মধ্যবর্গীয় জীবনবৃত্তের অভ্যাসে, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আভিজাত্যে ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের আচরণবিধিতে। তবে ঔপন্যাসিক আখ্যানের নিজস্ব যুক্তিশৃঙ্খলা অনুযায়ী পাঠকের কাছে তাঁর কাঙ্ক্ষিত বার্তা সফলভাবেই পৌঁছে দিয়েছেন। এর পরে অবধারিত ভাবেই চলে আসে টমাসের চূড়ান্ত মুহূর্ত ; দাঁতের তীব্র ব্যথা ও পথের উপরে তার জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাওয়া : এই সব এলিয়টের সেই প্রবাদ-প্রতিম কবিতা-পঙ্‌ক্তিগুলি মনে করিয়ে দেয় :

'This is the way the world ends,
This is the way the world ends,
This is the way the world ends,
not with a bang, but a whimper'

বাডেনব্রুক্‌স্ লেখার সময় তরুণ লেখক কি জার্মান জাতির জীবনে ১৮৩৫ থেকে ১৮৭৭-এর মধ্যে ঘটে-যাওয়া ঘটনাগুলি থেকে বহুমাত্রিক নির্যাস ছেঁকে নিচ্ছিলেন? ব্যক্তি ও পরিবারের আকল্পে ধরতে চাইছিলেন ইতিহাসের ট্র্যাজিক উল্লাস! প্রবল সংলগ্নতার মধ্যেই কি কোথাও প্রচ্ছন্ন ছিল অন্তরীন সত্তার স্বেচ্ছাচারও নির্বাসনের বোধ?

পাঁচ

কাছাকাছি সময়ে 'Tonio Kroger' লেখার সময় এই বোধ সক্রিয় ছিল যে শিল্পীসত্তা আসলে বাস্তব থেকে নির্বাসিত। বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই বিশ্বাস : 'To be an artist, one has to die to everyday life'। অন্যদিকে Death in Venice (১৯১২) বইতে শিল্প ও শিল্পী সম্পর্কে মানের প্রত্যয় রূপক ও বাস্তবের যুগলবন্দি আশ্রয় করেই ব্যক্ত হয়েছে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র গুস্তাভ আশেনবাখ নিজের নামে আভিজাত্য-সূচক 'ভন' ব্যবহার করতে শুরু করেছে। লেখক হিসেবে সুখ্যাতি,

কঠোরভাবে পরিমিত জীবনযাপন, আপন শিল্পকলার প্রতি প্রখর আনুগত্য সত্ত্বেও অভিজাত বর্গের মধ্যে গণ্য হওয়ার এই আকাঙ্ক্ষায় মধ্যবর্গীয় মনোভঙ্গিই প্রকাশ পেয়েছে। ভেনিসে ছুটি কাটাতে যাওয়ার পথে আশেনবাখের সঙ্গে এমন একজন বয়স্ক ব্যক্তির দেখা হয় যে কিনা একদল হুল্লোড়ে তরুণের সঙ্গে থেকে পরচুলা, উগ্র প্রসাধন ও স্থূলরুচি পোশাক, কৃত্রিম দাঁত ব্যবহার করে প্রাণপণে তরুণ সেজে রয়েছে। এইসবই বহুমাত্রিক অনুপুঙ্খ যাদের সাহায্যে মান জার্মান মধ্যবর্গ এবং সমকালীন বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব সমালোচনা উপস্থাপিত করেছেন। এই উপন্যাসে তিনি কি 'passion' কে 'confusion and degradation' বলে দেখাতে চেয়েছেন? কাহিনি-গ্রন্থনায় ফ্রিডরিখ নীৎশে ও সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের প্রভাব কতদূর অবধি ব্যাপ্ত? আর, আঠারো বছরের তরুণ উরলিখ ভন লেভেৎজোভের জন্যে মহাকবি গ্যয়ঠের সুবিদিত আকর্ষণ-কথা কি মানের রচনার পশ্চাদভূমিতে রয়েছে! প্রধান চরিত্রটি কি সঙ্গীত-রচয়িতা গুস্তাভ মাহলের ও সমকামী কবি অগুস্ত ভন প্লাটেন-হালেরমুণ্ডের সংকর-সত্তা? পাঠকৃতির সুস্পষ্ট অন্তঃস্বর হিসেবে গ্রিক প্রত্নকথার উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যুক্তি ও মেধার দেবতা অ্যাপোলোর কাছে নিবেদিত আশেনবাখ যুক্তিহীনতা ও সংরক্ত আবেগের দেবতা ডিয়োনিসাসের ক্ষমতাকে অস্বীকার করেছে। লালচুলওয়ালা যে-মানুষটি বারবার বিভিন্ন কুশীলবের ছদ্মবেশে প্রধান চরিত্রের মুখোমুখি হয়, সে সম্ভবত ডিয়োনিসাসের প্রধান অনুচর সিলেনাস। ঔপন্যাসিক চিহ্নায়িত বাচনে এই সংকেত দিয়েছেন যে যুক্তি ও মেধার পথ অনুসরণ করার জন্যে আশেনবাখকে ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে ডিয়োনিসাস ভেনিসে এসেছে। টাডজিয়ো নামে কিশোর এই বহুস্বরিক বয়ানের উপযোগী সৃষ্টি। প্রধান চরিত্রের স্বাস্থ্যহানি ও পরিণামে তার মৃত্যু গভীরভাবে প্রতীকী। বস্তুত এই অনুষঙ্গ মানের উপন্যাস-বিশ্বে সূচনাপর্ব থেকেই উপস্থিত।

ঔপন্যাসিকের অন্যতম প্রধান রচনা হিসেবে মান্যতাপ্রাপ্ত 'The Magic Mountain'-এর মধ্যেও একইভাবে স্বাস্থ্যহানি ও আরোগ্য বহুমাত্রিক তাৎপর্য সম্পন্ন। বাস্তব ও রূপকের এই অন্যোন্যাশ্রয়িতা কথা-গ্রন্থনায় ও হ্যান্স ক্যাসটর্প নামক প্রধান চরিত্রের উপস্থাপনায় বাখতিন কথিত 'Bildungsroman' জাতীয় উপন্যাসের সার্থক দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়। চিহ্নায়িত কথাবিশ্বের প্রধান উপাদানের সহগামী হিসেবে রয়েছে বহির্জগতের পরিবর্তনশীলতা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী ইউরোপীয় সভ্যতার অন্তর্বর্তী অনিশ্চয়তা-অসন্তোষ-সংকট সম্পর্কিত সামাজিক অনুষঙ্গ, জার্মান জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত বিবিধ জিজ্ঞাসা, সঙ্গীত-ভাবনার নানা অনুপুঙ্খ আর শিল্প-সংস্কৃতি-প্রেম ভাবনায় প্রতিবিম্বিত সময়ানুভব। অর্থাৎ কাহিনির মূল সংরূপের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেও মান ব্যাধি ও আরোগ্যের দ্বিরালাপ-সংশ্লিষ্ট প্রতীকী বিন্যাস সম্পর্কে সংবেদনশীল ছিলেন। নীৎশের দর্শনের ছায়ায় এই আখ্যান ও তার প্রধান কুশীলব পরিশীলিত। এই উপন্যাসের ইংরেজি ভাষান্তরের (১৯২৭) উত্তরকথনে স্বয়ং মান জানিয়েছিলেন : 'What Hans came to understand is that one must go through the deep experience

of sickness and death to arrive at a higher sanity and health......what Castorp learns to fathom is that all higher health must hrave passed through illness and death.....There are two ways to life : one is the common direct and brave. The other is bad, leading through death and that is the genius way. This concept of illness and death, as a necessary passage to knowledge, health and life, makes the Magic mountain into a novel of initiation'!

জার্মানদের মধ্যে হ্যান্স নাম হিসেবে খুবই সহজলভ্য। ঔপন্যাসিক প্রধান চরিত্রের এই নামকরণ করে তাকে সম্ভবত সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি বা everyman হিসেবে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে স্পন্দমান সময়কে ও পরিসরকে, বলা ভালো, তাদের বহুরৈখিক আন্তঃসম্পর্ককে নৈর্ব্যক্তিকভাবে কতটা গ্রহণ করা সম্ভব? শেষ পর্যন্ত কি তাকে ব্যক্তিগত দর্পণেই প্রতিফলিত করতে হয়? উপন্যাসের কথকস্বর সময়-সমুদ্রে ভাসমান সত্তার কাছে মূলত যে-প্রশ্নটি তুলে ধরেছে, তা হল : 'Can one tell—that is to say, narrate time, time itself, as such, for its own sake ?' হ্যান্স ক্যাস্টর্প বের্ঘক স্যানাটোরিয়ামে যে তেরো বছর কাটিয়েছেন, তার মধ্যে সময় ও পরিসরের আন্তঃসম্পর্ক সহ কার্নিভালের বিশিষ্ট উৎসব-মুখরতা এবং কখনও বা এর বিপ্রতীপ রিক্ততা ও একঘেয়েমির অবসাদ ব্যক্ত হয়েছে। কেন্দ্রীয় চরিত্র সহ অন্য কুশীলবেরা মানের নিজস্ব ঘরানায় সময়ের দর্শনকে নানাভাবে উপস্থাপিত করেছে।

স্বয়ং লেখকের মতে তাঁর চিত্রিত কুশীলবেরা প্রত্যেকেই আসলে 'exponents representatives and messengers of intellectual districts, principles and worlds.'। ব্যাধি ও মৃত্যুর সঙ্গে একদিকে সঙ্গীত ও অন্যদিকে রূপকের অন্তর্বয়ন আখ্যানকে পুরোপুরি ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। মানের উপন্যাস-বিশ্ব পরিক্রমা করে এই উপলব্ধি অনতিক্রম্য হয়ে পড়ে যে কাহিনি লেখকের কাছে প্রয়োজনীয় নির্মোকের চেয়ে বেশি কিছু নয়। তিনি যেন বাস্তবে থেকেও কার্যত অন্তেবাসী। তাই বাস্তব কখনও অবিমিশ্র বাস্তব হয়ে তাঁর কাছে আসে না। সত্তার মধ্যে যুগপৎ অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব, উদ্‌ভাসন ও কৃষ্ণবিবর তিনি অনুভব করেন। হেগেল যাকে 'identity of identity and non identity' বলেছেন, সেই দুর্মর বোধ তাঁকে উদ্দীপিত করে বলে তিনি যেন স্বতশ্চলভাবে দৃশ্য-প্রপঞ্চময় জগতে স্বেচ্ছা-নির্বাসিত জিজ্ঞাসু পথিক হিসেবে থেকে গেছেন। আর, এইজন্যেই টমাস মান একই সঙ্গে আকর্ষণীয় আখ্যান-প্রণেতা এবং বহুতল যুক্ত প্রতিবেদন-রচয়িতা হিসেবে প্রতিভাত হন। তাঁর শিল্পকর্ম তাই হতে পারে 'unequivocal in content and structure and yet open to differing, even contradictory, interpretations.' (Georg Lukacs : The meaning of contemporary realism : Merlin Press : London : 1979 : 15)

ছয়

ফাউস্ট-কথাবৃত্তের যে আধুনিক রূপায়ন মানের ডক্টর ফস্টাস (১৯৪৭) বইতে প্রকাশ পেয়েছে, তাতে যুদ্ধ-ক্লান্ত জার্মান বিশ্ববীক্ষায় কী ধরনের জটিল ও বহুমাত্রিক অভিব্যক্তি দেখা যায়, তা বিশ্লেষণের জন্যে স্বতন্ত্র পরিসর চাই। এখানে শুধু লিখতে চাই এই কথা যে লেখকের সৃজনী ভাবনায় ব্যক্তিগত ও সামূহিক সংকট স্বতন্ত্র হয়েও মিথষ্ক্রিয়ায় সম্পৃক্ত। আদ্রিয়ান লেভারকোহন নামক সঙ্গীত-স্রষ্টা কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে ইতিহাস ও ঐতিহ্যাগত উপাদানের মধ্যে চমৎকার দ্বিবাচনিকতার প্রস্থনা তৈরি করেছে। ফাউস্টের মতো আদ্রিয়ানও স্বাভাবিক মানব-প্রেক্ষিত থেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসিত। একই অবস্থান বিনির্মাণের সূত্রধার টমাস মানেরও। এখানে তাই অকুণ্ঠ সমর্থন জানাতে পারি লুকাচের এই মন্তব্যকে, যে, সার্থক উপাখ্যানের কুশীলবদের 'ontological being......cannot be distinguished from their social and historical environment. Their human significance, their specific individuality cannot be separated from the context in which they were created.' (তদেব : ১৯)। লেখকের পক্ষে ডক্টর ফস্টাসে পৌঁছানো যদি গভীরতর ও ব্যাপকতর ন্যায়বৃত্ত অনুযায়ী অনিবার্য ও স্বাভাবিক হয়—'দি হলি সিনার' (১৯৫১) এর পাঠ-অভিজ্ঞতাকে কী বলব? এই আখ্যানে মধ্যযুগীয় পটভূমিতে ভাই-বোনের যৌন সম্পর্ককে উপলক্ষ করে বয়ানের যে ঊর্ণাতন্তু-বয়ন হয়েছে, তাও কি বিশেষ তির্যক অর্থে নির্বাসিতের কথকতা! এর উত্তর খোঁজার জন্যে যেতে হবে আখ্যানের স্তর থেকে স্তরান্তরে, বাহির থেকে ভেতরে, ব্যক্ত থেকে অব্যক্তে। এই নিবন্ধের শুরুতে লিখেছি, ভিনদেশি পাঠকের জন্যে বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক-সামাজিক-ধর্মীয় অনুষঙ্গ ও অনুপুঙ্খ বেশ খানিকটা সমস্যা তৈরি করতে পারে। আখ্যানের প্রকৃত তাৎপর্যকে প্রতীয়মানের প্রসাধিত উপস্থিতি অনেকসময় আড়াল করে দেয়।

আবার মান এমন একজন কথাকার যিনি পাঠকের সঙ্গে শুধুই লুকোচুরি খেলতে চান না। তাই নিতান্ত সহজ বাচনে জানিয়ে দিয়েছেন কী প্রত্যাশিত আখ্যানের কাছে : 'The spirit of story telling is a communicative spirit, gratified to lead his readers and listeners everywhere, even into the solitude of the characters spun out of his words and into their prayers. Still he knows how to be silent too, and sparingly to leave out what to make present seems all too mistaken to him, and whatever he may keep in the shadow of wordlessness, events leave no doubt that in the time between there were word, presentness and scene।' [The Holy sinner : p. 138] মান ঠিকই লিখেছেন, সংযোগের যে-ক্ষমতা পাঠক কিংবা শ্রোতাকে গল্পভুবনের প্রতিটি শিখরে ও উপত্যকায় নিয়ে যায়—সার্থক কাহিনির কাছে তা প্রত্যাশিত। সৃষ্টিশীল শব্দের বিন্যাসে শুধু সরবতাই তৈরি হয় না, নৈঃশব্দ্য ও নির্জনতার আবহও নির্মিত হয়। মহৎ লেখকের প্রতিষ্ঠা নিছক 'technical

virtuosity'-এর ওপর নির্ভর করে না। বাস্তব উপাদানকে কল্পনা-প্রতিভার ইন্দ্রজাল দিয়ে যিনি আমূল রূপান্তরিত করতে পারেন, যথাপ্রাপ্ত জীবনের অভিজ্ঞতাকে নানাভাবে বিনির্মাণ করে আত্মতা ও নৈর্ব্যক্তিকতার আশ্চর্য যুগলবন্দি রচনা করতে পারেন—তাঁর সৃজনবিশ্বে অন্তর্বস্তু ও প্রকরণের মিথস্ক্রিয়া স্বাভাবিক ও অনিবার্য। টমাস মান এমনই এক কালজ-হয়েও-কালোত্তর লেখক যিনি নানাবিধ আন্তঃসম্পর্কের বিন্যাসে- প্রতিন্যাসে অনবরত যথাপ্রাপ্ত বাস্তবকে পুনর্নির্মাণ করে গেছেন। জীবন ও জগৎ, সময় ও পরিসর অন্তহীন জিজ্ঞাসার মন্থনে উদ্বুদ্ধ করেছে। এই প্রক্রিয়াকে আরো ব্যাপক, আরো শানিত করার তাগিদেই তিনি বারবার আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়িয়েছেন। তরুণ বয়সে বাডেনব্রুক্স্ লিখতে গিয়ে যে নির্বাসিতের বোধ জেগেছিল, বাস্তবে তা-ই যখন সত্য হল—পরিণত পর্যায়েও অব্যাহত রইল সিসিফাস-ব্রত।

অস্তিত্বের শূন্যতা ও ভাঙা জগৎ : ব্যর্থতার উপন্যাসীকরণ

জন্মশতবার্ষিকী পুনঃপাঠেও স্যামুয়েল বেকেট রয়ে গেলেন একই রকম দুরধিগম্য বিস্ময়, ভাষ্যের অতিরেক সত্ত্বেও যাঁর নাগাল পাওয়া খুব শক্ত। বেকেট মূলত অভিব্যক্তির সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বিন্যাস যোগান দিয়েছেন আমাদের। তবু, তিনি নিজেই অভিব্যক্তির সার্থকতা সম্পর্কে সন্দিহান কেননা নেতিবোধের সম্প্রসারণশীল মহাসমুদ্রে বাচনিক অভিব্যক্তি কতদূর যেতে পারে? তাই বেকেট ভেবেছিলেন, আধুনিক শিল্পী বা লিখিয়ের পক্ষে 'nothing to express, nothing with which to express, nothing from which to express, no power to express, no desire to express, together with the obligation to express' (Three Dialogues : 1983 : 139)। পারাপারহীন নেতির সমুদ্রে ভাষা যেন বুদ্বুদ ; অন্তহীন শূন্যতার বোধকে তা কীভাবে মোকাবিলা করবে! কোন্ বিষয়কে অভিব্যক্তির অবলম্বন হিসেবে ব্যবহার করবে—ভাষা-ব্যবহারকারীর কি সেই ক্ষমতা আছে? অস্তিত্বের উপশমহীন শূন্যতা ও নেতির সন্ত্রাসকে যদি কেউ উপন্যাসের আখ্যানে রূপান্তরিত করতে চান, তাহলে সেই পাঠকৃতির স্বরূপ কী হবে?

এতসব মৌলিক জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তর স্যামুয়েল বেকেটের বিখ্যাত ত্রয়ী উপন্যাস (বা না-উপন্যাস) Molloy : Malone Dies, The Unnameable [London : Calder : 1959)-এ কীভাবে রয়েছে, তা বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। অবশ্য প্রাগুক্ত অভিব্যক্তির মতো উপলব্ধিও যদি অনধিগম্য হয়, তাহলে তো পাঠ কিংবা পুনঃপাঠ কোনো কিছুরও কোনো মানে থাকে না। নাকি এই থেকে একেবারে ভিন্ন ধরনের একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাব : অজ্ঞেয়কেও নাছোড়বান্দা মানুষ যে অভিযাত্রীর প্রেরণা ও উদ্যম নিয়ে জানার চেষ্টা করে, তাৎপর্য-নির্ণয়বাদের নিরিখে এই উদ্যমের গভীরতর অর্থ রয়েছে। তেমনই রয়েছে অস্তিত্ববাদী ও প্রাতিভসত্তাবাদী ভাবনা-প্রস্থানের নিরিখেও। তবে এখানে ভাবছি অন্য কথা; সাম্প্রতিক সভ্যতায় প্রতীয়মানতার আড়ম্বরে যে নিষ্কর্ষহীন অস্তিত্বের প্রচ্ছদ-সর্বস্ব সমারোহ দেখতে পাচ্ছি, আখ্যানের নির্মাণ-কলাকে কতদূর অবধি বিনির্মাণ করলে তার যথার্থ ঔপন্যাসিক উপস্থাপনা সম্ভব! বেকেট কি পাঠকের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে চাইছিলেন যে শিল্পকলার সামর্থ্যও অনন্ত নয়! এর ব্যর্থতার উন্মোচনও হতে পারে লক্ষ্যহীন সময়ে ভাসমান কোনো জিজ্ঞাসু সত্তার

অন্বিষ্ট। যদিও 'Collected shorter prose'-এ লিখেছিলেন বেকেট, 'It's the end that gives meaning to words' (১৯৮৪ : ৯৬), তবু লিখব, তাঁর মন্তব্যকে তিনি নিজেই তো বারবার নিরাকৃত করে গেছেন। কেননা প্রথাসিদ্ধ সমাপ্তি-বাচন যেখানে নেই, ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ কি আদৌ নির্ধারিত হতে পারে!

জীবন-যাপনের অভিজ্ঞতা দিয়ে যে-জগতের প্রতিচ্ছবি আমরা অহরহ তৈরি করছি, তা তো ব্যক্তির নিজস্ব দর্পণে প্রতিফলিত সরলীকৃত ও খণ্ডীকৃত নির্মাণও হতে পারে। যে-সমস্ত উপকরণ বেছে নিয়ে বয়ান তৈরি করছেন কোনো লিখিয়ে কিংবা ছবি আঁকছেন কোনো চিত্রশিল্পী, তাতে কি যাপিত জীবন ও আত্তীকৃত জগতের অন্তহীন জটিলতার পর্যাপ্ত উন্মোচন ঘটে ? শিল্প-উপকরণ ও সৃজন-পদ্ধতির আন্তঃসম্পর্ক বেকেটের মতে ক্রমাগত অধিকতর মাত্রায় ছায়াচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে : 'as though shadowed more and more darkly by a sense of invalidity of inadequacy of existence at the expense of all that it excludes, all that it blinds to. The history of painting...is the history of its attempts to escape from this sense of failure by means of more authentic, more ample, less exclusive relations between representer and representee....' (Three Dialogues : p. 145)। ব্যর্থতার সর্বগ্রাসী বোধকে এড়িয়ে যাওয়ার এই চেষ্টা শুধু চিত্রশিল্পী করেন না, লেখকও করে থাকেন। উপস্থাপয়িতা ও গ্রহীতার মধ্যে তবু কোথাও রয়ে যায় অনতিক্রম্য দূরত্ব। বেকেটের মতো ব্যতিক্রমী চিন্তাবিদ-লেখক এই ব্যর্থতার বোধকেই উপন্যাসের 'বিষয়হীন বিষয়' করে তোলেন। অস্তিত্ববাদী ভাবুকেরা যাকে 'authentic existence' বলেন, তা সত্যিই কতখানি সম্ভব—এর গভীর অনুধ্যানের ফসলই তাঁর ত্রয়ী উপন্যাস। হয়তো তিনিও লিখতে পারতেন, 'আমার নাই-বা হলো পারে যাওয়া'—ব্যর্থতার অনিবার্য সত্যও তো হতে পারে ঔপন্যাসিক বয়ানের বীজতলি : এই ভাবনা তাঁকে প্রাণিত করেছিল ত্রয়ী উপন্যাস রচনায়।

দুই

বেকেট-বিশেষজ্ঞ রিচার্ড কোয়ে চমৎকার লিখেছেন 'Art...is the elucidation of the impossible'(১৯৬৪ : ৪)। শিল্প অসম্ভবের সম্ভাব্য ভাষ্য বলেই তো অভিব্যক্তির সহগামী অনভিব্যক্তকে নিয়ে স্রষ্টা চিরকালই জিজ্ঞাসু এবং অনিশ্চয়তাবোধে আক্রান্ত। সময়ের ঊর্নাতন্তুতে জেনে বা না-জেনে জড়িয়ে গিয়েই মানব-পরিস্থিতি ইদানীং মীমাংসাতীত জটিলতায় বিধুর। মানুষের অস্তিত্বের মর্মমূলে এখন সেই ক্লান্তি ও অবসাদ, যাদের ঈপ্সিত কোনো সংজ্ঞায় রুদ্ধ করা যায় না। জীবন ও জগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কও নিয়ত অস্থির বলে পূর্বনির্দিষ্ট কোনো ধারণা দিয়ে তার বৈধতা বা অবৈধতা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। ফলে কোনো পূর্বনির্ধারিত আখ্যানের আকল্প দিয়ে এই অনিবার্য ও সর্বব্যাপ্ত আপেক্ষিকতাকে বোঝা খুব দুরূহ ব্যাপার। বেকেট যেহেতু অনন্য

স্রষ্টা, তিনি সৃজন-প্রক্রিয়ার মধ্যেই নিরন্তর আত্ম-বিনির্মাণের আয়োজন করেছিলেন। যেন সর্বতোভাবে মুক্ত আপেক্ষিকতার কর্ষণ করে বয়ানের উপকরণ ও লক্ষ্য-সংশ্লিষ্ট যাবতীয় অভ্যাস পেরিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। তবু, ইতিমধ্যে দেখেছি, বেকেট নিজেই সৃজনী উদ্যমের ব্যর্থতাকে ভেবেছেন অনতিক্রম্য। তাহলে, বেকেটের ত্রয়ী উপন্যাসকেও ব্যর্থতাবোধের শিল্পকলার নিদর্শন বলতে হয়। এই প্রতিবেদনগুলির পক্ষে যা অর্জন করা সম্ভব নয়, এরা তা-ই করতে চেয়েছে। মানব-পরিস্থিতির সত্য প্রকাশ করতে গিয়ে যে-আকল্পগুলি ত্রয়ী উপন্যাস উপস্থাপিত করেছে, সেইসব শেষ পর্যন্ত নিরাকৃত হয়ে গেছে। কেননা বস্তু-পৃথিবী বলে ভাবছি যাকে, তা চিহ্নায়িত হতে গিয়ে নিশ্চিহ্নায়িত হয়ে গেছে। আন্তঃসম্পর্কের যে ঊর্নাতন্তুতে মানুষ জড়িয়ে আছে, অস্তিত্বের সর্বগ্রাসী শূন্যতায় ও বিচূর্ণিত জগতের সর্বাত্মক নেতির গ্রন্থনায় তা বিভ্রমে পর্যবসিত হয়। সমস্ত বস্তু যেহেতু অন্তহীন না-এর বুদ্বুদপুঞ্জ, মানব-পরিস্থিতিও হয়ে পড়ে নির্যাসহীন। ফলে মানুষের আস্তিত্বিক শূন্যতা ও কিমিতিবাদী নিরর্থকতার উপন্যাসীকরণ ব্যর্থতার শিল্পকলায় পরিণত না-হয়ে পারে না।

'The Unnameable' বইতে যে স্মরণীয় অভিব্যক্তি রয়েছে, ত্রয়ী উপন্যাসের পক্ষে তা যেন দিগ্‌দর্শক : 'I'm locked up, I'm in something it's not I'। এই যে পিঞ্জরবদ্ধ সত্তার অনির্দেশ্য ও আত্ম-নিরাকরণ সূচক অনুভব—তা পাঠকের মনে নিরন্তর অনুরণিত হতে থাকে। বিশেষত একুশ শতকের এই সূচনা-মুহূর্তে যখন দেখছি, বিশ্বপুঁজিবাদের সীমাহীন লোভ ও দম্ভ সামরিক প্রভুত্ববাদের রূপ নিয়ে বিনা বাধায় দেশে দেশে জাতীয় ঐতিহ্য-ভাষিক স্বাতন্ত্র্য-গণতন্ত্র-সার্বভৌমত্বকে জান্তব আক্রোশে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিচ্ছে, ব্যক্তিসত্তার কোনও পরিসর কোথাও স্বীকৃত হচ্ছে না—নির্মাণবায়নের এই ক্রূর ও উদ্ধত সন্ত্রাসে বিপন্ন মানুষ এই অবস্থানহীন অবস্থান থেকে বেকেটের ত্রয়ী উপন্যাসকে পুরোপুরি নতুনভাবে পুনঃপাঠ করতে পারে। আমরা বাঙালিরা তৃতীয় বিশ্বের মানুষ হিসেবে প্রতাপের সবচেয়ে কার্যকরী কৃৎ-কৌশল অর্থাৎ উন্নততম প্রযুক্তির মায়ায় বিভ্রান্ত ; সীমাহীন ভোগবাদের মরীচিকা একদিকে আমাদের ব্যক্তিগত পৃথিবীকে নিরর্থক প্রতিপন্ন করছে, অন্যদিকে অপ্রাপনীয় অলীক বিশ্বের ভ্রমকথায় চূড়ান্তভাবে উৎকেন্দ্রিক করে দিচ্ছে। ত্রয়ী উপন্যাসকে বুঝিবা এই কৃষ্ণবিবর-তুল্য সময়েই যথার্থ পুনঃপাঠ করা সম্ভব।

১৯৪৭ সালের ২ মে 'Molloy' রচনা শুরু হয়েছিল। আর, সে-বছরই ২৭ নভেম্বর তারিখে 'Mallone Dies' লিখতে শুরু করেছিলেন বেকেট। 'The unnameable' রচনা শুরু হয়েছিল ১৯৪৯-এর ২৯ মার্চ। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তিনটি বয়ানই ফরাসি ভাষায় আত্মপ্রকাশ করে। প্যারিস থেকে 'Molloy' প্রকাশিত ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে আর 'Mallone Dies' অক্টোবরে। বইগুলির ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হতে শুরু করে ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে। ত্রয়ী উপন্যাসের ইংরেজি সংস্করণ একসঙ্গে গ্রথিত হয়ে ১৯৫৬ সালে নিউইয়র্ক-এ প্রকাশিত হয়। যদিও

'Waiting for Godot', 'End Game', 'Murphy', 'Text for nothing', 'That time', 'All that fall' বা 'Happy days'-এর মতো বইয়ের জন্যে বেকেট বিশ্বসাহিত্যে চিরস্থায়ী কীর্তির অধিকারী, তবু কোনও কোনও সমালোচকের মতে ত্রয়ী উপন্যাসের জন্যেও তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

তিন

দান্তে যেমন ডিভাইন কমেডির জন্যে বা গ্যয়ঠে ফাউস্টের জন্যে বারবার পঠিত ও পুনঃপঠিত হচ্ছেন, তেমনি স্যামুয়েল বেকেটও তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসের জন্যে আলোচিত হবেন বারবার। এই তিনটি প্রতিবেদনে তিনি বিশ শতকের অন্তঃস্পন্দন ও তার আত্মহননকে যেন চিহ্নায়িত করে তুলেছেন। আবার একুশ শতকের প্রথম কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় অর্জিত উপলব্ধির সূত্রে মনে হচ্ছে তিনি বহমান সাম্প্রতিকেরও ভাষ্যকার। জেম্‌স্‌ জয়েস সম্পর্কে উচ্চারিত একটি বিখ্যাত মন্তব্য তাই বেকেটের ক্ষেত্রেও চমৎকার ভাবে প্রযোজ্য : 'Here form is content, content is form... His writing is not about something, it is that something itself.' ত্রয়ী উপন্যাস নয় কেবল, তাঁর সমস্ত সার্থক বয়ানে লক্ষ করি—কীভাবে প্রকরণই অন্তর্বস্তু হয়ে উঠছে আর অন্তর্বস্তুই প্রকরণ। আস্তিত্বিক উপস্থাপনা এমন যে প্রথাসিদ্ধ 'বিষয়' হিসেবে অস্তিত্ব নিজেকে জাহির করে না। উপস্থাপনার বিশেষ ধরনে ও নান্দনিক প্রতীতিতে তা অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্যভাবে মিশে থাকে। যেন মাধ্যমই বার্তা; কীভাবে ব্যক্ত হচ্ছে উপলব্ধি, তাতেই নিহিত থাকছে অভিব্যক্তির অন্বিষ্ট ও নির্যাস। ফলে পরাপাঠ ও অন্তঃস্বরের প্রচলিত স্তর-বিভাজন অস্তিত্বের উপন্যাসীকরণে মোটেই প্রাসঙ্গিক থাকে না।

কোনো সংশয় নেই যে যুক্তি-শৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের নিরবচ্ছিন্ন সংঘর্ষে দীর্ণ আধুনিকতাবাদী সভ্যতার স্থূল আড়ম্বরে পিষ্ট ও মর্দিত জীবনপটই ত্রয়ী উপন্যাসের আধেয়। এবং সেইসঙ্গে আধারও। ব্যক্তি-সত্তা যুক্তি ও কল্পনার মধ্যে নিয়ত দোদুল্যমান থেকে স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতার অভ্যস্ত সংজ্ঞাকে প্রত্যাখ্যান করছে। বিবিধ চূর্ণ-রচনার সংগ্রহ 'Disjecta' য় বেকেট একথাই লিখেছেন, যাতে মনে হয়, বহুদিন ধরে তিনি এই নিয়ে ভাবছিলেন : 'Art has nothing to do with clarity, does not dabble in the clear or make clear..... Art is the sun, moon and stars of the mind, the whole mind.' (১৯৮৩ : ৯৪)। এখানে পাঠকের মনে হতে পারে, তিনি বেকেটের নন্দনচিন্তা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সংকেত পেয়ে যাচ্ছেন। বেকেটের আস্তিত্বিক সংগঠনে বাহির ও ভেতরের জলবিভাজিকা অবলুপ্ত। তেমনই আখ্যান বা না-আখ্যান : কোনো আকল্পেই বাচন ও চিন্তার গ্রন্থিবিহীন গ্রন্থনাকে বাঁধা যায় না। তাহলে কি নব্য উপন্যাস লেখার ছলে উপন্যাসীকরণ প্রক্রিয়া ও সেই সম্পর্কিত যাবতীয় বিশ্বাস ও প্রত্যাশাকে মুছে ফেলতে চাইছিলেন বেকেট ? উচ্চসংস্কৃতির পরিপোষক স্বাভাবিক নান্দনিক অভ্যাসে তিনি কি তবে অন্তর্ঘাত করেছিলেন এভাবে! অস্তিত্ব-ভাবনার অজস্র

স্বর ও অন্তঃস্বরে যখন জটিল বুনট তৈরি হচ্ছে, তখনই আসলে তা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। একে কি কূটাভাসের অন্তহীন উপস্থাপনা বলব অথবা সৃজনী প্রয়াসের অনিবার্য ব্যর্থতার সচেতন প্রদর্শনী!

ত্রয়ী উপন্যাসে মোট চারটি কথক-সত্তাকে ব্যবহার করেছেন বেকেট যারা নিজেদের একান্ত অন্তর্বৃত অভিজ্ঞতাকে বয়ানে রূপান্তরিত করতে চেয়েছে। যেন এই রূপান্তরের মধ্য দিয়েই বহির্বৃত জগতের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কিত নিজস্ব বক্তব্যকেও উপস্থাপিত করতে চেয়েছে। ধারাবাহিক এই উদ্যম সত্ত্বেও বহির্জগৎ রয়ে যাচ্ছে একইরকম সুদূর, জটিল, অন্তহীন ও দুরধিগম্য যাকে কোনও অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে পারে না। তবু কথকসত্তা যা লিখতে চায় এবং শেষ পর্যন্ত যা লেখে তার ব্যবধান মেনে নিয়েও অন্তর্বৃত অনুভূতির অনতিক্রম্য বয়ানে রূপান্তর অব্যাহত থাকে। কেননা প্রকাশের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস সত্তার অবশ্যপালনীয় কৃত্য। এই দায়বোধ থেকে কথক-সত্তার মুক্তি নেই কেননা ভাষা-পৃথিবীর অধিবাসী মাত্রেই মূলত কথা-জাতক।

চার

'Molloy' উপন্যাসের দুজন কথকের প্রথমজন ঐ দায়বোধ থেকেই সক্রিয় থাকে, যদিও সে জানে না কিসের জন্যে এই দায়বোধ মেনে নিতে হয়। আখ্যান যখন শুরু হয়, আমাদের সে জানায় যে তার মায়ের ঘরে বিছানায় শুয়ে ব্যস্তভাবে লিখে যাচ্ছে। যেহেতু প্রতি সপ্তাহে একটি লোক এসে তাকে লেখার জন্যে টাকা দিয়ে যায়। অথচ মলয় বলে, 'আমি কিন্তু টাকার জন্যে লিখি না। তাহলে কিসের জন্যে লিখি আমি জানি না' (পৃ. ৭)। পরে অবশ্য দেখতে পাই যে সে লেখার কাজকে অপছন্দ করে এবং আখ্যান তার মতে 'Senseless, speechless, issueless misery.' (পৃ. ১৩)। আবার পাশাপাশি সে এও বলে যে, যা কিছু সে লিখেছে এতদিন—সবই কোনও একটি অন্তর্লীন স্বরের নির্দেশে। (পৃ. ৮৮) এতে মনে হয় বেকেট যেন বয়ানের ভেতর থেকেই বয়ানের বিস্তার ও উপযোগিতাকে প্রত্যাখ্যান করতে চাইছেন। আসলে আত্মবিনির্মাণের একটি বিশেষ ধরনকেই তিনি কথান্যাসের উপজীব্য করে তুলেছেন।

অন্তর্বৃত অনুভূতির পরম্পরায় বয়ানের যে টানা ও পোড়েন নির্মিত হচ্ছে, তা একই সঙ্গে স্মৃতি ও কল্পনা আর শব্দ ও নৈঃশব্দ্যের গ্রন্থনা। বিছানায় শুয়ে অর্থাৎ উদ্যম ও ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মলয় যে-বয়ান লিখেছে, তাতে ব্যক্তিসত্তা ক্রমাগত ডুবে যাচ্ছে একান্ত নিজস্ব অনুভবে বিম্বিত অভিজ্ঞতার দর্পণবিশ্বে। স্বভাবত এহেন দর্পণবিশ্ব কখনও ঘটমানতায় ক্লান্ত ও বিধুর কাহিনিবিশ্বের বিকল্প নয়। কোনও কোনও সমালোচক এতে মার্সেল প্রুস্তের ছায়া লক্ষ করেছেন। আবার হাইদেগার ও সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী ভাবনার সঙ্গে মলয়ের চিন্তাধারার সাযুজ্য কেউ কেউ বিশ্লেষণ করেছেন। স্বাধীনতা এই কথক-সত্তার কাছে খুব স্পষ্ট অর্থ নিয়ে আসে না, এ কেবল সুবিধাজনক ব্যবহারের উপযোগী একটি শব্দ মাত্র।

স্বাধীনতা সম্পর্কে মলয়ের নিম্নোধৃত বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য : 'I am....free, yes, I don't know what that means but its the word I mean to use, free to do what, to do nothing, to know, but what, the laws of the mind perhaps, of my mind, that for example water rises in proportion as it drowns you and that you would do better, at least no words, to obliterate texts than to blacken margins, to fill in the wholes of words till all is blank and flat and whole ghastly business looks like what it is.....' (পৃ. ১৩)।

নিরবচ্ছিন্ন চিন্তাস্রোতে প্রবহমানতাই আসল কথা, গন্তব্য নয় ; তাই অর্ধযতির সমাবেশ শুধু, পূর্ণ যতি নেই। স্বাধীনতা যেমন কথকসত্তার কাছে নিরর্থক, তেমনি তার ব্যবহার-বিধি কিংবা জগৎ বিষয়ে জ্ঞানও নিরর্থক। পূর্ববর্তী ভাবনাপুঞ্জ ও লিখনবিশ্বকে মুছতে মুছতে আর অস্বীকার করতে করতে নতুন লেখা জন্ম নেয়। এই কথকস্বর কিছুতেই এটা মানবে না যে মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে। বরং শব্দ তার মতে ফাঁপা ও নির্দিষ্ট অর্থের কাছে কোনও ধরনের দায়বোধ থেকে মুক্ত। তাই এর ভেতরকার শূন্যতাকে আপাতত ভরে নিতে হয় এক মুহূর্ত থেকে অন্য মুহূর্তে বহমান চিন্তা ও অনুভূতির উপলব্ধির স্রোত দিয়ে। ফলে, সব মিলিয়ে বয়ানও হয়ে পড়ে অনির্দেশ্য ও পূর্বানুমান বহির্ভূত—এমন কী কার্যকারিতার নিয়মবিধি ও বৈধতা থেকে মুক্ত। এই মুক্তি ও শূন্যতা অন্যোন্য-সম্পৃক্ত। ত্রয়ী উপন্যাসের তিনটি ভিন্ন পাঠকৃতির মধ্য দিয়ে পাঠক যেন প্রবাহিত হয়ে যান ; সত্যিকারের পা রাখবার ভূমি কোথাও যেন খুঁজে পাওয়া যায় না। মনে প্রশ্ন জাগে, এদের মধ্যেকার ভিন্নতা কি প্রতীয়মান শুধু? চেতনা যদি নেতির সর্বব্যাপ্ত শূন্যতা হয়, সত্তার সঙ্গে চেতনার সম্পর্ক কী? কথকের অভিজ্ঞান হিসেবে নির্মিত হচ্ছে যে-শূন্যতা, তার কোনও সময়গত বা পরিসরগত পরিচয় আছে?

পাঁচ

উত্তম পুরুষে বিধৃত কথক-সত্তা আর চেতনা কি অভিন্ন? চেতনা যেমন সত্তার নিয়ামক, তেমনি তা বিষয়গত। সত্তা ও শূন্য ্র বিচিত্র অন্বয় ও অন্বয়ে চেতনার ভূমিকা ও অবস্থান অহরহ রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। ফলে উপন্যাসীভূত কথান্যাসেও কোনও সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষণবিন্দু বজায় থাকছে না। শুধু কি জ্ঞাতব্য খানিকটা নির্ভরযোগ্য? জ্ঞাতার স্বরূপে বোধগম্য স্থিরতা নেই বলে তা নেতি! তাহলে তো জ্ঞাতাকে জ্ঞাতব্য থেকে নেতিই বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। ঐ 'আমি' কি মুক্ত ও স্বাধীন এমন কী, 'আমার' থেকেও! সত্তা যদি সমস্ত মূল্যবোধের ভিত্তি হয়, বহুমাত্রিক জাগতিক পরিস্থিতিতে 'স্বতঃনিক্ষিপ্ত' হয়ে কোনো কিছু বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা কি তার আছে? এই কূট জিজ্ঞাসা জাঁ পল সার্ত্র-র মতো স্যামুয়েল বেকেটকেও ভাবিয়েছে। ত্রয়ী উপন্যাসের শীর্ষবিন্দু 'The unnameable'-এর 'আমি' বলেছে : 'Perhaps that's what I feel,

an outside and an inside and me in the middle, perhaps that's what I am, the thing that divides the world in two, on the one side the outside, on the other the inside, that can be as thin as foil, I am neither one side nor the other, I'm in the middle, I'm the partition, I've two surfaces and no thickness...'। (পৃ. ৩৮৬) বাহির এবং ভিতরের বিভাজন এ জগতে প্রাসঙ্গিক হলেও সত্তার অভিজ্ঞানে কোনো ভিতর ও বাহির নেই। 'ঘরেও নহে পারেও নহে যেজন আছে মাঝখানে' যে-উপলব্ধিতে উচ্চারিত হয়েছিল, এখানকার এই 'I'm in the middle' ঠিক তা নয়।

চেতনার বিভিন্ন অবস্থানের ওপর সার্ত্র যেভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন, বেকেট যেন তারই কাছাকাছি। অস্তিত্ববাদী ভাবুকেরা চেতনাকে ভেবেছেন উৎকণ্ঠা বা উদ্বেগ, যাকে এড়ানো যায় না। আর, বেকেটের কাছে চেতনা দহনের সেই যন্ত্রণা যার মধ্য দিয়ে গিয়েই মুক্তির সম্ভাব্য প্রকল্প তৈরি করে নিতে হয়। ত্রয়ী উপন্যাসে এবং 'Texts for Nothing' ও 'How it is' নামক প্রতিবেদনেও লক্ষ করি, কথক-সত্তা ও সহজীবীদের (যারা সহযোগী নয়) মধ্যে আগাগোড়া আততি অক্ষুণ্ণ থেকে যায়। 'Molloy'-এর বয়ান কে উপস্থাপিত করে? এই কথক কি মোরান? 'The unnameble' এর নামহীন অস্তিত্বই বা কে? তবে কি বেকেটের সমস্ত কথক ও কুশীলবেরা মূলত এক ও অভিন্ন এবং সব কিছুতেই বেকেট উপস্থিত! কোনো অবস্থান যখন বয়ানের প্রয়োজনে তিনি গ্রহণ করেন কিংবা সব অবস্থান নিরাকৃত করেন—সর্বত্র আসলে ন যযৌ না তস্থৌ এর বিভঙ্গ। 'Texts for Nothing'-এর প্রথম স্বরের এই বাচন লক্ষণীয়, 'I need nothing, neither to go on nor to stay where I am, it's truly all one to me, I should turn away from it all.' (পৃ. ৭১)। এই স্বর যা-ই বলুক, কথকসত্তা কিন্তু সরে দাঁড়ায় না। কোথাও যাওয়া বা থাকার ইচ্ছা থাকুক বা না-ই থাকুক, অন্তহীন ভাবনার ঊর্ণতন্তু বয়ান চলতেই থাকে। কেননা ভাবনাই ঘটমানতা। তাই একে-একে ত্রয়ী উপন্যাসের বিভিন্ন এককগুলি রচিত হয় এবং তারপরও বেকেটের কথকসত্তা থামে না। নইলে ত্রয়ী উপন্যাসের পাশাপাশি 'Texts for Nothing' আর 'Waiting for Godot' রচিত হত না।

সার্ত্রের মতো বেকেটের কথকেরা কি বলতে পারত, 'I am condemned to be free?' স্বাধীনতা সার্ত্রের কাছে কূটাভাস আর বেকেটের জন্যে নিপীড়ন। অনিবার্য অভিব্যক্তিহীনতার মুখোমুখি সত্তা স্বাধীনতাকে দেখে নেতি ও বিনাশের দর্পণে। সমস্ত নাম ও রূপ তাতে হারিয়ে যায়। আত্মজীবী সত্তাকে যে-নাম দিন না কেন, তা স্বতশ্চলভাবে সেই নামের গণ্ডি পেরিয়ে যায়—এরকম ভেবেছেন সার্ত্র (Being and Nothingness, পৃ. ৪৩৯)। তাঁর মতে সচেতন মানবিক বাস্তবতার কোনো সুনির্দিষ্ট নিষ্কর্ষ নেই বলেই তা প্রতিনিয়ত নিজেকে নতুন ভাবে সৃষ্টি করে। তাই তাকে কোনো পূর্বনির্ধারিত সংজ্ঞায় রুদ্ধ করা যায় না। কিংবা কোনো বিশেষ নামের খাঁচায় বন্ধও করা যায় না। বেকেটও কি একই কথা ভেবে তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসে শেষ পর্যন্ত নাম বর্জন

করেছিলেন? চূড়ান্ত পর্যায়ে তাই এল 'The Unnameable'! আর, সেই সঙ্গে 'Texts for Nothing'-এর লেখক-সত্তার জন্যেও কোনো নাম বরাদ্দ হল না। সাপ যেভাবে খোলস ছেড়ে দেয় তেমনই যেন বেকেটের কুশীলবেরা বহির্জগতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ত্যাগ করে।

ছয়

মলয়, মোরান, ম্যালোনে সহ অন্য কথকেরা যেন প্রতিরোধহীনতা ও দ্রোহক্ষমতার অভাবের অভিব্যক্তি। সেইসঙ্গে এরা নিজেদের কাছেও আশ্রয়ের জন্যে ফিরে যেতে পারে না। ফলে তাদের দহনেরও অবসান হয় না। বেকেট যাদের বয়ানে উপস্থাপিত করেছেন, অস্তিত্বতাত্ত্বিক ভাবনার নানা স্বর ও অন্তঃস্বরের প্রতিনিধি হওয়া ছাড়াও সম্ভাব্য আখ্যানবিশ্বের নিরিখে তাদের মধ্যে আরও কিছু সংকেত রয়েছে। প্রধান কথককে যেসব সহজীবী কথকেরা পর্যবেক্ষণ করছে, তাদের চেতনাগত সংশয় ও অসামর্থ্য কি তাকে বিদ্ধ বা প্রভাবিত করছে? অথবা আদৌ করছে না! কথক নিজের উপস্থিতিকে কতদূর পর্যন্ত গ্রাহ্য ও প্রসারিত করতে পারছে! মনে হয় এইসব সহজীবী সহ প্রধান কথকও নিজের অবস্থানে দৃঢ় ও নিশ্চিত নয়। বরং এরা একে অপরের পালের হাওয়া কেড়ে নিচ্ছে যুগপৎ শব্দানুষঙ্গ ও নৈঃশব্দ্য দিয়ে। আসলে বেকেট জানেন, কোনো মানব-পরিস্থিতি ও জাগতিক পরিপার্শ্ব নির্ভরযোগ্য নয়, নিশ্চিত নয়; এমন কী, জিজ্ঞাসা-তাড়িত রূপান্তরের বয়নও অনিকেত। তেমন কোনো অপর পরিসরও নেই যাকে পূর্বানুমান করা চলে এবং সেই অনুযায়ী বিভিন্ন কথানুষঙ্গ দিয়ে সর্বগ্রাসী শূন্যতার কার্যকরী মোকাবিলা সম্ভব হতে পারে।

অনতিক্রম্য এই সত্যের কথকতা করার জন্যও যে বেকেটকে কথাভুবন পরিক্রমা করে লিখতে হয় ত্রয়ী উপন্যাস—সংকেত হিসেবে তা অমূল্য। অন্তর্বৃত অনুভূতিমালার পঞ্জীয়ন যখন ঔপন্যাসিকতায় রূপান্তরিত হচ্ছে, লিখন-কৌশল সম্পর্কে কিছু কিছু সিদ্ধান্ত স্বয়ং লেখককেই নিতে হয়। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্ভবত কথিতব্য ও অকথিতব্যের সীমানা নির্ণয়। অর্থাৎ কী লিখব এবং কী লিখব না, এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায় সত্য-মিথ্যার দার্শনিক আর অভিজ্ঞান-অনভিজ্ঞানের নান্দনিক প্রসঙ্গ। লক্ষণীয় ভাবে Molloy-এর কথকস্বর ভেবেছে, 'You must choose, between the things not worth mentioning and those even less so. For if you set out to mention everything you would never be done' (পৃ. ৪১)।

মলয় ও মোরানের মতে 'Malone Dies'-এর কথকও অংশত আত্মজৈবনিক স্বরের অধিকারী। সাহিত্য-দর্শন-শিল্পকলা-মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে বেকেটের মনোভঙ্গির শরিক এই উপন্যাস-রচয়িতা চরিত্রটি। স্পষ্টতই বেকেটের প্রতিনিধি হিসেবে সে পাঠকের মুখোমুখি। যেন এই চরিত্রের মাধ্যমে নিজেকেই বিশ্লেষণ ও পরখ করেছেন বেকেট, এমন মনে হয় এবং সেইসঙ্গে, পাঠককে ত্রয়ী উপন্যাসের সম্ভাব্য অন্বিষ্ট

সম্পর্কেও অবহিত করতে চাইছেন। অন্তর্লীন সত্যের সন্ধানে তিনি যে অন্তর্বৃত যাত্রার সূচনা করেছেন উপন্যাস রচনার নামে তাতে লেখায় বারবার পর্বান্তর হওয়া অপরিহার্য : 'Little by little with a different aim, no longer in order to succeed, but in order to fail...' (Malone Dies, পৃ. ১৯৫)।

পাঠক হিসেবে আমরাও একটু একটু করে এগিয়ে যাই বাহির থেকে ভেতরে কিংবা ভেতর থেকে বাইরে। কোনটা খোল আর কোনটা শাঁস, এ সম্পর্কে কোনোরকম পূর্বানুমান ছাড়াই। যাই সিদ্ধান্তহীনতার দিকে, যাই অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থ পাঠের দিকে। কেননা সূত্রধার লেখক বেকেটের অনুসরণে আমরাও ব্যর্থতার অনুসারী।

স্যামুয়েল বেকেট : অস্তিত্বের নিষ্কর্ষ সন্ধানে

অস্তিত্বের নিষ্কর্ষ কী, তা নিজস্ব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বুঝে নিতে হয় ; একে ব্যাখ্যা করা কঠিন। সত্তার কেন্দ্র ও পরিধি সম্পর্কিত ধারণা নৈর্ব্যক্তিক হতে পারে কিনা আদৌ, এই জিজ্ঞাসার দার্শনিক নির্মাণ সম্ভব। তবে সাহিত্যের বিভিন্ন মাধ্যমে প্রতিবেদনের বিশিষ্ট উপস্থাপনায় অস্তিত্বের আলো-আঁধার অনেক বেশি গ্রাহ্য হয়ে উঠতে পারে। স্যামুয়েল বার্কলে বেকেটের (১৯০৬-১৯৮৯) জীবনব্যাপ্ত সৃষ্টি ও মননের যুগলবন্দি অনুসরণ করে মনে হয়, তিনি মূলত অস্তিত্ব-ভাবুকতার বিচিত্র বিচ্ছুরণ ব্যক্ত করার জন্যে মাধ্যম থেকে মাধ্যমান্তরে পরিব্রজন করেছেন। উপন্যাস ও নাটকের শিল্পরূপ আধুনিক সংবেদনার বিদ্যুৎ-স্পর্শে কতখানি আমূল রূপান্তরিত হতে পারে, এর অনবদ্য দৃষ্টান্ত 'Murphy', 'Wait', 'Mercier and Camier', 'Molloy', 'Malone Dies', 'The Unnameable', 'Eleutheria', 'Waiting for Godot', 'Endgame', 'Texts for Nothing', 'How It is', 'Happy Days' প্রভৃতি প্রতিবেদন। এদের বহুমাত্রিকতা প্রমাণিত হয় আলোচকদের ভাষ্যের অতিরেকে। বেকেটের বিশ্ববীক্ষার প্রকৃত স্বরূপ নিয়েও মতভেদের অন্ত নেই। কেউ বা মনে করেন, এই লেখক বিশ শতকের দ্রুত রূপান্তর-প্রবণ সময়ানুভব নিজের মধ্যে শুষে নিতে গিয়ে বুঝেছিলেন যে সময়-পরিসর-ক্রিয়ার চিরাগত ঐক্যের প্রতীতি এখন আর প্রাসঙ্গিক নয় তত। আজকের পৃথিবী পরস্পর-বিরোধী প্রবণতার সংশ্লেষণী সমাবেশ।

অতএব এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্যে বেকেটের স্বরন্যাসে দেখা গেল বিষণ্ণ কৌতুক, উদাসীন শ্লেষ, তীক্ষ্ণ নৈরাশ্য ও দার্শনিক নিরাসক্তির বিচিত্র সহাবস্থান। তাঁকে কখনও মনে হয় কিমিতিবাদী আর কখনও অস্তিত্ববাদী ভাবুক। সত্তার বহুধা-বিভাজন বিশ শতকের বিপন্ন আবহে অনিবার্য। মানব-পরিস্থিতির বিভিন্ন অভিব্যক্তি থেকে সম্ভাব্য ঔপন্যাসিকতা ও নাট্য-ক্রিয়ার পরিসর খুঁজে নিতে গিয়ে বেকেট অনবরত একবিন্দু থেকে অন্যবিন্দুতে সরে গেছেন। এইজন্যে কোনও একক পাঠকৃতিই তাঁর বিশ্ববীক্ষার একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধি বলে বিবেচিত হতে পারে না। কিংবা কোনও একটি নির্দিষ্ট তত্ত্বপ্রস্থানের সীমায় তাঁকে বেঁধেও রাখা যায় না। জাঁ-পল সার্ত্রের বিখ্যাত চিন্তাসূত্র অনুযায়ী বেকেটও ভাবতেন যে আমাদের অস্তিত্বের মর্মমূলে রয়েছে শূন্যতার বোধ, স্বাধীনতার স্পৃহা এবং নির্বাচিত ইচ্ছার পরম্পরায় প্রতিনিয়ত নিজেদের সত্তাকে সৃষ্টি করার প্রবণতা। 'Waiting for Godot' কি তাহলে সার্ত্র-কথিত 'bad faith'-এর উদাহরণ? কেননা 'Being and Nothingness'-এ

সার্ত্র লিখেছেন : 'The first act of bad faith consists in evading what one cannot evade, in evading what one is,' (১৯৪৩ : ১১১)।

কিন্তু উপলব্ধিগত এই সাদৃশ্য সত্ত্বেও বেকেট কোনো বিশেষ তত্ত্বপ্রস্থানের সঙ্গে নিজেকে পুরোপুরি সম্পৃক্ত করেননি। তবু 'Waiting for Godot'-এর মতো অসামান্য নাট্যকৃতি যেহেতু বিশ শতকের আস্তিত্বিক কূটাভাসের অভিজ্ঞান হয়ে উঠেছে, বিভিন্ন চিন্তাপ্রেক্ষিত থেকে তার উপর উদ্‌ভাসনী আলো নিক্ষেপ করা হয়েছে। ফলে এই পাঠকৃতি ঘিরে গড়ে উঠেছে অজস্র ভাষ্য ও অন্তর্বেদনের বলয়। দার্শনিক, নান্দনিক, মনস্তাত্ত্বিক ও ধর্মীয় অনুষঙ্গে ব্যাখ্যা করার পরেও কেউ বা এই নাট্যকৃতির মধ্যে খুঁজে পান কবিতার নিবিড় দ্যোতনা। বিখ্যাত সমালোচক মার্টিন এসলিন তাঁর বহুপঠিত বই 'The Theatre of the Absurd'-এ লিখেছেন : 'Yet above all it is a poem on time, evanescence, and the mysteriousness of existences, the paradox of change and stability, necessity and absurdity.' (১৯৫১ : ৬২)। কিমিতিবাদের লক্ষ্য ও অন্বিষ্ট সংজ্ঞায়িত হয়েছে বিশ শতকের ক্রমবর্ধমান জটিল ও অস্থির আবহের তাৎপর্য অনুশীলনের সূত্রে। সময় যখন নিজেই দাহ্য এবং দাহক, বহুধরনের অনন্বয়ে ক্লিষ্ট ও বিপন্ন ব্যক্তি-সত্তা অনুভব করছিল, চিরাগত যুক্তিশৃঙ্খলার কোথাও কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই আর। সেইসঙ্গে যুক্তিবাদ-নিয়ন্ত্রিত জগৎও অর্থহীনতায় আক্রান্ত ; দিশাহারা মানুষ এই নির্ভরতাশূন্য জগতে আঁকড়ে ধরার মতো খড়কুটো পর্যন্ত পাচ্ছে না কোথাও। বেকেট ব্যক্তি-সত্তাকে সময়-সমুদ্রে বিচ্ছিন্নভাবে ভাসমান ভেলা বলেই অনুভব করেছিলেন। অস্থির জগতে ব্যক্তিত্বও তরল, পরিসরশূন্য ; অস্পষ্ট সংরূপহীন বহিঃপৃথিবীর সন্ত্রাসে সর্বদাই যেন কাতর ও দয়াপ্রার্থী। অস্তিত্বের অতলান্ত রহস্য এবং স্থবিরতা ও পরিবর্তনের সম্ভাব্য দ্বিরালাপ খুঁজে না-পেয়ে কূটাভাসের মুখোমুখি হয়ে ব্যক্তি-সত্তা অবসন্ন, বিধুর।

দুই

বিশ শতকীয় আধুনিকতার মধ্যে বিভিন্ন অন্ধবিন্দুর উপস্থিতি যখন সংবেদনশীল লেখকদের অন্তর্বস্তু ও প্রকরণের নতুন নতুন প্রত্যাহ্বান নিয়ে আসছিল, বেকেটের সংবেদনশীলতা তাতে সাড়া না-দিয়ে পারেনি। পশ্চিমি সমাজের যুক্তিবাদী চিন্তাপ্রবাহের স্তিমিত গতি, অবনমন ও অনিবার্য বন্ধ্যাত্ব তাঁর নাট্যপাঠকৃতি ও ঔপন্যাসিক পরাবয়নকে প্রভাবিত করেছিল। ফ্রান্‌ৎস কাফকা ও আলবেয়ার কাম্যু, জাঁ-পল সার্ত্র ও টমাস মান : কেউ বা সংলগ্ন আর কেউ দূরবর্তী সহযাত্রী। বেকেটের ট্র্যাজি-কমিক জীবনবীক্ষা সময়লালিত আস্তিত্বিক চেতনারই তির্যক অভিব্যক্তি। প্রথম যৌবনেই তিনি সমসাময়িক ইউরোপের বহুমুখী বৌদ্ধিক ও শৈল্পিক সমৃদ্ধির উত্তাপে পরিশীলিত হয়েছিলেন। উচ্চমার্গীয় বিদ্যায়তনিক পাঠের মধ্য দিয়ে তাঁর চিন্তা ও অনুভূতির যুগলবন্দি অভিব্যক্তির উপযোগী ভিত্তি রচিত হয়েছিল। আর, ১৯২৮ থেকে ১৯৩৯ এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সূচনা হওয়ার আগে অজস্র বাঁকসম্পন্ন লেখক-জীবনের সূত্রপাত

হলো। ঐ পর্বে জেম্স্ জয়েসের প্রভাব তাঁর সৃজনী ভাবনাকে মুকুলিত হতে সাহায্য করেছে। তখনই বেকেট অন্তর্বস্তু ও প্রকরণের গভীর অন্যোন্য-উদ্‌ভাসক সম্পর্ক বিষয়ে সচেতন ছিলেন, এর প্রমাণ পাওয়া যায়। সে-সময় প্রুস্ত ও দান্তে সম্পর্কে তাঁর নিবিড় ভাবনায় মানব-সত্তার নিষ্কর্ষও যে অভিনিবেশের বিষয় হয়ে উঠেছে, তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। 'Proust and Three Dialogues with Georges Duthuit' (১৯৬৫) বইতে জীবন বিষয়ে যে-উপলব্ধির প্রকাশ দেখি, 'Waiting for Godot'-এ তাঁরই সর্বোত্তম শৈল্পিক অভিব্যক্তি লক্ষ করি।

প্রুস্ত প্রসঙ্গে বেকেট লিখেছেন : 'The laws of memory are subject to the more general laws of habit. Habit is a compromise effected between the individual and his environment or between the individual and his own organic eccentricities, the guarantee of a dull inviolability, the lightning conductor of his existence. Habit is the ballast that chains the dog to his vomit. Breathing is habit, life is habit. Or rather life is a succession of habits, since the individual is a succession of individuals' (পৃ ১৯)। নিরবচ্ছিন্নভাবে পুনরাবৃত্ত দৈনিক অভ্যাসের শৃঙ্খলে বদ্ধ জীবন ব্যক্তি-সত্তাকে ক্লান্তি-ক্ষয়-অবসাদের অন্তহীন যন্ত্রণায় বন্দী করে দেয়। স্পষ্টত 'Waiting for Godot'-এর পাঠকৃতিতে মূলত এই উপলব্ধির বহুস্বরিক অভিব্যক্তি লক্ষ করি। নিঃসন্দেহে আত্মদ্বন্দ্বে বিক্ষত ইউরোপে ওই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ের যাবতীয় বৌদ্ধিক আততি ও বিভিন্ন চিন্তা-প্রস্থানের সংঘাত থেকে অর্জিত উপলব্ধির সূক্ষ্ম ও সংহত শিল্পরূপ বেকেটের লিখন-প্রণালীতে ব্যক্ত হয়েছিল। কোনও কিছুই আকস্মিক নয় ; সমস্তই প্রগাঢ়ভাবে ঐতিহাসিকতায় নিষ্পন্ন।

একদিকে ব্যক্তিগত জীবনের নানা উথাল-পাথাল ও অনিশ্চয়তা এবং অন্যদিকে বহির্জগতের ঘনায়মান তীব্র সংকট বেকেটের আধুনিকতা বিষয়ক অনুভবকে প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। দীপায়ন ও যুক্তিবাদের সামূহিক অবসানের মধ্যে তিনি লক্ষ করেছিলেন মানব-স্বরূপের অভূতপূর্ব সংকট। সমসাময়িক পৃথিবী যখন অনতিক্রম্য বিনাশবাদের দ্বারা আক্রান্ত, বেকেটের সৃজনশীল সত্তা সাহিত্য-মাধ্যমের আমূল পুনর্বিন্যাসের জন্যে উৎসুক হয়ে উঠেছিল। বহির্বৃত জগতের উৎকেন্দ্রিকতা ও বিশৃঙ্খলতাকে সাহিত্যিক অভিব্যক্তির মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার চেষ্টা তাঁর কাছে অনাবশ্যক বিবেচিত হলো। চিত্রশিল্পে পাবলো পিকাসো যেমন চিত্রবস্তু, প্রকরণ ও চিত্রভাষার আমূল পুনর্বিন্যাস করে আধুনিকতাবাদের নতুন নতুন আকল্প নির্মাণ করেছিলেন, তেমনি স্যামুয়েল বেকেটও বাচনিক সংযোগের পুরোপুরি নতুন ধরন আবিষ্কার করার জন্যে সত্যভ্রম ও সত্য আর বাস্তব ও অধিবাস্তবের প্রচলিত সংরূপকে প্রত্যাখ্যান করতে চাইছিলেন।

অতি উদ্ভাসিত বাহিরের বদলে তিনি সত্তার অন্তর্বৃত অন্ধকার পরিসরে ঔপন্যাসিকতার আশ্রয়ভূমি খুঁজে নিলেন। ভাষার গভীরে যে-আয়তনটুকু সাধারণত

অনাবিষ্কৃত রয়ে যায়, তিনি ক্রমশ সেদিকে মনোযোগী হয়ে উঠলেন। জর্জ ডুথুই-এর সঙ্গে আলাপচারিতায় ঐ সময়কার শিল্প-সংবিদ সম্পর্কে বেকেট জানিয়েছেন, অভ্যাস-ক্লান্ত সাহিত্যিকতার পথ বর্জন করে তিনি এই বিশ্বাসে স্থিত হয়েছিলেন যে 'There is nothing to express, nothing with which to express, nothing from which to express, no power to express, no desire to express, together with the obligation to express.' (প্রাগুক্ত : ১০৩)।

আস্তিত্বিক জিজ্ঞাসা ও উপলব্ধির কথকতা হয়তো বা অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রত্যাশিত বয়ানের ধরনকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেনি। কিন্তু তাতে ক্ষতি হয়নি কিছু। কেননা বেকেট বিভিন্ন প্রচলিত চিন্তাপদ্ধতির সীমান্তে অবস্থান করেছেন। আধুনিকতাবাদী অভিজ্ঞতাও তাঁকে নিগড়ে বাঁধেনি কখনও। আখ্যান হোক বা নাট্যকৃতি, তাঁর নান্দনিক চিন্তা পূর্ব-নির্ধারিত সত্যের বদলে গুরুত্ব দিয়েছে সত্তার নির্মীয়মান প্রকল্প ও জগতের সংজ্ঞা-বিরোধী প্রবণতার ওপর। বিশ শতকের শেষ তিনটি দশকে বেকেট-চর্চার দিগন্ত-বিস্তার প্রমাণ করে যে তাঁর সার্থক পাঠকৃতি মাত্রেই বহুমাত্রিক ও অনেকার্থ-দ্যোতক। এইসব বিশ্লেষণী পাঠ-সংহতিকে এড়িয়ে যাওয়া আজ আর সম্ভব নয়। আজকের পুনঃপাঠে পড়ুয়ারা সংশ্লেষণী মনোভঙ্গি গ্রহণ করাকেই সমীচীন বলে মনে করতে পারেন। বেকেটের অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসার সঙ্গে আধুনিকতাবাদী শিল্প-সংবিদের পুনর্নির্মাণও হতে পারে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। একটু অন্যভাবে বলা যায়, ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিত ও প্রসঙ্গের অনেকান্তিক দ্বিবাচনিকতা বরং সমান্তরাল নিবিড় পাঠে উৎসাহ যোগান দেয়। এভাবে পাঠকেরা বুঝে নিতে পারেন কীভাবে এবং কেন বেকেট কালজ হয়েও কালোত্তর স্রষ্টা বলে গণ্য হয়েছেন।

তিন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরবর্তী এক দশকে (১৯৪৫-১৯৫৩) যে বেকেটের খ্যাতি লন্ডনে ও প্যারিসে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ল, এর ঐতিহাসিকতা আমরা লক্ষ না করে পারি না। ইউরোপের অভূতপূর্ব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের পরে ধ্বংসের ভস্মরাশি থেকে যে সর্বাত্মক পুনর্গঠনের আর্তি জেগে উঠল, তারই নান্দনিক সংকেত যেন দেখা গেল বেকেটের বিভিন্ন দিক-নির্দেশক বয়ানে। সর্বব্যাপ্ত ধ্বংসের পটভূমিকায় নতুন নির্মাণের আকল্প কখনও আধুনিকতা বা আস্তিত্বিক সংহিতা বা মানববিশ্বের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কিত বৌদ্ধিক জিজ্ঞাসায় ফুরিয়ে যেতে পারে না। কিংবা এ কেবল অন্তর্বস্তু বা প্রকরণ বা উপস্থাপনা-শৈলী সংক্রান্ত ভাবনায় রুদ্ধ নয়। বেকেট ব্যক্তি-সমাজ-ইতিহাসের বহুরৈখিক সূক্ষ্ম আন্তঃসম্পর্কের গ্রন্থনাকে অনুশীলন করেছেন অনুভূতি ও মননের অনবদ্য যুগলবন্দির মধ্য দিয়ে। যথাপ্রাপ্ত জগতের কাল্পনিক প্রতিরূপ রচনা করে শিল্প-সংবিদের দায় শেষ হয়ে যায়, এরকম তিনি ভাবেননি কখনও।

এই সময়-পর্বে বেকেট যেসব ছোটগল্প, উপন্যাস ও নাটক লিখেছেন, তাদের মধ্যে

ক্রমশ ব্যক্ত ভাষার চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে অব্যক্ত পরাভাষার গ্রন্থনা। অপ্রকাশের সংবেদনশীল উপস্থিতিতে শেষ পর্যন্ত আখ্যান ও নাট্যকৃতির যাবতীয় পরিচিত অনুষঙ্গ চূর্ণ হয়ে গেছে। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে এই সময়-পর্বে বেকেট যুগপৎ ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় লিখে গেছেন। নিঃসন্দেহে এর ফলে বাচনিক অভিব্যক্তিতে অনির্বচনীয়ের বিচিত্র দ্যোতনা সম্পৃক্ত হতে পেরেছে। 'Waiting for Godot' বইতে বেকেটের সৃজনী সংবিদ শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছে, শুধুমাত্র এইটুকু লেখা যথেষ্ট নয়। আত্ম-বিনাশক ইতিহাস যখন প্রসঙ্গ ও প্রেক্ষিতের যাবতীয় প্রচলিত ধরন ও পরম্পরাকে নিঃশেষে মুছে ফেলতে চাইছে, মানুষের কোন্ সংরূপ ও অবস্থান লিখন-প্রণালীর আধেয় হবে? জটিল গোলকধাঁধায় আকীর্ণ সময়ের সাহিত্যিক অভিব্যক্তি সম্পর্কে ইহাব হাসানের প্রাজ্ঞ মন্তব্য মনে পড়ে : 'Language has become void ; therefore words can only demonstrate their emptiness'. (১৯৬৭ : ৩০)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ধূসর সময়ের উৎকেন্দ্রিকতাকে পুরোপুরি নতুন আধারে ধারণ করতে চেয়েছিলেন বেকেট। তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিবেদন ও নাট্যকৃতি এই অনন্য প্রয়াসের ভিন্নমাত্রিক বিচ্ছুরণ যাকে বুঝতে হলে অস্তিত্বতাত্ত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সাধারণ পরিধির বাইরে যেতে হয়।

সর্বগ্রাসী ধ্বংসের দীর্ঘতম কালোরাত্রি পেরিয়ে এসে ইউরোপের বৌদ্ধিক চর্চা অতলান্ত নিরর্থকতার বোধে আক্রান্ত হয়েছিল। মিত্রপক্ষ ও অক্ষশক্তির মধ্যে কারা জয়ী আর কারা পরাজিত, এই তথ্য আসলে কোনও কাজে লাগেনি। আদিগন্ত উষর মরুভূমি কিংবা চোরাবালির মুখোমুখি হয়ে নতুন পরিস্থিতির সার্থক ভাষ্য রচনা কিংবা প্রতিবিধান ও বিকল্প পথ সন্ধান সাহিত্যের অন্তর্বস্তু ও প্রকরণ সম্পর্কিত ধারণার এই পর্বে আমূল রূপান্তর সূচনা করেছে। বেকেটের ত্রয়ী উপন্যাস (Moloy, Malone Dies ও The Unnameable) এবং সাড়া জাগানো দুটি নাট্যকৃতিতে (Eleutheria ও Waiting for Godot) সময়-তাড়িত বিপন্ন সত্তার বন্ধ্যাত্ব, অবসাদ, মন্থরতা ও আপেক্ষিকতা জনিত সংযোগশূন্যতা অজ্ঞাতপূর্ব পরাভাষার বয়নে ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর লেখক-জীবনের শিখরপর্বে (১৯৫৩-১৯৬৯) 'Endgame' ও 'Happy Days' নামক নাটক এবং 'All that Fall', 'Embers'-এর মতো বেতার-নাটক প্রমাণ করে, সাহিত্য-মাধ্যমের সম্ভাবনা প্রসারিত করার জন্যে তাঁর ভাবনা ও উদ্যোগ ছিল নিরবচ্ছিন্ন। লেখা যেন তাঁর কাছে নিজেরই অনুদ্যম ও অবসাদ থেকে নিষ্ক্রমণের আয়োজন। 'Texts for Nothing' ও 'How it is' নামক গদ্য-প্রতিবেদন এর অসামান্য দৃষ্টান্ত।

আখ্যানের চিরাগত ঐক্য-বোধ ও তাৎপর্য-প্রতীতির রৈখিকতা বিনির্মাণ করেই বেকেট সময়ের গোলকধাঁধার মোকাবিলা করতে চেয়েছিলেন। ইতিহাসের নিষ্ঠুর সন্ত্রাসে মানুষের সমস্ত প্রত্যয় যখন ধূলিসাৎ, মানবিক বোধ ও অবস্থানের যাবতীয় আকরণ নিরাকৃত—মানুষের সংজ্ঞা নিয়ে মৌলিক জিজ্ঞাসা দেখা দিয়েছিল তাঁর মনে। বহুমাত্রিক অন্ধকারের নৈরাজ্য ভাষা, সংযোগ, নান্দনিকতা এবং ব্যক্তি-পরিসর,

সামাজিক সম্পর্ক : সব কিছুকে আচ্ছন্ন করেছে। এ-সময় সৃজনী কল্পনাও নামহীন রূপহীন চরিত্রহীন পিণ্ডাকার ধূসরতায় হারিয়ে যাচ্ছে। ফ্রাঙ্কফুর্ট চিন্তা-প্রস্থানের অন্যতম পুরোধা তাত্ত্বিক থিয়োডোর অ্যাডোর্নো বিশ শতকের সংকট-ক্লিষ্ট প্রেক্ষিতে বেকেটের 'End Game' বইয়ের তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন : 'after the second world war, everything, including a resurrected culture, was destroyed, although without its knowledge. In the wake of events which even the survivors cannot survive, mankind vegetates, crawling forward on a pile of rubble, denied even the awareness of its own ruin.' (১৯৬৯ : ৮৫)

আকীর্ণ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ক্ষয় ও বিনাশের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে হারিয়ে-যাওয়া বিপন্ন মানব-সত্তার বুদ্বুদতুল্য উপস্থিতি বেকেটের লিখন-প্রণালীর প্রধানতম আধেয় হয়ে উঠেছিল। বস্তুত 'Waiting for Godot' এর চূড়ান্ত আস্তিত্বিক অবসাদ, রিক্ততা, নিঃসঙ্গতা ও সম্পর্কশূন্যতার নিষ্ঠুর বোধ 'EndGame'-এর বয়ানে প্রসারিত হয়েছিল আরও। সময় ও পরিসরের গ্রন্থনা যখন আঁধির অন্য নাম, নিরর্থকতার বুদ্বুদপুঞ্জ হিসেবে চিহ্নায়িত কুশীলবেরাও আসলে নিশ্চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ারই প্রতিনিধি।

চার

এই নিরিখে বেকেটের প্রতিবেদনগুলিতে প্রত্ন-আধুনিকোত্তর চেতনার পূর্বাভাস লক্ষ করি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ঐতিহাসিক আবহে পুঁজিবাদী আধুনিকতাবাদ যে শিল্প-প্রকরণের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলছে, এই সত্য বেকেট অনুভব করেছিলেন বলেই তাঁর রচনায় পরাভাষা, পরাবয়ন ও পরানন্দনের প্রকাশ ঘটেছে। প্রচলিত শিল্পকলা ও শৈলীর রুদ্ধতা থেকে নিষ্ক্রমণের চেষ্টায় আসলে ব্যক্ত হয়েছে অন্তঃসারশূন্য আধুনিকতাবাদ থেকে মুক্ত হওয়ারই নিবিড় আকাঙ্ক্ষা। বেকেটের দ্বারা উপস্থাপিত মানুষেরা মানব-অস্তিত্বের অপভ্রংশ-সমাবেশ দেখে দেখে ক্লান্ত ও অবসন্ন। তাদের অস্তিত্বের তাৎপর্য সন্ধানের সূত্রে তারা যে কেবলই যথাপ্রাপ্ত জগতের ধ্বংস, নিরাশ্রয়তা ও পারম্পর্য-হীনতা থেকে সরে দাঁড়াতে চায়—তাতেই আভাসিত হয় আরোপিত অপজীবনের প্রতি তাদের প্রত্যাখ্যান। সমালোচক আলভারেজ বেকেটের রচনায় যে 'remorseless stripping away of superfluities' (১৯৭৩ : ১২৩) দেখতে পেয়েছেন, তা বিশেষ অভিনিবেশ দাবি করে।

কোনও কোনও বিজ্ঞ সমালোচক ভেবেছেন যে অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসার নিরিখে বেকেটকে হাইদেগার, সার্ত্র ও কাম্যুর সঙ্গে একই পঙ্‌ক্তিভুক্ত করা যেতে পারে। আবার কেউ কেউ মনে করেছেন যে সত্তার সংগঠন সম্পর্কে বেকেটের ধারণা একেবারে নিজস্ব। এটা ঠিক যে সত্তার তাৎপর্য নিছক ব্যাখ্যার বিষয় নয়, তাকে শুধুমাত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই আত্মস্থ করে নিতে হয়। আর, এইজন্যে দার্শনিকের চেয়ে সাহিত্যিকই অস্তিত্ব-সংবিদের বেশি কাছাকাছি আসতে পারেন। অন্তর্দর্শনের সূত্রেই

যথাপ্রাপ্ত বাস্তবের সঙ্গে সমান্তরাল অপর-বাস্তব বয়ানে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। যদিও এসম্পর্কেও প্রতিপ্রশ্ন তুলে ধরা যায়। শতবার্ষিকী পুনঃপাঠে মানব-পরিস্থিতির সাম্প্রতিক বিভ্রম, অবভাস ও নির্মাণবায়নের প্রেক্ষিত যেন আগাম সক্রিয় হয়ে উঠেছে—এমন মনে হয়। বেকেট বুঝি বা বোঝাতে চাইছিলেন, বহুদ্বন্দ্ব-কন্টকিত মানব-অস্তিত্বই উৎকট কূটাভাসের আকর। সত্তা ও অস্তিত্ব সমার্থক হতে পারছে না কিমিতিবাদী পরিস্থিতির তীব্র পেষণে। বেকেটের লিখনবিশ্ব জুড়ে 'chaos' এর সর্বগ্রাসী ছায়া লক্ষ করে সমালোচক ডেভিস হেলসা অনিকেত সত্তার মীমাংসাহীন প্রয়াণের ওপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে, বেকেটের মৌলিক প্রতিপাদ্য হলো : 'What is absurd is human existence, why is it absurd ? Because being human and existing are mutually contradictory'. (১৯৭১ : ৮)।

'Waiting for Godot', 'Endgame'-এর প্রতিবেদনেই কেবল এই উপলব্ধির বিচ্ছুরণ রয়েছে, এমন নয়। ইতিমধ্যে অন্য কিছু বয়ানের উল্লেখ করেছি যাদের মধ্যে বেকেটের ব্যতিক্রমী জীবন-ভাবনা ও শিল্প-সংবিদ চমৎকার ব্যক্ত হয়েছে। খোলা প্রান্তরে গাছের পাশে দুজন ভবঘুরে গোডো নামে অনির্দেশ্য কারো জন্যে প্রতীক্ষা করছে—বহুস্বরিক ও অনেকার্থদ্যোতক এই দৃশ্যকল্প বিশ শতকের সাহিত্যের অন্যতম প্রধান ভাববীজের মর্যাদা অর্জন করেছে। নাট্যকৃতির নিরিখে একে জটিল বলা যায় না; মঞ্চসজ্জাও যৎসামান্য। ভ্লাদিমির ও এসত্রাগোন নামে দু'জন ভবঘুরে গোডোর প্রত্যাশিত উপস্থিতির জন্যে অপেক্ষা করতে করতে সময় কাটিয়ে দিচ্ছে। প্রতিটি অঙ্কে পোজো নামে এক জমি-মালিক ও তার ভৃত্য লাকির সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হয় এবং প্রতিটি অঙ্কের শেষে একটি ছেলে গোডোর কাছ থেকে এই বার্তা নিয়ে আসে যে পরদিন গোডো অবশ্যই তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। ভবঘুরেরা ঐ গাছের পাশ থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু সেখান থেকে সরে যায় না। নাট্যকর্ম যেহেতু নাট্যচরিত্র সৃষ্টি করে, অন্বিষ্টশূন্য ঘটনা কিংবা ঘটমানতার সামান্য আভাস থেকে ভ্লাদিমির ও এস্ত্রাগোনের মধ্যে তফাত করা কঠিন। তবে তুলনামূলক ভাবে ভ্লাদিমিরকে মনে হয় জিজ্ঞাসু বুদ্ধিজীবী আর এস্ত্রাগোনকে খানিকটা নির্ভরশীল। এদের প্রতিতুলনায় পোজো ও লাকি একটু বেশি গতিময় হলেও শেষ পর্যন্ত চারজনের মধ্যে কোনো প্রকৃত ব্যবধান দেখা যায় না। এরা কেউই যথাপ্রাপ্ত অবস্থান ও ঘটমানতা থেকে সরে যেতে পারে না। এই নাটক গোডো সম্পর্কে নয়, প্রতীক্ষা ও সময়যাপনই নাট্যকৃতির মুখ্য আধেয়।

সময় ও পরিসরের সংকেত হিসেবে যা-কিছু উচ্চারিত হয়েছে, তাদের ঘিরে আছে নৈঃশব্দ্যের বলয়। যেন অন্তহীন নীরবতার সমুদ্রে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো ভেসে আছে শব্দের ভেলা, এমন মনে হয়। অস্তিত্ব-বোধও তো এরকম অনন্ত অসীম অতলান্ত রহস্যের দ্যোতনা বয়ে আনে। নাট্যকৃতি এই কেন্দ্রীয় সত্য প্রকাশ করার জন্যে সংলাপের ভাষাকেও আগাগোড়া চিহ্নায়িত করেছে। এস্ত্রাগোন ভ্লাদিমিরকে যে বলে 'কোন্ শনিবার? সত্যি শনিবার তো? নাকি এটা রবিবার? (একটু থেমে) অথবা

সোমবার? (একটু থেমে) নাকি শুক্রবার?' ওরা একজন আরেকজনকে সংশয়ী করে তুলতে চাইছে, এরকম না-ভেবে এই সংলাপের অন্য কোনও তাৎপর্য খুঁজতে পারি। নির্দিষ্ট কোনও বারে বা দিনে অর্থাৎ সময়ের এককে রুদ্ধ নয় বয়ান। তার মানে, সাময়িকতার ঊর্ধ্বে সামূহিক অস্তিত্বের সংবিদে বেকেট নাট্যকৃতিকে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। একইভাবে পরিসর এবং ক্রিয়াও এতে অনির্দেশ্য। সংলাপে বারবার ফিরে আসে যেসব নির্দিষ্ট কথা, এরাও আসলে অনির্দেশ্যতার ইঙ্গিত বয়ে আনে। যেমন 'চলো, আমরা যাই', 'আমরা যেতে পারব না', 'কেন পারব না'? 'আমরা গোডোর জন্যে অপেক্ষা করছি'।

একটু আগে যে বহুস্বরিকতা ও অনেকার্থ-দ্যোতনার কথা লিখেছি, উদ্ধৃত সংলাপের বিশেষ ধরনে তা স্পষ্টভাবে উপস্থিত। কেননা এ কেবল বিশেষ কোনও নাট্যকৃতির অংশমাত্র নয় ; দেশ-কাল-নিরপেক্ষভাবে কিংবা আধুনিক-আধুনিকোত্তর পরিস্থিতি নির্বিশেষে বহুধাবিপন্ন ব্যক্তি-সত্তা ও অস্তিত্ব-যুগ্মকের দ্বিরালাপ-শূন্য অভিজ্ঞতার চিহ্নায়িত মর্মসত্য বলে একে গণ্য করা যায়। 'Waiting for Godot'-এ মনে হয়, কুশীলবেরা যেন কথা খুঁজে পাচ্ছে না ; অনেক কষ্টে কোনও রকমে ওরা সংলাপের প্রবাহকে বজায় রাখছে। অর্থাৎ সংযোগের প্রধান অবলম্বন যে বাক্‌কুশলতা, তার সব সম্ভাবনা ফুরিয়ে গেছে। সংলাপের মধ্যে নাট্যকার তাই দীর্ঘ নীরবতা নির্দেশ করেছেন। এই দীর্ঘ নীরবতা ভেদ করে উঠে আসে ভ্লাদিমিরের এই কথা ; 'কিছু একটা বলো!' এর উত্তরে, এস্ত্রাগোন বলে, 'আমি চেষ্টা করছি।' তারপর আবার দীর্ঘ নীরবতা।

পাঁচ

তেমনি গোডোর জন্যে প্রতীক্ষা সম্পর্কে দুই ভবঘুরের নিম্নোধৃত সংলাপও লক্ষণীয় : 'এস্ত্রাগোন : তুমি নিশ্চিত তো যে এখানেই তা (সাক্ষাৎ) হওয়ার কথা ছিল?

ভ্লাদিমির : কী!

এস্ত্রাগোন : আমাদের যে অপেক্ষা করার কথা ছিল।

ভ্লাদিমির : সে বলেছিল গাছের পাশে। (ওরা গাছের দিকে তাকায়) তুমি কি আর কিছু দেখতে পাচ্ছ?

এস্ত্রাগোন : আর কী?

ভ্লাদিমির : আমি জানিনা—হতে পারে কোনও উইলো গাছ।

এস্ত্রাগোন : পাতাগুলো কোথায়?

ভ্লাদিমির : নিশ্চয় মরে গেছে।

এস্ত্রগোন : আর চোখের জল নয়।'

এখানে বুঝতে পারি যে নাট্য-ঘটনার পরিসর বা সংশ্লিষ্ট সাংকেতিকতাও নির্দিষ্ট নয়। বস্তুত এই অনির্দেশ্যতার জোরেই বয়ান সর্বজনীন ও সর্বকালীন। অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসার

অভিব্যক্তির জন্যে যে-কোনও অনুপুঙ্খ-ই হতে পারে সংকেতগূঢ়।

আগেই লিখেছি, দুই ভবঘুরে এস্ত্রাগোন ও ভ্লাদিমিরের তুলনায় জমি-মালিক পোজো ও তার ভৃত্য লাকি অনেকখানি আলাদা। কিন্তু ক্রমশ এদেরও বিবর্তন ঘটে। পোজোর স্বৈরাচারী শাসক চরিত্রের মধ্যেও দেখা যায় আত্ম-সংশয় ও আত্ম-করুণার মুহূর্ত। লাকি একধরনের আত্মবিনাশী প্রবণতার মুখোমুখি দাঁড়ানোর আগে এস্ত্রাগোনকে লাথি মারে এবং প্রভুর আদেশ অনুযায়ী নাচতেও পারে। অথচ সে-ই আবার উদাসীন ঈশ্বর ও নিরাসক্ত প্রকৃতির মধ্যে ত্রিশঙ্কুর মতো দোদুল্যমান মানুষের ভাগ্য-বিড়ম্বনা নিয়ে দীর্ঘ একান্তিক আলাপের মাধ্যমে আপন প্রাজ্ঞতায় পরিচয় দেয়। তার মানে, বিচিত্র ও জটিল জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে থাকার ফলে অভিজ্ঞতা ও বোধের মাত্রাগত ব্যবধান অনস্বীকার্য হলেও অস্তিত্বের আলো-আঁধার সম্পর্কে নিরবচ্ছিন্ন জিজ্ঞাসাই মূল কথা। আস্তিত্বিক আলো-আঁধার জিজ্ঞাসাকে ক্রমাগত শানিত করে। তাই আস্তিত্বিক উপলব্ধি বুদ্ধিজীবীবর্গের একচেটিয়া অধিকারের বিষয় নয়।

নাট্যকৃতির দ্বিতীয় অঙ্কে যে পোজো অন্ধ ও লাকি বোবা হয়ে যায়, এর সংকেত-মূল্য অনেকখানি। এমনকী গাছটিও বদলে যায় ; কেননা এর মধ্যে দেখা যায় কিছু নতুন পাতার কুঁড়ি। অতএব আপাতদৃষ্টিতে একই ধরনের উপস্থাপনা থাকলেও দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম অঙ্কের প্রতিবিম্ব-মাত্র নয়। কিছু একটা ঘটে গেছে ; কিন্তু তা যে ঠিক কী, তা বোঝা যায় না। পৃথিবী কি ধ্বংস-গোধূলির দিকে একটুখানি এগিয়ে গেছে? এই প্রশ্নেরও কোনও মীমাংসাসূত্র নেই। আসলে অস্তিত্বের ত্রিশঙ্কুদশা আরও একটু প্রকট হয়েছে। গোডো কবে আসবে, আদৌ আসবে কীনা—তাও অমীমাংসিত। এমন কী গোডো আসলে কী এবং এর জন্যে প্রতীক্ষার কোনো মানে আছে কীনা—তাও সংশয়ের কুহেলিতে আচ্ছন্ন রয়ে যায়। আলাদা-আলাদা দিন মিশে যায় একটি আদ্যন্তহীন অভিন্ন দিনের পরিধিশূন্য অস্তিত্বে। সব কিছু মুহুর্মুহু বদলে যায় অথচ কোনো কিছুই বদলায় না : এই তো জীবনের, মানব-অস্তিত্বের কূটাভাস। সূচনা-পর্বে যাকে মনে হয় দীর্ঘ জীবন-পথ, বড়ো দ্রুত তা ফুরিয়ে যায়। কত জিজ্ঞাসা থাকে অস্তিত্বের কৃতি ও তাৎপর্য নিয়ে ; উত্থাপন করতে-না-করতে উত্থাপকের আয়ু ঝরে যায়। প্রতীক্ষার শেষ হয় না ; সেই কাঙ্ক্ষিত শীর্ষবিন্দু থেকে যায় অপ্রাপনীয়।

এমন কী, অস্তিত্বের শুদ্ধতম নিষ্কর্ষ কী, তাও জানা বা বোঝা হয় না। এই উপলব্ধিই তো ব্যক্ত করেছে ভ্লাদিমির :

'অন্যরা যখন যন্ত্রণা পাচ্ছিল, আমি কি ঘুমোচ্ছিলাম? আমি কি ঘুমোচ্ছি এখন? আগামীকাল যখন আসে, মনে হয় সেটা সত্যি আসে, আজ সম্পর্কে কী বলব আমি! বলব কি যে আমার বন্ধু এস্ত্রাগোনের সঙ্গে, রাত না-হওয়া পর্যন্ত, এই জায়গাটায়, আমি গোডোর জন্যে অপেক্ষা করেছিলাম? বলব কি যে তার বাহকের সঙ্গে পোজো এদিক দিয়ে গেছে আর আমাদের সঙ্গে সে কথা বলেছিল? সম্ভবত। কিন্তু এসব বলার মধ্যে কোন্ সত্য থাকবে! [এসময় এস্ত্রাগোন তার জুতো নিয়ে খানিকক্ষণ ব্যস্ত থেকে আবার ঢুলতে শুরু করেছে। ভ্লাদিমির তার দিকে তাকাল।] সে কিছুই জানবে না। সে

কতটা মার খেয়েছে, তা আমাকে বলবে ; আমি তাকে একটা গাজর দেব। [একটু থেমে] কবর আর কঠিন জন্মের মধ্যে আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে, গর্তের ভেতরে গিয়ে, ধীরে-সুস্থে কবর-খনক তার সাঁড়াশি হাতে নেয়। বুড়ো হওয়ার জন্যে আমাদের যথেষ্ট সময় রয়েছে। আমাদের কান্নায় বাতাস ভরে আছে। [কিছু একটা শোনে] কিন্তু অভ্যাস বড়ো বেশি অসাড় করে দেয়। [আবার এস্ত্রাগোনের দিকে তাকায়] আমার দিকেও তাকাচ্ছে, কেউ না কেউ আমার সম্পর্কে কিছু বলছে। সে ঘুমোচ্ছে, সে কিছুই জানে না, তাকে ঘুমোতে দাও...'

দীর্ঘ এই বাচনকে কি সংলাপ বলা যায় অথবা পরাসংলাপ? ভ্লাদিমির ও এস্ত্রাগোন কি আসলে নাট্যকৃতির প্রয়োজনে দ্বিধাবিভাজিত অভিন্ন সত্তা, অস্তিত্বের তাৎপর্য বোঝার জন্যে যে-সত্তা অনবরত নিজের চারদিকে চিহ্নের ব্যূহ তৈরি করছে আবার সেই ব্যূহভেদের আয়োজনও করতে হচ্ছে তাকেই? পুঁজিবাদী আধুনিকতার অভিঘাতে দৃশ্যমান জগৎ যখন চূড়ান্ত অবভাস বলে প্রতীত হচ্ছিল, বাস্তব জগৎ ক্রমশ ফাঁপা ও রিক্ত হতে-হতে মরীচিকা বলে প্রতিভাত হলো। সেই বাস্তবতায় অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত মানবসত্তাও ঐ অবভাসের ছায়ায় আকীর্ণ হয়ে গেল। স্যামুয়েল বেকেট এই আবহকেই নিঙড়ে নিয়েছেন নিজস্ব সৃজনী অভিব্যক্তিতে। 'Waiting for Godot' তাই মূলত সময়েরই সৃষ্টি, নাট্যকার অনুলেখক মাত্র।

'Endgame' সহ তাঁর অন্যান্য প্রতিনিধিত্ব-মূলক রচনায় যে রিক্ততা-বন্ধ্যাত্ব-অবসাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবেদন উপস্থাপিত হয়েছে, তাদের মধ্যে সেই একই—ব্যক্তিগত হয়েও নৈর্ব্যক্তিক, পরিবর্তনশীল হয়েও অপরিবর্তনীয়, মনস্তাত্ত্বিক হয়েও আস্তিত্বিক—মহাবিনিপাতের প্রগাঢ় ছায়া উপস্থিত।

উপস্থাপনার এই বিশিষ্ট ধরনেই ব্যক্ত হচ্ছে যথাপ্রাপ্ত আধুনিকতাবাদী পরিস্থিতির প্রতি বেকেটের একান্ত নিজস্ব সমালোচনা, তার প্রতিবাদ ও প্রত্যাখ্যান।

'EndGame' এর হ্যাম চরিত্রটি যেমন অন্ধ ও হুইল-চেয়ারে রুদ্ধ হয়েও বহির্জগতে মনোভ্রমণ করে এবং নানা ধরনের গল্প বলে সময় যাপন করে—আমরাও যেন তেমনি পঙ্গু ও অন্ধ হয়ে নানা ধরনের আখ্যান নির্মাণ করে নিজেদের জীবন নির্বাহ করছি। বেকেটের হ্যাম অবশ্য অন্ধ হয়েও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ; গতিহীন হয়েও কল্পনায় সঞ্চরমান। সত্যভ্রম ও ছদ্ম-সত্তার পিঞ্জরে রুদ্ধ হয়ে আমরা তেমন চক্ষুষ্মান কীনা—এই জিজ্ঞাসা বেকেট আমাদের মনে জাগিয়ে দিয়েছেন। হ্যাম-এর অণুগল্পে পাগল চিত্রকর ও খোদাইকর যেমন সর্বত্র শূন্যতা দেখতে পেত, সেই চূড়ান্ত নেতির বিন্দু থেকে পরিত্রাণ চাইতেন বলেই অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসার প্রতিবেদন রচনা করে গেছেন বেকেট। নিঃসঙ্গতা ও নৈঃশব্দ্য মন্থন করেই চিহ্নায়িত লিখনবিশ্ব নির্মাণ করেছেন তিনি। আস্তিত্বিক জিজ্ঞাসাকে আরও শানিত ও বহুসঞ্চারী করার জন্যেই সাহিত্যিকতার এমন অনন্য বিনির্মাণের আয়োজন।

সারামাগোর আখ্যানবিশ্ব

বাঙালি পড়ুয়ার মননবিশ্বে প্রতীচ্যের দুরপনেয় উপস্থিতি সম্পর্কে বাগ্‌বিস্তারের প্রয়োজন নেই কোনো। ঐতিহাসিক কারণে ইংরেজি সাহিত্যই ছিল কার্যত একমেবাদ্বিতীয় বীজতলি যা আমাদের দিয়েছে আন্তর্জাতিকতার পাঠ ও কিছু কিছু অভিনব চিন্তাবীজ। এছাড়া মূলত ইংরেজি ভাষার মধ্য দিয়ে আমরা পরিচিত হয়েছি অন্যান্য ইয়োরোপীয় সাহিত্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডারের সঙ্গে। আমাদের কবিতা ও উপন্যাসের আধুনিকতা, বিশ্ববীক্ষার উদ্ভাসন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঊর্ধ্বায়ন : সমস্ত কিছুর জন্যে মাননীয় আকল্প খুঁজেছি হোমার-ভার্জিল-দান্তে-মিলটনের ধ্রুপদি প্রতীচ্যে কিংবা ইয়েটস-এলিয়ট-বোদলেয়ার-র‍্যাঁবো-রিলকে-মালার্মে-এলুয়ার-ব্রেতোঁর নতুন পাশ্চাত্যে। ইংরেজি অনুবাদের মধ্য দিয়ে সাধারণ বাঙালি পড়ুয়া ফরাসি-জার্মান- স্পেনীয়-রুশ সাহিত্যের শরিক হয়েছেন। অঙ্গুলিমেয় কয়েকজন শুধু মূল ভাষার স্বাদ নিতে পেরেছেন। আমরা এভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছি পুশকিন-ডস্টয়েভস্কি-টুর্গেনিভ-গোগোল-চেকভ-টলস্টয়-গোর্কি-মায়াকোভস্কির সাহিত্যভুবনে। অথবা কাম্যু-কাফকা-সার্ত্র-টমাস মান-গুন্টার গ্রাসদের সমবায়ী উপস্থিতিতে গড়ে-ওঠা লিখনবিশ্বে আমাদের অভিনিবেশ। নুট হামসুন বা ইবসেন অথবা হাল আমলের উমবের্তো একো ও ইতালো ক্যালভিনোর কথা মাঝে মাঝে বললেও আমরা কিন্তু এখনও ইংরেজি-ফরাসি-জার্মান সাহিত্যকে ভাবি প্রতীচ্যের প্রধান প্রতিনিধি। লাতিন আমেরিকার মার্কেজ-বোর্হেস-রুল্‌ফো-কার্পেন্তিয়েরদের সাহিত্যকৃতি স্পেনীয় ভাষার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করেছে আমাদের। যাদুবাস্তবতায় গ্রথিত এই অপর প্রতীচ্য কিংবা টনি মোরিসন-আচিবিদের কালো আমেরিকা ও আফ্রিকার লোকপুরাণ ঋদ্ধ সাহিত্যে আবার আরেক প্রতীচ্যের অবয়ব দেখি।

কবিতায়, আখ্যানে তবুও যে রয়ে গেছে আরও এক অনাবিষ্কৃত ইয়োরোপ, যা নন্দন-প্রক্রিয়ায় নিহিত প্রতাপের যুক্তিশৃঙ্খলার প্রতিস্পর্ধী এবং সম্ভাব্য নতুন বিকল্পেরও প্রস্তাবক—এই অত্যন্ত জরুরি সত্য আমাদের কাছে সেদিন পর্যন্ত অজানা রয়ে গেছে। আবার লিখছি, মুষ্টিমেয় কয়েকজন সন্ধানী পড়ুয়া ছাড়া সাধারণভাবে আমরা কিন্তু অপরতার সমৃদ্ধ বিন্যাস সম্পর্কে উদাসীন অর্থাৎ আমাদের পাঠবিশ্বও প্রতাপের যুক্তিশৃঙ্খলার কাছে অজ্ঞাতসারেই সমর্পিত এবং সেইজন্যে দ্বিবাচনিকতার সম্ভাব্য মাত্রা সম্পর্কেও অনবহিত। তাই পর্তুগিজ ভাষার ঔপন্যাসিক হোসে সারামাগো যখন ১৯৯৮ সালে সাহিত্যকৃতির জন্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন, সাধারণ বাঙালি পাঠকের কাছে প্রতীচ্যের পুরোপুরি স্বতন্ত্র অবয়ব উন্মোচিত হল। ইংরেজি ভাষান্তরে তাঁর রচনা

পাঠের অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে আমাদের কাছে সৃষ্টির আশ্চর্য নতুন মাত্রার বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। মোটামুটি ভাবে গত দু-দশক ধরে আমরা লাতিন আমেরিকার নতুন আখ্যান-প্রকরণে মানব-স্বভাব ও নির্মাণ-প্রকল্প-এর অভিনব সংহিতা লক্ষ করে মুগ্ধ ও আবিষ্ট ছিলাম ; ভেবেছিলাম আধিপত্যপ্রবণ ইউরোপের আধুনিকতাবাদী সাংস্কৃতিক রাজনীতির প্রতিস্পর্ধী শৈল্পিক অবস্থানের শীর্ষ-বিন্দু জেনে নিয়েছি। সারামাগোর আখ্যানবিশ্ব আমাদের ভুল ভেঙে দিয়ে মুহুর্মুহু পুলকিত ও বিস্মিত করেছে। আমরা আধিপত্যবাদী আধুনিক ও আধুনিকোত্তর ইউরোপের আরও-একটি চমৎকার বিকল্প পেয়ে গেছি।

এই নিবন্ধ রচনার মুহূর্তে হোসে সারামাগো প্রায় বিরাশি বছরের সৃষ্টিশীল তরুণ। তাঁর বয়স যখন মাত্র উনিশ, তিনি নিজেকে লেখক হিসেবে গড়ে তুলতে শুরু করেন। চব্বিশ বছর বয়সে তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা প্রকাশিত হয়। ধারাবাহিক ভাবে তিনি লিখে গেছেন যদিও, পরবর্তী দুই দশকে কিন্তু প্রকাশনার সংখ্যা খুব একটা বাড়েনি। তিনি একটি সাক্ষাৎকারে, কিছুটা আত্ম-সমালোচনার ভঙ্গিতে, জানিয়েছেন যে বহুদিন তাঁর লেখালেখির পেছনে সুবিন্যস্ত কোনো পরিকল্পনা ছিল না। ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত তাঁর যে ছ'টি বই বেরিয়েছিল, তাদের মধ্যে দুটি কবিতার বইও ছিল। ওই সময় পর্যন্ত বেশ কিছু সাংবাদিক গদ্যও তিনি লিখেছিলেন।

সারামাগোর জন্ম হয় রিবাতে জো প্রদেশের আজিনহাগা গ্রামে। শৈশব ও কৈশোর কেটেছে পর্তুগালের রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে। বস্তুত তিনি মাঝপথেই স্কুলের পড়া ছেড়ে দিয়ে জীবিকার সন্ধান করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আপন অন্তর্জীবনের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে তিনি নিজে যে-প্রতিবেদন রচনা করেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে তাঁর নিরক্ষর দাদু ও দিদিমার প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী হয়েছে। নিজের প্রতিনিধি-স্থানীয় উপন্যাসগুলিতে সারামাগো আখ্যানের যে-আশ্চর্য নতুন ধরন তুলে ধরেছেন, তার কোষে কোষে ছড়িয়ে আছে লোককথা-কিংবদন্তি-অলৌকিক অনুপুঙ্খ এবং বাস্তব ও কল্পনার অবিচ্ছেদ্য গ্রন্থনা। এই সবই তিনি দাদু-দিদিমার সাহচর্য থেকে অর্জন করেছিলেন। ভাষার দুস্তর বাধা সত্ত্বেও ইংরেজি অনুবাদের মধ্য দিয়েই আমাদের কাছে এই প্রতীতি পৌঁছে যায় যে সারামাগোর আখ্যানবিশ্ব আদ্যন্ত বহুস্বরিক ও বহুমাত্রিক।

১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হল *Manual of Painting and Calligraphy*। নাম দেখে যে-কেউ ভাববেন এটি অবশ্যই প্রবন্ধের বই ; কিন্তু পড়তে গিয়ে চমকে যাবেন! উপন্যাস তাহলে এরকম হতে পারে! চিত্রশিল্প ও লিপিবিদ্যার ইস্তাহার যার নাম, স্পষ্টত তা কেবল চূড়ান্ত বিনির্মাণের প্রতিশ্রুতি। তেমনই The Gospel according to Jesus Christ (১৯৯১) নয় কোনো খ্রিস্ট-ধর্মতত্ত্বের পুঁথি কিংবা *The History of the Siege of Lisbon* (১৯৮৯)ও নয় ইতিহাসের নিরেট তথ্যে ঠাসা কোনো বই। এ ধরনের নামকরণ করার মানে কী তবে? সারামাগো কি এই সংকেত দিতে চান যে তাঁর বয়ানের মধ্যে থাকবে বহুবিচিত্র ছদ্মবেশের নির্মোক! সতর্ক পাঠককে সেইসব শুধুমাত্র লক্ষ করলে চলবে না ; যেতে হবে ভিত্তি খুঁড়ে খুঁড়ে, স্তরের পর স্তর পেরিয়ে।

তবু সারামাগোর প্রতিবেদনে এলিসের আয়নামহল নেই কিংবা নেই বোর্হেসের গোলকধাঁধাও। তাঁর আখ্যানগুলি যেন পর্তুগালের অতীত-বর্তমান স্বপ্ন-বাস্তব স্মৃতি-বিস্মৃতি ঐতিহ্য-প্রকল্পনার চলমান যুগলবন্দি। যেন অনাদি কালের উৎস হতে জেগে উঠেছে যৌথ-অস্তিত্বের যাত্রাপথ। প্রতীকিতায়, ঘটমানতায় আর দিনের উজ্জ্বল আলোয়, রাতের গভীর নিস্তব্ধতায় ওই যাত্রাপথ জুড়ে ব্যক্ত হয় যুগপৎ বাস্তব ও পরাবাস্তবের চলাচল। এইজন্যে তাঁর রচনায় সৃষ্টি ও নির্মাণের দ্বিরালাপ স্বতঃসিদ্ধ। বয়ানে অনায়াসে মিশে যায় তাঁর দেশের উচ্চাবচতাময় ইতিহাস, প্রত্নকথা, কিংবদন্তি, ভৌগোলিক পরিসর, রাজনৈতিক অন্তঃসার, আধিপত্যবাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভঙ্গ, অজস্র লোকায়ত সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, রূপকথা-প্রত্নস্মৃতি বাহিত আদিম গ্রাম-কথা ও সর্বত্রগামী পরাবাস্তব কল্পনা।

দুই

সারামাগো নিজেই জানিয়েছেন : 'আমার উপন্যাসগুলির বিষয় হল অসম্ভব স্বপ্ন ও অবভাসের সম্ভাব্যতা।' নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণে তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলি বলেছেন : 'In one sense it could even be said that letter-by-letter, word-by-word, page-by-page, book-after-book, I have been successively implanting in the man I was the characters I created, I believe that without them I wouldn't be the person I am today ; without them may be my life wouldn't have succeeded in becoming more than an inexact sketch, a promise that like so many others remained only a promise, the existence of some one who may be might have been but in the end could not manage to be.'। নিঃসন্দেহে খুব প্রণিধানযোগ্য এই সংবেদনশীল মন্তব্য। ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক রচনার চিরাগত বিবাদ এখানে নিরর্থক বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। লেখাতেই লেখকের প্রকৃত ও সার্বিক পরিচয় নিহিত থাকে, এই ভাবনাকে সারামাগো আরও প্রসারিত করে দিয়েছেন। প্রতিটি অক্ষরে, শব্দে, পৃষ্ঠায়, বয়ানে নিজেকেই ভিন্ন ভিন্ন ধরনে ও দ্যোতনায় নির্মাণ করে চলেছেন যে আশ্চর্য সজীব স্রষ্টা—তাঁর প্রতিটি প্রতিবেদনই পরবর্তী প্রতিবেদনের অনিবার্য প্রাক্কথন যেন। অথচ কোথাও পূর্ববর্তী কোনো লিখন-প্রকল্পের অনুসৃতি দেখি না। তাই পার্থক্য-প্রতীতি সারামাগোর প্রতিটি উপন্যাসের কেন্দ্রীয় অভিজ্ঞান।

আর, এইসঙ্গে আপন প্রগাঢ় সংবেদনশীল স্রষ্টা-অস্তিত্বের উপস্থিতির ঘোষণাকে তিনি বারবার নবীকৃত করে চলেছেন। মনে পড়ে ফুকোর সেই বিখ্যাত প্রত্যয়দীপ্ত উচ্চারণ : 'But couldn't everyone's life become a work of art ?...from the idea that the self is not given to us, I think that there is only one practical consequence : we have to create ourselves as a work of art.' (১৯৮৭ : ৩৫০)। কীভাবে আমরা নিজেদের শিল্পকর্ম হিসেবে নির্মাণ করতে পারি,

সারামাগো যেন তারই মহড়া দিয়ে গেছেন। তাঁর প্রতিটি বয়ান এই উপলব্ধির পুনরুচ্চারণ করছে : 'আমি লিখছি আমাকেই'। তবে এই 'আমি' বহতা সময়-লালিত জাতীয় সত্তার প্রতীকী প্রতিনিধি। অথবা তার চেয়েও অনেক বেশি : সামূহিক মানবসত্তার শ্রুত ও অশ্রুত মূর্ছনায় লালিত এই বহুস্বরিক স্রষ্টা-আমি। নির্মাণ করতে হয় সৃষ্টির চলমান প্রেক্ষিতকেও, যা শুধু আত্মিক নয়—অনস্বীকার্য ভাবে ধূলিধূসর জগতে বাস্তব তথ্য-নিয়ন্ত্রিতও। হয়তো 'নিয়ন্ত্রিত' শব্দে মৃদু আপত্তি উঠতে পারে কারো কারো : তাহলে লিখব, বাস্তব-পরিশীলিত। সারামাগো কারিগরি বিদ্যায় পাঠ নিয়েছিলেন ; সাংবাদিক-অনুবাদক-লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার আগে বেশ কিছু কায়িক শ্রমের কাজও করেছেন তিনি। অতএব অনুমান করা কঠিন নয়, জীবনকে তলানি পর্যন্ত পান করার মানসিকতা তাঁর ছিল। বহুতলযুক্ত জীবনকে সক্রিয় পর্যবেক্ষক হিসেবে দেখেছেন। অর্থাৎ মিখায়েল বাখতিন কথিত participant observer-এর বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল বলেই প্রাগুদ্ধৃত নোবেল বক্তৃতায় তিনি এই উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন : 'I was the characters I created'।

১৯৬৯ সালে সারামাগো যে পর্তুগালের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বৈরতন্ত্রী সৈনিক প্রশাসনের জমানায় পার্টি নিষিদ্ধ ছিল; তবু যে তিনি পার্টিতে যুক্ত হলেন, এতে তাঁর নির্ভীক ও স্বাধীনতাপ্রিয় মানসিকতা স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে। এবং, ঠিক একই কারণে, তিনি প্রয়োজন মতো পার্টির সমালোচনা করতেও কুণ্ঠিত হননি। সত্তর দশকে মূলত নানা ধরনের অনুবাদের কাজ করেই তিনি জীবিকা নির্বাহ করেছেন। ১৯৭৯ সাল থেকে তিনি হয়ে উঠলেন পূর্ণ সময়ের লেখক। আখ্যানের নতুন আদল আবিষ্কারে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ব্যাপৃত রইলেন তিনি ; ক্রমাগত সরে গেলেন এক আকল্প থেকে অন্য আকল্পে। সম্ভব ও অসম্ভবের, বাস্তব ও কল্পনার চিরাচরিত জলবিভাজনরেখা মুছে দিতে দিতে এগিয়ে গেলেন তিনি। ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি মুখ্যত আদৃত যদিও, ছোটোগল্প-কবিতা-নাটক-ভ্রমণকাহিনি-দিনলিপি-মুক্তগদ্য : সব কিছুই প্রকাশিত হয়েছে। এতে বোঝা যাচ্ছে, বাচনের অন্তহীন সম্ভাবনাকে নানা শিল্প-মাধ্যমের মধ্যে যাচাই করতে চান সারামাগো। প্রাগুক্ত *Manual of Painting and Calligraphy*-তে তিনি শিল্প-স্রষ্টার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশকে উপন্যাসায়িত করেছেন। নোবেল বক্তৃতায় তিনি তাই জানিয়েছেন, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিই তাঁকে নির্মাণ করে চলেছে, এবং যত লিখেছেন, ততই একটু একটু করে লেখা তাঁর লেখক-অস্তিত্বকে পূর্ণতা দিয়েছে। এমন যাঁর বক্তব্য, সেই ব্যতিক্রমী চিন্তা ও অনুভবের মানুষটির সৃজন-সম্ভারের দিকে এবার তাকানো যেতে পারে :

১. OS POEMAS POSSIVEIS (১৯৬৬)
২. PROVAVELMENTE ALEGRIA (১৯৭০)
৩. DESTE MUNDO E DO UNTRO (১৯৭১)

৪. A BAGAGEN DO VIAJANTE (১৯৭৩)
৫. AS OPINIOES QUE O DL TEVE (১৯৭৪)
৬. O ANO DE 1993 (১৯৭৫)
৭. MANUAL DE PINTURA E CALLIGRAFIA (১৯৭৭) [ইংরেজি অনুবাদে *Manual of Painting and Calligraphy.*]
৮. OBJECTO QUASE (১৯৮৭) [ইংরেজি অনুবাদে *Quasi Object.*]
৯. POETICA DOS CINCOSENTI DOS O QUVIDO (১৯৭৯)
১০. A NOITE (১৯৭৯)
১১. LEVANTADO DO CHAO (১৯৮০)
১৩. VIAGEM A PORTUGAL (১৯৮১) [ইংরেজি অনুবাদে *Journey to Portugal : A Pursuit of Portugal's History and Culture.*]
১৪. MEMORIAL DO CONVENTO (১৯৮২) [ইংরেজি অনুবাদে *Baltasar and Blimunda.*]
১৫. O ANO DA MORTE DE RICARDO REIS (১৯৮৪) [ইংরেজি অনুবাদে *The Year of the Death of Ricardo Reis.*]
১৬. A JAGANDA DE PEDRA (১৯৮৬) [ইংরেজি অনুবাদে *The Stone Raft.*]
১৭. HISTORY DO CERCO DE LISBOA (1989) [ইংরেজি অনুবাদে *The History of the Siege of Lisbon.*]
১৮. O EVANGLMO SEGUNDO JESUS CRISTO (১৯৯১) [ইংরেজি অনুবাদে *The Gospel According to Jesus Christ.*]
১৯. IN NOMINE DEI (১৯৯৩)
২০. ENSAIO SOBRA A CEGUEIRA (১৯৯৫) [ইংরেজি অনুবাদে *Blindness.*]
২১. TODOS OS NOMES (১৯৯৭) [ইংরেজি অনুবাদে *All the Names.*]
২২. EL AMOR POSIBLE (১৯৯৮)
২৩. CADERNOS DE LANZAROTE (১৯৯৮)
২৪. O CONTO DA ILHA DESCONHECIDA (১৯৯৮) [ইংরেজি অনুবাদে *The Tale of The Unknown Island.*]
২৫. A CAVERNA (২০০০) [ইংরেজি অনুবাদে *The Cave.*]
২৬. O HOMEN DUPLICADO (২০০২) [ইংরেজি অনুবাদে *The Duplicated Man.*]

একটু আগে লিখেছি, তাঁর নামকরণের মধ্যে থাকে বিনির্মাণের ইশারা ; শব্দাতিয়ায়ী তাৎপর্যের বিপুল নৈঃশব্দ্য যেন বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। রূপক ও সংকেতের দ্যোতনায় নিবিড় ওইসব অভিধা তাই পাঠকের কাছে চিহ্নায়ক-খচিত যাত্রাপথ

উন্মোচিত করে দেয়। তবে প্রতিমুহূর্তে সতর্ক অভিনিবেশ অটুট রাখতে হয় আমাদের, কেননা এমন-এক লেখকের মুখোমুখি আমরা, যাঁর লিখন-প্রকরণ প্রতিটি বয়ানে বদলে যাচ্ছে। অ্যানা ক্রোবুকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সারামাগো এই বলে তাঁর কথা শেষ করেছিলেন যে, 'সারা জীবন ধরে এই পালটে যাওয়ার চেষ্টা ক্রমাগত করে গেছি। আর এ কারণে প্রকৃত সমঝদার পেতে অসুবিধা হয়, বিলম্ব ঘটে, তাই না?' কিন্তু এই সংশয় অমূলক। নইলে অন্য-এক ভুবনের বাসিন্দা হয়েও বাঙালি পাঠকেরা কেন ভাষা ও সংস্কৃতির দুস্তর ব্যবধান পেরিয়ে গিয়ে সারামাগোর আখ্যানবিশ্বে পর্যটন করবেন বিমুগ্ধ বিস্ময়ে!

তিন

প্রতিটি বয়ান প্রবলভাবে স্বতন্ত্র নিশ্চয় ; তবু গভীরতর অন্বয়-সূত্রে এইসব প্রতিবেদন একে অন্যের ঘনিষ্ঠ সহযাত্রী : এরকম মনে হয়। এই নিরিখে *Journey to Portugal*-এর মতো ভ্রমণকাহিনি অবিচ্ছেদ্য ভাবে তাঁর সৃজনবিশ্বে সম্পৃক্ত। কেননা পর্তুগালের ভৌগোলিক পরিসর তাঁর একমাত্র বিবেচ্য ছিল না। ১৯৭৪-এর ২৫ এপ্রিল পর্তুগালের বিপ্লব সমাধা হওয়ার পরে যখন স্বৈরতন্ত্রী শাসনের অবসান হল, পর্তুগিজ জাতিসত্তার ভাবাদর্শ কীভাবে কতটা গড়ে উঠছে, তা বুঝে নেওয়ার জরুরি তাগিদে তিনি নিজের দেশকে নতুন দৃষ্টিতে নতুন বিস্ময়ে পুনরাবিষ্কার করতে চাইছিলেন যেন। এই প্রতিবেদনে সারামাগো প্রথম পুরুষের বাচন ব্যবহার করেছেন, উত্তম পুরুষের নয়; অর্থাৎ তিনি আপন দেশের ইতিহাস-সংস্কৃতি-ভূগোল পর্যবেক্ষণ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভ্রামণিক সত্তার প্রতিক্রিয়াও যাচাই করে নিচ্ছিলেন। এ যেন আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়ানোর বিশেষ একটি ধরন। তাই তিনি দ্রষ্টব্যের সঙ্গে দ্রষ্টা এবং তার দৃষ্টিকেও গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করে নিতে নিতে তাঁর চিন্তাপ্রণালী আর বয়ন-পদ্ধতির ভেতরকার সম্ভাব্য অপূর্ণতাও বুঝে নিতে চাইছিলেন। গভীর সততায় ঘোষণা করেছিলেন, তাঁকে সব কিছুই নতুন করে শিখে নিতে হবে। পর্তুগিজ জাতিসত্তার সঞ্চালক বাস্তবতা-কিংবদন্তি-যৌক্তিকতা-অলৌকিকতা : সমস্ত কিছুই নতুন শিক্ষার্থীর মতো অনুভবে ধারণ করে নিচ্ছিলেন। অপরিমেয় এই সততাই সারামাগোকে বিশিষ্ট করেছে। ইতিমধ্যে লক্ষ করেছি, তাঁর আখ্যানবিশ্বকে তিনি সর্বতোভাবে পর্তুগিজ জাতির স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ-এর সৃষ্টিশীল প্রতিবেদন হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে ক্লান্তিহীন উদ্যম গ্রহণ করেছেন।

অতএব আপন দেশের ভ্রমণবৃত্তান্ত সারামাগোর কাছে হয়ে উঠেছিল আবহমান কালে ব্যাপ্ত যৌথসত্তার নির্যাস নিংড়ে নেওয়ার অনন্য প্রয়াস। এক হিসেবে তাঁর প্রতিটি উপন্যাসই কোনো-না-কোনো ভাবে সত্তার বিশিষ্ট আত্মগত ও বহির্বৃত ভ্রমণেরই উপাখ্যান। তাই সামাজিক-সাংস্কৃতিক-মনস্তাত্ত্বিক অনুপুঙ্খের সমবায়ী উপস্থিতিতে তিনি বারবার এক নতুন দর্পণ গড়ে তোলেন যা শুধু একবারই ব্যবহৃত হতে পারে। পরবর্তী আখ্যানের জন্যে নির্মিত হয় আরেকটি দর্পণ এবং লেখকের ভ্রামণিক সত্তা

মোটামুটি ভাবে একই ধরনের উপাদান দিয়ে গড়ে তোলে পর্তুগিজ জাতিসত্তার ভিন্ন ভিন্ন আখ্যানে বিধৃত সংরূপ। স্বভাবত তাঁর পর্যটন শেষ হয় না কখনো ; নিয়ত নবায়মান উপলব্ধিই তাঁকে লিখতে উদ্‌বুদ্ধ করে। তৈরি হতে থাকে আখ্যানের সজীব টাটকা নতুন আদল যেখানে বাস্তবই ইন্দ্রজাল, ইন্দ্রজালই বাস্তব আর আকাঙ্ক্ষাই বয়ান, বয়ানই আকাঙ্ক্ষা। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে সারামাগো তাই ভ্রমণবৃত্তান্ত শেষ করেও প্রতিবেদনে দাঁড়ি টানতে পারেন না। যেন পুনশ্চ হিসেবে যোগ করেন আরও কিছু কথা এবং এভাবেই তাঁর পর্যটনের বয়ান আপাত-সমাপ্তিতে পৌঁছায়, আখ্যানের নতুন কোনো সংরূপে নতুন ধরনে বিন্যস্ত হবে বলে : 'The journey is never over. Only travellers come to an end. But even then they can prolong their voyage in their memories, in recollections, in stories. ... The end of one journey is simply the start of another. You have to see what you missed the first time, see again what you already saw, see in springtime what you saw in summer, in daylight what you saw at night, see the sun shining where you saw the rain falling, see the crops growing, the fruits ripen, the stone which has moved, the shadow that was not there before. You have to go back to the foot steps already taken, to go over then again or add fresh ones alongside them. You have to start the journey anew always. The traveller sets out once more.' (*Journey to Portugal* : 433)

মনে হয় নাকি প্রখরভাবে চিহ্নায়িত এই বাচন? কাব্যিকতা শুধু অন্তর্বয়ন হিসেবে উপস্থিত নয়, ভ্রমণের এই বয়ান নিজেই যেন কবিতা। তাই প্রতিটি শব্দ এখানে চিহ্নায়ক। এমনকী, বর্তমান কালের ক্রিয়াপদে বিন্যস্ত অন্তিম বাক্যটিও। সারামাগোর পর্যটন বারবার নতুনভাবে শুরু হয় বলেই চিত্রশিল্প ও লিখনের ইস্তাহারের নামে আখ্যানের অভিনব আকল্প শেষ কথা হতে পারে না। প্রকৃত কবির অনুভব নিয়ে তিনি লেখেন ছদ্ম-বস্তুদের প্রস্থনা নিয়ে, রাত্রির আদিকল্পাশ্রিত অন্তর্নাট্য নিয়ে, আঠারো শতকের ধর্মীয় কুহকে ভরা বাতাবরণে বিন্যস্ত নুলো সৈনিক ও অলৌকিক দৃষ্টি সম্পন্ন এক স্বতন্ত্র নারীর প্রণয় নিয়ে। তাঁর লিখন-বিশ্বে লোকায়ত বীক্ষার বহুস্বরিক উপস্থিতি এত স্বাভাবিক যে অলৌকিক নিছক অলৌকিক থাকে না ; সব কিছুই বয়ানের মধ্যে নিজস্ব যুক্তি-শৃঙ্খলা তৈরি করে নিয়ে সমান্তরাল ভাবে উপস্থিত থাকে। *Baltasar and Blimunda* এর চমৎকার দৃষ্টান্ত। এইসব উপন্যাস নিবিড় পাঠ ও বিস্তৃত বিশ্লেষণ দাবি করে। বিশেষত যে-লেখকের প্রতিটি বয়ান স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত ও পার্থক্য-প্রতীতির নিদর্শন, তাঁর লিখন-বিশ্বে পরিক্রমা করতে হলে আমাদেরও প্রতিটি বিন্দুতে নতুনভাবে যাত্রা-বিরতি ও যাত্রা-সূচনা করতে হয়। নইলে *Baltasar and Blimunda* পড়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে কোনোভাবেই *The Year of the Death of Ricardo Reis* নামক আশ্চর্য অন্তর্বস্তু ও শৈলী সম্পন্ন বইয়ের মুখোমুখি হওয়া যায় না। সারামাগোর প্রতিটি

ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনই বহুতল-যুক্ত রচনা ; তবে শেষোক্ত বইটি এই সাধারণ নিরিখেও অনেকটা আলাদা।

চার

পর্তুগালের মহান কবি ফারনান্দো পেশোয়া (১৮৮৮-১৯৩৫) এবং তাঁর বৈকল্পিক কবিসত্তা, রিকার্ডো রেইস, এই আখ্যানে দ্বিধাবিভক্ত এবং বাস্তব ও রহস্যের অন্যোন্য-গ্রন্থনার কুশীলব। সমালোচক জোনাথন গ্রিফিন পেশোয়ার জটিল অন্তর্লোকের উপর সন্ধানী আলো নিক্ষেপ করে লিখেছেন যে এই কবি বহুবাচনিক আধুনিক কবিসত্তার চূড়ান্ত নিদর্শন। নিজের নাম ছাড়াও আরও তিনটি নাম ব্যবহার করে পেশোয়া কবিতা লিখেছিলেন, যাদের প্রচলিত অর্থে ছদ্মনাম বলা যায় না। রিকার্ডো রেইস, আলবের্টো কেইরো ও আলভারো দ্য কাম্পোস—এই তিনটি নাম আসলে ভিন্ন তিনটি স্বাধীন কবি-সত্তার নাম, যদিও পেশোয়া স্বয়ং এদের নির্মাণ করেছিলেন। সারামাগো তাঁর এই উপন্যাসে রিকার্ডো রেইসকে আখ্যানের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তুলেছেন, যার সঙ্গে ফারনান্দো পেশোয়ার প্রেতাত্মা বারবার দ্বিরালাপে বৃত হতে পারে। আর, শেষ পর্যন্ত, খুব তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, পেশোয়ার প্রেতাত্মা রিকার্ডো রেইসকে নিয়ে আদি ও অন্তহীন সময়ের শূন্যায়তনে মিলিয়ে যায়। এই উপন্যাসের বিখ্যাত অন্তিম বাক্যটি কবিতার মতো সম্পূর্ণ চিহ্নায়িত : 'Here, where the sea ends and the earth awaits.' (পৃ. ৩৫৮)। অর্থাৎ সময় যেন রূপান্তরিত হল সেই পরিসরে যার কোনো নির্দিষ্ট রূপ বা ঠিকানা নেই। আছে শুধু নিরবয়ব অনন্ত প্রতীক্ষার বিচ্ছুরণ।

আপন সাহিত্যে আমর্ম-প্রোথিত সারামাগো নিশ্চয় পেশোয়ার সত্তা-বিভাজন ও অন্তর্বৃত দ্বিবাচনিকতার বহুমাত্রিক তাৎপর্য দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। আখ্যানের কেন্দ্রীয় আকল্প হিসেবে তিনি যে অস্তিত্বের অন্তর্নাট্যকে যুগপৎ বহির্বৃত ও প্রসারিত করেছেন, এতে তাঁর সৃজনী কল্পনার অনন্যতা ব্যক্ত হয়েছে। মৃত্যুর সতেরো দিন আগে (১৩. ১১. ৩৫) ফারনান্দো পেশোয়া যে রিকার্ডো রেইস নাম নিয়ে *Legion Live in Us* কবিতাটি লিখেছিলেন, তার রহস্যগূঢ় বাচনে কি সারামাগো তাঁর উপন্যাসের পরাপাঠ খুঁজে পেয়েছিলেন? কবিতাটির প্রতিটি পঙ্‌ক্তি এই সূত্রে গভীর অভিনিবেশ দাবি করে :

> Legion live in us ;
> I think or feel and don't know
> Who it is thinking, feeling.
> I am merely the place
> Where thinking or feeling is.
>
> I have more souls than one
> There are more 'I's than myself.
> And still I exist

Indifferent to all.
I silence them. I speak.

The crisscross thrusts
Of what I feel or don't feel
Dispute in the I, I am.
Unknown. They dictate nothing
To The I I know. I write

[*Selected Poems :* Penguin : 1974 : 105]

বিশেষভাবে দ্বিতীয় স্তবক নিঃসন্দেহে তর্জনি সংকেত করে আখ্যানের মৌল আকল্পের দিকে : একাধিক আত্মা আছে আমার ; অনেক 'আমি' আছে যা আমার নিজস্ব বৃত্ত বহির্ভূত। এদের সবার সম্পর্কে উদাসীন আমি, তবু রয়েছে আমার অস্তিত্ব। এদের ঢেকে দিই নৈঃশব্দ্যে : শুধু আমি কথা বলি।

কাব্যবীজও তাহলে রূপান্তরিত হতে পারে বহুস্তরান্বিত ঔপন্যাসিকতায়! *দি ইয়ার অফ দি ডেথ অফ রিকার্ডো* রেইস-এর বিস্ময়-স্থাপত্য অনেকান্তিক প্রতিবেদনের অসামান্য দৃষ্টান্ত হিসেবে পাঠকের কাছে উপস্থিত। যেহেতু এই উপন্যাস বহুস্বরিক, আমাদের লক্ষ করতে হয়, ত্রিশের দশকে স্পেনের গৃহযুদ্ধ এবং হিটলার-মুসোলিনি-ফ্রাঙ্কো-সালাজার-এর মতো ফ্যাসিবাদী শাসকদের উত্থানের কালই কাহিনির প্রেক্ষিত রচনা করেছে। যেভাবে বাস্তব ও ছদ্মবাস্তব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে আখ্যানে, আমাদের মনে পড়ে যায় পিকাসোর একটি স্মরণীয় উক্তি : 'মিথ্যার মধ্য দিয়ে সত্যে পৌঁছাতে চাই আমি।' এই আখ্যানে যেন তারও চেয়ে বেশি কিছু দেখতে পাচ্ছি। এখানে মিথ্যার আয়তন ও সত্যের আয়তন আলাদা নয় ; একের পথ মিশে গেছে অন্যের পথে। শুধু রিকার্ডো রেইস ও ফারনান্দো পেশোয়ায় উপন্যাসীভূত অস্তিত্বের কথা লিখছি না ; লিখছি নানা অনুপুঙ্খে বিধৃত আখ্যানের সার্বিক প্রেক্ষিতের কথাও। সমস্ত পরিসর একাকার হয়ে গেছে বলে ইতিহাস ও ভূগোল নির্ভর বাস্তব জীবন এবং পরিকল্পিত অবভাস অবিচ্ছেদ্য হয়ে পড়েছে। নিছক কাহিনির জন্যে নেই কোনো কাহিনি, বা বর্ণনার জন্যে বর্ণনা, তেমনই চরিত্রের উপস্থাপনাও। স্বভাবত গল্পভাষা ও কাব্যভাষার মতো উপন্যাসের ভাষাও শব্দ ও নৈঃশব্দ্যের যুগলবন্দিতে গ্রথিত। ভিন্নধর্মী প্রত্যয়ের এই উচ্চারণ লক্ষ করা যাক : 'A word lies, with the same word one can speak the truth, we are not what we say, we are true only if others believe us.'। এই বিশ্বাস গভীর সংবেদনশীল কবির পক্ষে স্বাভাবিক। তাই, বলা যায়, সারামাগো উপন্যাসেও কবিতাই লিখে গেছেন। বস্তুত মূল বয়ানে পৌঁছানোর আগেই আমাদের নজরে পড়ে পরপর তিনটি উদ্ধৃতি। এদের প্রথমটি হল রিকার্ডো রেইসের নামে : 'Wise is the man who contents himself with the spectacle of the world'। ভাবতে ইচ্ছে করে, এ হল তির্যক বাচন যার প্রকৃত

অন্বিষ্ট রয়েছে ঠিক বিপরীতে। অর্থাৎ জগৎ-প্রপঞ্চ সম্পর্কে নিজেকে তৃপ্ত রাখতে পারে না যে, সেই মানুষই প্রাজ্ঞ।

অন্তত *দি ইয়ার অফ দি ডেথ অফ রিকার্ডো রেইস* রচিত হয়েছে সারামাগোর তৃপ্তি নেই বলেই। যা প্রতীয়মান, তা সত্য নয় মোটেই কিংবা যা মিথ্যা তা-ই আসলে প্রতীয়মান : এই উপলব্ধি থেকে ক্রমাগত পৌছাতে হয় স্বর থেকে স্বরান্তরে, অর্থ থেকে অর্থান্তরে। আর, তৃতীয় উদ্ধৃতি স্বয়ং ফারনান্দো পেশোয়ার : 'If they were to tell me that it is absurd to speak thus of someone who never existed, I should reply that I have no proof that Lisbon ever existed, or I who am writing or any other thing wherever it might be.'। এই মন্তব্যে অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণাকেই প্রত্যাহ্বান জানানো হয়েছে যেন। কবিতায় সত্তার বহুবাচনিকতা সম্পর্কে যে-প্রত্যয় ইতিমধ্যে ব্যক্ত হতে দেখেছি, তার সম্ভাব্য অন্তর্নাট্য আর আধার ও আধেয়—সমস্তই বহুদূর অবধি প্রসারিত হয়েছে সারামাগোর আখ্যানে। বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে তাতে সমান্তরাল কবিসত্তা অর্থাৎ রিকার্ডো রেইস হয়ে উঠেছেন কেন্দ্রীয় কুশীলব এবং রক্তমাংসের অস্তিত্ব যাঁর, সেই ফারনান্দো পেশোয়া হয়ে উঠেছেন গৌন চরিত্র। তবু বিশিষ্ট এই গোলকধাঁধা যখন সমাপ্তিবিহীন উপসংহারে পারাপারহীন মহাসমুদ্রে মিলিয়ে যেতে থাকে, লক্ষ করি, অধিবাস্তবের বাস্তব উৎস যেন বহুধা প্রসারিত ওই অধিবাস্তবের প্রপঞ্চকে নিজের মধ্যে শুষে নিচ্ছে। বিখ্যাত এক ভারতীয় প্রত্নকথা ব্যবহার করে লিখতে পারি, বিলয়-মুহূর্ত আসন্ন হলে জগৎপ্রপঞ্চের স্রষ্টা যেমন সমগ্র জগৎকে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সহ নিজের অনির্বচনীয় পরা-অস্তিত্বে সংহৃত করে, ঠিক তেমনি যেন ঘটে গেল এই আখ্যানে। অতএব আমরা ভাবতেই পারি, এই আখ্যান কবিতার প্রগাঢ় অনুভবে অনুরণিত ও অস্তিত্বতাত্ত্বিক দর্শনে সন্নিবিষ্ট। সত্তার সমান্তরাল উপস্থিতিতে তা অভিনব উপন্যাসের সংরূপ ধারণ করেছে।

পাঁচ

রিকার্ডো রেইস-এর নামে প্রকাশিত *Hate You Christ, I do Not* কবিতার অন্তিম স্তবকের শেষ অংশটি যেন এই উপন্যাসের ভাববিশ্বে সঞ্চারিত হয়েছে : 'Life/ is multiple, all days different from each other,/and only as multiple shall we/be with reality and alone.!' জীবন যে অনেকান্তিক আর সমস্ত দিনই একটি অন্যের চেয়ে আলাদা—এই উপলব্ধি উপন্যাসের প্রধান চরিত্র রিকার্ডো রেইসকেও বিশেষ মাত্রা দিয়েছে। বাস্তবের অন্তর্বয়ন হিসেবে যে-অধিবাস্তব সক্রিয়, তা আসলে উভয়কেই সম্ভাব্য পরিসর-মাত্র করে তোলে। সমস্ত ঘটনাক্রমে, সম্পর্কের বিন্যাসে কেবলই জেগে উঠতে চায় বৈকল্পিক অপর। ফলে বাস্তব ও অধিবাস্তব—দুটোই হয়ে পড়ে আপেক্ষিক ও অনিশ্চিত। আর, এর অভিঘাতে সময়-পথে ভ্রাম্যমান ব্যক্তিসত্তা জুড়ে নেমে আসে নির্জনতার অমোঘ ঝরোখা। সত্তা বাহির থেকে ভেতরে যেতে চায় যত, জীবনের সম্ভাবনা ও রিক্ততার দোলাচল তত শানিত হয়ে ওঠে। সেইসব

উপন্যাসের নতুন নতুন ঘটনা-সংস্থানে ও সম্পর্কের বিন্যাসে ব্যক্ত হয়। পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষাকে কেবলই শাসন করে জীবনের অনস্বীকার্য অপূর্ণতা ও তৃপ্তিরহিত আকাঙ্ক্ষাগুলি। রিকার্ডো রেইস ও ফারনান্দো পেশোয়ার অতিলৌকিক উপস্থিতি ও আততি বাস্তব নাকি অধিবাস্তব—এই প্রশ্নের চেয়েও জরুরি আখ্যানের বহুস্বরিক তাৎপর্যের অন্যতম এই বার্তা যে সারামাগোর অভিনব ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনে তথ্য ও সত্যের চিরাগত অর্থ-সম্পর্ক-ব্যবধান অবান্তর হয়ে পড়েছে। রিকার্ডো রেইসের *I Stick to Facts* কবিতার গভীর ব্যঞ্জনাগর্ভ দুটি প্রারম্ভিক পঙ্‌ক্তি এরকম : 'I stick to facts. Just what I feel, I think./words are ideas.'! অর্থাৎ যা অনুভবে ও চিন্তায় উপস্থিত, তা-ই তথ্য। শিল্পে সমর্পিত শব্দ তথ্য-বিষয়ক এই ব্যতিক্রমী ভাবনাকেই প্রকাশ করে।

সুতরাং সারামাগো যাকে আখ্যানের ভরকেন্দ্র হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন, কবি ফারনান্দো পেশোয়ার সেই সমান্তরাল অপরসত্তা রিকার্ডো রেইসের নামে প্রচলিত দার্শনিক নির্যাস-ঋদ্ধ কবিতাগুলিতে দেখতে পাচ্ছি তথ্যাতিযায়ী সত্যের প্রতি, অনেকান্তিক জীবনের প্রতি, খণ্ডিত পরিসর থেকে পূর্ণাঙ্গ পরিসরের দিকে যাত্রার প্রতি অস্খলিত প্রত্যয়। উপলব্ধির এই বহুমাত্রিকতা ও কেন্দ্রাভিমুখ্য হয়ে উঠেছে ঔপন্যাসিকতার পরাপাঠ। 'To be Great, be Entire' শীর্ষক দার্শনিক বার্তাবাহী কবিতায় রিকার্ডো লিখেছেন : 'to be great, be entire : of what's yours nothing/exaggerate or exclude,/be whole in each thing.'। মহৎ হতে চাও যদি, সমগ্র হও তবে—এই যে বার্তা, তার নিবিড়তর বিচ্ছুরণ কি সারামাগোর আখ্যানে ঔপন্যাসিকতায় রূপান্তরিত হল? প্রতিটি বস্তুতে বা অনুপুঙ্খের বিন্যাসে কীভাবে সম্পূর্ণ হতে পারে সত্তা? যা-কিছু অস্তিত্বে সম্পৃক্ত হতে পারে, সেইসব নিজস্ব মূল্যে মর্যাদাবান, তাতে নেতি বা অতিরেক থাকে না। বরং প্রতিবেদনে সম্ভবের সঙ্গে অসম্ভবও অন্তর্বৃত হয়ে পড়ে। সমান্তরালতার বিচ্ছুরণে প্রাগুক্ত বাস্তব ও অধিবাস্তবের দ্বিরালাপ এবং সত্তার অন্তর্বৃত নিঃসঙ্গতা : সমস্তই কল্পনায়, অলৌকিকতায়, প্রকল্পনায়, ঘটনা-সংস্থানে বিধৃত হতে পারে। অন্তত সারামাগো গভীরভাবে এই বিশ্বাসই করেন। এইজন্যে তাঁর লিখনশৈলী যেন সর্বগ্রাহী ছেদহীন প্রবাহ যা প্রতিটি আখ্যানে ফিরে ফিরে আসে।

অনুবাদক গিওভান্নি পোন্‌টিয়েরো তাঁর ভূমিকায় *দি ইয়ার অফ দি ডেথ অফ রিকার্ডো রেইস*-এর অনন্যতা এবং তার স্রষ্টার শিল্পবীক্ষার বিশেষত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু মন্তব্য করেছেন। আমাদের পাঠ-অভিজ্ঞতায় কার্যত প্রতিটি ঔপন্যাসিক প্রতিবেদন সম্পর্কে যে মৌল প্রতীতি হয়ে থাকে অর্থাৎ সারামাগোর আখ্যানবিশ্ব বহুস্বরিক ও অনেকার্থদ্যোতক— তা এই উপন্যাস সম্পর্কে অনেক বেশি মাত্রায় সত্য। এবং, পোন্‌টিয়েরো ঠিক তা-ই বলেছেন : এই আখ্যানকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। তবে তাঁর প্রারম্ভিক বাক্য আমাদের মতো ভিন্ন সাংস্কৃতিক পৃথিবীর বাসিন্দাদের খানিকটা হতাশ করবে হয়তো কিন্তু এর সত্যতাও অনস্বীকার্য। আসলে

অনুবাদক এখানে লেখকের অভিমত উদ্ধৃত করেছেন মাত্র। একটি সাক্ষাৎকারে সারামাগো মন্তব্য করেছিলেন, যিনি পর্তুগিজ নন তাঁর পক্ষে এই বইয়ের তাৎপর্য পুরোপুরি অনুধাবন করা সম্ভব নয়। বহুস্তরান্বিত এই পাঠকৃতির যত ভেতরে প্রবেশ করেছি, চমৎকার ইংরেজি ভাষান্তর সত্ত্বেও মনে হয়েছে, সমস্ত অনুষঙ্গের সূক্ষ্ম অনুরণন আমাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে না। চিহ্নায়িত বয়ানের ইশারা অনধিগম্য রয়ে যাচ্ছে, আমাদের পাঠ সীমাবদ্ধ থাকছে শুধুই বহিরঙ্গে। এমনকী, পর্তুগালের ইতিহাস-সংস্কৃতি-রাজনীতি-লোকশ্রুতি সম্পর্কেও যথেষ্ট অবহিত থাকাটা সারামাগো-পাঠের অপরিহার্য প্রাক্‌শর্ত। তা না হলে আমাদের পড়া হবে সেই ক্লিশে-হয়ে-যাওয়া ছ'জন অন্ধের হাতি দেখার রূপকের আরেকটি দৃষ্টান্ত। তবে কি বাঙালি পাঠকেরা সারামাগোর অমূল্য রত্নগুহায় প্রবেশাধিকার পাবেন না! না, তাও নয়। বরং আমাদের নিবিষ্ট পাঠে অগ্রাধিকার পেতে পারে আখ্যানের সেই নিজস্ব শিল্পভাষা যা বিশ্বজনীন। রূপক ও প্রতীকিতার গ্রন্থনায় বহু উৎস-জাত যে-সমস্ত উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছে, আলাদাভাবে তাদের সার্বিক পরিচয় হয়তো আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় না। কিন্তু ওই গ্রন্থনার দার্শনিক, নান্দনিক ও সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য অর্থাৎ নির্যাসগত নিরিখে মৌল মানবিক অন্তঃস্বর অনুধাবন করা সম্ভব সংবেদনশীল মন দিয়ে। নইলে বোর্হেস-মার্কেজ-কার্পেন্তিয়েরের তো প্রশ্নই ওঠে না, আমরা বাঙালিরা ডস্টয়েভস্কি বা বালজাক বা টমাস মানের আখ্যানবিশ্ব সম্পর্কেও কখনো আগ্রহী হতাম না।

ওস্ *লুসিয়াডোস্* নামক মহাকাব্যের রচয়িতা ক্যামুয়েন্সের পরে যিনি পর্তুগিজ সাহিত্যের প্রধানতম কবি, সেই পেশোয়া-র সার্বভৌম ও সমান্তরাল অপর সত্তা রিকার্ডো রেইসকে সারামাগো যেভাবে নির্মাণ করেছেন, তা সৃজনী কল্পনার অনবদ্য অভিব্যক্তি। উপন্যাস জুড়ে রয়েছে রিকার্ডো ও পেশোয়া-র রহস্যগর্ভ ও অনেকান্তিক তাৎপর্য সম্পন্ন দ্বিরালাপ। কথা-গ্রন্থনার এই প্রকৌশল ব্যবহার করে সারামাগো যেন শল্যচিকিৎসকের দক্ষতায় পেশোয়ার বহুমাত্রিক কবি-ব্যক্তিত্বকে পাঠকের কাছে উন্মোচিত করেছেন। এই সূত্রে ত্রিশের দশকে পর্তুগালের উত্তাল সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসকেও নিপুণভাবে ব্যবহার করেছেন তিনি। একদিকে রয়েছে তথ্যের আদল, অন্যদিকে সেইসব তথ্যের কখনো শ্লেষগর্ভ আর কখনো দর্শনগর্ভ ভাষ্য। তবে সমস্ত কিছু পেরিয়ে গিয়ে বড়ো হয়ে ওঠে মানব-অস্তিত্বের সম্ভাব্য অনেকান্তিকতা এবং সত্তার বিভিন্ন অবতলের মধ্যে বৈপরীত্য ও অসংগতি। পেশোয়ার মৃত্যুর ন'মাস পরেও তাঁরই সৃষ্ট সমান্তরাল সত্তা যে-নির্মিত বাস্তবে সঞ্চরণ করে এবং কবর থেকে বেরিয়ে এসে পেশোয়া রিকার্ডোর সঙ্গে বন্ধুত্ব পুনর্নবীকৃত করেন—এর অন্তর্বর্তী রূপক অনতিক্রম্য। সারামাগো যেন পাঠকদের বোঝাতে চান, আমরাই আমাদের সত্তা ও বাস্তবের নির্মাতা হতে পারি এবং পরিকল্পিত অধিবাস্তবও বাস্তবের স্থান নিয়ে নিতে পারে। শুধু উপন্যাসীকরণ প্রক্রিয়ার স্বার্থে লক্ষ রাখতে হয় যেন এই পরিকল্পিত বাস্তবের শেকড় ছড়ানো থাকে যুগপৎ ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে।

এইজন্যে উপন্যাসে দেখানো হয়, রিকার্ডো রেইস ব্রাজিলে ষোলো বছর রাজনৈতিক কারণে নির্বাসিত থাকার পরে পর্তুগালে ফিরে এসেছেন।

ছয়

অনুভববিশ্ব ও বস্তুজগৎ, বিমূর্ততা ও মূর্ততা, সাহচর্য ও নিঃসঙ্গতার মিথস্ক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে রিকার্ডো রেইসের আখ্যানগত পরিসর। সারামাগো এর সূত্র পেয়েছিলেন ফারনান্দো পেশোয়ার ছায়াতপময় কবি-ব্যক্তিত্বে। সত্তার বহুবাচনিকতায় বিশ্বাসী হলেও এই কবি কখনো মীমাংসাতীত স্ববিরোধিতা ও প্রগাঢ় নিঃসঙ্গতাবোধ পেরিয়ে যেতে পারেননি। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছে তিনি নাকি বলেছিলেন, 'আমি জানি না আমি কে ; আমি এ-ও জানি না, কী ধরনের আত্মা আছে আমার।' এ আসলে বোর্হেসীয় গোলকধাঁধার তুলনায় একটু ভিন্ন ধরনের অভিব্যক্তি। যে-মানুষ একই সঙ্গে বহুবিধ অস্তিত্বের অধিকারী, নিশ্চয়তা কিংবা কেন্দ্রিকতা সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ থাকার কথা নয়। বরং বহুবিধ সমান্তরাল সত্তার আততিতে, অনির্দেশ্যতায় তৈরি হয়, যেন বা কাম্যু-কাফকা-মানের উৎকণ্ঠা ও অবসাদের বিপ্রতীপে, বার্তাগর্ভ অপার নিঃসঙ্গতার বোধ। স্বভাবত আখ্যানে পেশোয়া ও রিকার্ডোর পরাবাস্তব দ্বিরালাপে এই প্রসঙ্গও বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে যায়—'Come now, you have a long way to go before you know what loneliness is. I've always lived alone. I too, but loneliness is no living alone, loneliness is the enability to keep one or something within us company, it is not a tree that stands alone in the middle of a plain but the distance between the deep sap and the bark, between the leaves and the roots. You are talking nonsense, the things you mention are connected, there is no loneliness there. Let us forget the tree, look inside yourself.' (পৃ. ১৯৩)।

সন্দেহ নেই যে এই পরাবাস্তব দ্বিরালাপে সত্তা নিজেই সম্বোধক ও সম্বোধিত, সম্বোধ্যমানতাই অন্বিষ্ট। অন্যভাবে বলা যায়, সংযোগের অভিনব ধরনই বার্তা ; অতিরিক্ত কিছু সংযোগের 'বিষয়' নয়। স্মরণীয় বাচনে সমৃদ্ধ এই অংশে আখ্যানের শিল্পভাষার সঙ্গে কবিতা ও দর্শনের ভাষার ব্যবধান নেই কোনো। এই উপন্যাসে সত্তা নিজেই তার জগৎ নির্মাণ করে নিয়েছে কেননা এছাড়া উপন্যাস রচনা হত না। তাই রিকার্ডো রেইস সম্পর্কে পেশোয়া-প্রদত্ত তথ্যানুষঙ্গগুলির ওপর ভিত্তি করে সারামাগো তাঁর প্রধান কুশীলবের বাহির ও ভিতরকে সানুপুঙ্খ বিন্যাসের সাহায্যে মূর্ত করে তুলেছেন। মনে রাখা প্রয়োজন, উপন্যাসের দাবিতে এই রিকার্ডো পুনর্নির্মিত নতুন অস্তিত্ব। তা যুগপৎ পেশোয়ার সমান্তরাল অপর পরিসর এবং সেই পরিসর থেকে স্বতন্ত্র অস্তিত্বও। পোন্‌টিয়েরোর বিশ্লেষণে উপন্যাসের চরিত্র হিসেবে এই নতুন মানুষটি প্রচলিত চিন্তাধারার বাইরে ; সংশয়বাদী রিকার্ডোর কাছে স্বাধীনতা ও সুখ মানে যথাক্রমে স্বাধীন ও সুখী হওয়ার অবভাস। তাঁর মতে, সত্য কী, কখনো জানা

যায় না—এমনকী, দেবতারাও তা না জানতে পারেন। আর, নিয়তি অনতিক্রম্য বলে জ্ঞানী ব্যক্তি প্রতিটি মুহূর্তকেই অন্তিম বলে ধরে নেন। পোন্‌টিয়েরো লিখেছেন, রিকার্ডোকে বলা যায়—'An aesthete who tries to reconcile the clarity of reason and the obscurity of the dream world (at times on the fringe of madness), Reis confronts the unknown and the unknowable with total equanimity.' (ভূমিকা : আট)। এই মানুষটি দুজন বিপরীত মেরুর নারীর সঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি সম্পর্ক-বিন্যাসে জড়িয়ে গেছে। একদিকে নিম্নবর্গীয় উৎস-জাত হোটেলের পরিচারিকা লিডিয়া, যার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক গড়ে তুলেছে রিকার্ডো, যে বিনা শুল্কে তাঁর দৈনন্দিন গৃহকর্ম করে দেয় এবং অন্যদিকে অভিজাত বংশীয়া বিষণ্ণ মার্সেন্ডা, যার একটি হাত ক্রমাগত শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এই দুই নারী যেন পুরুষের জৈব আকাঙ্ক্ষা ও অপ্রাপনীয় কলাপ্রতিমার প্রতিনিধি। দ্বিমেরুবিষমতার মধ্যে আন্দোলিত পুরুষ কেবল প্রেম-চেতনার বিচিত্র দ্বৈততাকে প্রকাশ করে না, আশ্চর্য সূক্ষ্মতায় তা ত্রিশের দশকের পর্তুগালের সংশয়-পীড়িত অস্থির সমাজবীক্ষায় সম্পৃক্ত হয়ে যায়। ব্যক্তি-পরিসর ও সমাজ-পরিসরের দ্বিরালাপ আবার ইতিহাস, দর্শন ও প্রকল্পনার ব্যাপকতর সমবায়ী দ্বিবাচনিক প্রেক্ষিতে যুক্ত। ফলে, অনিবার্যভাবেই তৈরি হয়ে যায় মানব-প্রেক্ষিতের জটিল কিছু সুড়ঙ্গপথ যেখানে নিশ্চয়তার বদলে সম্ভাবনাকেই প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে।

অতএব পোন্‌টিয়েরোর উদ্ভাসক মন্তব্যের শরিক হতে পারি আমরাও : 'To walk the labyrinth is to journey at random through time and space, a human adventure which demands courage and imagination. ... Saramago's protagonist is a precarious entity, inhabited by alien voices, driven by desires, tainted by self-interest, a creature at once prodigious and tragic.' (প্রাগুক্ত : দশ)। উপন্যাসের পরাপাঠ অমোঘ ভাবে সর্বত্রসঞ্চারী। তাই আখ্যানের কেন্দ্রীয় কুশীলবের উপস্থাপনা থেকেই প্রবলভাবে উঠে আসে এই বার্তা : অন্য আরও মানুষের প্রতিরূপ হয়েও প্রতিটি মানুষই অভ্রান্তভাবে একক অস্তিত্ব। আমরা প্রত্যেকেই অনন্য তবু অসংখ্য আমাদের প্রতিরূপ। ব্যক্তিত্বের এই অনেকান্তিকতায় সত্তার অভিজ্ঞান কখনো কখনো ঝাপসা হয়ে যায় এবং আমাদের টুকরো-হয়ে-যাওয়া হয়ে ওঠে অবাধ ও ত্বরান্বিত। সারামাগো লিখেছেন, 'আমরা প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো ব্যাধিতে ভুগি যা দুরারোগ্য কেননা তাকে আমাদের সত্তা থেকে আলাদা করে দেখা যায় না। মজা হচ্ছে, আমরা যা হয়েছি তা ওই ব্যাধির জন্যেই সম্ভব হয়েছে। আসলে আমরা নিজেরাই নিজেদের ব্যাধি যা থাকায় আমরা যেমন আকাঙ্ক্ষার অতি সামান্য অংশই পূরণ করতে পারি তেমনই এর জন্যে আমরা অজস্র সফলতাও অর্জন করি।' সারামাগো অস্তিত্বগত কূটাভাসের কথাই লিখেছেন এখানে।

আর, এই ভাবনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচ্ছুরণ দিয়ে নির্মাণ করেছেন *দি ইয়ার অফ দি ডেথ অফ রিকার্ডো রেইস*-এর আখ্যান-স্থাপত্য। স্বভাবত এর কোষে কোষে ছড়িয়ে

রয়েছে কবিতা, দর্শন, জীববিশ্বের অধিবিদ্যা। এক কথায়, পর্তুগালের অন্তর্জীবনের অন্তরঙ্গ ইতিহাস যা অবশ্যই নিঃশ্বাস নিয়েছে সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস খচিত বহির্জীবনে। হোসে সারামাগো এই আখ্যানে সবচেয়ে বেশি যা প্রমাণ করেছেন, তা হল, সাহিত্যিকতার চূড়ান্ত বিনির্মাণ করেই লেখা যুগপৎ কালজ ও কালোত্তর হতে পারে। প্রকৃত লেখক আমাদের জগৎকে সম্প্রসারিত করেন, মানুষের সম্ভাবনা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ও বীক্ষাকে করেন ঋদ্ধতর। তাই শেষ পর্যন্ত এই উপন্যাসের কোনো-একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে আমাদের অভিনিবেশ রুদ্ধ হয় না। পাঠ শেষ হওয়ার পরেও অক্ষুণ্ণ থাকে যে-অনুরণন, সেই সূত্রে সমগ্রতার অনুভব অটুট রেখেও দেখি অজস্র, আসলে অন্তহীন, খণ্ড-খণ্ড একক বাচনের সমারোহ হয়ে উঠছে অপরিহার্য। যেন, যে-বিন্দুতে শুরু করি, ভুবন পরিক্রমার পরে, ধ্রুপদি সংগীতের সমে ফেরার মতো, সেই বিন্দুতে ফিরে যাই। পুরোপুরি ঠিক বলা হল কি? অথবা, পরিক্রমার পরে দেখি, আপাত-সাদৃশ্যের অন্তরালে সময়-ভাস্কর্য খোদাই করে রেখেছে মৌলিক রূপান্তরের ইশারা। তাই তো এই উপন্যাসের প্রারম্ভিক বাক্য—'Here the sea ends and the earth begins' এবং অন্তিম বাক্য—'Here, where the sea ends and the earth awaits.' স্পষ্টত প্রাগুক্ত সমগ্রতার অনুরণন এবং সেইসঙ্গে সময়-প্রাণিত রূপান্তরের দিকে তর্জনি সংকেত করছে বলে বুঝে নিই। 'সূচনা' আর 'প্রতীক্ষা' বাচক ক্রিয়াপদ দুটির আন্তঃসম্পর্কের দ্যোতনা নিয়ে ভাবতে প্ররোচিত হই আমরা। নৈসর্গিক প্রেক্ষিতের এই রূপান্তরে মানব-প্রেক্ষিতের বিন্যাস কীভাবে কতটা পরিবর্তিত হল, তা বোঝার জন্যে মন উৎসুক হয়ে ওঠে।

সাত

১৯৮৬ সালে প্রকাশিত *The Stone Raft* ঔপন্যাসিক প্রকল্পনায় সৃষ্ট রূপক-উপন্যাস। রাজনৈতিক অন্তঃস্বর এই আখ্যানকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। মূল ঘটনা অবশ্যই বুদ্ধির নাগালের বাইরে, কেননা ধারাবাহিক ভাবে কিছু কিছু অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেছে এতে। একদিকে হঠাৎ পর্তুগাল ও স্পেন (আইবেরিস উপদ্বীপ) ইউরোপ মহাদেশের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে ভেসে যেতে শুরু করে ; এই হল মুখ্য বৃত্তান্ত। এর অনিবার্য পরিণতিতে সমাজে অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় সংস্থায় অভূতপূর্ব বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সর্বত্র-ব্যাপ্ত প্রতিক্রিয়ার বিবরণ দিতে গিয়ে সারামাগো তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বহুমাত্রিক বাচন ব্যবহার করেছেন। বাখতিন যাকে 'polyphonic discourse' বলেন, এই উপন্যাস তার চমৎকার নিদর্শন। লেখক মূলত সময়-পর্যটক; তাই তাঁর লিখন-প্রক্রিয়ায় ব্যক্ত হয় বহুযুগের ওপার থেকে ভেসে-আসা যৌথ কণ্ঠস্বরের ঐকতানও। লেখক-স্বরকে সঞ্চালিত করে গোষ্ঠীচেতনায় লালিত ও বহুপ্রজন্মবাহিত কথকস্বর। ফলে বাখতিন-কথিত দ্রষ্টা চক্ষুর উদ্ভাসন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ব্যক্ত হয় সারামাগোর আখ্যানবিশ্বে। *The Stone Raft*-এর মূল বয়ানে প্রবেশ করার আগে, যেন বা তোরণে উৎকীর্ণ সংকেতের মতো, দেখতে পাই, আলেহি কার্পেন্তিয়েরের

চিন্তাপ্রসূ বাচন উদ্ধৃত হয়েছে, 'Every future is fabulous'। বইটি পড়ার পরে অবশ্য আমাদের লিখতে ইচ্ছে করে, প্রতিটি বর্তমানও রহস্যনিবিড়। শুধু দেখা ও দেখানোর প্রকরণ জানা চাই। সংকেতই যখন বাস্তব, আলাদাভাবে বাস্তব খুঁজবেন না কেউ—বিশেষত যাঁদের লেখার শ্রুতি-সাহিত্যের পরম্পরা বহতা কালের যাবতীয় চিহ্নায়ক নিয়ে উপস্থিত। এইজন্যে লেখক-কথকের স্বতঃসিদ্ধ যুগলবন্দিতে গদ্যরচনার প্রচলিত অন্বয়বিধি ও নানা ধরনের যতিচিহ্ন অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। তাই *দি স্টোন র‍্যাফ্‌ট* উপন্যাসে সারামাগো কমা (অর্ধযতি) ও ফুলস্টপ (পূর্ণযতি) ছাড়া অন্য কিছুই (যেমন ড্যাশ-বিন্দু-কোলন-সেমিকোলন-প্রশ্নবোধক-বিস্ময়বোধক চিহ্ন) ব্যবহার করেননি। সারামাগোর প্রগাঢ় ঐতিহ্যানুস্মৃতি ব্যক্ত হয় যখন তিনি বিখ্যাত কিছু মধ্যযুগীয় সাহিত্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে জানান, তাঁর লিখনশৈলী শ্রুতিসাহিত্যের মৌল নীতিকে অনুসরণ করে : 'everything said is destined to be heard'। তার মানে, সারামাগো চান, তাঁর পাঠকেরা নিবিষ্ট শ্রোতাদের মতো কথাপ্রবাহের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও শরিক হয়ে উঠুক।

অনুবাদক গিওভান্নি পোন্‌টিয়েরো বিশদ করে লিখেছেন : 'Defining himself as an oral narrator whose words are meant to have the same impact as music, he claims to orchestrate rather than merely construct phrases and to write as if he were composing a score by concentrating on a pattern of sounds (loud or soft). and pauses (long and short). For him commas and fullstops suffice to create the necessary tension in prose, and he is adamant that any additional punctuation marks would inevitably destroy the sense of "continous flow" and hinder his experiments with timber and resonance....'। এই মন্তব্যের তাৎপর্য ভাষান্তরের মধ্য দিয়েও আমাদের কাছে পৌঁছেছে। ভাবনার ধারাবাহিক প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রেখেও সারামাগো তাঁর ঈপ্সিত আখ্যানকে বহুমেরুবিন্যস্ত করে তুলতে পেরেছেন। বাস্তবের অন্তঃশায়ী অধিবাস্তব, ঘটমানতার অন্তরালে অলৌকিকতা আবিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে আধিপত্যবাদী ইউরোপের প্রতাপের প্রলম্বিত ছায়া থেকে পর্তুগালের প্রতীকী নিষ্ক্রমণের অভাবনীয় বিবরণ দিয়ে লেখক-কথকস্বরের যুগলবন্দি আমাদের যে-পাঠ দিয়েছে, এর তাৎপর্য যতখানি নান্দনিক ততটুকু রাজনৈতিক। হোয়ানা কার্ডা গাছের ডাল দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটলে কিংবা হোয়াকিম সাসা সমুদ্রে পাথর ছুঁড়ে মারলে অথবা স্পেনীয় পেড্রো ওর্সের পায়ের নিচে মাটি কেঁপে উঠলে অথবা হোসে আনাইকোর মাথার উপরে এক ঝাঁক পাখি সারাক্ষণ ওড়াউড়ি করলে কিংবা মারিয়া গুয়াভাইরার হাতে নীল সুতো অন্তহীন হয়ে উঠলে আখ্যানের সম্মুখ-গতির মধ্য দিয়ে এদের পরস্পরের সহযাত্রী হয়ে ওঠায় অন্তহীন পর্যটনের সূচনা : এই সবই বাস্তব হওয়া সত্ত্বেও আসলে অধিবাস্তব।

আবার এই বিশেষ পর্যটনের বিচিত্র ধরনের মতোই যেন আখ্যান এক স্তর থেকে

অন্য স্তরে পরিক্রমা করে। ন্যাটো-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ইউরোপীয় আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থ—স্পেন ও পর্তুগালের নিজস্ব সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি : এই সবই অন্যোন্য-সম্পৃক্ত এই উপন্যাসে। তাই সারামাগোর এই বয়ানের সঙ্গে পাঠক হিসেবে আমরাও একমত : 'writing is extremely difficult, it is an enormous responsibility.' (পৃ. ৫)। এই দায়িত্বের তাৎপর্য কত বহুসঞ্চারী, তা কেবল নিবিড় পাঠেই স্পষ্ট হতে পারে। কিন্তু এখানে তার অবকাশ নেই। আমরা শুধু লক্ষ করব আখ্যানের নাম ও ঘটনা-বিন্যাস এবং প্রধান কুশীলবেরা, এমনকী তাদের পর্যটনের বিশ্বস্ত সঙ্গী সেই অলৌকিক সংবেদনা সম্পন্ন কুকুরটিও বাস্তব ও প্রকল্পনার যুগলবন্দি থেকে উৎসারিত।

The Gospel According to Jesus Christ সারামাগোর সবচেয়ে বিতর্কিত উপন্যাস। এই আখ্যানে যিশুখ্রিস্ট সর্বজন-বিদিত সেই পরিত্রাতা নন। সবচেয়ে বড়ো কথা, এই উপন্যাসে বাইবেলের বিভিন্ন ঘটনাকে শ্লেষগর্ভ দৃষ্টিকোন থেকে পুনর্নির্মাণ করে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া লেখক কিছু নতুন অলৌকিক কাহিনিও উদ্ভাবন করেছেন। এই উপন্যাসে ঈশ্বর ও শয়তানকে অমঙ্গল নিয়ে বিতর্ক করতে দেখি। যিশু মঙ্গল-অমঙ্গল সম্পর্কিত বিশ্বাসের ব্যাপারে ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে প্রত্যাহ্বান জানিয়েছেন। তবে সারামাগোর অন্য আখ্যানের মতো এখানেও একমাত্রিকতা দেখি না। লেখক ধর্মতত্ত্বের পুনর্নির্মিত বৃত্তান্তকে সুকৌশলে সৃষ্টিশীল লেখকের সৃজনী প্রক্রিয়ার সঙ্গে সমন্বিত করে দিয়েছেন। যেমন : 'The gaping mouth sends up a cry we shall never hear, for none of these things is real, what we are contemplating is mere paper and ink, nothing more.'। আসলে কাকে বাস্তব বলব আর কাকে অধিবাস্তব কিংবা কাকে বলব সৃষ্টি-প্রতিভার অযত্নসম্ভব ফসল আর কাকে সুপরিকল্পিত নির্মিতিবিজ্ঞানের নৈপুণ্য—এসব বিষয়ে সাধারণ মাপকাঠি সর্বত্র ব্যবহার করা চলে না। অন্তত সারামাগোর ক্ষেত্রে তো নয়ই। তাঁর দুরন্ত সাহসেরও তুলনা নেই কোনো। তাই তিনি মারিয়া ম্যাগড্যালিন নামে বারাঙ্গনা চরিত্র নির্মাণ করে যিশুর সঙ্গে তার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা উপস্থাপিত করতে পারেন। কিংবা যোসেফের অপরাধবোধ ও ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাকে নতুন ভাবে তুলে ধরতে পারেন। পিতার ভাগ্যকে স্বেচ্ছায় অনুবর্তন করেন যিশু ; কেননা এটাই পূর্ব-নির্ধারিত। উপন্যাসের এই উপলব্ধি ভারতীয় পাঠককে মনে করিয়ে দেয় যযাতি ও পুরুর উপাখ্যান।

আট

অল দি নেম্‌স্ উপন্যাসে কেউ কেউ কাফকার আমলাতান্ত্রিক গোলকধাঁধার উন্মোচন-প্রকল্পের ছায়া দেখতে পেয়েছেন। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের পঞ্জীয়ন কার্যালয়ের গৌন কর্মচারী সেনর হোসেকে কেন্দ্র করে এই আখ্যান গড়ে উঠেছে। কোনো-এক অপরিচিত মহিলার নাম-মাত্র সম্বল করে কৌতূহলী হোসে প্রায় গোয়েন্দার ভঙ্গিতে এই মেয়েটির পূর্ণ পরিচয় উদ্‌ঘাটনে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে

যে পরিচয়ও কোনো একমাত্রিক সংজ্ঞা নয়; তারও আছে স্তরের পরে স্তর, বলা ভালো, বিবরের পরে বিবর। সব মিলিয়ে অন্তহীন জটিলতার গ্রন্থনায় উন্মুক্ত হয়ে পড়ে সমাজের আপাত-অভ্যস্ত বহিরঙ্গের আড়ালে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার সত্য। হোসে এই উদ্যমে কী কী ঘটনা ঘটাল কিংবা কত ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হল, তার নিপুণ উপস্থাপনা লক্ষ করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রত্যাশিত ভাবেই সারামাগোর গভীর উপলব্ধিজাত উচ্চারণে আপ্লুত হই। অর্থাৎ উপলক্ষ যত সামান্যই হোক, সারামাগোর প্রকৃত অন্বিষ্ট জীবনের গভীর অবতলের উদ্ভাসন। অজস্র অনুপুঙ্খ সমাবেশের সূত্রে উপন্যাসের শুরুতেই লেখক কার্যত তাঁর পরাপাঠ সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে তোলেন : 'There are people like Senhor Jose everywhere who fill their time ... by collecting stamps ... and they probably do so out of something that we might call metaphysical angst, perhaps because they cannot bear the idea of chaos being the one ruler of the universe, which is why, using their limited powers and with no divine help, they attempt to impose some order on the world.' (পৃ. ১৩)। অর্থাৎ উপন্যাসে সেনর হোসে যা-যা করেছে, সেই সবই গভীরভাবে প্রতীকী।

কোনো সন্দেহ নেই যে অজস্র মণিমুক্তো ছড়িয়ে রয়েছে বয়ানে। এদের অস্তিত্ব আরেকবার প্রমাণ করে যে সারামাগোর আখ্যানবিশ্ব যতটুকু নান্দনিক, ততখানি দার্শনিকও। কয়েকটি প্রতিনিধি স্থানীয় দৃষ্টান্ত দিচ্ছি শুধু :

১. 'I indeed nothing so tires a person as having to struggle, not with himself, but with an abstraction.' (পৃ. ১৬)
২. 'Fame, alas, is a breeze that both comes and goes, it is a weather vane that turns both to the north and to the south.' (পৃ. ১৯)
৩. 'Even though the clock would like to convince us otherwise, time is not the same for everyone.' (পৃ. ৩৫)
৪. 'It's only because we live so sunk in ourselves that we don't notice that what is actually happening to us leaves intact, at every moment, what might happen to us. Does that mean that what might happen is constantly being regenerated. It's not only being regenerated, it's multiplying.' (পৃ. ৩৬-৩৭)

এই সবই দ্বিরালাপের অন্তহীন গ্রন্থনার নিদর্শন। স্পষ্টত সম্বোধক ও সম্বোধিত—দু-পক্ষই সারামাগোর কেন্দ্রীয় স্বর-বিচ্ছুরণের শরিক। এই দৃষ্টান্ত আরও আছে :

৫. 'A meeting, an infatuation, a disappointment, a few smiles, a few tears, which seem, at first sight, the same for everyone but which are in fact, different for us all.' (পৃ. ৪৩)

৬. 'that's how you learn, by answering questions.' (পৃ. ৫০)

৭. 'It is the search that gives meaning to any find and that one often has to travel a long way in order to arrive at what is near.' (পৃ. ৫৬)

৮. 'Probably the greater the difference the greater the similarity, and the greater the similarity, the greater the difference.' (পৃ. ৮১)

শেষোক্ত দুটি বয়ান যেন আমাদের এই সারামাগো-পাঠেরও দিগ্‌দর্শক। উপযুক্ত সন্ধানই কোনো আবিষ্কারকে অর্থবহ করে তোলে—এই উপলব্ধি বারবার আমাদের সঞ্চালিত করে এক আখ্যান থেকে অন্য আখ্যানে। অন্যত্র লিখেছি, এদের অভিজ্ঞানই হল প্রবল পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য। আবার, এই স্বাতন্ত্র্য এদের অনস্বীকার্য গভীর সাদৃশ্যের প্রতিও ইশারা করে। *অল দি নেম্‌স্* থেকে আরও অনেক স্মরণীয় বাচন উদ্ধৃত করতে পারি। কিন্তু আপাতত তা থেকে বিরত থাকছি। বরং লিখি, উপস্থিতির অন্তর্বর্তী অনুপস্থিতি ও অনুপস্থিতির অন্তঃশায়ী উপস্থিতি যে সারামাগোর পরিশীলনের বস্তু, তা তিনি পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছেন। আর লক্ষ করি এই উপন্যাসের মর্মসত্য উন্মোচনের দুটি ভিন্ন অভিব্যক্তি :

ক. 'The truth is that there are never any solid guarantees about what you see, appearances are very deceptive.' (পৃ. ২৩৪)

খ. 'Contrary to what is generally believed, meaning and sense were never the same thing, meaning shows itself at once, direct, literal, explicit, enclosed in itself, univocal, if you like, whilst sense cannot stay still, it seethes with second, third, and fourth senses, radiating out in different directions that divide and subdivide into branches and branchlets, until they disappear from view, the sense of every word is like a star hurling spring tides out into space, cosmic winds, magnetic perturbations,afflictions.' (পৃ. ১২৫)

দ্বিতীয় অভিব্যক্তি যেন প্রধানত দার্শনিক কবির, গৌনত আখ্যান-ভাবুকের। 'meaning' এবং 'sense'-এর মধ্যে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্যের প্রতি তর্জনি সংকেত করেছেন সারামাগো, তাকে সতর্কভাবে যদি প্রসারিত করি, তাহলে কাহিনির নির্মোক ও আখ্যানের অন্তঃসার কীভাবে অন্যোন্য-নির্ভর হয়েও স্বতন্ত্র—তা বুঝতে সুবিধে হবে। এই নিরিখে *দি হিসট্রি অফ দি সিজ্ অফ লিসবন* ও *দি কেভ্* উপন্যাস দুটির তাৎপর্যও বিশ্লেষণ করতে পারি। শেষোক্ত রচনায় সিপ্রিয়ানো আল্‌গোর নামক ৬৮ বছরের মৃৎশিল্পীর ছোট্ট অভ্যস্ত পৃথিবী যখন ভঙ্গুর মৃৎপাত্রের মতো হয়ে গেল, কীভাবে একটু-একটু করে প্লেটোর গুহা-রূপক অমোঘ সত্য হয়ে উঠল তার

জীবনে—তারই আখ্যান উন্মোচিত হয়েছে। সিপ্রিয়ানোর মতো আমরাও যেন ভাবতে শুরু করে দিই—'What awaits us is our own memory and perhaps a tear.' (পৃ. ৩১)। প্রশ্ন জাগে মনে, আমরা কি তবে নিশ্চেষ্ট ভাবে অপেক্ষা করে থাকব নিশ্চিত ক্ষয় ও অবসানের জন্যে যদি 'the overwhelming melancholy of what lay outside had contaminated with incurable artificiality what was growing inside.' (পৃ. ১৭)? প্রায় তিনশো পৃষ্ঠার আখ্যান জুড়ে, অত্বরিত বিন্যাসে, এই মৌলিক জিজ্ঞাসার সম্ভাব্য মীমাংসা খুঁজেছেন সারামাগো।

.

নয়

যেহেতু প্রতিটি উপন্যাসের নিবিড় পাঠ করার সুযোগ সীমিত পরিসরে নেই, বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসেবে গণনীয় *Blindness* (ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA : 1995)-এর পাঠ-প্রস্তাবনা দিয়ে এই আলোচনাকে আপাত-সমাপ্তির উপকূলে নিয়ে যেতে পারি। উপন্যাসবিশ্বের আরেক আসামান্য স্থাপত্য আলবেয়ার কাম্যুর প্ল্যাগ-এর কথা বারবার মনে পড়বে পাঠকের। *Blindness* উপন্যাসেও মড়ক, তবে তা অন্ধতার, সাদা অন্ধতার। নামহীন নগরে নেমে আসে এই অন্ধকার ; অতি দ্রুত সংক্রামিত হয় নাগরিকেরা। তারা কোনো বস্তু দেখতে পায় না কোথাও, দেখে শুধু অবয়বহীন ও দুর্ভেদ্য সাদা আলো। অন্ধদের জন্যে প্রশাসন একটা সংরক্ষিত বন্দিশালার ব্যবস্থা করে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে প্রশাসন সহ সভ্য দুনিয়ার যাবতীয় নিয়মশৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে। কেননা রূপকার্থে অন্ধজন আরেক অন্ধকে পথ নির্দেশ করতে পারলেও সর্বত্রব্যাপ্ত অন্ধতার সংক্রমণে কোথাও কোনো পরিত্রাণের উপায় অবশিষ্ট থাকে না। দৃষ্টিশক্তি অটুট ছিল। একমাত্র অন্ধ-হয়ে-যাওয়া চক্ষুবিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের স্ত্রীর কিন্তু অন্ধদের সমাজে তাঁকেও অন্ধতার ভান করতে হয়, নইলে স্বামীকে অনুসরণ করে তিনি অন্ধদের গারদখানায় আসতে পারতেন না। অন্ধ বন্দিদের মধ্যে যেন গড়ে ওঠে নতুন সমাজ। ওই ডাক্তারের স্ত্রী গারদখানায় ন্যূনতম নৈতিক বোধ ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু অসহায়তা যখন আক্রোশে রূপান্তরিত হয়, ওই গারদখানার নতুন সমাজে দেখা দেয় নব্য সন্ত্রাসবাদ।

নরক দুর্বার হয়ে ওঠে তাতে। তবু, কোনো কোনো মানুষ হাল ছেড়ে দেয় না। তারা সংঘর্ষ থেকে পিছিয়ে আসে না। তারপর একদিন যেমন হঠাৎই অন্ধতার সূচনা হয়েছিল, তেমনই আরেকদিন আকস্মিক ভাবে তার অবসান হতে শুরু করে। মানবিক সম্পর্কের নতুন বিন্যাস কোথাও তৈরি হয়, দেখা যায় অন্যোন্য-নির্ভরতার নতুন সংরূপ, কোথাও বা জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত সত্যের নতুন উন্মোচনের প্রতি ইশারা দেখতে পাই। এই উপন্যাসে ডাক্তারের চক্ষুষ্মান স্ত্রী-র বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে ঠিকই ; কিন্তু এখানে প্রচলিত অর্থে কোনো প্রধান বা অপ্রধান কুশীলব নেই। যেহেতু লেখকের ঈপ্সিত হল সর্বত্রব্যাপ্ত ও অন্যোন্য-সম্পৃক্ত দ্বিবাচনিকতা বা তার অনুপস্থিতির উদ্ভাসন। সারামাগো বিশ্বাস করেন, ব্যক্তিস্বর স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় ; তা সামূহিক স্বরের

শরিক হয়েই অস্তিত্ববান। অতএব অন্ধতার রূপকও সম্পৃক্ত রয়েছে লেখকের রাজনৈতিক উপলব্ধির সঙ্গে যা তিনি অর্জন করেছেন স্বৈরতন্ত্র ও বিপ্লবের দীর্ঘমেয়াদি অভিজ্ঞতার সূত্রে। পৌর সমাজের উদ্‌বেগ ও ভয় তো রাজনৈতিক সমাজের পেষণে উদ্ভূত হচ্ছে অহরহ ; কিন্তু চোখ থাকা সত্ত্বেও ক'জন সেইসব অনুভব করে? এই বার্তার অনুরণন তো দেশান্তরে-কালান্তরেও অনুভূত হয়ে থাকে। হিটলার-মুসোলিনি-সালাজারের জমানায় মানবতা যখন বিপন্ন হচ্ছিল একটু একটু করে, সবাই কি তা দেখতে ও বুঝতে পেরেছিল! অথবা, চোখ থাকা সত্ত্বেও অন্ধ ছিল অনেকেই। ফ্যাসিবাদ যখন যাবতীয় হিংস্রতা নিয়ে চেপে বসল জনসমাজে, তখনই কেবল সর্বজনীন অন্ধতার স্বরূপ স্পষ্ট হল। সারামাগো এই আখ্যানের বহুস্বরিক দ্যোতনা এভাবেই পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। বস্তুত তাঁর সার্থকতার আরও একটি অতিরিক্ত প্রমাণ এই যে আমাদের মতো ভারতীয় উপমহাদেশের বাঙালি পাঠকদের কাছে মৌলবাদ-ধর্মান্ধতা- কুসংস্কার-বিশ্বপুঁজিবাদ-সাংস্কৃতিক উপনিবেশবাদ কবলিত রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে বিপুল সংখ্যক মানুষের সীমাহীন অন্ধতাও অভিন্ন সূত্রে জড়িয়ে যায়।

সারামাগো এই উপন্যাসে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে অন্ধতা কোনো আক্রান্ত মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার নয় কিংবা তা নিছক চোখের ব্যাধিও নয়। অন্য আখ্যানের মতো এই বয়ানেও ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র দ্যুতিময় বাচন যা আমাদের উপন্যাসের পরাপাঠ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। যেমন :

ক. 'the eye that is blind transmits the blindness to the eye that sees.' (পৃ. ১০৪)

খ. 'to be dead is to be blind.' (তদেব)

গ. 'If we cannot live entirely like human beings, at least let us do everything in our power not live entirely like animals.' (পৃ. ১১১)

ঘ. 'Blindness was spreading, not to like a sudden tide flooding everything and carrying all before it but like an insidious infiltration of a thousand and one turbulent rivulets which, having slowly drenched the earth, suddenly submerge it completely.' (পৃ. ১১৬)

বিশেষত শেষোক্ত বয়ানে মনে হয় না কি আজকের ভারতবর্ষের অন্ধতা-সংক্রমণের ছবি ও ভাষ্য পেয়ে যাচ্ছি! এবং, এখানেই, হোসে সারামাগো হয়ে ওঠেন আঁধি ও পীড়া-সংক্রমিত এই বিপন্ন পৃথিবীর কথাকার। তাঁর গভীর দার্শনিক দ্যুতিসম্পন্ন বাচনের প্রতিধ্বনি করে বলতে ইচ্ছে করে, 'if you want to be blind, then blind you will be.' (পৃ. ১২২)। নিজেদের সতর্ক করে এও বলতে ইচ্ছে করে : 'Fear can cause blindness...fear struck us blind, fear will keep us blind.' (পৃ. ১২৩)। আধিপত্যবাদী ও স্বৈরতন্ত্রী দম্ভের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্যে

দেশে-দেশে কালে-কালে এই উচ্চারণ নিশ্চিতই হতে পারে প্রত্যেকের কবচকুণ্ডল। মনে হয়, এই উপন্যাসের মতো আমরাও হয়তো 'blind internees' (পৃ. ১৩০) ; তফাত মাত্র এইটুকু যে নিজেদের অন্ধতা স্পষ্ট নয় আমাদের কাছে।

সারামাগো যে অন্ধতার ভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা দিতে চাইছেন, তা আখ্যানের বিন্যাসে সুস্পষ্ট। তাই তো তাঁর বাচনকে এত অমোঘ মনে হয় : 'blindness is also this, to live in a world where all hope is gone' (পৃ. ১৯৯)। নিজেদের প্রশ্ন করতে হবে আজ, আমরা কি কার্যত 'blind in eyes and blind in feeling' (পৃ. ২৩৮) হয়ে পড়েছি! আমরা কি তবে নির্মানবায়নের কুহকের দ্বারা গ্রস্ত হয়ে শুধুই প্রকরণসর্বস্ব 'নিরপেক্ষ' জীবন চাইছি! পড়া শেষ হয়ে যায়, তবু আখ্যানের অনুরণন থামে না। দেশ-কাল-ভাষার ব্যবধানকে অলীক করে দিয়ে এইসব উচ্চারণ হয়ে ওঠে বজ্রগর্ভ মেঘের মতো উদ্দীপক : 'The experience of time has taught us nothing other than that there are no blind people but only blindness.' (পৃ. ৩০৭)। আর, এবার আমাদের ঠিক করে নিতে হবে, আমরাও কি অন্ধতাকে এভাবে চিনে নিতে পারব, 'I think we are blind, Blind but seeing, Blind people who can see, but do not see' (পৃ. ৩০৯)।

হায়, আমাদের বাংলা সাহিত্যেও যদি এমন একজন হোসে সারামাগো থাকতেন!

ওরহান পামুক, তাঁর ভাবনাবিশ্ব

তুরস্কের ওরহান পামুক (১৯৫২—) বিশ্ববন্দিত নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী ঔপন্যাসিক যিনি আপন সময় ও পরিসরের বিশেষ ও নির্বিশেষ স্বভাবের মধ্যে নিয়ত দোদুল্যমান সন্ধানী সত্তা। আপাত দৃষ্টিতে সাংস্কৃতিক জাতীয়তার গণ্ডিতে তিনি রুদ্ধ নন। অথচ তাঁর সৃষ্টিশীল সত্তার কোষে কোষে ছড়িয়ে আছে তুরস্কের ঐতিহ্য-জাতীয় আকাঙ্ক্ষা- কূটাভাস-দেশকালগত স্ববিরোধিতা আর ঐ স্ববিরোধিতা থেকে উৎক্রমণের প্রবণতাও। পামুকের প্রথম উপন্যাস 'Cevdet Beyond the Sons' (১৯৮২) প্রকাশিত হওয়ার পরে সমকালীন তুরস্কের পাঠকেরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করেন। এরপর একে একে প্রকাশিত হয় 'The Silent House' (১৯৮৩), 'The White Castle' (১৯৮৫ : ১৯৯১), 'The Black Book' (১৯৯০ : ১৯৯৪), 'The New Life' (১৯৯৪ : ১৯৯৭), 'My Name is Red' (১৯৯৮ : ২০০১), 'Snow' (২০০২ : ২০০৪), 'Instanbul : Memories of a City' (২০০৩ : ২০০৫), 'Other Colours' (২০০৭) ও 'The Museum of Innocence' (২০০৮)। এদের মধ্যে ইস্তানবুল নামে তাঁর বিখ্যাত ও ব্যতিক্রমী স্মৃতিকথা ছাড়া 'Other Colours' হল প্রবন্ধ সংকলন। নব্বই এর দশকে পামুক 'Secret face' (১৯৯২) নামে একটি চিত্রনাট্য লিখেছিলেন। আর গত বছর (২০১০) প্রকাশিত হয়েছে 'Pieces from the views, life, streets, literature' নামক প্রবন্ধ-সংগ্রহ। নোবেল পুরস্কার সহ আরও অনেক সাহিত্যিক সম্মান পেয়েছেন পামুক। আবার তাঁর দেশেই উগ্র জাতীয়তাবাদী গোপন সংগঠন তাঁকে হত্যার চক্রান্তও করেছিল।

পামুকের মতো লেখক গভীর ও সূক্ষ্মভাবে আপন দেশকালে নিহিত নির্যাস সন্ধান করেন কিন্তু জাতীয়তাবাদের স্থূল অভিব্যক্তি কখনও তাঁদের সমর্থন পায় না। ফলে স্বদেশেই তিনি লাঞ্ছিত হন। সময় ও পরিসরের সংকীর্ণ গণ্ডিকে অতিক্রম করতে চাইলে এই মাশুল সম্ভবত দিতেই হয়। তাঁর উপন্যাসগুলির নিবিড় পাঠ থেকে যে সঞ্চালক সত্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তা হল নিছক কাহিনির কাঠামো তৈরি করা বা তাতে মায়া সঞ্চার করা তাঁর অন্বিষ্ট নয়।

দেশকাল-পটে আধারিত ব্যক্তিসত্তা ও যৌথসত্তার বিচিত্র আততি এবং সেই আততির সঙ্গে নানাবিধ জীবন-ভাবনার সমন্বয় খুঁজতে খুঁজতে তৈরি হয় তাঁর পাঠকৃতি। ফলে প্রচলিত অর্থে উপন্যাসের গণ্ডির মধ্যে রুদ্ধ না থেকে তাঁর বাস্তব-বোধ ও কল্পনার সংরাগ অনেকান্তিক স্থিতিস্থাপক আখ্যানের আদল গড়ে তোলে। এই আদল

এমন যা জন্ম-মুহূর্তেই নিজেকে মুছে ফেলে পরবর্তী আখ্যানের পূর্বলেখ হিসেবে নিজেকে উপস্থাপিত করে। পামুকের নিভৃত ব্যক্তি-জীবন, শৈশব ও কৈশোরের কল্পনা-প্রবণতা, যথাপ্রাপ্ত বাস্তবকে ক্ষণে ক্ষণে হারিয়ে ফেলে আবার নতুন দ্যোতনায় খুঁজে পাওয়া, প্রিয় নগর ইস্তানবুলের ভিন্নমুখী সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গের দোলাচল, জাতিসত্তার জটিল সন্ধান, আস্তিত্বিক অনন্বয়ের ক্ষোভ ও যন্ত্রণা, রাষ্ট্র ও সমাজের জাড্য ও জাড্যমুক্তির আকাঙ্ক্ষা, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নিহিত অন্ধতা ও সেই অন্ধতা থেকে সম্ভাব্য উদ্ভাসনের দিকে যাত্রা : এই সমস্তই পামুকের আখ্যানবিশ্বে অনুপুঙ্খের বিচিত্র বিন্যাসে ও প্রকরণের নিত্যনতুন বিভঙ্গে ফিরে ফিরে আসে।

উপন্যাস ছাড়াও পামুক লেখেন প্রবন্ধ সমালোচনা, স্মৃতিচারণ, সামাজিক বয়ান কিংবা রাজনীতি সংশ্লিষ্ট নিবন্ধ। তবে তাঁর 'Other Colours' নামক প্রবন্ধ সংকলনের 'The implied Author' নিবন্ধে তিনি দ্বিধাহীনভাবে জানিয়েছেন, তাঁর আসল কাজ হল উপন্যাস লেখা, কেননা উপন্যাস লিখতে লিখতেই তিনি আরও প্রগাঢ়ভাবে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে তাঁর পরিস্থিতি যেন সেই রোগীর মতো যাকে প্রতিদিনই নিয়মিতভাবে ঔষধ ব্যবহার করতে হয় যার ব্যতিক্রম হলে রোগীর জীবনীশক্তি অর্ধেক কমে যায়। যেদিন থেকে তিনি লিখতে শুরু করেছেন, সেই তরুণ বয়সেই সাহিত্য তাঁকে সঞ্জীবিত করেছে। চারদিকে ব্যাপ্ত অসুস্থতা, বিকার ও পীড়া সংক্রমণের মধ্যে লেখা নিয়মিত তাঁকে বেঁচে থাকার প্রেরণা দিয়েছে। এই ঔষধ-পথ্যকে অবশ্যই ন্যূনতম মানসম্পন্ন হতে হবে যাতে তাঁর চেতনা ক্রমাগত নিবিড়তর হতে পারে। আরও দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবের বাহির থেকে বাস্তবের ভেতরে তাঁর লেখকসত্তা প্রবেশ করতে পারে এভাবেই। অন্য কোনও কিছুই তাঁকে বেশি সুখী করে না কিংবা জীবনের সঙ্গে আরও বেশি সম্পৃক্ত করে না। সেইসঙ্গে এও তাঁর উপলব্ধি হয়েছে যে মৃত লেখকেরাই উৎকৃষ্ট বই-এর স্রষ্টা। তাঁদের উপস্থিতি তাঁকে বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে পাড়ি দিতে সাহায্য করে। এখানে আমাদের মনে পড়ে যে 'Paris Review' পত্রিকায় প্রকাশিত বিখ্যাত সাক্ষাৎকারে তাঁর এই নিয়মিত লেখার অভ্যাস সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন যে প্রতিদিনই অন্তত দশঘন্টা তিনি লেখার জন্যে কঠোর পরিশ্রম করেন। নিজেকে তখন তাঁর খেলনা নিয়ে মগ্ন শিশুর মতোই মনে হয়। এখানে আমাদের মনে হয় যে 'স্নো' উপন্যাসের কথক (যার নামও ওরহান) নিজেকে একজন করণিক বলে বর্ণনা করেছে যে প্রতিদিন একই সময়ে তার নির্দিষ্ট কাজের জায়গায় বসে। এই শৃঙ্খলা-পরায়ণতা ঔপন্যাসিককে সর্বদাই কবির চেয়ে আলাদা করে দেয়। ঐ সাক্ষাৎকারে পামুক বলেছেন : 'A novelist is essentially a person who covers distance through his patience, slowly, like an ant. A Novelist impresses us not by his demonic and romantic vision, but by his patience.'। আঠারো বছর বয়সে পামুক কিছু কবিতা প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু তার পরই তাঁর এই উপলব্ধি হয় যে 'A poet is someone through whom God is speaking.You have to be possessed by poetry.....I realised after

sometime that God was not speaking to me. I was sorry about this and then I tried to imagine—if God were speaking through me, what would he be saying ? I began to write very meticulously, slowly trying to figure this out. That is Prose writing, Ficition writing. So I worked like a clerk. Some other writers consider this expression to be a bit of insult. But I accept it ; I worked like a clerk.'

দুই

নিশ্চয়ই এই কথাগুলিকে আমরা নিছক বহিরঙ্গ মূল্যে গ্রহণ করছি না। কেননা গভীর জীবন-দর্শনে অন্তর্দীপ্ত পামুকের আখ্যান যখন আপাত-সমাপ্তিতে পৌঁছায়, মনে হয় যেন এইমাত্র নিটোল একটি মহাকবিতা পাঠ শেষ হল অথবা বহুমাত্রিক কোনও চিত্র দেখা শেষ হল। পামুক আসলে তাঁর সৃজনশীল অস্তিত্বের হয়ে ওঠায় অনাবিষ্কৃত জীবনের উদ্ভাসন জনিত আশ্চর্য বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করতে চেয়েছেন। সেইসঙ্গে এটাও স্পষ্ট করতে চাইছেন যে গদ্যভুবন স্থাপত্যেরই মতো প্রখর যত্নসাধ্য ও শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়া যার জন্যে সম্পূর্ণ জীবন পরিণত হয় অন্তহীন ইন্ধনে। কেননা পামুকের মতো স্রষ্টার পক্ষে প্রতিটি নতুন লেখাই নতুন সম্ভাবনাময় দিগন্তের সন্ধান যে-জন্যে অব্যবহিত পূর্ববর্তী কোনও সার্থক লেখাকেও চেতনা থেকে মুছে ফেলতে হয়। প্রাক্তন সৃষ্টির স্মৃতি যতক্ষণ অস্বীকৃত না হচ্ছে, প্রকৃত নতুন সৃষ্টির জন্ম হয় না। সেইজন্যে পামুকের প্রতিটি রচনাই আলাদা, চেতনার নতুন অভিজ্ঞানের স্মারক। তাই তিনি জানিয়েছেন যে লেখক-জীবনের তিন দশক পেরিয়ে যাওয়ার পরেও লেখার কাজটি কিন্তু সহজসাধ্য হয়নি। হয়নি যে, এর কারণ, বারবারই তাঁর সৃষ্টিতে দেখা গেছে নতুন নতুন সূচনা-বিন্দু। এমনকী লিখতে লিখতে হঠাৎই হয়তো বদলে গেছে তার প্রকল্প এবং অবধারিতভাবে সেইসঙ্গে বিন্যাসের ধরনও। শুধু যে সৃষ্টির প্রক্রিয়া বদলে গেছে, এমন নয়; প্রকৃতপক্ষে রূপান্তরিত হয়েছে তাঁর অনুভবী ব্যক্তিত্ব। আর এই সূত্রে উপলব্ধির জগৎ। পামুকের প্রতিটি পাঠকৃতি নিয়ে যদি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা যায়, অন্তর্বৃত এই রূপান্তরের ছবি বিশদ হতে পারে। প্রতিটি পাঠকৃতিই তাঁর সত্তার ক্রমবিবর্তনের বিশিষ্ট কোনও পর্যায়ের বা ভাবনা-সমবায়ের সূচক। তাঁর চিরচলিষ্ণু সৃজনীসত্তার পরিচয় প্রতিটি পাঠকৃতিতে এমনভাবে সম্পৃক্ত যে কোনও দুটি উপন্যাসই তিনি একই পদ্ধতিতে লেখেননি।

আসলে পামুক যত কুশীলবদের নির্মাণ করেছেন, যত ঘটনা-সংস্থানের পরিকল্পনা করেছেন, বিবরণের যত উপস্থাপনা করেছেন—কোথাও কোনও সুনির্দিষ্ট ও পূর্বনির্ধারিত ধারণার অনুসৃতি পাই না। ফলে পাঠকের কাছে প্রতিটি পাঠকৃতি নিয়ে আসে আত্ম-বিনির্মাণের প্রত্যাহ্বান। কেননা কোনও পূর্ব-নির্ধারিত প্রত্যাশার সমর্থন পামুকের নির্মাণশিল্পে পাওয়া যায় না। জীবনের আপাত-পরিচয়ের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে যত তাৎপর্য ও সম্ভাবনা, পামুক চান পাঠকেরা সে-বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠুন। পামুকের

আখ্যানের পাশাপাশি যখন তাঁর সাক্ষাৎকার, স্মৃতিচারণ, সংক্ষিপ্ত বয়ান এবং সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি পড়ি, ব্যতিক্রমী সংবেদনশীলতার অধিকারী এক ব্যক্তিত্বের আদল ফুটে ওঠে। আপন সত্তাকে যিনি বহু অনুপুঙ্খ ভরা জগতের মধ্যে সম্প্রসারিত করেন এবং সেই জগৎকে আবার তার অন্তহীন ইতিহাস-প্রত্নকথা-ইন্দ্রজাল সহ আপন সত্তায় প্রতিফলিত করেন, তাঁর পাঠকৃতি অনিবার্যভাবে বহুস্বরিক ও অনেকার্থদ্যোতক হয়ে পড়ে। এইসব পাঠকৃতিতে রয়েছে অজস্র প্রবেশ-দ্বার ও নির্গম-বিন্দু। ফলে এদের মধ্যে যত আলো তত ছায়া, যতখানি বাস্তব ততটুকু প্রকল্পনা, যতখানি ঘটনা ততটুকু সম্ভাবনা। এতে অবশ্য সাধারণ পড়ুয়াদের পক্ষে আবশ্যিক হয়ে পড়ে মননশীল অধ্যবসায়। যিনি প্রবলভাবে আন্তর্জাতিক আখ্যানভাষার উপস্থাপক, তিনি কীভাবে তুরস্কের আলো-হাওয়া-রোদের গভীরতায়ও সম্পৃক্ত, তা লক্ষ করে আমরা বিস্মিত হই।

প্রতিদিনকার পরিচিত জীবনকে যদি কোনও উপায়ে স্তব্ধ করে পেরিয়ে যাওয়া যায় এবং সেই অপর মাত্রার দিকে ফিরে তাকানো যায়, পরিচিত মানুষ-মানুষী, সম্বন্ধগুলি, ঘটনা-প্রবাহ, নৈসর্গিক অনুপুঙ্খ, ভুলে-যাওয়া কিছু তুচ্ছ মুহূর্ত, স্বপ্ন-কল্পনা-চাওয়া-পাওয়া : সব কিছু নতুন হয়ে উঠতে পারে। পরিচিত বস্তুপুঞ্জের এই অপরিচিতীকরণ যেন পামুকের মুখ্য শিল্প-কৌশল। জীবন একই সঙ্গে অন্তহীন এবং অসংখ্য খণ্ডের সমাবেশ যাদের সহাবস্থানে ও মিথষ্ক্রিয়ায় জীবনের তাৎপর্য গড়ে ওঠে। এই সত্য চোখের সামনে থাকে বলেই হয়তো অভিনিবেশের বাইরে চলে যায়। পামুকের মতো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনভূতি সম্পন্ন লেখক বাস্তবকে তাই কল্পনা দিয়ে পুনর্নির্মাণ করেন এবং সত্তার কেন্দ্রে সময় ও পরিসরের অন্যোন্য-গ্রন্থনাকে নিয়ে আসেন। যেহেতু অন্তহীন এই প্রক্রিয়ায় আরম্ভ আছে কিন্তু সমাপ্তি নেই, পামুকের শিল্পিত অভিযাত্রাও চলেছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। এই অনন্য কৃতিত্বের পরেও পামুক আপন শিল্প-সাফল্য সম্পর্কে অত্যন্ত বিনীতভাবে বলেন : 'Literature does not allow such a writer to pretend to save the world ; rather it gives him a chance to save the day. And all days are difficult. Days are specially difficult when you donot do any writing. When you cannot do any writing. The point is to find enough hope to get through the day and if the book or the page you are reading is good to find joy in it and happiness if only for a day.' (২০০৭ : ৪)

তিন

সাহিত্যের সত্য অবস্থান-নিরপেক্ষ নয় কখনও। এই যে অবস্থান, তা যতখানি পাঠকের ততখানি লেখকেরও। তবে আখ্যানের সূত্রধার ও আখ্যানের গ্রহীতার পক্ষে তার স্বরূপ আলাদা। তুরস্কের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস তার জনমানসের বৈশিষ্ট্যকে ঐতিহাসিকভাবেই নিয়ন্ত্রণ করে নিশ্চয়, কিন্তু এই প্রক্রিয়ার মধ্যে নিহিত

থাকে বহুধরনের প্রচ্ছন্ন কৌনিকতা। সব মিলিয়েই গড়ে ওঠে পরিগ্রহণের বিধি-বিন্যাস যা পামুক ও তাঁর তুর্কি ভাষাভাষী পাঠকের পক্ষে অনিবার্য সত্য। যে-সমস্ত দ্যোতনা অনুভবগম্য, নিশ্চিতভাবেই তার অধিকাংশ, বিশেষভাবে ভাষার অন্তর্বর্তী অথচ ভাষার সঞ্চালক নৈঃশব্দ্যের ছায়াঞ্চল, অনুবাদ বহন করতে অক্ষম। ফলে আমাদের মতো বাঙালি পাঠকেরা যখন ইংরেজির মাধ্যমে পামুকের লেখার মুখোমুখি হচ্ছেন, প্রাথমিকভাবে ঐ নীরবতার অপ্রাপ্তি মেনে নিতেই হয়। অবশ্য পামুকের আপন ভাষার পাঠকেরাও যে তাঁর ঈপ্সিত সংযোগের দ্যোতনা পুরোপুরি লাভ করেন, এমন না হওয়াই সম্ভব। তবু আন্তর্জাতিক লেখক হিসেবে সম্মানিত ওরহান পামুকের আখ্যান-বিশ্বে আমরা কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্বৃত্ত বাচনের সংকেতই পাই। যেমন প্রাচ্য অস্তিত্ব ও প্রতীচ্য অস্তিত্বের মধ্যে তুরস্কের বৌদ্ধিক বর্গের দোলাচলকে বাঙালিরা নিজস্ব বৌদ্ধিক ইতিহাসের নিরিখে সামান্য হলেও বুঝতে পারেন। তবে মাত্রাগত ভিন্নতার কথা অস্বীকার করা যায় না যার কারণ পামুক স্বয়ং তাঁর সাক্ষাৎকারে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। বিষয়টি এমন যে তা আরও গভীর ও বিস্তৃত আলোচনা দাবি করে, কিন্তু তার অবকাশ এখানে নেই। কথাপ্রসঙ্গে তিনি সহস্র-এক আরব্য রজনীর কথা-পরম্পরা এবং পারস্য-ভারত সহ অন্য প্রাচ্য দেশের আখ্যান-পরম্পরার উল্লেখ করেছেন। সময়োপযোগী পুনর্নির্মাণের মধ্য দিয়ে কথাবস্তু ও লিখনশৈলীর আমূল রূপান্তর ঘটে যাওয়াতে 'নভেল' এর মতো মূলত প্রতীচ্যাগত সাংস্কৃতিক প্রকাশ-মাধ্যমও অজ্ঞাতপূর্ব সম্প্রসারণ অর্জন করেছে।

প্রতিটি জাতিই একান্ত নিজস্ব—গোপন ও প্রকাশ্য—চাহিদা অনুযায়ী ঐ প্রতীচ্যাগত প্রকরণকে গ্রহণ করেছে। ভারতীয় উপমহাদেশের বাঙালিরা ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের সাংস্কৃতিক রাজনীতির যুক্তিশৃঙ্খলায় আত্মসমর্পণ করে আধিপত্যবাদকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রাক্-ঔপনিবেশিক প্রকাশ-মাধ্যম, বিশেষভাবে কথকতার পরম্পরাকে, সমূলে উপ্‌ড়ে ফেলে 'পরধনে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি' বানিয়ে-তোলা কাহিনির মাদকে বুঁদ হয়েছে। ঔপনিবেশিক আধুনিকতার মোহে আচ্ছন্ন বাঙালি ঔপন্যাসিকেরা কখনও আপন ঘর-পানে ফিরে তাকাননি। বৈষয়িক স্বার্থ সুরক্ষিত রাখার প্রয়োজনে উপনিবেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য অনুসরণ করতে-করতে মনকে করেছেন পাথর। মাঝে-মাঝে কল্প-অতীতের গৌরবকথায় মগ্ন থেকে বর্তমানের প্রতি দায়কে অস্বীকার করেছেন তথাকথিত দীপায়নের সুফল-প্রাপক বিদ্বৎবর্গ। শাসকের নির্মম পীড়ন সত্ত্বেও উপন্যাসায়িত বাস্তবে উঠে আসেনি কোনও শিল্পিত প্রতিরোধের প্রস্তাবনা। বরং আমাদের বৌদ্ধিক বর্গ আগাগোড়া রয়ে গেলেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী' নামক আখ্যানের 'মিঃ গমীশ'-এর সগোত্র। পশ্চিম থেকে ধার-করা আয়নায় নিজেদের মঞ্চসাজ দেখে-দেখে মুগ্ধ থাকলাম আমরা। প্রশ্ন এই, সাম্প্রতিক তুরস্কের পশ্চিমীভূত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে প্রাচ্য-সুলভ সংবেদনা ও প্রতীচ্যোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গির দোলাচল লক্ষ করেন পামুক—তার যৌক্তিকতা কতটা? নানা স্তর-বিন্যস্ত তাঁর আপন চেতনায় ঐ দোলাচল কিংবা দ্বিধা-সংশয় প্রাসঙ্গিক কি আদৌ! ইতিহাস জানায়, তুরস্ক কখনও

পশ্চিমি শক্তি দ্বারা অধিকৃত হয়নি। ভারত কিংবা চিন কিংবা পারস্য যেভাবে বিদেশি প্রভুদের লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে এবং তার ফলে জাতীয় স্বভাবে রয়ে গেছে তার দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতচিহ্ন—তুরস্কে তো তা ঘটেনি। তবু উপনিবেশবাদের নানা স্তরে এবং সাম্প্রতিক বিশ্বায়নের পর্যায়ে সমস্ত জাতীয় অভিজ্ঞান মুছে দিয়ে যে 'অজগর সাপের ঐক্যনীতি' প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ক্রমশ—ঐসব দেশের বস্তুজীবনে-সাংস্কৃতিক চর্যায়-সাহিত্যকৃতিতে তা কত বিচিত্র ধরনের কূটাভাস তৈরি করেছে, এই জরুরি বিচার কীভাবে হবে? ঐ কূটাভাসের আরেক নাম যদি হয় আত্মিক বিপর্যয়, অন্য নাম কি পশ্চিমায়িত হওয়া নয়!

তুরস্কের পামুক এবং পামুকের তুরস্ককে বুঝতে চাই যদি, আমাদের ভাবতেই হবে, প্রতীচ্যের চোখই কেন হবে তুরস্কের সমকালীন বুদ্ধিজীবীদের 'আপন' চোখ! ইস্তানবুলের নগরায়ন প্রাক্-বিশ্বায়ন পর্ব থেকেই যখন পশ্চিমি আদব-কায়দার সম্পূর্ণ তাদাত্মীকরণের পথে হেঁটেছিল, ইসলামি মৌলবাদের বাড়বাড়ন্ত তখনই কীভাবে ঘটে? পামুকের 'Snow' উপন্যাস নিয়ে নানা আলোচনা হয়েছে, আরও হবে। এই প্রেক্ষিতের বহুমুখী তাৎপর্য—আখ্যানের সংগঠনে এবং নিষ্কর্ষে এবং বিচ্ছুরিত বার্তায়—অবশ্যই বিবেচনা করা প্রয়োজন। এডোয়ার্ড সাঈদের 'Orientalism' বইটি ভালো লাগে তাঁর, সংক্ষিপ্ততম এই বাক্যটি কিন্তু বহু প্রশ্ন উশ্‌কে দেয়। পামুক আরও বলেছেন, তুরস্কের প্রতিনিধিত্বকারী নাগরিকরা— 'Everyone is sometimes a Westerner and sometimes an Easterner—in fact a constant combination of the two'। হয়তো আমরা বাঙালিরাও তা-ই; তবু তলিয়ে ভাবলে বুঝি, মাত্রাগত অনেক তফাত রয়েছে। কেননা আমরা আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে উপনিবেশীভূত; বিশ্বায়নের সাম্প্রতিক পর্যায়ে নয়া উপনিবেশবাদের জালে স্বেচ্ছাবন্দী। আমাদের ভুলে-থাকা শেকড়ের গুঞ্জন কি শুনতে পাই সবাই! নিরবচ্ছিন্ন দ্বিধার, দ্বিধাবিভক্ত সত্তার আর্তি কতজনের কাছে পৌঁছায়? ওটোমান সাম্রাজ্যের স্মৃতিবহ ইস্তানবুল নগরে ছড়িয়ে আছে অতীতের অজস্র দীর্ঘশ্বাস আর লুপ্ত স্বর্গের চূর্ণ ছবি আর সেইসবকে ক্রমাগত ঝাপসা করে দিয়ে এগিয়ে চলেছে আধুনিক নগরের মনোলোভা আয়োজন। নাগরিক মনের দ্বিধা-বিভাজিত হওয়ার প্রত্যক্ষ কারণ সম্ভবত এটাই। বাঙালিরও আছে স্মৃতিভারাতুর রূপসী বাংলা। এই পৃথিবী একবার পায় যারে পায় নাকো আর। কেননা নির্মম ইতিহাসের অভিঘাতে আমাদের পুনর্বিরহ আছে কেবল, কোথাও পুনর্মিলনের সম্ভাবনাও নেই। বরং প্রতি মুহূর্তেই আমরা স্মৃতির ঐশ্বর্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। বাঙালি পাঠকের পক্ষে তুরস্কের বর্তমানে ভবিষ্যৎ অতীতের ধূসর ছায়া প্রকট হওয়া লক্ষ করা কঠিন। উপনিবেশীভূত বাংলায় অতীতের রোমান্সময় পুনর্বিন্যাস যে-অনুষঙ্গ নিয়ে আসে, কখনও ঔপনিবেশিক শক্তির অধীনে না-যাওয়া তুরস্ক কি ঐ একই রোমান্সীকরণ প্রক্রিয়ায় সাড়া দিতে পারে?

ওটোমান সাম্রাজ্য হারিয়ে যাওয়ার বেদনা পশ্চিমীভূত তুরস্কের নাগরিকের কাছে কতটা প্রাসঙ্গিক, এ-বিষয়ে সংশয় যায় না কিছুতেই। তবু এও বুঝতে পারি যে সমৃদ্ধ

সাংস্কৃতিক অতীতের উপস্থিতি অনুভব করা সম্ভবত তুরস্কের সংবেদনশীল স্রষ্টার পক্ষে অনিবার্যই। একটু আগে যে অবস্থানগত কূটাভাসের কথা লিখেছি, এতে তার দংশন সম্ভবত অনেকখানি সহনীয় হয়ে ওঠে। ইসলামি মৌলবাদ সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক চিহ্নায়কও তখন কোনও অস্বস্তিকর জিজ্ঞাসার জন্ম দেয় না। দুটি ভিন্ন ধরনে 'My Name is Red' ও 'Snow'-এর মতো উপন্যাস আরেকটি বিকল্প নন্দনের বার্তা বয়ে আনে। যদিও প্রাচ্যের নন্দন-ভাবনার সঙ্গে বহু শতাব্দীর বিচ্ছেদ অনস্বীকার্য, পামুক কিন্তু তাকে অবান্তর বলে ভাবেননি। বরং জোর দিয়ে বলেছেন : 'It should be explored, developed, shared, criticized and then accepted'। এখানে যে পুনরাবিষ্কার ও পুনর্বিকাশের মধ্য দিয়ে শরিক হয়ে ওঠার কথা বলা হল, এতেই নিহিত রয়েছে পুনঃপরীক্ষা ও পুনর্গ্রহণের সংকেত। পামুকের আখ্যান-বিশ্বকে এই নিরিখেই ভালভাবে লক্ষ করতে হবে। চিরাগত মহাকাব্যিক প্রকরণ থেকে সরে গিয়ে স্বাধীনভাবে যে-উপন্যাস যাত্রা শুরু করেছিল, তা মূলত শিল্পায়নোত্তর আধুনিক ইউরোপের ফসল। পরম্পরাগত কথকতায় কাহিনির উপস্থাপক সমাজের মধ্যেই তৈরি হত, উপস্থাপনা জুড়ে প্রকট হত তার সামাজিক স্বভাব অর্থাৎ উচ্চারণের সামাজিকতা। দাতা ও গ্রহীতাকে তখন বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যেত না। কিন্তু আধুনিক কালের ঔপন্যাসিকের উদ্যম শুরু হয় সমাজ-বিচ্ছিন্ন অবস্থান থেকে। হয়তো পামুকের মতো কোনও কথাকার বহমান সময়ে প্রতিস্রোতপন্থী হয়ে লুপ্ত সংযোগকে পুনর্গঠিত করার জন্যে নতুন নতুন কৃৎকৌশল উদ্ভাবন করেন। এ সম্পর্কে পামুকের বক্তব্য এরকম : 'The Novelist is a person who does not belong to a community, who does not share the basic instinct of community and who is thinking and judging with a different culture than the one he is experiencing. Once his consciousness is different from that of the community he belongs to, he is an outsider, a loner. And the richness of his text comes from that outsider's voyeuristic vision.' প্রাক্-আধুনিক কথকের প্রতিতুলনায় সাম্প্রতিক কথাকার এই নিরিখে দ্বিমেরু-বিষম হয়ে যান। প্রথমোক্ত জনকে সমাজ প্রয়োজন মতো তৈরি করে ও পাল্টে নেয় ; অন্যদিকে শেষোক্ত জন আপন সত্তার অতলান্ত নিঃসঙ্গতা থেকে কল্পিত সমাজের অবভাস তৈরি করেন এবং আপন চাহিদা অনুযায়ী বদলেও নেন।

চার

'The New Life' যেমন এর একটি দৃষ্টান্ত, অন্য আরেকটি দৃষ্টান্ত তেমনি 'The Black Book'। আমাদের কাছে বহুপরিচিত একটি রূপক ব্যবহার করে লিখতে পারি, পামুকের লেখক-সত্তা যেন ঊর্ণনাভ যার সমস্ত তন্তুর উদ্ভব ও বিকাশে অন্য কারো ভূমিকা নেই কোনও। জগতের মধ্যে এ যেন আরেক জগৎ যা যুগপৎ সত্য ও সেই সত্যের প্রতীতি। এই জগৎ ভালোও নয় মন্দও নয় ; এই জগতের বাসিন্দারা দানবও

নয় দেবদূতও নয়—নিজেদের অজস্র অপূর্ণতা ও স্ববিরোধিতা, উদারতা ও সংকীর্ণতা, ধৈর্যশীল নির্মাণ ও নিরর্থক আত্মবিলোপ নিয়ে এরা প্রত্যেকেই শুধুমাত্র মানুষ মানুষী। এদের আমরা পছন্দ করতে পারি কিংবা অপছন্দও করতে পারি, কিন্তু তাদের তৈরি-করা জগৎ সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারি না। ওরহান পামুকের আখ্যান-বিশ্ব সম্পর্কে এই কথাগুলি খুব বেশি প্রযোজ্য। প্রাগুক্ত 'The Implied Author' প্রবন্ধে লেখাকে নিজের আশ্রয় ও পীড়া-উপশম বলে বর্ণনা করেছেন তিনি। লিখেছেন তাঁর অজস্র দিবাস্বপ্ন ও সেইসব স্বপ্নের ধৈর্যশীল ও পরিশ্রমী উপস্থাপনার কথা। লেখকের অনেক আকাঙ্ক্ষাই হয়তো অর্থহীন, অস্পষ্ট ও রহস্যাবৃত; তবু এদের উপস্থাপনাতেই তাঁর আনন্দ। আপাতদৃষ্টিতে এই মন্তব্য নিতান্ত সাধারণ ; কিন্তু তাঁর পরস্পর-ভিন্ন রচনাগুলির প্রতি মনোযাগী হলে বুঝতে পারি, শেষ পর্যন্ত তাঁর কোনও স্বপ্ন বা আকাঙ্ক্ষা নিজেকে ঘিরে পলে পলে ঘুরে মরে না। এইসবই আসলে তাঁর অস্তিত্ব-সম্প্রসারণের শিল্পিত কৃৎকৌশল।

তাঁর কয়েকটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য ভালোভাবে লক্ষ করা প্রয়োজন: 'A Novel is inspired by ideas, passions, furies and desires....we may not understand where they come from or what, if anything, our daydreams may signify; but when we sit down to write it is our daydreams that breathe life into us, as wind from an unknown place stirs an aeolian harp. One might even say that we surrender to this mysterious wind like a captain who has no idea where he is bound.'। এই নিরিখে তো শেষ পর্যন্ত কথাকারও হয়ে ওঠেন উৎক্রান্তিশীল প্রজ্ঞার অধিকারী কবির-ই সগোত্র যাঁর দিব্য প্রেরণা তাঁকে কখনও কখনও লিখন-প্রকল্পের বাইরে নিয়ে যায়। বিখ্যাত ইংরেজ রোমান্টিক কবি কোলরিজের 'কুবলা খান' নামক প্রেরণাদীপ্ত কবিতার সঙ্গে এভাবে যেন আত্মীয়তা গড়ে ওঠে পামুকের 'The New Life', 'My Name is Red' ও 'Snow' এর মতো উপন্যাসের। লেখার শরীর ও আত্মা জুড়ে কত রহস্য রয়েছে, সেদিকে তিনি তর্জনি সংকেত করেছেন যেন। জীবনের পরতে পরতে লুকিয়ে থাকে আরো কত জীবনের হয়ে ওঠা : আশ্চর্য এই নান্দনিক ও সামাজিক সত্য ব্যক্ত হয়েছে বারবার। উপন্যাস নামক শিল্প-মাধ্যমটি প্রকৃত অর্থেই আন্তর্জাতিক। অথচ কোনও-না-কোনওভাবে ঔপন্যাসিক তাঁর নিজস্ব দেশ ও সংস্কৃতির আলো-হাওয়া-রোদ তাতে সম্পৃক্ত করেন। এতে বাচনের এই বিশিষ্ট শিল্প হয়ে ওঠে নতুন দিগন্তের উন্মোচক। আবার নানা দেশে নানা কালে পাঠকের বিচিত্র পরিগ্রহণে ঔপন্যাসিকতার প্রতীতিও ক্রমাগত বদলে যেতে থাকে। এই বিচিত্র দ্বিবাচনিকতার অন্ত নেই বলেই ওরহান পামুকের আখ্যান-বিশ্বে আমাদের পরিক্রমার পথও আলাদা। কালজয়ী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে যারা প্রকৃত অর্থেই বিশ্বনাগরিক—যেমন টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কি, বালজাক, টমাস মান, হেমিংওয়ে, কাফকা, কাম্যু, কুন্দেরা, মার্কেজ, সারামাগো, লোসা এবং রবীন্দ্রনাথ—এঁদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই দেশকাল-সংস্কৃতি দ্বারা চিহ্নায়িত জীবনকথা ও আন্তর্জাতিক মানবস্বভাবের

আশ্চর্য দ্বিবাচনিকতা আমাদের বিস্ময় জাগায়। ওরহান পামুক যখন তাঁর লেখক-জীবনের সূচনাপর্বে টলস্টয় ও মান এর প্রভাব আত্তীকরণের কথা বলেন, তাঁকে প্রচলিত অর্থে না নিয়ে বরং ভেবে নিতে পারি বহুদূরগামী নাবিকের স্থির দিকনির্ণায়ক চেতনার সংকেত হিসেবে। কেননা নিজস্ব কক্ষপথ খুঁজে পাওয়ার পরে যাত্রীর জন্যে থাকে শুধু পাখা, থাকে মহানভ অঙ্গন। পামুকের মতো লেখকের সৃজনী চেতনায় শুধুমাত্র তাঁর আপন সত্তার স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা-আবেগ-যন্ত্রণা সম্বলিত ভাবনাপ্রতিভা সক্রিয় থাকে না, তিনি একই সঙ্গে তাঁর জাতীয় স্মৃতিসত্তা ও আন্তর্জাতিক মানব প্রজাতির নিরন্তর উৎক্রান্তিরও প্রতিনিধিত্ব করেন। পামুকের আখ্যান-বিশ্বের নির্মাণ যেন নিরবচ্ছিন্ন যাত্রার সংকেত বয়ে আনে। সেখানে অভিযাত্রী বন্দর থেকে বন্দরে পৌঁছে যেতে যেতে অনবরত যাত্রাপথ ও গন্তব্যের ধারণাকে পাল্টে নিতে থাকেন। ফলে আখ্যান কখনওই রৈখিক কাহিনির প্রতি আনুগত্য দেখাতে পারে না। তেমনি সমবায়ী সমগ্রতার পুরোপুরি নতুন ধারণা দ্যোতিত হয়। তাঁর উপন্যাস হয়ে ওঠে বহু উৎস-জাত আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণার প্রকাশভূমি। ব্যক্তিসত্তা ও সমষ্টিসত্তার মিথস্ক্রিয়ায় জেগে-ওঠা নিস্তব্ধতা ও কুহেলি, প্রখর উত্তাপ ও শীতল অন্ধকার নানা কুশীলব ও ঘটনার প্রতীকে আবির্ভূত হতে থাকে। কীভাবে এই আশ্চর্য উদ্ভাসন পামুক সম্ভব করে তোলেন, তা কেবলমাত্র প্রতিটি রচনার নিবিড় পাঠ থেকেই বুঝে নেওয়া সম্ভব। সেই উদ্যমের নান্দীপাঠ করা যেতে পারে পামুকেরই উচ্চারণ দিয়ে : ‘For what is a novel but a story that fills its sails with these winds, that answers and builds upon inspirations that blow in from unknown quarters, and seizes upon all the daydreams we have invented for our diversion, bringing them together into a meaningful whole. Above all else, a novel is a vessel that carries inside it a dreamworld we wish to keep, forever alive and forever ready.’

পাঁচ

উপন্যাস লেখার প্রেরণা ও অন্বিষ্টের বহুমুখিনতা সম্পর্কে পামুক নিজের ধারণা নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। তাঁর রচনার নিবিড় পাঠের মধ্য দিয়েই এইসব মন্তব্যের তাৎপর্য বুঝে নেওয়া সম্ভব। সেইসঙ্গে তাঁর পাঠকৃতির বিচিত্র উচ্চারণ-সমাবেশ থেকে সূত্র নিয়ে নিজেদের প্রতীতি অনুযায়ী সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি। ‘The White Castle’ থেকে ‘The Museum of Innocence’ পর্যন্ত ব্যাপ্ত আমাদের পাঠ-অভিজ্ঞতা থেকে লক্ষ করতে পারি যে পামুকের কোনো আখ্যানই নিছক ঘটনা ও বিবরণের উপস্থাপনা নয়, কিংবা নয় উপস্থাপিত কুশীলবদের সাফল্য ও ব্যর্থতার প্রতিবেদন। কেননা সচেতনভাবেই পামুক ব্যক্তিসত্তা ও সমষ্টিসত্তার অজস্র দ্বিবাচনিকতাকে আখ্যানের আধেয় করে তোলেন। তাতে বাস্তবই প্রকল্পনা হয়ে ওঠে কখনও আবার প্রকল্পনা থেকে বাস্তবে প্রত্যাবর্তন করে এদের মধ্যবর্তী সীমান্তকে তিনি মুছে দেন। তিনি লেখেন

পলে-অনুপলে সুপ্ত ইতিহাসের জেগে ওঠা, লেখেন স্বপ্ননির্মাণ ও সেই নির্মিতিকে ভেঙে ফেলা, লেখেন আকাঙ্ক্ষার দিকে যাত্রা ও সেই যাত্রা থেকে সরে আসার উপন্যাসায়িত কথকতা। পামুক এইসব প্রকরণের মধ্য দিয়ে আসলে আখ্যানে নিরন্তর প্রশ্নমালা নির্মাণ করেন এবং সম্ভাব্য মীমাংসার খোঁজেই বাস্তবের মাত্রাকে পেরিয়ে যান বারবার। তাঁর এমন উপন্যাস কমই আছে যা কাহিনিকে অনেক নির্মোকের সমাহার হিসেবে ব্যবহার করে না। পামুক তাঁর পরিকল্পিত কথকসত্তাকে অনেকখানি স্বাধীনতা দিলেও শেষপর্যন্ত অলক্ষ্যে আপন নিয়ন্ত্রণ অটুট রাখেন। তাঁর প্রিয় অন্বিষ্ট স্বপ্নজগৎ বাস্তবের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে খুব সহজেই বাস্তব ও স্বপ্নের মধ্য দিয়ে বিনিময়ের পথগুলি গড়ে ওঠে।

'The New life' (১৯৯৪ : ৯৭) কি কোনো দার্শনিকের প্রতিবেদন অথবা রহস্য-উপন্যাস! নাকি এধরনের সংশয় বা দোদুল্যমানতা অবান্তর! সাহিত্য ও সাহিত্য সমালোচনার দীর্ঘকাল ব্যাপ্ত পাঠাভ্যাস আমাদের মনে আবছাভাবে হলেও ওইসব পরিচিত ছকের স্মৃতি ফিরিয়ে আনে। এমন তো হতেই পারে যে পামুক এইসব ছক ভাঙতে চেয়েছেন প্রবল অন্তর্গূঢ় পরিহাসে। ইচ্ছে করেই নিজস্ব কৌতুকে এইসব ছকের আবছা ধারণা দিয়ে পরক্ষণেই তা মুছে ফেলেছেন! পূর্ববর্তী প্রতিবেদন সহ চিরাগত সাহিত্যিক নির্মাণের আদল মুছতে মুছতেই আপন আখ্যানকে যেন চিরকালীন উত্তরলেখ হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এই বয়ান কেবলই আমাদের সম্ভাব্য পূর্বলেখ সন্ধানে প্ররোচিত করে। এর আকস্মিক সূচনা থেকে আপাত-সমাপ্তির দ্যোতনাগর্ভ উপসংহার পর্যন্ত সমস্তই বিশিষ্ট আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভাবনার আখ্যান। এর তন্তুগুলি গড়ে উঠেছে স্বপ্ন ও স্বপ্নের বিনির্মাণ, ব্যর্থতা ও সার্থকতায় দোলায়িত সত্তার সম্প্রসারণ ও প্রত্যাবর্তনের অন্তহীন দ্বিবাচনিকতা দিয়ে। ঔপন্যাসিক নিজেই 'The New life' এর পাঠকৃতিতে সূত্রধার হিসেবে উপস্থিত। প্রকৃতপক্ষে বহমান সময়ের অন্তহীন দহন-স্ববিরোধিতা-রিক্ততা-সম্ভাবনার বিচিত্র আততিতে যে-ব্যক্তিসত্তা গড়ে উঠেছে, পামুকের মতো সংবেদনশীল ঔপন্যাসিকই জানেন শুধু, কীভাবে তার মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অফুরন্ত অনুষঙ্গগুলি সক্রিয় থাকে। আখ্যানকার সৃষ্টির নিজস্ব ব্যাকরণের মধ্যে সমষ্টিসত্তা ও ব্যক্তিসত্তার গভীর আততিকে কত ধরনে যে ব্যক্ত করেন, তার ইয়ত্তা নেই। জীবনের প্রতি গভীর অভিনিবেশ থেকে লেখক অর্জন করেন নিরন্তর জিজ্ঞাসার প্রেরণা। সেইসব জিজ্ঞাসায় সম্পৃক্ত থাকে কল্পনার নতুন নতুন চারণভূমি নির্মাণের উৎসাহ। দৈনন্দিন জীবন থেকে সঞ্চিত বিষাদ ও আকাঙ্ক্ষা, স্মৃতি ও স্বপ্ন, চিন্তাপ্রণালী ও নিবিড় অনুসন্ধান যখন আখ্যানের নিজস্ব প্রকরণে রূপান্তরিত হয়, ঐ রূপান্তরের ধরনে জীবন ও জগতের তাৎপর্য সম্পর্কে লেখকের ধারণাও মুদ্রিত হয়ে যায়। পামুক এমন একজন লেখক যিনি তাঁর পাঠকৃতিকে নিরন্তর উদ্ভাসিত করে তোলেন চিন্তাপ্রণালীর অভিনবত্ব দিয়ে। পাঠক এই উদ্ভাসনের মধ্যে অনুভব করেন নিজস্ব নিঃসঙ্গতা ও কল্পনার আবেশ আর জীবনের সঙ্গে সমান্তরাল অন্য আরেক জীবনের আভাস।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে আরও একবার, পামুক সাহিত্যের সৃজনাত্মক শব্দকে জল বা পিঁপড়ের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। আর 'On Reading : Words or Images' নিবন্ধে লিখেছিলেন : 'Nothing can penetrate into cracks, holes and invisible gaps of life as fast or as thoroughy as words can. It is in these cracks that the essence of things—the things that make us curious about life, about the world can first be ascertained, and it is good literature that first reveals them. Good literature is a piece of wise counsel that has yet to be given, and as such it has the same aura of needfulness as the latest news.' (Other Colours : 2007 : 111)। অসামান্য এই মন্তব্য কেননা আমাদের চিরাভ্যস্ত ছকে-বাঁধা জীবনের মধ্যে ভব্যসভ্য প্রচ্ছদের আড়ালে লুকিয়ে-থাকা ক্ষত, ফাটল, ফাঁকফোকর সাধারণ চোখে ধরা পড়ে না। সৃজনশীল সাহিত্যের চক্ষুষ্মান শব্দ অবলীলায় ওইসব অদৃশ্য ফাঁকগুলিকে উদ্ভাসিত করে তোলে। আর তখনই সংবেদনশীল জনের কাছে সেই উদ্ভাসনের সূত্রে বস্তু-অস্তিত্ব ও বস্তু-সম্বন্ধে নিহিত সত্য পুরোপুরি নতুনভাবে উন্মোচিত হয়ে পড়ে। পামুকের মতো আখ্যানকার তাই কাহিনির কাঠামো ও উপকরণকে প্রয়োজনীয় অবলম্বনের চেয়ে বেশি কিছু মনে করেন না। তাঁর অন্বিষ্ট হল অফুরান জীবন যার খোঁজে তিনি বারবার বর্তমান থেকে অতীতে আর অতীত থেকে বর্তমানে পর্যটন করেন। তাঁর প্রতিটি পাঠকৃতি যেন নিয়ত উৎসুক পর্যটকের আত্ম-আবিষ্কারমূলক ভ্রমণলিপি। ঐতিহ্যের অনুষঙ্গও তাঁর সৃজনী চেতনায় সাম্প্রতিকের স্বভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। যেন আবহমান মহাকালের প্রেক্ষিতে প্রতিটি আখ্যানই সংস্থাপিত আর বহুস্বর সন্নিবেশে ঋদ্ধ প্রতিটি পাঠকৃতি আশ্চর্যজনক ভাবে হয়ে ওঠে আনকোরা বর্তমানের প্রতিবেদন।

ছয়

পামুকের প্রথম দু'টি বই ইংরেজি অনুবাদে পড়িনি। 'The White Castle' বা শ্বেতদুর্গ পড়ার আগে 'The Silent House' বা নিঃশব্দ ঘর সম্পর্কে সামান্য যা-কিছু মন্তব্য চোখে পড়েছে, তাতে কৌতূহলই বেড়েছে শুধু। সেইসঙ্গে একটি মূল বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে তুরস্কের উত্থান-পতনময় বর্ণময় ইতিহাস এবং মধ্যপ্রাচ্যের আবহমান সংস্কৃতির পশ্চাদ্‌পট সম্পর্কে অবহিত না হলে ওরহান পামুকের সাহিত্য-যাত্রার তাৎপর্য অনেকটা অধরা থেকে যাবে। কিন্তু এত বিশাল ব্যাপ্তি ও বহুকৌনিকতা সম্পন্ন তুর্কি ইতিহাস ও সংস্কৃতির নিবিড় পাঠও খুব দুরূহ। ওটোমান সাম্রাজ্যের উদয় ও অস্ত, পর্বে পর্বে সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ ও জীবন-ভাবনার রূপান্তর : এই সমস্ত কিছুই যিনি চিন্তাপ্রণালী ও সৃজনী চেতনায় আত্তীকৃত করে নিয়েছেন, তাঁর পক্ষেই লেখা সম্ভব 'My name is Red' এর পাশাপাশি 'Snow', 'The Black Book' এর পাশাপাশি 'The Museum of Innocence'। উপন্যাসের মধ্য দিয়ে জীবন অনুসন্ধানের বিপুল যাত্রায়

তাই কোনও রৈখিকতা নেই। এ কেবল আখ্যান-ভাবুক স্রষ্টার বৈশিষ্ট্যমাত্র নয়, সূক্ষ্ম ভাবে যেন বহমান জীবনের ঐশ্বর্য ও সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব সংবেদনশীল ভাষ্য।

সেইজন্যে পামুকের উপন্যাসে সমাপ্তি-বিন্দু সম্পর্কে কোনও অতৃপ্তি না থাকা সত্ত্বেও পাঠকেরা সেই বিন্দু থেকেই হয়তো একান্ত নিজস্ব জগতের দিকে যাত্রার সূচনা করেন। সেই যাত্রায় উপন্যাসের কুশীলবেরা কখনও সহযাত্রী হয় আর কখনও বা জীবনের কোনও পর্যায়ের প্রতি ইশারা করেই তাদের ভূমিকা ফুরিয়ে যায়। পাঠক উপন্যাসের আপাত-সময় ও প্রকৃত সময়ের মধ্যে পর্যটন করতে করতে নিজেরই অজ্ঞাতসারে সময় ও পরিসরের ভিন্ন ভিন্ন স্তর ও মাত্রা আবিষ্কারের সামর্থ্য অর্জন করেন। তুরস্কের ইতিহাসের যে-বহুমাত্রিকতা পামুকের অন্তর্ভুবনের প্রকৃত নির্মাতা, সেদিকে তাকিয়ে পাঠক নিশ্চয়ই নিছক তথ্য-সন্নিবেশে বা বহিরঙ্গ উপকরণে রুদ্ধ হবেন না। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের আকরণ নয়, গভীর নির্যাসই পাঠকের অন্বিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। তুর্কি মনোজগতে অবধারিতভাবে যে প্রাচ্য-প্রতীচ্য বিভাজন এবং সেই বিভাজন জনিত অনন্বয় ও সংকট রয়েছে, সে-সম্পর্কে পামুক স্বয়ং বিভিন্ন সময় নানা ধরনের মন্তব্য করেছেন। হয়তো আমাদের মতো বৈদেশিক পাঠকের কাছে তুর্কি জাতীয়তা ও ইসলামি মৌলবাদী ভাবনার সংঘাত আলাদা ধরনের বার্তা বয়ে আনে। কিন্তু তুরস্কের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে মৌলবাদী ব্যবহারবিধিও কখনও কখনও প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের দ্যোতক হয়ে উঠতে পারে। যেমন ঘটেছে 'Snow' উপন্যাসে। যে-কথাটা এখানে লিখতে চাইছি, তা হল, সংবেদনশীল লেখক যখন তাঁর আখ্যানবিশ্ব নির্মাণ করেন, সমসাময়িক সমাজের বৈশিষ্ট্য বা উপকরণকে তিনি উপেক্ষা করেন না এবং সেইসঙ্গে আপাতভাবে ব্যবহৃত অনুষঙ্গগুলির ইতিবাচক বা নেতিবাচক দ্যোতনা সম্পর্কে নিজস্ব বক্তব্য স্থগিত রাখেন। তাৎপর্যের এই স্থগিতীকরণ কীভাবে মহান সাহিত্যকৃতির গোত্র-লক্ষণ, তা জাক দেরিদার ভাবনাসূত্রে আমরা জেনেছি। ব্যবহৃত উপাদান বা অনুপুঙ্খ সম্পর্কে লেখকের প্রকৃত অবস্থান কী, এ সম্পর্কে আমাদের যতই কৌতূহল থাকুক, এই কথা অনস্বীকার্য যে, কালে কালান্তরে স্থগিতীকৃত তাৎপর্য প্রকৃত পাঠকের দ্বারা পুনর্বিশ্লেষিত ও পুনঃপরীক্ষিত হয়ে থাকে। পৃথিবীর নানা ভাষায় অনূদিত ওরহান পামুকের আখ্যানবিশ্বও তাই আগামী বহুদিন পর্যন্ত নানাভাবে পুনর্গৃহীত হবে।

পামুকের প্রথম উপন্যাস 'Cevdet beyond the Sons'-এর প্রেক্ষাপট হল দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধ যাতে তিনি দীর্ঘায়ত পারিবারিক কাহিনি তৈরি করেছিলেন। এই উপন্যাসটি লিখতে লিখতে তিনি 'The White Castle'-এর আখ্যানবীজ আপন সৃষ্টিশীল মনে বপন করেছিলেন। তুর্কি শাসকদের প্রাসাদ ছেলেবেলা থেকেই তাঁকে আকর্ষণ করত এবং ইতিহাস ও প্রকল্পনার প্রাচীন রচনা তাঁকে প্রবলভাবে আবিষ্ট করত—এই তথ্য আমরা তাঁর আত্মকথন থেকে জেনেছি।

সেইসঙ্গে ওটোমান সমৃদ্ধির যুগে যত বিজ্ঞান-দর্শন-জ্যোতির্বিদ্যা-চিকিৎসাবিদ্যা-

জ্যোতিষ প্রভৃতি অনুশীলিত হত, তাদের সম্পর্কে গভীর আগ্রহ ছিল তাঁর। 'The White Castle' সহ বিভিন্ন উপন্যাসে এই আগ্রহের অভ্রান্ত প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে। ঐতিহ্যের নির্যাস আহরণের এই গভীর তাগিদ কিন্তু পামুককে একমাত্রিক হতে দেয়নি; কেননা তাঁর সৃজনী চেতনা কখনও সাম্প্রতিক সংবেদনাকে উপেক্ষা করেনি। বরং ইতিহাসের প্রতি এই নিবিড় আকর্ষণ তাঁর আখ্যানবিশ্বের প্রেক্ষিতকে বহুদূর অবধি সম্প্রসারিত করে দিয়েছে। প্রণালীবদ্ধ অনুশীলন ছাড়া এধরনের উপন্যাস যে লেখা সম্ভব নয়, তা 'My Name is Red' বা 'The Museum of Innocence' এ নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হচ্ছে।

প্রতিটি উপন্যাসেই সচেতনভাবে নতুন হয়ে ওঠার চেষ্টা করেন পামুক। বহুপরিচিত যে শ্রেণিবিভাজন ঔপন্যাসিকদের সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়, সেই অনুযায়ী তাঁকে sentimental বলব না কী naive—এ বিষয়ে দ্বিধা ও সংশয় কাটিয়ে ওঠা সহজ নয়। তাঁর উপন্যাসে প্রথম বাক্যটি কীভাবে রচিত হয়, বিভিন্ন সময় পামুক আমাদের জানিয়েছেন। সুচিন্তিত এইসব সূচনা-মুহূর্ত আসলে অন্তহীন পরম্পরারই অংশ-বিশেষ। এই নিরিখে এদের তাই 'in-median res'-এর দৃষ্টান্ত বলতে ইচ্ছে করে। সেইসঙ্গে অবশ্যই মনে রাখতে হয় মধ্যপ্রাচ্যের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বহুশতাব্দী-ব্যাপ্ত আখ্যান-পরম্পরার ভাণ্ডার যেখানে জন্ম নিয়েছে সহস্র এক আরব্য-রজনীর রূপকথা-কিংবদন্তি-লোককথা আর রোমান্সভরা অন্তহীন কাহিনিগুলি। পামুক যত বড় লেখক ঠিক তত বড় পাঠকও, যার প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর আখ্যানগুলিতে এবং সেইসঙ্গে প্রবন্ধ সংকলনগুলিতে। এতে বুঝতে পারি, তাঁর মনোজগৎ গড়ে উঠেছে বহুদেশকাল ব্যাপ্ত পাঠকৃতির অন্তহীন সৃজনশীল বিনির্মাণে। তাছাড়া তুর্কি লোককথা ও সাহিত্যে তাঁর অনুসন্ধিৎসু পদচারণা তো স্বতঃসিদ্ধ। প্রথম দু'টি উপন্যাস যে লেখকের পরবর্তী বিশ্বব্যাপ্ত খ্যাতি সত্ত্বেও ইংরেজিতে অনূদিত হল না, এর কারণ কি এই যে প্রথম দু'টি উপন্যাস লেখকের নিজস্ব বিচারে আপাত ও গভীর অর্থে মূলত তুর্কি-সংস্কৃতি, পরিবেশ ও স্বভাবের দ্বারা চিহ্নিত? তাহলে 'The White Castle' থেকেই পামুক জাতীয় সাংস্কৃতিক স্বভাবের প্রতি দায়বদ্ধ থেকেও বৃহত্তর বিশ্ব-পরিবেশের পড়ুয়াদের কাছে সচেতনভাবে পৌঁছাতে চেয়েছেন? অথচ মধ্যযুগে ওটোমান তুর্কিদের বিচিত্র-পথগামী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অন্বেষণ, দর্শনের মেধাবী বিচ্ছুরণ, রাজনৈতিক প্রতাপের কৃৎকৌশল এবং এই সমস্ত উপাদানকে আত্তীকৃত করে আখ্যানের নতুন পরিসর সন্ধান : সমস্তই 'The White Castle' এর আধার ও আধেয় গড়ে তুলেছে। বস্তুত এই উপন্যাসেই সূচিত হল উপন্যাসকে সর্বগ্রাহী বিশ্বকোষ হিসেবে পুনর্নির্মাণের পথে ওরহান পামুকের নান্দনিক যাত্রা।

সাত

মাত্র সাত বছর বয়সে পামুক সহস্র-এক আরব্য রজনীর একটি গল্প পড়েছিলেন। সেই নিতান্ত বাল্যকালেই একই গল্প মন্ত্রমুগ্ধের মতো তিনি বারবার পড়েছেন, এই তথ্য

তাঁর বয়ান থেকেই জানতে পারি। এরপর যৌবনে এবং প্রৌঢ়বেলায় যতবার তিনি এই কাহিনিগুলি পড়েছেন, নানাভাবে এদের তাৎপর্য তাঁর কাছে উন্মোচিত হয়েছে। লেখক-জীবনে কত সূক্ষ্মভাবে কাহিনি পরিবেশনের কৌশলে, নির্মোকের পরে নির্মোক আর স্তরের পর স্তরে সন্নিবেশিত কাহিনিগুলির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার পদ্ধতি অর্থাৎ গল্পের ভেতরে গল্প এবং তারও মধ্যে গল্প উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে কল্পনারঞ্জিত বাস্তবের আদল তৈরি করা : এইসব পামুক নিজস্ব শিল্পগত প্রয়োজনে আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন। তাঁর নিবন্ধে তিনি আরব্য রজনীর কাহিনিতে যে 'Secret internal geometry' আর 'timeless games of logic'-এর কথা লিখেছেন, তা নিশ্চিতভাবে তাঁর আখ্যানবিশ্বের মৌলিক বৈশিষ্ট্য, আর, এর সূচনা হয়েছিল 'The White Castle' এর বয়ানে। লেখক পামুক উত্তমপুরুষের বাচনে আধারিত এই উপন্যাসের অদৃশ্য সূত্রধার বা উপস্থাপক সত্তা হিসেবে ফারুক দার্ভিনোগ্লু নামে একটি ছায়া-অস্তিত্ব নির্মাণ করেছেন। পাঠকৃতির মুখবন্ধ লিখে সে জানিয়েছে যে ১৯৮২ সালে এই পাণ্ডুলিপি কোনও-একটি সরকারি কার্যালয় সংশ্লিষ্ট বিস্মৃত মহাফেজখানায় খুঁজে পেয়েছিল। একদিকে বিশেষ একটি বছরের উল্লেখ এবং অন্যদিকে বিস্মৃত মহাফেজখানার ভেতরে ধূলিধূসরিত বাক্সের একেবারে নিচে অন্য আরও অসংখ্য দলিল-দস্তাবেজ-আদালতের কাগজপত্রের মধ্যে এই পাণ্ডুলিপি খঁজে পাওয়াটাই যেন বাস্তবের মধ্যে ইন্দ্রজাল তৈরি করে নেওয়া। উপস্থাপক লিখেছে : 'The dreamlike blue of its delicate, marbled binding, its bright Calligraphy, shining among the faded government documents, immediately caught my eye'। আর, অপ্রতিরোধ্য কৌতূহলে ওই পাণ্ডুলিপি সে চুরি করে নিয়েছে। সব মিলিয়ে এই বিবরণ হয়ে ওঠে বাস্তবের ভেতরে আরেক বাস্তব তৈরির সাহিত্যিক কৃৎকৌশল। সেইসঙ্গে প্রেক্ষাপটে ওটোমান মিনিয়েচার শিল্পকলার গৌরবময় পরম্পরারও আভাস পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞের মন্তব্য থেকে বুঝি যে কোথাও রচয়িতার ব্যক্তিগত উপস্থিতি নয়, সমগ্র পরম্পরার সামূহিক উপস্থিতিই লক্ষণীয় :

'Ottoman Miniature or Turkish miniature was an artform in the Ottoman empire. ....It was a part of the Ottoman Book Arts together with illumination (tezhip), calligraphy (hat), marbelling paper (ebru) and bookbinding (cilt).'

'The White Castle'-এর কল্পিত মুখবন্ধে এই অনুষঙ্গগুলি স্পষ্টত ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এই ব্যবহারকে শুধু বহিরঙ্গে দেখলে চলবে না, দেখতে হবে আরও একটু গভীরে গিয়ে। শিল্পীদের গোষ্ঠীগত পরম্পরা যেখানে প্রধান, সামূহিক স্বর ও প্রেক্ষিতে ব্যক্তি-পরিসর কার্যত মুছে যায়। এই বিশ্ববীক্ষা ও শিল্প-সংবিদ নিঃসন্দেহে অন্যান্য সৃজন-মাধ্যমে সঞ্চারিত ও গৃহীত হয়েছে। অতএব লোকায়ত চেতনা থেকে উৎসারিত আখ্যানেও ব্যক্তিস্বর মূলত অন্তঃস্বর হিসেবে থাকে। সামূহিক স্বর ও পরিসরের উপযোগী বয়ান ও উপস্থাপনার কৃৎকৌশল উপন্যাসের সংগঠনকে সূক্ষ্ম

ভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এই ভূমিকায় লেখকের দ্বারা সৃষ্ট উপস্থাপক যে ওটোমান ইতিহাস-সংস্কৃতি-সমাজ ও রাজনীতির উল্লেখ করেছে, তা প্রকৃতপক্ষে পাঠকৃতিকে বিশ্বাস্য করে তোলার শিল্পকৌশলেরই অন্তর্গত। খুঁজে-পাওয়া এই পাণ্ডুলিপির প্রকৃত লেখকের সন্ধানে উপস্থাপক সত্তার প্রয়াসের বিবরণও এই অনুষঙ্গে বিবেচ্য। খেলাচ্ছলে স্বয়ং পামুক যেন তাঁর লেখার সাজঘরের জানালা আমাদের জন্যে খুলে দিয়েছেন : 'It occured to me that the author who clearly enjoyed reading and fantasizing, may have been familiar with such sources and a great many other books—such as the memoirs of European travellers or emancipated slaves—and gloaned material for history from them.'

'Istanbul' ও 'Other colours' এর মতো বই থেকে আমরা জেনেছি একদিকে বিশ্বসাহিত্য ও অন্যদিকে বহুমাত্রিক তুর্কি ঐতিহ্যে পামুকের অবিরাম পরিক্রমার কথা। বহু শতাব্দীর স্মৃতি-জড়িত প্রিয় নগরের প্রাচীন ও ধ্বংসোন্মুখ প্রাসাদে, মসজিদে, রাজপথে ও গলিপথে, ছোটবড় গ্রন্থাগারগুলিতে তিনি কৈশোর থেকেই ঘুরে বেড়াতেন। একদিকে তাঁর ব্যাপক পাঠ-অভিজ্ঞতা এবং অন্যদিকে সমস্ত ইন্দ্রিয় ও সত্তা দিয়ে নিঙড়ে-নেওয়া তুর্কি পরম্পরা আর ছোটবড় নগর ও জনপদের আলো-হাওয়া-রোদ : এইসব কিছু দিয়ে রচিত হয়েছে তাঁর পাঠকৃতিগুলি। বহুরৈখিক এই রচনা-প্রক্রিয়ারই সূচনা হয়েছিল 'The White Castle' বইতে। লেখক-সৃষ্ট উপস্থাপক সত্তার ভূমিকার শেষে যে খেলা-ভাঙার-খেলার ইশারা পাওয়া গেল, তা যেন আখ্যানে অন্তর্বৃত রহস্যকথার নির্মাণ ও বিনির্মাণের যুগলবন্দি। এমনকী, ভূমিকার আগে উদ্ধৃত মার্সেল প্রুস্ত এর ঐ বয়ানও আলো-আঁধারিকে বাড়িয়ে দিয়েছে : 'To imagine that a person who intrigues us has access to a way of life unknown and all the more attractive for its mystery to believe that we will begin to live only through the love of that person, what else is this but the birth of great passion' ?

আট

এখানে আমাদের হঠাৎই মনে পড়ে যায় পামুকের কাছ থেকেই জেনে-নেওয়া তাঁর শৈশবের একটি বিশ্বাসের কথা ; কোথাও না কোথাও নিশ্চয় আরেকজন ওরহান রয়েছে যার জীবন বয়ে চলেছে সমান্তরালভাবে। কোনো ঘটনা-সংস্থানের মধ্য দিয়ে যদি ঐ প্রতিকল্প সত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তাহলে কী হতে পারে? কিংবা যদি কোনওভাবে দুজনের অবস্থানের বিনিময় ঘটে : একই সময়ে বর্তমান এবং অত্যন্ত সংলগ্ন হয়েও পুরোপুরি অনাবিষ্কৃত পরিসর কি উন্মোচিত হতে পারে? 'The White Castle' বইতে কথকসত্তা আপাত-স্বাধীনতা সত্ত্বেও দাস হিসেবে প্রকৃত মুক্তির জন্যে আকাঙ্ক্ষিত ছিল। অন্যদিকে তারই সমরূপ সম্পন্ন হোজা ছিল আপাতভাবে মুক্ত। সমকালীন বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-দর্শন-ধর্মবোধ দিয়ে গড়ে-ওঠা উপন্যাসটির কথনবিশ্বে

বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে হোজা ও কথকসত্তা যখন পরস্পরের অবস্থান বিনিময় করে নিল, ঈপ্সিত মুক্তি কি অর্জিত হল?

আখ্যানের এই জিজ্ঞাসাটিকে যেন পামুক পরিকল্পিতভাবে অমীমাংসিত রেখে দিয়েছেন। আখ্যানের একাদশ বা অন্তিম পরিচ্ছেদের সূচনায় পামুক এই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তাঁর পাঠকৃতিতে রয়েছে একাধিক নির্গম-বিন্দু। প্রকৃতপক্ষে এই পরিচ্ছেদকে 'Epilogue' বা পরিশিষ্টও বলা যেতে পারে। কেননা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের অন্তিম বাক্যটি যদি সম্ভাব্য সমাপ্তি-বিন্দুর দ্যোতক হিসেবে গণ্য হয়, শেষ পরিচ্ছেদে রয়েছে বহু বছর পেরিয়ে যাওয়ার ইশারা আর অনুস্মৃতি। কোনও একজন সফল মানুষের ইতিবৃত্ত নয় কেবল, এতে আমরা লক্ষ করি অন্য আরেক জীবনে উন্নীত হওয়ার পরে কী কী হতে পারে, কী কী হওয়া সম্ভব! কিন্তু এখানে যদি থেমে যেতেন পামুক, তাহলে এই বয়ান তাৎপর্যরিক্ত হত। তাই বিবরণের মধ্যেই ক্রমশ চলে এল সম্ভাব্য সেই সূচনাবিন্দু যখন কল্পনার পরিসরে ইতিহাস সম্পৃক্ত হল 'Book of Travels' এর রচয়িতা ইভলিয়া চেলেবি (১৬১১-১৬৮২) এর সঙ্গে কথকসত্তার সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে। বৃদ্ধ ইভলিয়ার 'profound melancholy' এবং পরস্পরের ভ্রমণস্মৃতির শরিক হওয়ার বিবরণ ইশারাগর্ভ। কেননা বৃদ্ধ পর্যটকের অভিজ্ঞতার কথা শুনতে শুনতে 'For some reason these stories prompted a strange melancholy, I felt like crying. The red glow of the setting sun flooded my room.'

জীবনের সায়াহ্নে পৌঁছে কথকসত্তার অনুভবে এই অস্তায়মান সূর্যের রক্তিম আভা এবং অপরিচিত নিঃসঙ্গতা বোধের উপস্থিতিই কথকতাকে বিবরণের পিঞ্জর থেকে মুক্ত করেছে। আগেই লিখেছি, সহস্র-এক আরব্য রজনীর ঘরানায় গল্পের ভেতরকার গল্প যেন অন্তহীন ভাবে উন্মোচিত হয়েছে। ফারুক ডারভিনোগলু খুঁজে পায় অনির্দেশ্য উৎস থেকে আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপি যার কোনও নামগোত্র নেই এবং যাকে অতীতের বাচন থেকে সাম্প্রতিক তুর্কি ভাষায় পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে। অনুমান করা কঠিন নয়, এই প্রক্রিয়ায় বহু কিছু ওলট-পালট হয়ে গেছে। উত্তম পুরুষের বাচনে কোনও-এক স্বশিক্ষিত দাসের কাহিনি বিবৃত হতে হতে ভরকেন্দ্র বদলে গেল। অভিজ্ঞান সহ অবস্থানের বিনিময়ে যে সম্ভাব্য জীবন-কথা ব্যক্ত হল, তাতে ইভলিয়া চেলেবির উপস্থিতি যেন আখ্যানের অন্তর্বর্তী বিকল্পের যুগপৎ প্রবেশদ্বার ও নির্গমদ্বার।

বস্তুত উপলবন্ধুর গতিতে এগিয়ে-যাওয়া এই আখ্যানে প্রতিটি স্তরে রয়েছে অজস্র নাতি-প্রচ্ছন্ন ও আকস্মিকতায় ভরা গবাক্ষ যাদের মধ্য দিয়ে কার্যত প্রতিটি মুহূর্তে বাস্তব ও সম্ভাবনা অনবরত পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারে। কিংবা দৃষ্টিপাতই নয় কেবল, অন্যোন্য-নিবিষ্ট হতে হতে একসময় একে অপরের অবস্থানও গ্রহণ করতে পারে। আখ্যান জুড়ে কথক-ভাষ্যকারের আড়ালে থেকে স্বয়ং পামুক জীবন ও তার অনেকান্তিক বয়ান সম্পর্কে নিজস্ব বিশ্বাস ও দর্শন প্রকাশ করে গেছেন। তবে সমস্তই করেছেন চিহ্নায়িত শিল্পভাষার বহুমাত্রিকতায়। আখ্যানের সূচনায় কুহেলি (fog)

ঘটনার নিয়ন্ত্রক হয়েছিল। তেমনি কাহিনির শেষপ্রান্তেও কথকের সঙ্গে আপন অবস্থান বদলে নিয়ে হোজা 'slowly disappears in the silent fog'। যদিও লেখক বয়ানের শুরুতে লিখেছেন, জীবন পূর্ব-নির্ধারিত নয় এবং 'All stories are essentially a chain of co-incidences', তবু শেষপর্যন্ত বিচিত্র কূটাভাসে আকস্মিকতাই অনিবার্য বলে প্রতিভাত হয়। এই নিরিখে সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত এই উপন্যাসে যা-কিছু ঘটেছে, সমস্তই যুগপৎ আকস্মিক ও অনিবার্য। কুয়াশার মধ্যে অনির্দেশ্যতায় হোজার মিলিয়ে যাওয়ার মুহূর্তও এইজন্যে গভীরভাবে পূর্বনির্ধারিত। তাই তাৎপর্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ঠিক তার পরবর্তী বাক্য 'it was getting light' প্রকৃতপক্ষে বহুস্বরিক বাচন। আর, বাঙালি পাঠককে তা মনে করিয়ে দেয় কমলকুমার মজুমদারের অন্তর্জলী যাত্রার সেই বহুচর্চিত সূচনাবাক্যটি : 'আলো ক্রমে আসিতেছে।'

নয়

এই ক্রমায়াত আলোর পশ্চাদ্‌পট হিসেবে বিবেচ্য 'The White Castle'-এর সমগ্র আখ্যান-বিন্যাসটি। আখ্যান জুড়ে বারবার যে দিবাস্বপ্ন ও কল্পনার কুহেলি থেকে রূঢ় বাস্তবের আলোয় জেগে ওঠার ইঙ্গিত ব্যক্ত হয়েছে, তা থেকে পামুকের শিল্প-ভাবনা সম্পর্কে ধারণা নিশ্চয় করা সম্ভব। আগেই লিখেছি, ওটোমান শিল্পকলা, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, পদার্থবিদ্যার পাশাপাশি নানাবিধ চিত্রকলা থেকে চেতনার নির্যাস আহরণ করে এই আখ্যান সযত্নে গড়ে তুলেছেন পামুক। শুরু থেকেই তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন এমন কিছু ইশারা, যাদেরে ভালভাবে লক্ষ না করলে বোঝা সম্ভব নয় কেন শ্বেতদুর্গ গদ্য আখ্যায়িকা হয়েও কার্যত একটি মহাকবিতা হয়ে উঠেছে। কথকের মনে যে অতীত জীবন হারানোর ভয় এবং স্মৃতির গ্রন্থনা তৈরির আর্তি দেখতে পাই, তাতে বারবারই হস্তক্ষেপ করেছে স্বপ্ন ও প্রকল্পনা। বাস্তব আর কল্পনা একাকার না হলে বিবরণে আসত না 'The dream-like shades of those lands that never were, the animals that never existed, the incredible weapons we later invented year after year' এর কথা।

মধ্যযুগীয় আবহ অক্ষুণ্ণ রেখেও পামুক যেহেতু তাঁর কথকসত্তাকে দিয়ে 'I have to invent a past for myself' এর মতো ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছেন, এতে বুঝতে পারি, পাঠকের জন্যে উপস্থাপিত হবে কেবল আপেক্ষিক ও প্রতীয়মান জগৎ। সুতরাং যতক্ষণ আমরা আখ্যান-বিশ্বে পর্যটন করব, আমাদের মনে রাখতে হবে বহির্বৃত প্রতীয়মান আকরণ ও গভীর আকরণের দ্বিবাচনিকতার কথা। বিবরণ ও ঘটনার সানুপুঙ্খ বিন্যাস অবশ্যই লেখকের প্রকাশ-সামর্থ্যের পরিচায়ক। আগেই লিখেছি, এর উৎস রয়েছে ওটোমান ইতিহাস ও পরম্পরা সম্পর্কে তাঁর নিবিড় পরিশীলনে। বিচিত্র ঘটনা-প্রবাহের মধ্য দিয়ে কথক-সত্তা ও হোজার সম্পর্ক যেভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে, তাতে কে দাস আর কে প্রভু—তা নির্ণয় করা কঠিন। এ ক্ষেত্রে 'জ্ঞান' যে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে, তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আবার কথকসত্তার অর্জিত

জ্ঞান ও সৃষ্টি যে হোজার মধ্যে সঞ্চারিত হল এবং তার যাবতীয় স্মৃতিরও অংশীদার হল হোজা, তা অন্তিম পর্যায়ে বিবৃত অভিজ্ঞান বিনিময়ের নিরিখে নিঃসন্দেহে সংকেতগর্ভ। লক্ষণীয়ভাবে পরিশিষ্ট হিসেবে উপস্থাপিত একাদশ পরিচ্ছেদে কথকসত্তার বৈষয়িক সমৃদ্ধি সহ তথাকথিত পাণ্ডুলিপির প্রাগ্-ইতিহাস সংক্ষেপে অথচ ইশারাময় বাচনে উপস্থাপিত হয়েছে। অবশ্যই তা সর্বতোভাবে পাঠকের পরিসর। ঠিক একইভাবে কুহেলির মধ্যে মিলিয়ে-যাওয়া হোজার পরবর্তী নতুন জীবনের সম্ভাব্যতাও নৈঃশব্দ্যের অঞ্চল যেখানে পাঠকই নিতে পারে আবিষ্কারকের ভূমিকা।

আখ্যানের মধ্যে কথকসত্তা ও হোজার সমরূপতার সূত্রে যে 'search together, discover together, progress together' সহ নতুন ধারণা (idea) আবিষ্কারের কথা লেখা হয়েছে, তা যেন প্রসঙ্গ-নিরপেক্ষভাবে পাঠকের পক্ষে দিক্‌দর্শক। পামুক যে 'sow the seeds of a new revival' এর কথা লিখেছেন, তাঁর নিজস্ব সৃষ্টিজীবনের তা চলমান ধ্রুবপদ। তাই পরবর্তী আখ্যান 'The New Life'-এর বয়ানে এই পরাপাঠ স্পষ্টতর ও নিবিড়তর হয়ে উঠেছে। 'The White Castle' আপাতভাবে সরল কাহিনি হলেও নিরন্তর আত্ম-নিরীক্ষার যন্ত্রণা ও উদ্ভাসনের অন্তর্বৃত জটিলতায় তা অনন্য। নিজের জন্যে যে অতীতকে আবিষ্কার করে নিতে হয় বারবার, তাতে ব্যক্তি-পরিসর আসলে আপন সামর্থ্যকেই নিঙড়ে নেয়। মধ্যযুগীয় সুলতানদের, নিষ্ঠুরতা ও যুদ্ধোন্মাদনার প্রেক্ষাপটে সমসাময়িক সংবেদনায় আশ্রিত ব্যক্তিসত্তার বিচিত্র উন্মোচন বুঝিয়ে দেয়, কেন পামুকের মতো লেখক প্রকৃতপক্ষে নিষ্কর্ষের অক্লান্ত আবিষ্কারক এবং সময় ও পরিসরের নবীন ভাষ্যকার। কথক-সত্তা ও হোজা পরস্পরের স্মৃতির শরিক হয়, ওরা একসঙ্গে ভাবে, লেখে, পড়ে, নতুন আবিষ্কারে অংশ নেয়। তবু ভয়ঙ্কর মহামারী হিসেবে প্লেগ দেখা দিলে 'why I am what I am' এর মতো দার্শনিক আত্মপ্রশ্নও আড়ালে চলে যায়। হোজা ভুল করে বা স্বেচ্ছা-প্ররোচিত হয়ে ভেবে নেয় যে সে সম্ভবত আক্রান্ত আর কথক-অস্তিত্বকে সে কল্পিত পীড়ায় সংক্রমিত করতে চায়। বৃথাই কথক দাসত্বের গ্লানি ও মৃত্যু সংক্রমণের আশঙ্কা থেকে পালাতে চেষ্টা করে, হোজা তাকে খুঁজে নেয়। আপাতভাবে এর অর্থ যা-ই হোক, দুজনেই নিঃসঙ্গতাকে ভয় পায়। আবার সত্তার অন্তর্বৃত আলো ও অন্ধকার, ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রবণতা হোজা ও কথকসত্তার বিচিত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ধরা পড়েছে। কখনও বিজ্ঞান-প্রযুক্তির চর্চা, কখনও লেখা-পড়ার যুগলবন্দি, কখনও স্মৃতি-১ হন আর স্মৃতিবিনিময় এবং কখনও মৃত্যুভয়ের সঞ্চার : এই সবই যেন জীবনের অন্যোন্য-গ্রন্থনার অভিব্যক্তি।

কাহিনির শেষপ্রান্তে সুলতানের ব্যর্থ দুর্গ-আক্রমণের সানুপুঙ্খ বিবরণের পরে যে শ্বেতদুর্গের মুখোমুখি হলো কথকসত্তা এবং পরে আর ঐ দুর্গের কোনো ভূমিকা রইল না—এতে মনে হয়, আখ্যানে এর উপস্থিতি কাহিনির প্রয়োজনে নয়, সংকেত-গূঢ়তায়। লেখকের চিহ্নায়িত উপস্থাপনার চমৎকারিত্বে বুঝতে পারি, ঐ বিন্দুতে পৌঁছানোই তাঁর অন্বিষ্ট ছিল : 'We finally saw the castle itself. It was at the top of a high

hill, it's towers streaming with flags were caught by the faint red glow of the setting sun, and it was white, purest white and beautiful. I do not know why I thought that one could see such a beautiful and unattainable thing only in a dream. In that dream you would run along a road twisting through a dark forest, straining to reach the bright day of that hilltop, that ivory edifice ; as if there were a grand ball going on which you wanted to join in, a chance for happiness you did not want to miss, but although you expected to reach the end of the road at any moment, it would never end.'। এই শ্বেতশুভ্র সুন্দর দুর্গ বিশুদ্ধতার প্রতীক। এবং, তাই তা অনর্জনীয় স্বপ্নসম্ভব অস্তিত্ব। কাহিনির অন্তভাগে হঠাৎ-ই এর মুখোমুখি হয়ে লক্ষ করি, অস্তায়মান সূর্যের রক্তিম আভা একেও যেন প্রচ্ছন্ন বিষাদের কারুণ্যে মণ্ডিত করেছে। ইশারায় কী বার্তা আমাদের দিতে চাইছেন পামুক? রণরক্ত সফলতা কিংবা অপচয়-ভরা ব্যর্থতার পরে বুঝতে পারি, যাত্রাপথ শেষ হবে না কোনোদিন। কখনও পৌঁছানো যায় না জানাড়ু বা অলকাপুরীর কল্পস্বর্গে ; জীবন জুড়ে প্রত্যাশা বা প্রতীক্ষাই শুধু করা যায় পরম প্রাপ্তির। এবং, সেই শ্বেতদুর্গ দেখার পরেই হোজা ও কথকসত্তা পরস্পরের মধ্যে অভিজ্ঞান বিনিময় করেছে, এর তাৎপর্য অনেকান্তিক। তখন আরও মনে হয়, এই আখ্যান আধারমাত্র ছিল। আকরণ চূর্ণ হয়ে গেল যেন নিষ্কর্ষের উদ্ভাসনে।

কোনো মানুষ আসলে কেন অভিজ্ঞান খুঁজতে চায়? কে সে! এই জিজ্ঞাসা উত্থাপিত হয়েছে পরিশিষ্টে। গল্পের ভেতরের গল্পের ভেতরকার গল্প সাজাতে-সাজাতে এবং মীমাংসারহিত প্রত্যুত্তর খুঁজতে-খুঁজতে আখ্যান নানা গ্রহীতার মধ্যে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে, এই ইঙ্গিত বয়ানেই পাই। আপাত-সমাপ্তিতে থাকে সেই অন্তহীন দৃশ্য-পরম্পরার আভাস যেখানে লেখক-কথকের অধিকার গৌন হয়ে যায়, পাঠকের পরিসর ক্রমশ প্রসারিত হতে থাকে। জীবন কি সত্যিই বিনিময় করা যায়? হোজার অকথিত অভিজ্ঞতা যে নৈঃশব্দ্যের যবনিকায় আবৃত হলো, তাকে কি পাঠক আবিষ্কার করতে পারেন? নাকি নতুন আরেক পাঠকৃতির সম্ভাবনার তোরণে পৌঁছে গেলাম আমরা!

ঈগলটনের কুন্দেরা-পাঠ : বিলম্বিত পুনর্ভাষ্য

'Narrative technique ultimately takes us back to the metaphysics of the novelist' (Situations : Paris : 1947 : 71) জাঁ পল সার্ত্রের এই দ্যোতনাগর্ভ মন্তব্যটি যে কত অমোঘ, তা সাম্প্রতিক বিশ্বসাহিত্যের প্রধান ঔপন্যাসিকদের পাঠকৃতির নিবিড় অনুধ্যান থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সারামাগো-পামুক-মিলান কুন্দেরার মতো অসামান্য স্রষ্টাদের কথাভুবন শুধুমাত্র কাহিনি উপস্থাপনার বৈচিত্র্য দিয়ে আমাদের আবিষ্ট করে না, কল্পনা ও বাস্তবের প্রচলিত সীমারেখাকে প্রতিমুহূর্তে মুছে দেয়। তাঁদের উপন্যাসবিশ্ব জুড়ে কখনও সোচ্চারভাবে ব্যক্ত হলেও মূলত নিরুচ্চারভাবেই প্রকাশিত হয় জগৎ-সমীক্ষার ছলে আত্মনিরীক্ষার অভিনব যত আয়োজন। অবশ্য ঠিক তার উল্টোটাও ঘটতে দেখি কোনও কোনও পাঠকৃতিতে। আখ্যানে ঘটনা অনিবার্যভাবে প্রতীকী হয়ে যায় আবার কখনও প্রতীক নেয় ঘটনার ছদ্মবেশ। নানাধরনের নান্দনিক বিন্যাসের মধ্য দিয়ে এই ঔপন্যাসিকেরা যেন যথাপ্রাপ্ত জগতের তথাকথিত বাস্তবতা থেকে অনবরত চিহ্ন-পৃথিবীর দিকে যাত্রা করেন। বুঝিবা তাঁরা বাস্তবের যাবতীয় প্রসাধন ও নির্মোক অনবরত ছিন্নভিন্ন করতে থাকেন এবং এভাবেই এর ভেতরকার যাবতীয় গ্লানি-কুশ্রীতা-অপূর্ণতাকে সংশোধন করতে চান। এই তাঁদের সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার মূল প্রেরণা।

এই যে কথাগুলি লিখলাম, তা প্রাগুক্ত তিনজন ঔপন্যাসিকের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হলেও মিলান কুন্দেরা যেন এঁদের মধ্যেও একটুখানি আলাদাভাবে লক্ষণীয়। আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে (১৯৮৭) ঈগলটন লিখেছিলেন 'Estrangement and Irony in the fiction of Milan Kundera' শীর্ষক প্রবন্ধটি। এই বয়ানটি পুনঃপাঠ করতে গিয়ে বুঝতে পারি, ঈগলটন মূলত কুন্দেরার এই ক'টি বই পড়েছিলেন তখন 'The Book of Laughter and forgetting', 'The unbearable lightness of being', 'The farewell party', 'The Joke'। তার মানে, 'Laughable loves', 'Life is elsewhere', 'Immortality', 'Slowness', 'Identity', 'Ignorance' ইত্যাদি তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। বা, বলা ভালো, ঈগলটনের এই নিবন্ধের ভাববৃত্তের বাইরে এদের অবস্থান। ঈগলটনের মনোভূমি আমাদের কাছে যেভাবে পরিস্ফুট হয়েছে, তাতে বুঝতে পারি, এই প্রবন্ধ রচিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্ববর্তী তিনটি দশকে দ্রুত পরিবর্তনশীল ইতিহাস ও মার্ক্সীয় বিশ্ববীক্ষা যেভাবে বিবর্তিত হয়েছে, সেই নিরিখে মিলান কুন্দেরার উপন্যাস-বিশ্বের নির্যাসকে তিনি বুঝে নিতে চেয়েছেন। আঁদ্রে জিদ্ নান্দনিক চেতনার দিক দিয়ে উপন্যাসকে কবিতার প্রতিস্পর্ধী হওয়ার কথা

বলেছিলেন। আগে ভাবা হত, কবিতা হচ্ছে অজস্র অনুপুঙ্খের গ্রন্থনায় রচিত এমন এক সমগ্রতা, যার যে-কোনও একটি উপাদান সরে গেলে তার মায়াবী ঘোর ভেঙে যায় এবং সম্পূর্ণ কবিতাটি ধ্বসে পড়ে। কিন্তু উপন্যাস ঠিক তার বিপ্রতীপ স্বভাবের অধিকারী কেননা তাতে থাকে সম্ভাব্য অনেক বিকল্পের বিন্যাস যাতে পাঠক অনায়াসে হস্তক্ষেপ করতে পারেন। কিন্তু ইদানীং বিশ্বসাহিত্যের পাঠ-অভিজ্ঞতায় এই সত্য স্পষ্ট হয়েছে যে নিরন্তর কর্ষিত উচ্চতর নান্দনিকতার নিরিখে নতুন ধরনের উপন্যাস ও কবিতা এখন অনায়াসে পরস্পরের সহযাত্রী। জিদ্ তাঁর জার্নালে লিখেছেন : 'The novel must now show that it can be more than a mirror taken along a road. Every part of the work must prove the truth of every other part by their very relationship.' (Paris : 1996 : 187-188)।

দুই

আমরা যখন মিলান কুন্দেরার আখ্যানবিশ্বে প্রবেশ করি, জিদের এই মন্তব্যের যৌক্তিকতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হই। কেননা স্তরে স্তরে বিন্যস্ত আখ্যান আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় অন্তহীন সোপানের পরে সোপান হিসেবে। অনবরত এগোতে এগোতে একসময় হারিয়ে যায় উপরে ওঠা কিংবা নেমে আসার বোধ আর সেই চেনা বাস্তবের আদল সরে যেতে যেতে আশ্চর্য এক আয়না-মহলে ঢুকে পড়ি যেন। তখন ভেতর ও বাহিরের ব্যবধান মুছে যায়, হারিয়ে যায় ক্রিয়া ও ভাবনার তফাতও। হয়তো Immortality আর Identity-এর মিলান কুন্দেরা পাঠকদের এই উপলব্ধিতে পৌঁছে দেন। একটু আগে যে লিখেছি, যথাপ্রাপ্ত বাস্তবের অপূর্ণতা, অশুদ্ধতা ও অসামঞ্জস্যকে সংশোধন করার নান্দনিক প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে সাম্প্রতিক উপন্যাসকে—সেই প্রসঙ্গটি ফিরিয়ে আনতে পারি। ঈগলটনের যে-প্রবন্ধটি এইসব চিন্তা উস্‌কে দেয়, তার রচনা-কাল থেকে পঁচিশ বছর পরে এরকম প্রতিপাদ্য হয়তো বা স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা ফিরে যাব উৎসে অর্থাৎ ঈগলটনের সেই প্রবন্ধটির কাছে যেখানে তিনি কুন্দেরার উপন্যাসে খুঁজে পাচ্ছেন পুঁজিবাদোত্তর রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও আমলাতন্ত্রের নানাবিধ বিচ্ছুরণে ধ্বস্ত-বিচ্ছিন্ন, আত্মশ্লেষে দীর্ণ ব্যক্তি-সত্তার প্রতীকী আখ্যান।

প্রবন্ধের প্রারম্ভিক বাক্যটি এমন, যা ঈগলটনের দেখার বিশেষ ধরনটির প্রতিও ইশারা করে। 'The Book of Laughter and forgetting' বইতে প্রাগ্ নগরের একজন চেক নাগরিকের গল্প করেছেন কুন্দেরা যে কীনা সোভিয়েত আগ্রাসনের কিছুদিন পরে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। আরেকজন চেক নাগরিক তার কাছে গিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিল : 'আমি জানি তুমি ঠিক কী বোঝাতে চাইছ'! সাধারণত সাহিত্যের নির্যাস সংক্রান্ত কোনও প্রবন্ধ এভাবে শুরু হয় না। ঈগলটন যে সাহিত্যের আপাততুচ্ছ অনুষঙ্গকেও গভীরতর সামাজিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্যে ধরতে চান, এতে সংশয় নেই কোনও। ঐ বিন্দু থেকে শুরু হয় ঈগলটনের নিজস্ব পরিক্রমা। প্রথমোক্ত চেক

নাগরিকের অসুস্থ হয়ে পড়ার মতো যে-কোনও একটি ঘটনাকে দ্বিতীয়োক্ত চেক নাগরিক যে তাৎপর্যবহ বলে ভেবেছে, প্রাবন্ধিকের মতে তা নিছক কৌতুককর। প্রচ্ছন্ন শ্লেষের সঙ্গে তিনি লিখেছেন পুঁজিবাদোত্তর আমলাতন্ত্রের কাছে বমি করার মতো তুচ্ছ ঘটনাও কোনও-না-কোনও ধরনের তাৎক্ষণিক তাৎপর্য পেয়ে যায়। যেন পূর্ব ইউরোপে কোনও কিছুই আকস্মিকভাবে ঘটতে পারে না। এই প্রবণতার যৌক্তিক চূড়ান্ত-বিন্দু হলো এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে বাস্তবতার চেয়েও বড়ো হয়ে ওঠে বাস্তবতাকে আচ্ছন্ন-করা তাৎপর্যের অতিরেক।

এই আতিশয্য সর্বব্যাপ্ত ও নিপীড়ক যার ফলে তার ক্ষুদ্রতম অনুপুঙ্খও ত্রাস-সঞ্চালক চিহ্ন হিসেবে গণ্য হয়। অথচ সম্পূর্ণ বয়ানটি হয়তো বা স্পষ্ট বোধগম্য যার নিরিখে বিচ্ছিন্নভাবে কোনও-একটি অনুষঙ্গকে অকারণ দ্যোতনায় সম্পৃক্ত করার প্রয়োজন নেই। ঈগলটনের মতে এ আসলে বৌদ্ধিক বিভ্রম যাকে বিশেষ ধরনের উন্মাদনাও বলা চলে। এই বক্তব্যে ঈগলটনের মনোভঙ্গি দিবালোকের মতো স্পষ্ট। তাঁর মতে, রাজনৈতিক প্রকরণের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা যখন সমগ্র পৌরসমাজের উপর তার আধিপত্য বিস্তার করে, সমাজ-বাস্তবতা প্রবল ও নিশ্ছিদ্রভাবে প্রণালীবদ্ধ ও বহুবিধ সংকেতে গ্রথিত হয়ে পড়ে। আবার এই পরিস্থিতিতে সর্বদা অনিবার্য হয়ে ওঠে একধরনের ‘pathological overreading, a compulsive semiosis which eradicates all contingency.’। যাকে ঈগলটন পাঠ-অতিরেক বলেছেন, তার সঙ্গে অনিবার্যভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যায় আবশ্যিক অতিচিহ্নায়ন যা কী না বাস্তবের পদচ্ছাপগুলি মুছে দেয়। এই মন্তব্যটি অবশ্যই ভেবে দেখার মতো। এ প্রসঙ্গে ঈগলটন স্যামুয়েল বেকেটের একটি বিখ্যাত মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন—‘No symbol where none intended’ অর্থাৎ যা বয়ানের পক্ষে মোটেই ঈপ্সিত নয়, সেখানে কোনও প্রতীক খোঁজা পণ্ডশ্রম মাত্র।

কিন্তু সর্বগ্রাসী সমাজ-ব্যবস্থায় যখন তাৎপর্যের নিশ্ছিদ্র একমাত্রিক কাঠামো তৈরি হয়ে পড়ে, সেই সমাজে কেউ কখনও নিশ্চিতভাবে বলতে পারে না কোনটি কাঙ্ক্ষিত এবং কোনটি আদৌ কাঙ্ক্ষিত নয়। ঈগলটন পরপর কিছু অবান্তর অর্থসন্ধানের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যেমন : প্রেমিক বা প্রেমিকার বিলম্বিত উপস্থিতি, অফিসে বা অন্য কোনও চাকরির ক্ষেত্রে উপরওয়ালার গোমড়ামুখ বা সুপ্রভাত না বলা, রাস্তায় দশমাইল ধরে একনাগাড়ে আপনার গাড়ির পেছনে অন্য আরেকটি গাড়ির চলে আসা ইত্যাদি। এরপর ঈগলটন ‘The unbearable lightness of being’ থেকে সেই দৃষ্টান্তটি দিয়েছেন যেখানে টেরেজা কোনও-এক ইঞ্জিনীয়ারের ফ্ল্যাটে শরীরী মিলনে লিপ্ত হয় এবং একটু পরেই ভাবতে থাকে যে ঐ ব্যক্তিটির বাহ্যিক চাকচিক্যের সঙ্গে ফ্ল্যাটের মালিন্য অনেকটা বেমানান। কফি তৈরি করতে লোকটি যখন অল্পক্ষণের জন্যে রান্নাঘরে যায়, বইয়ের তাকে সফোক্লিস এর রচনা দেখতে পেয়ে টেরেজা কেনই বা অবাক হয়? এই ফ্ল্যাটটি কি তবে ঐ ইঞ্জিনীয়ারের নয়? তা কি কোনও জেলখানায় বন্দি বুদ্ধিজীবীর পরিত্যক্ত ঘর। অথবা ঐ ইঞ্জিনীয়ার আসলে পুলিশের চর, যে কফি তৈরি করার নামে

আসলে লুকোনো কোনও ক্যামেরার সুইচ চালু করতে গেছে? আমরা পাঠকেরা ভাবছি, এইসব জল্পনা এমনভাবে কেনই বা উপস্থাপিত করলেন ঈগলটন? কেননা কুন্দেরার 'Identity' ও 'Immortality' সহ প্রায় প্রতিটি রচনাতেই যেন এক ধরনের আদিগন্ত ব্যাপ্ত সংশয় ও অনিশ্চয়তার চিহ্নায়িত উপস্থাপনা দেখতে পাই।

তিন

চেকোশ্লাভাকিয়ার ছিন্নমূল জীবনে রাষ্ট্র ও সমাজ যেহেতু নিশ্ছিদ্রভাবে রুদ্ধ-পরিসর, পা রাখবার ভূমি কোনও কিছুতেই খুঁজে পায় না সংবেদনশীল ব্যক্তিসত্তা। প্রতিটি মুহূর্ত সেখানে অনিশ্চিত ও সংশয়ে আচ্ছন্ন। কোনটা মুখ আর কোনটা মুখোশ, তা যখন বোঝার উপায় থাকে না—কোনও সম্পর্ক সেখানে স্থায়ী হয় না এবং পারস্পরিক বিশ্বাসের প্রসঙ্গও অনুপস্থিত। ঈগলটনের পরিশীলন মার্ক্সীয় চেতনায়। তবুও এই পারাপারহীন শূন্যতার বহুমাত্রিক তাৎপর্য তিনি কতখানি অনুধাবন করেছেন : এই জিজ্ঞাসা জেগে ওঠে। টেরেজার ঐ শরীরী মিলন ও তার পরবর্তী প্রতিক্রিয়া গভীরভাবে চিহ্নায়িত। পাঠকের মনে আসে 'Life is elsewhere' কিংবা 'Ignorance' সহ কুন্দেরার প্রায় প্রতিটি উপন্যাসের প্রসঙ্গ। কেননা প্রতিটি ক্ষেত্রেই শরীরী মিলন নিগূঢ় দ্যোতনা নিয়ে উপস্থিত। বন্ধ্যা সময় ও পরিসরে নরনারীর মিলনও কোনও সম্পর্কের পরিচায়ক নয়। বরং শারীরিক মিলনের মধ্য দিয়ে তীব্রতর ভাবে প্রকট হয়ে পড়ে সম্পর্কহীনতা ও সময়-তাড়িত মানুষের গন্তব্যহীন যাত্রা।

ঈগলটন অবশ্য লক্ষ করেছেন যে পূর্ব ইউরোপে ব্যক্তি হিসেবে টিকে থাকতে হলে সমস্ত ঘটনা ও বৃত্তান্তের মধ্যে প্রচ্ছন্ন গৌন পাঠ সম্পর্কে সচেতন থাকতেই হবে। তিনি একে বলেছেন 'Daily hermeneutics of suspicion'। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে সতর্ক প্রহরীর মতো যদি ব্যবহার করে যেতে হয়, তাহলে প্রতাপের অনুপস্থিত উপস্থিতির সঙ্গে অনিবার্য সংঘর্ষ কীভাবে এড়ানো যাবে : এই হলো ঈগলটনের জিজ্ঞাসা। কোনও ঘটনাই যেহেতু আকস্মিক নয় কিংবা কোনও আচরণ নয় সংকেতশূন্য ও একমাত্রিক—কতদূর অবধি প্রসারিত হবে এর মান্যতা? একটু আগে ঈগলটনের চিন্তাসূত্রে যে পাঠের অতিরেকের কথা লিখেছি, তা এড়িয়ে গিয়ে আখ্যানের প্রকৃত সত্যে পৌছাব কী করে? কোথাও কি অতিসরলীকরণের ফাঁদ পাঠকের জন্যে বড় সমস্যার কারণ হয় না? ঈগলটন এই পরিস্থিতিকে ভেবেছেন 'Semiological Paranoia' অর্থাৎ চিহ্নতাত্ত্বিক বিভ্রমের উন্মাদনা যা, তাঁর মতে, সবচেয়ে বেশি প্রকট বিশ শতকের সবচেয়ে বিখ্যাত চেক সাহিত্যিক ফ্রান্ৎস কাফকার মধ্যে যিনি তাঁর পাঠকদের সর্বদা আখ্যান ও গৌন পাঠের মধ্যে ত্রিশঙ্কুর মতো ঝুলিয়ে রাখেন। পাঠক সিদ্ধান্তবিহীন আপেক্ষিকতায় দুলতে থাকুন, এটাই কি চান কথাকার? একদিকে আপাত-দৃশ্যমান ঘটনা-প্রপঞ্চ এবং অন্যদিকে নিরবচ্ছিন্নভাবে নাগালের বাইরে রয়ে-যাওয়া সত্য : এই দুইয়ের প্রতিটি অনুষঙ্গই হয়তো যুগপৎ তথ্য ও বিভ্রম, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অথচ রূপক। জীবনের চূড়ান্ততাহীন সত্যকে তো কখনও পূর্ব-নির্ধারিত

ধারণার সমগ্রতায় পিঞ্জরাবদ্ধ করা যায় না। কেননা যখনই সত্যের উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ হতে চাই, সেই মুহূর্তেই তা নিজস্ব জমি ও আকাশ নিয়ে নাগালের বাইরে চলে যায়।

ফ্রানৎস কাফকা থেকে মিলান কুন্দেরা পর্যন্ত চেক সাহিত্যের বহমান পরম্পরায় বারবার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে পরা-আখ্যানের প্রতীতি যা একদিকে জীবনের ক্ষুদ্রতম অনুপুঙ্খটিকেও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে আবার একইসঙ্গে নিয়ে আসছে চলমানতার বার্তা : হেথা নয় হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে। আমাদের অবধারিতভাবে মনে পড়ে যায় কুন্দেরার 'Life is elsewhere' নামের বইটির কথা। এই নামটি নিশ্চয় সেই বিশেষ আখ্যানের জন্যেই সুপ্রযুক্ত ; আবার তা হতে পারে কুন্দেরার সাহিত্য-জীবনেরও ধ্রুবপদ। ঈগলটন ভাবছেন এ কেবল হারিয়ে-যাওয়া লুপ্ত ঈশ্বরের রূপক নয়, পুঁজিবাদোত্তর রাষ্ট্রব্যবস্থারও রূপক। কেননা এই সেই কূটাভাসময় পরিস্থিতি যেখানে প্রতিটি বস্তুই বাধ্যতামূলকভাবে অতিস্পষ্ট ও অধিগম্য হওয়ার তাগিদে কোনও আপাতভাবে একমাত্রিক কাহিনিকে আশ্রয় হিসেবে পেয়ে যায়। আবার অন্যদিকে এই পরিস্থিতি জুড়ে রয়েছে চলমান ইতিহাসের বহু গোপন রহস্য-কথা, প্রায়-নিরুচ্চার বিশ্বাস-হননের ইতিবৃত্ত। এবং, প্রকৃত অন্বিষ্ট সত্যকে আড়াল করে রাখার সচেতন কৃৎকৌশল হিসেবে রচিত কথা-পরম্পরা। এই ক্লান্তিকরভাবে অতিনির্দেশিত পৃথিবীর মর্মমূলে রয়েছে সার্বিক অনিশ্চয়তা। তাই একদিকে সমস্ত কিছুই যেন যান্ত্রিকভাবে দৃষ্টি-গোচর, একঘেয়েভাবে পুনরাবৃত্তিময় ও খুবই নীরসভাবে দ্বিমাত্রিক। অথচ এই সমস্তই প্রতীয়মান মাত্র ; প্রতিটি বস্তু বা ঘটনা বা সম্পর্ককে বাইরে থেকে যা মনে হয়, আসলে তা আদৌ নয়। বাইরে থেকে যদিও মনে হয় যে এ-জগতে শুধু রুগ্ন-বিকারগ্রস্ত-দৃষ্টি সত্ত্বেও দৃষ্টিহীন-নুলো-অন্ধ-বধির কাঠের পুতুলের ভিড়, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সত্তার সবচেয়ে রহস্যময় গভীরতার বিচ্ছুরণ প্রচ্ছন্ন রয়েছে কোথাও।

চার

কূটাভাস-ভরা এই জগতের উপস্থাপনায় কোনও কিছুই স্পষ্টতার নির্দেশক নয়। বাইরে থেকে কোনও বস্তু বা ঘটনা বা কুশীলবদের আন্তঃসম্পর্ককে যা-ই মনে হোক, আসলে তা আদৌ নয়। এই উপলব্ধি থেকে ঈগলটন এ-সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে এ-হেন আখ্যানবিশ্ব জুড়ে রয়েছে 'Postmodernist eradication of depth, mystery, subjectivity co-exists strangely with a persistent modernist impulse to decipher and decode, a sense of concealment and duplicity.'। অর্থাৎ গভীরতার বোধ, রহস্যের প্রতীতি, অস্মিতার উপলব্ধি ক্রমাগত মুছে নেওয়ার আধুনিকোত্তর প্রবণতা যেমন রয়েছে এই আখ্যানবিশ্বে, তেমনি বিচিত্র সহাবস্থানে এর মধ্যেই সমান্তরালভাবে রয়েছে গোপনতা ও দ্বৈততা নির্মাণের আধুনিকতাবাদী আগ্রহ এবং প্রতীয়মান উপস্থিতির ভেতরকার নিষ্কর্ষ আবিষ্কার ও বিশ্লেষণের ধারাবাহিক প্রচেষ্টাও। চেকোশ্লাভাকিয়ার সমাজে আপাত-তুচ্ছও যে চিহ্নায়িত অস্তিত্ব বলে গণ্য

করা হয়, তা একটু আগে লক্ষ করেছি। তার মানে, নির্মোক ভেদ করে কোনো সম্ভাব্য সত্যে পৌঁছানোর তাগিদও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় কোথাও কি লুকিয়ে রয়েছে তুচ্ছকে মহীয়ান করার হাস্যকর উদ্যমও! এমন নয় যে ঈগলটন এই হাস্যকরতাকে সাম্প্রতিক উপন্যাস-বিশ্বের সাধারণ লক্ষণ বলে মনে করেন। তিনি আসলে যুগপৎ আধুনিকতাবাদী ও আধুনিকোত্তরবাদী লিখন-পদ্ধতির অন্তর্বৃত অন্ধবিন্দুর দিকে তর্জনি সংকেত করতে চেয়েছেন। মিলান কুন্দেরার মতো সৃষ্টিশীল আখ্যানকার কীভাবে চতুর ফাঁদে ভরা দুটি পথ থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন, সেদিকে আমাদের অভিনিবেশ আকর্ষণ করেছেন। মানুষের সৃজনী কল্পনাকে কোনওভাবেই রুদ্ধ আকরণে বন্দি করতে চাননি কুন্দেরা : এই হলো বার্তা।

'The curtain' নামক প্রবন্ধ-সংকলনে কুন্দেরা এই মন্তব্যটি করেছেন যে, 'we are in the Post-Kafka era, where the frontier of the implausible is no-longer underguard' (2007 : 161)। এই নিরিখে এটা প্রত্যাশিত যে যথাপ্রাপ্ত বাস্তব আমূল বিনির্মিত হবে কল্পনা-প্রকল্পনা-কুহকের সঙ্গে নিরন্তর দ্বিবাচনিকতায়। এই ধরনের আখ্যানে পুঁজিবাদোত্তর আমলাতন্ত্রের রুদ্ধ পরিসর প্রত্যাখ্যাত হয়ে থাকে। ঈগলটন মনে করেন প্রতীচ্যের অতিপরিশীলিত বিনির্মাণ পন্থার অনুসারী নয় কুন্দেরার উপন্যাস। পরস্পর-অসম্বদ্ধ বয়ানের সংশ্লেষণে কুন্দেরার উপন্যাস-বিশ্বে আরোপিত পরা-আখ্যানের বিরুদ্ধে শিল্পিত প্রতিবাদ ব্যক্ত হয়। এভাবে কুন্দেরা কাহিনির আকরণে প্রবলভাবে অন্তর্ঘাত করেন অথচ আপাতদৃষ্টিতে তা শিথিল সম্পর্ক-বিন্যাসের সূত্রে পরস্পর-ভিন্ন কাহিনিকে একটিমাত্র পরিধির মধ্যে আশ্রয় দেয়। যেন একই মলাটের মধ্যে বেশ কিছু অণু-আখ্যান পরস্পর-সম্পৃক্ত হয়ে যায়। আখ্যানের মধ্যে ঈঙ্গিত বাস্তবতাকে আধুনিকতাবাদী জোয়ারের দিনগুলিতে যেভাবে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল, তাতেও পাঠকৃতির সমগ্রতার বোধ বিপুলভাবে ধ্বস্ত হয়েছে। লেখার অন্দরমহলে বিভিন্ন উপাদানের মিথষ্ক্রিয়া তাতে কখনও স্থগিত হয়েছে, কখনও বা হয়েছে খণ্ডিত। বোধের পরম্পরাকেও অস্বীকার করেছেন আধুনিকতাবাদী কথাকার। পাশাপাশি কুন্দেরার কাহিনি-বিন্যাসে ঈগলটন লক্ষ করেছেন যে প্রতিটি শাখা ও প্রশাখার নিজস্ব তাৎপর্য কখনও হারিয়ে যায়নি, বরং এরা একে অপরের সঙ্গে অন্তর-মন্থনে সম্পৃক্ত থেকেছে। পূর্ব-পরিকল্পিত কোনও পরা-আখ্যানের রুদ্ধতায় এদের মুক্ত সঞ্চরণ ব্যাহত হয়নি ; নিজস্ব আখ্যানগত পরিসরে এদের স্বতন্ত্র ও সমান্তরাল অস্তিত্ব বজায় থেকেছে। নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও সমান্তরাল অবস্থান অটুট রেখেও এই অণু-আখ্যানগুলি যে আখ্যানের প্রধান গ্রন্থনার শরিক হতে পেরেছে, এতেই শিল্পমাধ্যমের বৈশিষ্ট্য দীপ্যমান। কুন্দেরার উপন্যাসায়ন প্রক্রিয়া তাই চিরমুক্ত যেখানে তিনি নিরন্তর হস্তক্ষেপ করেছেন ; ফলে আখ্যান কোনও পর্যায়েই রৈখিকতায় আক্রান্ত হয়নি।

ঈগলটন যথার্থ লক্ষ করেছেন যে কুন্দেরা যেন চলমান আখ্যানের পথ থেকে একটুখানি সরে দাঁড়িয়ে ঘটনাপ্রবাহ-বস্তুগত অনুষঙ্গ-মানবিক সম্পর্ক ইত্যাদির দিকে

দৃষ্টিপাত করে সত্তাতাত্ত্বিক ও দার্শনিক নিষ্কর্ষ খুঁজে নিয়েছেন। অন্তত সেইসব অন্তর-বীক্ষণের মুহূর্তগুলিতে কথা-প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখার দায় থেকে ছুটি নিয়েছেন। একই সঙ্গে কুশীলবদের নির্মাণ-বিনির্মাণের ইতিহাস এবং অন্তর্মুখী ভ্রমণের ইতিবৃত্তকে গ্রথিত করার কাজটি খুব সহজ নয়। কুন্দেরা তাঁর প্রায় প্রতিটি আখ্যানে এ-কাজটি করেছেন নিখুঁত দক্ষতায়। ফলে এইসব দার্শনিক উদ্ভাস কাহিনির গতিকে রুদ্ধ না করে তাতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সবই যেন ঘটেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, যেন বা কোনও একটি অলিখিত শৈল্পিক শর্ত পূরণের জন্যে লেখকের আঙ্‌রাখাটি খুলে নিয়ে কথকসত্তার জোব্বা কিছুক্ষণের জন্যে পরে নিয়েছেন তিনি। আবার কথকস্বর ও লেখকস্বরের যুগলবন্দিও দুর্লক্ষ্য নয়।

এই প্রক্রিয়ায় আধুনিকতাবাদী লেখকের ঔদ্ধত্য ও পাঠকের উপরে আধিপত্য বিস্তারের প্রবণতা নেই ; কিংবা নেই কোনও আরোপিত নান্দনিক নিরীক্ষার নামে উৎকেন্দ্রিক কৃৎকৌশলের অভিব্যক্তি। পাঠকৃতির মধ্যে ভাঙন বা গোলকধাঁধা তৈরি করে পাঠকদের চকিত করতে চান না তিনি যাতে সম্ভাব্যতাকে ধারণ করার মতো শৈল্পিক আয়োজন বিপর্যস্ত হয়ে যায়। অন্তত আধুনিকোত্তরবাদী ঘরানার সুকৌশল রচিত অসামঞ্জস্য কিংবা বিভিন্ন অসম্পৃক্ত বয়ানের পূর্ব-পরিকল্পিত কোলাহলের সন্ত্রাস তাঁর আখ্যানবিশ্বে দেখতে পাই না। ঈগলটন অবশ্য এর মধ্যে লক্ষ করেছেন কুন্দেরার পরিশীলিত ঔদাসীন্য, যেন আখ্যানের গন্তব্য সম্পর্কে তাঁর কোনও উৎকণ্ঠা নেই। তাই সত্তাতাত্ত্বিক ও দার্শনিক উদ্ভাসনের ফলে আখ্যানের গতি যদি কিছুক্ষণের জন্যে মন্থরও হয়ে পড়ে, এবিষয়ে তাঁর কোনও উদ্বেগ নেই। মনে হয় কুন্দেরার কাছে উপন্যাস এমন একটি উন্মুক্ত পরিসর যেখানে কাহিনি সহ কাহিনির উদ্বৃত্ত অনুষঙ্গগুলিও অনায়াসে ঠাঁই পেয়ে যায়। অর্থাৎ সৃজন-মাধ্যম হিসেবে এর ধারণ ও শোষণ-ক্ষমতা কার্যত অন্তহীন। দিনলিপি সুলভ খুঁটিনাটি তথ্য, কখনও প্রচ্ছন্ন আর কখনও প্রকাশ্য নাটকীয়তা, অন্তর্জীবনের বিশ্লেষণ : সমস্ত কিছুই বুঝিবা এই নবায়িত মাধ্যমের অপরিহার্য অংশ।

পাঁচ

এপ্রসঙ্গে খুবই তাৎপর্যবহ মন্তব্য করেছেন ঈগলটন : 'No doubt, psycho-biographically speaking, this artlessness is the effect of a finely conscious art, but his writing bears none of its traces and communicates instead a quite astonishing naturalness, a stunning off-handedness and laid-back companionability which forces the reader genuinely to doubt whether it is in the least aware of its own brilliance.'। নিঃসন্দেহে কুন্দেরার ঐ পরিশীলিত-শিল্পকলার-ই অভিব্যক্তি তাঁর বিভিন্ন আখ্যানে স্পষ্ট-হয়ে-ওঠা আপাত-শিল্পহীনতা। এই নিবন্ধের সূচনাপর্বে উল্লেখ করেছি যে ঈগলটনের এই প্রবন্ধ লেখার পরে কুন্দেরার যেসব অসামান্য আখ্যান প্রকাশিত হয়েছে, তাদের মধ্যে উদ্ধৃত মন্তব্যটির যৌক্তিকতা আরও বেশি স্পষ্ট। তবে ঐ যে আপাত-ব্যক্ত শিল্পহীনতা,

তার মধ্যেও প্রচ্ছন্ন রয়েছে ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত সাংস্কৃতিক চিহ্নায়ক। একটা প্রশ্ন অবশ্য এড়ানো যায় না। যত বড়ো প্রতিভাধর শিল্পীই হোন না কেন, তিনি কি অলক্ষিত অথচ অমোঘভাবে উপস্থিত নিয়ন্তা ভাবাদর্শের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন? বিশেষত ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে বহুশতাব্দী ধরে অভ্যস্ত পরিশীলিত সংস্কার ও চেতনার অদৃশ্য শেকলগুলিকে তিনি শনাক্ত করতে পারেন কি? যাপিত অভিজ্ঞতার বহুবিধ অন্তর্বয়নের মধ্যে মিথ্যা ধারাবাহিকভাবে সত্যের ছদ্মবেশ ধরে এসেছে কী না, তা কি শিল্পী-সাহিত্যিকেরা সর্বদা তলিয়ে ভাবেন? সুতরাং তাঁর কাছে যা কিছু "স্বাভাবিক" বলে মনে হচ্ছে, সেইসব তো হতেও পারে আধিপত্যবাদের বহু-শতাব্দী ব্যাপ্ত পরিশীলিত কৃৎকৌশলের পরিণত অভিব্যক্তি।

এ-হেন পরিস্থিতিতে 'শূন্যবিন্দু লিখন' কি শুরু হবে যথাপ্রাপ্ত বাস্তবের প্রতি মান্যতায়? অথবা ঐ 'বাস্তব'-কে আরোপিত ধারণা-সমবায়ের সমষ্টি হিসেবে বুঝে নেওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় অন্তর-বীক্ষণ অব্যাহত থাকবে পুঁজিবাদোত্তর সমাজে? পাশাপাশি যখন সাম্যভিত্তিক বিকল্প জীবনাদর্শ ও সমাজ-ব্যবস্থার ঐতিহাসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা অক্ষুণ্ণ ছিল, তার প্রতি একমাত্রিক সংশয় তো ধনোদ্ধত নয়া ঔপনিবেশিক প্রভুত্ববাদী শক্তির চাতুর্যই সর্বত্র সুকৌশলে ছড়িয়ে দিয়েছে। পূর্ব ইউরোপের বুদ্ধিজীবী বর্গ কি এই চাতুর্যের শিকার হননি, যার ফলে একচক্ষু হরিণের বিশ্ববীক্ষা—হয়তো বা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই—তাঁদের স্বযাচিত নিয়তি হয়ে পড়েছে? মুহুর্মুহু পশ্চিমী প্রচার-দানবের দাপটে উৎপাদিত তথ্য ও সেইসব তথ্যের সুবিধাজনক বিশ্লেষণ সময় ও পরিসরের মধ্যে এত নিরেট ঝরোখা তৈরি করে দিয়েছিল (এবং এখনও বহুগুণ বেশি উৎসাহে দিচ্ছে) যে অন্য কোনো কিছু দেখা, ভাবা, বোঝা কারও পক্ষেই সম্ভব ছিল না। এমনকি, মিলান কুন্দেরার মতো চিহ্নসন্ধানী স্রষ্টার পক্ষেও নয়। এপ্রসঙ্গে একথাও লেখা প্রয়োজন যে আলবেয়ার কাম্যু বা আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, ফ্রান্‌ৎস্ কাফকা বা হোসে সারামাগো, হোর্হে লুই বোর্হেস বা ওরহান পামুকের মতো আপাত-দৃষ্টিতে দ্বিমেরু-বিষম অবস্থানে বিধৃত লেখকদের মতো মিলান কুন্দেরাও নিছক একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেননি। তাঁর দেশকাল-গত পটভূমি এবং অন্তর্বৃত ও বহির্বৃত ইতিহাসের পরম্পরাই তাঁকে প্রাথমিকভাবে লালন করেছে আর তাঁর স্বোপার্জিত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির নিরন্তর সংশ্লেষণে উদ্ভূত বিশ্ববীক্ষাই তাঁর উপন্যাস-বিশ্বের প্রকৃত ধাত্রী।

এইজন্যে একটু আগে যে 'স্বাভাবিকতা'র উল্লেখ করেছি, তার মধ্যেও নিহিত রয়েছে রাজনৈতিক আধিপত্যবাদ এবং দৈনন্দিন জীবনের প্রাতিভসত্তাবাদী ভাবনার বিচিত্র ও বহুমুখী সমীকরণ। ভাবাদর্শ তাঁরই নিজস্ব ধরনে উপন্যাসীকৃত হয়েছে ; ফলে তা যুগপৎ স্বাভাবিক ও পরিশীলিত, স্বতঃস্ফূর্ত ও বৌদ্ধিক কৃৎকৌশলে ঋদ্ধ। এই দ্বৈততা নিয়েই কুন্দেরার ভাবনাবিশ্ব গড়ে উঠেছে। ফলে একে আধুনিকতাবাদী বা আধুনিকোত্তরবাদী ভাবনা-পিঞ্জরে রুদ্ধ করা খুবই দুরূহ। কুন্দেরার সৃষ্ট কোনো-এক ঔপন্যাসিক কুশীলব উপন্যাস-লিখন সম্পর্কে এই গূঢ়ার্থবহ মন্তব্য করেছিল : 'The only thing we can do is to give an account of our own selves.

Anything else is abuse of power. Anything else is a lie !' সত্য-মিথ্যার দোলাচলে স্পন্দিত বাস্তবে সামাজিক ও রাজনৈতিক নিষ্কর্ষের মিথস্ক্রিয়া যেমন অবধারিত, তেমনি অনিবার্য ব্যক্তিসত্তা ও বহুমাত্রিক ইতিহাসের অন্যোন্য-সম্পৃক্তিও।

প্রতিমুহূর্তে যে-জীবনে আত্ম-অভিজ্ঞান হারিয়ে যায়, সেখানে পার্থক্য ও অনন্যতার দ্বিবাচনিকতাও যেন অভীষ্ট মুক্তি এনে দিতে পারে না। উপন্যাসে যা-কিছু ঘটে, তা অন্যভাবেও ঘটতে পারত : এই বোধ যত প্রখর হয়ে ওঠে, যথাপ্রাপ্ত বাস্তব ও অন্তহীন সম্ভাবনার মধ্যে তত বেশি প্রসারিত হয় গোলকধাঁধার ক্ষেত্র। এই পরিস্থিতিতে ঈগলটন লক্ষ করেছেন অস্থির অতীত ও অনিশ্চিত স্মৃতির দোলাচল আর বিশুদ্ধ আকস্মিকতার সমারোহ। এর ফলে দেখা যায় 'Massive haemorrhage of meaning'। এই শব্দবন্ধ নিশ্চিতভাবে পাঠকদের চকিত করে। অস্থির বর্তমানের ছায়ায় যদি অনিশ্চিত অতীত মিশে যেতে থাকে এবং বয়ানে ভেঙে পড়ে সমস্ত রৈখিকতা, তাহলে উপন্যাস নামক শিল্প-মাধ্যম সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাগুলিও অটুট থাকতে পারে না। ব্যক্তি-ঘটনা-সম্পর্ক-বিন্যাসের কোনও মূল্যই যখন নিশ্চিত নয়, যুগপৎ সত্তাতাত্ত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক অ-সুখ ও বিকার যেন সংক্রামিত হয় লিখন-বিশ্বে। ব্যক্তিগত ও যৌথজীবনের অনন্বয়গুলিকে লিখন-প্রণালীর নিজস্ব ধরনে যেন পরীক্ষা করেছেন কুন্দেরা। আকরণগত নির্দিষ্টতার বদলে আকরণোত্তর প্রতিন্যাসই তাঁর উপন্যাস-বিশ্বের প্রধান ঈঙ্গিত।

ছয়

ব্যক্তিসত্তার অভিজ্ঞানের সহগামী পার্থক্যবোধ কুন্দেরার প্রায় প্রতিটি আখ্যানের প্রধান উপজীব্য। সঙ্গে সঙ্গে এও লক্ষ করতে হয় যে সত্তার অজস্র জটিলতা ও অনন্বয় জনিত সংকট উপস্থাপনার অন্যতম মুখ্য অবলম্বন হলো নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্কে বারবার পুনরাবৃত্ত অন্ধবিন্দুগুলি। প্রেম থেকে রোমান্টিকতা কার্যত নির্বাসিত ; এমন কী, শরীরী মিলনের বৃত্তান্তগুলিও নিরবচ্ছিন্নভাবে যান্ত্রিক, ক্লান্তিকর, পুনরাবৃত্তি-প্রবণ। ফলে দুটি উপন্যাস পড়ে নিলে পাঠক পূর্বানুমান করে নিতে পারেন, অন্য উপন্যাসগুলিতে কুশীলবেরা মোটামুটি কী কী ভাবে আচরণ করবে! যে-বৃত্তান্ত উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলিতে তেমনভাবে পাওয়া যায় না, প্রথাবিরোধিতার বৈশিষ্ট্যসূত্রে যা বিপুলভাবে ব্যতিক্রমী বলে গণ্য হতে পারে, অবাধ যৌথ যৌনাচারের সেই শরীরী উৎসবও কুন্দেরার আখ্যানে শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে প্রবলভাবে হাস্যকর। যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তির আতিশয্য শরীরী উত্তাপকেও পুরোপুরি নির্মানবায়িত করে দিয়েছে। আদিগন্ত রিক্ততা ও নিরর্থকতার বোধ গভীর ট্র্যাজিক সংবেদনার উৎস হতে পারে, কিন্তু তা না-হয়ে যে আয়নামহলের ধূসর নির্জনতায় প্রতিফলিত প্রতিবিম্বগুলি হয়ে উঠল কৌতুককর ও পরস্পরের প্রতি বিদ্রূপপ্রবণ—এ যেন অন্তঃসারশূন্য সাম্প্রতিক কালেরই চিহ্নায়িত উপস্থাপনা। মনে হয়, মানুষের জৈবিক অস্তিত্বের শরীরী আকাঙ্ক্ষা বা যৌনতার অভিব্যক্তি বুঝি বা কুন্দেরার আখ্যানে সবচেয়ে মজার দিক। যেন কার্নিভালের উপন্যাসায়নে জান্তব প্রবৃত্তির মোক্ষণ ঘটে,—এমনই বিশ্বাস কুন্দেরার।

রক্তমাংসের দাবি কোনো মানুষের পক্ষেই এড়ানো সম্ভব নয় ; কিন্তু উৎক্রান্তি ছাড়া মুক্তি নেই—এই বার্তা যেন আখ্যান থেকে ক্রমাগত বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

ঈগলটনের বিশেষত্ব এখানেই যে এই ব্যতিক্রমী আলোচনাতেও তিনি রাজনৈতিক নিষ্কর্ষ লক্ষ করেছেন। একনায়কতন্ত্র যে সমগ্রীকরণের নামে 'অজগর সাপের ঐক্যনীতি' অনুযায়ী সব কিছু একাকার করে দিতে চায় এবং সমস্ত ধরনের পার্থক্যবোধ নির্দয়ভাবে মুছে দেয়—আখ্যানে উপস্থাপিত রক্তমাংসের আর্তি অর্থাৎ শরীরী অনন্বয় দাঁড়ায় তারই প্রতিষেধক কৃৎকৌশল হিসেবে। এই বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে খুব অভিনব। ব্যক্তিসত্তার সম্ভাব্য রোমান্টিক আদর্শবাদকে প্রাগুক্ত কার্নিভাল এমন প্রবলভাবে প্রতিহত করে যে তা অ্যাবসার্ডের সীমানায় পৌঁছে গেছে। ঈগলটন অবশ্য এই প্রশ্নও তুলে ধরেছেন যে এর ফলে 'demonic cackle of meaninglessness' থেকে ঈপ্সিত তাৎপর্যকে আলাদাভাবে খুঁজে নেওয়া সম্ভব হবে কি? কেননা ঔপন্যাসিক তো একদেশদর্শীভাবে জৈবিক সত্তা-সর্বস্বতার রূপক নির্মাণ করেননি। সমকালীন পৃথিবীতে সমস্ত ট্র্যাজিক ঘটনাই প্রহসন হিসেবে পুনরাবৃত্ত হয়ে থাকে—এমন ভেবেছিলেন মার্ক্স। শরীরী আকাঙ্ক্ষা যদি উতরোল প্রহসনে রূপান্তরিত হয়, তা কি ধ্বংসের মধ্য দিয়ে মুক্তির সূচনা করে? ঈগলটন ভেবেছেন, কুন্দেরার আখ্যানে নগ্ন শরীরের ভিড় যে যৌনতাকে হাস্যকর করে তুলেছে, তাতে আসলে নাৎসিদের বন্দী শিবিরের রূপক উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। তাঁর মতে, প্রতিবারই যখন কোনো কিছু পুনরাবৃত্ত হয়, তা পূর্বাগত অর্থের একটি অংশ হারিয়ে ফেলে। অনন্যতার ধারণা রোমান্টিক ভ্রম ছাড়া অন্য কিছু নয়। একদিকে তাৎপর্যের অতিরেক ও অন্যদিকে প্রায়-তাৎপর্যহীনতা : এই দুয়ের মধ্যে আততি কুন্দেরার আখ্যানে খর্ব হয় না কখনও। সব কিছুর মধ্যে তাৎপর্য খোঁজার নিপীড়ক প্রক্রিয়া যেন নিজের ভারে নিজেই ন্যুব্জ হয়ে পড়ছে। কথাকার এই পরিসরেই উপন্যাসায়নের কার্যকরী সূত্রগুলি খুঁজে পান। বস্তু-ঘটনা-ব্যক্তি-সমবায়ের সন্নিবেশ থেকে যখন বহুপরিচিত প্রত্যাশিত অর্থগুলি হঠাৎ সরিয়ে দেওয়া হয়, এক ধরনের অমোঘ আমোদ তৈরি হয়। ঔপন্যাসিক যেন বা ঐ কৌতুককর মুহূর্তগুলি তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করেন।

এপ্রসঙ্গে অত্যন্ত চমৎকার মন্তব্য করেছেন ঈগলটন : 'Meaninglessness can be a blessed moment of release of a lost innocent domain for which we are all nostalgic, a temporary respite from the world's tyrranical legibility in which we slip into the abyss of silence!' অতি-অর্থবহত্ব যখন অত্যাচারী হয়ে ওঠে, তথাকথিত অর্থহীনতার মধ্যে আমরা পেতে পারি মুক্তির আনন্দময় পরিসর। হারিয়ে-যাওয়া সারল্যের সেই পরিসর আমাদের স্মৃতিমেদুর করে তোলে ; কিন্তু নিপীড়ক তাৎপর্য-অতিরেকের কবল থেকে শুধুমাত্র সাময়িক পরিত্রাণই সম্ভব। তবু, একথা লিখতে হয় যে, প্রসঙ্গক্রমে ঈগলটন যেভাবে স্ট্যালিনবাদ ও কার্নিভাল, জীববিদ্যা ও ইতিহাস, সমরূপতা ও পার্থক্যের মধ্যবর্তী অদৃশ্য সীমারেখার কথা বলেছেন—সেই ব্যাখ্যা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। এমন কী, তা অতিদূরান্বয়ী যা মূল বক্তব্যকে ঝাপসা করে দিয়েছে। তবে উপন্যাসের দার্শনিক উদ্ভাস সম্পর্কে তাঁর

নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি স্মরণীয় : 'The novel records these truths, but is itself an image of them : to write is to cross a border where one's own ego ends, creating characters who are neither imaginary self-identifications nor opaquely alien, but who repeat the self with a difference.'। বস্তুত অসামান্য দ্যোতনাগর্ভ এ-মন্তব্য শুধুমাত্র মিলান কুন্দেরার আখ্যানবিশ্বই নয়, অন্য সমস্ত দিকপাল আখ্যানকারের লিখনবিশ্ব সম্পর্কেও সমান প্রযোজ্য। সার্থক উপন্যাস মাত্রেই নিজের অন্তর্বৃত প্রয়োজন এবং আকরণগত যুক্তিশৃঙ্খলা খুঁজে নেয়। উপন্যাসবিশ্বে ব্যক্তিগত ও সামাজিক অস্তিত্বের যাবতীয় বিধি-বিন্যাস পুনঃপরীক্ষিত হয় যার মধ্য দিয়ে সত্তার অসহনীয় লঘুতা পুনরাবিষ্কৃত ও অনেকটা পরিমাণে পুনরর্জিত হয়ে থাকে। অনেক সময় খেলাচ্ছলে জন্ম নেয় মহৎ সৃষ্টির উদ্যম যার মধ্য দিয়ে যথাপ্রাপ্ত অস্তিত্বের ক্ষীণতা ও দুর্বলতাকে যেন সংশোধন করতে চান ঔপন্যাসিক।

কিন্তু উপন্যাসের নান্দনিক প্রয়োজনে যা-কিছু আবিষ্কৃত ও পুনরাবিষ্কৃত হয়, তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কি ঈগলটন ব্যাখ্যার অতিরেকে পৌঁছে গেছেন? কুন্দেরার কথাবস্তুর অনন্য উপস্থাপনায় যে শ্লেষ ও বিয়োগ-অনুভবের দ্যোতনা রয়েছে, তা কি কেবল নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক সংস্থার ঈষৎ-তিক্ত সমালোচনা—এর মীমাংসা বরং পাঠকেরা করুন। রাষ্ট্র-সমাজ-ব্যক্তির সমবায়ী ভূমিকা কিংবা তাদের প্রখর অনুপস্থিত উপস্থিতি আখ্যানের অন্তঃস্বরকে নিয়ন্ত্রণ করলেও কুন্দেরা তো কখনও ভুলে যান নি যে তাঁকে মূলত সুখপাঠ্য অথচ চিন্তা-প্রসূ উপন্যাসের সংরূপ নির্মাণ করতেই হবে। এই অনস্বীকার্য প্রকাশ-ক্ষমতার জোরেই তিনি নানা দেশের পড়ুয়াদের সঙ্গে অনায়াস আত্মীয়তা তৈরি করে নিতে পেরেছেন। সব দ্বন্দ্বের নিরসন জীবনে হয় না যেমন, সাহিত্যেও হয় না। অমীমাংসিত দ্বন্দ্বকে বস্তুত সৃষ্টি-প্রেরণার ধাত্রীভূমি বলতে পারি। এই নিরিখে ঈগলটনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : 'For it is exactly from the irresolvable conflict between the unique and the necessarily repeatable, the fragility of the particular and the comedy of the collective that his fiction draws part of its formidable strength.'। মীমাংসাতীত দ্বন্দ্বের পরিসর জীবনে যেহেতু ক্রমাগত প্রসারিত হয়, আখ্যানকারের জন্যে কথাবস্তুর অনুষঙ্গও কার্যত অন্তহীন হয়ে পড়ে। জিজ্ঞাসা-মালায় গ্রথিত জীবন থেকে সত্য-প্রেম-সম্পর্ক-অভিজ্ঞান-পূর্ণতা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্নোপযোগী পরিস্থিতি নির্মাণ করতে-করতে আখ্যানের এক সংরূপ ও লিখনকৌশল থেকে অন্য সংরূপ ও লিখনকৌশলে পৌঁছে যান মিলান কুন্দেরার মতো ঔপন্যাসিকেরা। কুন্দেরা স্বয়ং জেরোমির জন নামে কোনো-এক গৌন পূর্বসূরি চেক ঔপন্যাসিকের রচনা সম্পর্কে যে-দ্যুতিময় মন্তব্য করেছেন : 'he was not just copying truths stitched on the curtain of preinterpretation' (The Curtain : London : 2006 : 122), তা সমস্ত যথার্থ আখ্যানকারের পক্ষে মান্য প্রাক্‌শর্ত। ঈগলটনের প্রবন্ধটি আমাদের কুন্দেরা-পাঠে সহায়ক নিশ্চয় ; তবে পূর্বধার্য বিশ্লেষণের দ্বারা আচ্ছন্ন না-হয়ে নিজস্ব পাঠ-বিধি ও পাঠ-সংহতি খুঁজে নেওয়াই কাম্য।

এ সময়ের মননশীল প্রাবন্ধিকদের মধ্যে অন্যতম পুরোধা হিসেবে জিজ্ঞাসু পড়ুয়াদের কাছে সুপরিচিত তপোধীর ভট্টাচার্য (জন্ম ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯) শিলচরে আসাম কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের বরিষ্ঠ অধ্যাপক এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য। এর আগে তিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে রবীন্দ্র অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। প্রতীচ্যের সাম্প্রতিক সাহিত্য-তত্ত্বে তাঁর বিশেষজ্ঞতা ইতিমধ্যে কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে। তপোধীর ভট্টাচার্যের মধ্যে কবি ও তাত্ত্বিক সমালোচকের বিরল সমন্বয় ঘটেছে। এখনও পর্যন্ত তাঁর কুড়িটি কাব্যগ্রন্থ এবং যাটেরও বেশি প্রবন্ধগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, আধুনিকতা ঃ পর্ব থেকে পর্বান্তর, 'বাখতিন ঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ, নারীচেতনা ঃ মননে ও সাহিত্যে, ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ, উপন্যাসের সময়, আখ্যানের স্বরান্তর, উপন্যাসের বিনির্মাণ, কবিতার রূপান্তর, জীবনানন্দ ঃ কবিতার নন্দন, সময় অসময় নিঃসময়, Indian Epic Tradition, Relocating Bakhtin, Between Two Worlds ইত্যাদি। অখণ্ড ও অবিভাজ্য মানববিশ্বের তত্ত্বে পৌঁছাতে চান তপোধীর, চিহ্নায়ন প্রকরণের সঙ্গে মেলাতে চান নন্দনতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসাকে।